মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদনা

ড. আবদুস সাত্তার

দীপ প্রকাশন ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৬

Mir Mosharraf Hossien Rachanabali
4th Volume
Edited by
Dr. Abdus Sattar

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬১ • প্রচ্ছদ : অনুপ রায়
প্রকাশক : শংকর মণ্ডল
দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক : লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ, ৭/১ গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা ৬৭
দাম : ২০০ টাকা

বাবা ও মা-কে

—যে ঋণ অপরিশোধ্য

সম্পাদকের অন্যান্য গ্রন্থসমূহ:

- বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক আখ্যান
- সাহিত্যপাঠ নবপত্র

সম্পাদনা

- চেতনার তরবারি : কাজী আবদুল ওদুদ
- কালোয় ঢেকেছে আলো
- নির্বাচিত রচনা : সুফিয়া কামাল
- মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী (১ম খণ্ড)
- মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী (২য় খণ্ড)
- মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী (৩য় খণ্ড)

প্রাক্‌-কথন

মীর মশাররফ হোসেনের সমগ্র রচনা প্রকাশের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হল। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও মীর ভাষাচর্চা ও সাহিত্যসৃষ্টিতে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখক হয়েও একটা নিজস্ব আদল গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। আখ্যানবৈশিষ্ট্য হিসাবে তাঁর লেখায় দোভাষী পুঁথি, রূপকথা এবং অধ্যাত্মকথাও প্রাধান্য পেয়েছে। এই খণ্ডে রয়েছে মীরের চিরায়ত গ্রন্থ 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'। সৈয়দ আলী আহসান-এর লেখনীতে : 'চলতি গদ্যের ক্ষেত্রে যে গ্রন্থটি মীর মোশাররফ হোসেনকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর করে রাখবে তা হচ্ছে গাজী মিয়াঁর বস্তানী।' এই গ্রন্থে মীর সুন্দর শব্দ-বিন্যাস ও প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার করেছেন। অবিভক্ত বঙ্গের সমাজ-জীবনের শঠতা এবং প্রবঞ্চনার ছবি ফুটে উঠেছে। সমাজের মোহান্ধ-স্বার্থান্ধ মানুষ-রূপী এক একটি প্রাণীর নামাঙ্কনই চরিত্রকে পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। আখ্যানটিকে রূপক-কাহিনী-রূপে অভিহিত করা যায়; যার পূর্বসূরি একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' মীরের রচিত শেষ উপন্যাস। প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে। এর প্রথম সংস্করণ ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। বৃহৎ এই গ্রন্থটি মোট ২৪টি নথিতে বিভক্ত। এ ছাড়া রয়েছে গাজী মিয়াঁর আত্মপরিচয়, বস্তানী প্রাপ্তির বিবরণ, অপর হস্তে অর্পণের কারণ, পরিণাম এবং সবশেষে গাজী মিয়াঁর বিদায়। এই গ্রন্থে মীর তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন অনাচারের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। প্রায় জনা পঞ্চাশেক পাত্র-পাত্রীর বিচিত্র চরিত্রের বিরাট মিছিলের মাধ্যমে লেখক সে যুগের সামাজিক শঠতা ও প্রবঞ্চনার ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সমাজ ও ধর্মের সেবকেরা বিভিন্ন রঙের মুখোশ পরে কীভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছেন; তারই মর্মস্পর্শী বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশের অভিজাত সমাজের নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক দুর্নীতির প্রকাশই এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। তৎকালীন বঙ্গে জমিদারদের যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা 'বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন/একেবারে অর্বাচীন/বাঙ্গালার প্রায় জমিদার।'

অথবা 'অলসের দাস হয়ে/বিছানা বালিশ লয়ে/গড়াগড়ি যান দিনরাত।' তাঁর লেখনী আরো তীক্ষ্ণ, বাঙ্ময় : 'জমিদারগুলি এমন বেআক্কেল, ধর্মের জন্য দান করে না। কেবল নাম কিনবার দান। কেমন মজার দান।'

গ্রন্থে বর্ণিত স্থানগুলির নাম অরাজকপুর, যমদ্বার, নচ্ছারপুর, আহ্লাদগঞ্জ, খামখেয়ালীগঞ্জ, পাতাল গ্রাম, নেংটিচোরা গ্রাম, কুলকুচনগর। পুলিশ ইন্সপেক্টরের নাম তেছমার খাঁ, থানার নাম হাতপাতা। কথকের নাম ভেড়াকান্ত। তাকে 'আলাল', 'হুতোম' ও 'কমলাকান্তে'র উত্তরসূরি বলা যায়। চরিত্রগুলির নামও ইঙ্গিতবহ-ঘরভাঙা সান্যাল, মাথাপাগলা রায়, ধামাধরা সরকার, ধিনতাধিনা বাবু, ধড়িবাজ ঠাকুর, উনুপাজুড়ে ঘোষ। রয়েছে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কোর্ট-কাছারি ও থানার ভয়াবহ ছবি। মীর দাবি করেছেন, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানীর মধ্যে না আছে এমন কথা নাই, দুনিয়াজাহানে যাহা আছে, সংসারক্ষেত্রে যত প্রকার বৃক্ষলতা, গুল্ম-গাছা, আগাছা-পরগাছা, বিশাল রসাল, মিষ্ট কটু কষায় টক অম্লমধুর ছোটবড় সর্বাঙ্গ কণ্টক, সর্বাঙ্গ মধুমাখা, নয়ন মনের তৃপ্তিকর, বিরক্তিকর যাহা যাহা আছে গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে তাহার অভাব নাই।'

এই আখ্যানের মূল পটভূমি যমদ্বার, মীর যাকে দেলদুয়ারের আদলে রচনা করেছেন। টাঙ্গাইলের নাম হয়েছে অরাজকপুর এবং ময়মনসিংয়ের নচ্ছারপুর। অরাজকপুরের হাকিম ভোলানাথ ও অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে কুঞ্জনিকেতনের বেগম পয়জারুন্নেসার অন্তরঙ্গতা এবং যমদ্বার গ্রামের জমিদার সোনাবিবি ও তাঁর বেয়ান মনিবিবির পারস্পরিক শত্রুতা, কাহিনির দু'টি মূল ধারা। কাহিনির সূত্রপাত ভোলানাথ এবং পয়জারুন্নেসার সম্পর্ক বর্ণনায়। প্রধান চরিত্র তিনজন মহিলা মুসলমান জমিদার। পয়জারুন্নেসা, মনিবিবি ও সোনাবিবি। এঁরা সবাই বিধবা। প্রধান পুরুষ চরিত্র হচ্ছে ভোলানাথ বা হাকিম সাহেব। ব্যক্তিটি অসৎ, লোভী এবং সংকীর্ণমনা। প্রকাশ্যে বেগমের সঙ্গে সখ্যতা থাকতেও তিনি আড়ালে বেগমের নিন্দা করে বেড়ান। সোনাবিবি ও মনিবিবির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির মূলে জমিদার সবলোট চৌধুরী, যমদ্বারের একমাত্র পুরুষ চরিত্র। সবলোটের লাম্পট্যের বিবরণ বিদ্রুপ ও হাস্যরসে কৌতুকাবহ হয়ে উঠেছে। গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটি চরিত্র হল 'ভেড়াকান্ত', 'দাগাদারি' ও 'জয়ঢাক।'

পয়জারুন্নেসা বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন পছন্দ করেন। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর অবাধ মেলামেশা। স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁদের সঙ্গে তিনি প্রেমের অভিনয়ও করেন। অবরোধ প্রথাকে অবজ্ঞা করেন। ধর্মের রীতিনীতির ধার ধারেন না। সংগীত ও নৃত্যের উৎসাহী বলে পুরুষের সঙ্গে 'সংগীতে সংকীর্তনে' অংশগ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। যাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পান এবং যার বিরুদ্ধে মনের আক্রোশ তাঁর সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন জনপ্রিয় ভেড়াকান্ত ওরফে গাজী মিঁয়া। সে দরিদ্র অথচ তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী। ভেড়াকান্তকে কয়েকদিনের জন্য হলেও জেলহাজতে কয়েদির মতো জীবনযাপন করতে তিনি বাধ্য করেছিলেন। মামলার শুনানির দিন নচ্ছারপুর জেলার

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁর মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে কায়মনে প্রার্থনা করেছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশের অভিজাত সমাজের নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক দুর্নীতির বিশদ ছবি রয়েছে। মামলা-মোকদ্দমায় হাকিম-উকিল- অভিজাতদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, দুঃস্থের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেও বিশ্বাসঘাতকতা করা, বিপদের দিনে বন্ধুর চরম বিশ্বাসঘাতকতা, পুলিশ-জেল-কর্মচারী-জেল ডাক্তার-দারোগাদের অসাধু উপায়ে অর্থোপার্জন, মানুষে-মানুষে বিশ্বাসহীনতা, তাদের মধ্যে সততা ও সাধুতার নির্বাসন, অত্যাচারী জমিদারের পরস্ত্রী ও দরিদ্রের সর্বস্ব অপহরণ—এসবই রসসিক্ত কুটিলতায় প্রকাশ পেয়েছে। মীর লিখেছেন, 'টাকার অভাবে কত মুসলমান-বালক গরুর দলে মিশেছে, টাকার অভাবে কত ভদ্র বংশের ছেলে কত প্রকার নীচ ব্যবসা অবলম্বন করেছে, কত পরিবার হা অন্ন, হা অন্ন করে ঘরে পড়ে মরছে। কত দুধের ছেলে এক ফোঁটা দুধের জন্য, এক মুঠো ভাতের জন্য ছটফট করছে, সেদিকে লক্ষ্য নাই। ...কেবল নাম ফুটাবার জন্য দান।'

এর পাশাপাশি স্থান পেয়েছে সে যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষত স্ত্রী শিক্ষার অবস্থা, যুগ সংস্কার ও বিশ্বাস, সমাজে নারীর স্থান, হিন্দু ও মুসলিম সমাজে নারীর মর্যাদা, মুসলমান নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক। মুসলিম সমাজের স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে তিনি লিখেছেন 'মুসলমান রমণীর মধ্যে বিদ্যাচর্চা ও শিখিবার সুপ্রশস্ত পথ নাই, জ্ঞানলাভের কোনও উপায় নাই। ভালমন্দ বিবেচনা করার শক্তি নাই।' বলা বাহুল্য, মুসলমান সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা সে যুগে ছিল না। ১৮৮২ সালে 'ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে' দেখা যায় ৫৬৮ জন মুসলিম মহিলার মধ্যে একজন লিখতে বা পড়তে পারেন। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' পাঠ করে অক্ষয়কুমার মৈত্রে'য় লিখেছিলেন 'বস্তানীর পল্লী-চিত্র ইংরেজ রাজ্যের লজ্জার বিষয়। পড়িতে পড়িতে মনে হয় ইংরাজ রাজ্যের বাহিরে বিলাতি বার্নিস, ভিতরে টিনের পাতা। দেখিতে খুব জমকালো। আইন আছে, আদালত আছে। আপীলের উপর আপীল আছে, কিন্তু বিচার নাই।' এই গ্রন্থে সাধু ভাষা ব্যবহৃত হলেও সংলাপের ক্ষেত্রে কথ্যরীতির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

পশ্চিমবঙ্গে মীর মশাররফের সমগ্র রচনাবলী পুনর্মুদ্রণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তাঁর সমস্ত রচনা অগ্রন্থিত, অপ্রকাশিত থাকা যেমন সমগ্র জাতির ক্ষতি, তেমনই তাদের বাঙলা ভাষার পাঠকের কাছে অবিলম্বে সহজপ্রাপ্য করে তোলা একটা মস্ত দায়-ও বটে।

আজ আমার যা কিছু সবই বাবা ও মা'র দান। সম্পর্কের চিরকালীনতায় তাঁদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও প্রেরণায় জীবন ঋদ্ধ। বলা যায়, 'Our Bond is unbound'. এই খণ্ডটি তাঁদের প্রতি নিবেদিত, উৎসর্গীকৃত।

আত্মজা সানিয়া ও সহধর্মিণী ইন্দ্রাণী আমার সকল কাজের বস্তুনিষ্ঠ সমালোচক। তাদের প্রতি রইল আমার অকুণ্ঠ ভালোবাসা।

'দীপ প্রকাশন'-এর কর্ণধার শ্রী শংকর মণ্ডল, তাঁর অত্যুৎসাহী পুত্র দীপ্তাংশু মণ্ডল

ও আশিস চৌধুরীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের তরুণ গবেষক রাহুল ওরফে অরিন্দম দাশগুপ্ত প্রকল্পটির পরিকল্পনা ও রূপায়ণে যথাসম্ভব সহায়তা করেছেন। তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ছোটো করতে চাই না। মীরের দুষ্প্রাপ্য রচনার সংগ্রাহক বাংলাদেশের 'কালি ও কলম' পত্রিকার হাসনাত ভাই-এর প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আবদুস সাত্তার

গাজী মিয়াঁর বস্তানী

প্রথম নথি

অরাজকপুর হাকিম ঝাঁহাপনার[১] বাসগৃহ। বাসগৃহ বৃহৎ একখানি আটচালা ঘর—উপরে করোগেট্ আয়রণের চাল, পাকা দেয়াল দিব্বি চুনকাম করা, আটচালার চারিদিকে বাগান, নানাবিধ রঙ্গ বিরঙ্গ ফুলের গাছ, পাতার গাছ ; টগর, গোলাপ, মল্লিকা, ক্রোটান, গোলসর্ব্ব, বিজলী, কড়কের জীবন্ত ফুটন্ত অনন্ত বাহার। সম্মুখে স্রোতস্বতী—মৃদুমন্দ প্রবাহে প্রবাহিতা, বজরা বোট লাল ডিঙ্গি, লাঞ্চ[২] বাঙ্গলা পান্সী, বোঝাই নৌকা, সর্ব্বদা উজন ভাটী যাওয়া আসা করিতেছে। হাকিম সাহেব সাহেবি পোষাকে সাহেবি ধরনে চেয়ারে বসিয়া একখানা পত্র হস্তে কি যেন ভাবিতেছেন। সুবদন হইতে সুগন্ধি চুরুটের ধূম উড়িতেছে, মনঃসংযোগে পত্রখানি মনে মনে পাঠ করিতেছেন। সন তারিখ পর্য্যন্ত পড়িতেছেন, আবার মনের আবেগে—কলিজার টানে "প্রিয় মহাশয় হইতে আপনার চির ভালবাসা ভগিনী পয়জারন্ নেসা বেগম" নাম সহি পর্য্যন্ত পড়িয়া চিত্তসুখ সম্ভোগ করিতেছেন।

কিঞ্চিৎ দূরে একজন ভোজপুরিয়া—নাম কোট্না সিংহ দণ্ডায়মান। সেপাইজীর মাথায় লাল পাগড়ি—বুকের উপর চকমকে রূপার চাপরাস। সবুজ রঙ্গ মখমলের বেল্টে চাপরাসখানি বাঁধা। ইংরেজী অক্ষরে বাদামী কেতায় নাম খোদা বি. এন. বি,—উপরে জোড়া সিংহের আকৃতি। সিপাইজীর আকৃতি গঠন বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। যিনি যেরূপ ভালবাসেন, তিনি সেইরূপ পাগড়ি, উর্দ্দি, চাপরাসে সাজাইয়া, কোট্না সিং মনে করিয়া, চিত্র দেখিতে থাকুন।

কথা ফুটিল। প্রথম কথা হাকিম পক্ষ হইতে আরম্ভ হইল। কথা কোন প্রকারে হিন্দি ভাষাতেই আরম্ভ হইল। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালাতেও আলাপ চলিল। হাকিম সাহেব দেশালাই জ্বালিয়া চুরুট ধরাইলেন, গর গর করিয়া ধূঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে মিটি মিটি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোম্‌রা নাম ঠো হাম্ ভুল গেয়া।"

সেপাইজী জোড় হস্তে—"খোদাবন্দ মেরা নাম কোট্না সিং পাড়ে সেপাইজী জাঁহাদার। হাম বহুত রোজসে সাহেবকা নীমক খাতা হোঁ। হামসে কুই বাত চ্ছেপা নাই হুজুর।"

হাকিম সাহেব চক্ষু মিটি মিটি চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন।

"হাঁ হাঁ—আচ্ছা—আচ্ছা"। এই কথা বলিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পায়চারি করিতে মন দিলেন। দুই চারি পা চলিয়া যান, আর পত্রখানি এক একবার পাঠ করেন। বহু রকমে ফিরিয়া ঘুরিয়া, হেলিয়া দোলিয়া, মাথা নওয়াইয়া—কোন সময় একেবারে চক্ষুর নিকট

লইয়া—পত্রখানি বহুবার পাঠ করিলেন। চুরূটের ধূম ছাড়িয়া পুনরায় কথা আরম্ভ করিলেন।

"সোন, কোটনা সিং পাড়ে সিপাইজী জাঁহাদার, তোম্‌রা বেগাম সাহেব আপনা হাত্‌সে লিখ সাক্‌তা হায়?"

সেপাইজী তিন হাত আগে বাড়িয়া, জোড় হাতে মাথা নাওয়াইয়া অথচ চক্ষে চক্ষে মিল রাখিয়া বলিল—

"হুজুর ক্যা কঁহো"? আরে এত বাঙ্গলা! ইংরেজি, বাঙ্গলা, উর্দ্দু, আরবী, ফারসী, নাগরী, কাইতি, উড়িয়া, জর্ম্মান, চিন, গ্রীক, আওর হাম ভুল গেয়া, হুজুর! এক কুড়ি দশ জবনমে উন্‌কা হাত চালতা হায়, কালাম দৌড়তা হায়, (ঈষৎ হাস্যে) হুজুর ক্যা কঁহো, পায়ের ছুটতা হায়। হিন্দুস্তানী, ইংরেজি, মগী, মনিপুরি, যেত্‌না রকম, পায়েরকা চাল হায়, সাব রকম মে জোরসে চালতা হায়।"

হাকিম সাহেব ক্ষণকাল পদগতি স্থির রাখিয়া সজোরে চুরূটের ছাই দুই তিন বার ঝাড়িয়া বলিলেন—

"আচ্ছা সেপাইজি! বেগাম সাহেব্‌কা পাছ হাম্‌রা সালাম বোলো। দো-ঘণ্টা বাদ্ চিট্টিকা জবাব জায়গা।"

সেপাইজী জোড় হাতে সেলাম বাজাইয়া বাঙ্গলা হইতে বাহির হইলে হাকিম সাহেব চুরূট^৩ টানিতে টানিতে পূর্ব্বমত হেলিয়া দোলিয়া পায়চারি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে স্বগত বলিতেছেন—

"মুসলমান মধ্যে নেসা কথাটা কি! স্ত্রীলোকের নামের শেষে—সম্ভ্রান্ত এবং মাননীয়া স্ত্রীলোকদিগের নামের শেষে—ব্যবহার হয়, ইহার কারণ কি? কি ভাষা? এ পাহাড় জঙ্গল অঞ্চলে এত নেসা কোথা হইতে জুটিল? যদি সম্ভ্রান্তা, সাধ্বী, সতী, স্ত্রীলোকের নামের শেষে "নেসা" কথা ব্যবহারের কথা হয়, তাহা হইলে বলিব, জগতে প্রাচীন কথার আর যথার্থ অর্থ নাই। নানা অর্থে নানা অনর্থ ঘটিয়াছে। আমার অনুমান ঠিক্ না হয়, তবে যা ইচ্ছে তাহাই হউক। নেসার দল দিন দিন উন্নতি লাভ করুক। হাত পা মুখ খুব চলিতে থাক্।"

এমন সময় অর্থাৎ ঐ স্বগত কথা কহিবার শেষ সময় ঐ এক প্রকার ফাঁন্দে মিল গোছের আর এক হাকিম বাবু যাঁহাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, দাঁত ভরা বিষ, অহঙ্কারে ভোর বিভোর মাতয়ারা, সময় সময় জ্ঞানহারা—নাম ঋতুরাজ—পরিষ্কার সার্ট গায়ে, কোঁচান চাদরখানি কাঁন্দে ফেলান, বেঁটে খাট হৃষ্ট পুষ্ট দিব্বি দুষ্ট চেহারা বেওফা কমিন, গজদন্ত-মণ্ডিত ষষ্ঠি-মুণ্ড হস্ত-মুঠে ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে, বিষদন্ত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে, হাকিম সাহেবের বাঙ্গলার বারান্দায় উপস্থিত হইতেই, হাকিম সাহেব, মাথা নওয়াইয়া দক্ষিণ হাত উঠাইয়া মুসলমানি কায়দায় বা আদাব বলিলেন—"খোদাবন্দ আদাব! আসুন আসুন! আইয়ে, বইঠিয়ে, বসতে আজ্ঞা হয়।"

সম্পর্ক কিছু গুরুতর! তাহাতেই এত আদর, এত সম্মান। উভয়ে চেয়ারে বসিলেন

দেদার চুরুট পুড়িতে লাগিল। হাকিম সাহেব, প্রিয় বন্ধুর অভ্যর্থনা করিয়া, চুরুট, পান, তামাক, ইত্যাদি দ্বারা আদর অভ্যর্থনা করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—

"মহাশয় বলুন দেখি! "নেসা" কথাটার অর্থ কি? আপনি ত মুসলমান প্রধান স্থানেই বহুকাল কাটাইয়া মঙ্গল হেতু জঙ্গলে আসিয়াছেন, অনেক জানা শুনা আছে। তাহাতেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন ত মহাশয়! নেসা কথাটা কি? নেসার অর্থ কি? উচ্চারণই বা কি? "নেছা" কি "নেসা"। স্ত্রীলোকের নামের শেষে মুসলমানেরা কেন "নেসা" শব্দ বসায়। এই জঙ্গলে যত নেসার ছড়াছড়ি দেখি, এমন আর কোথাও দেখি না। বড় বড় শহর, বড় বড় নামজাদা নগরে, কসবা—জায়গায় এত নেসার ভিড় নাই। দেখুন ত, দেবী, দাস্যা, দাসী, কেমন সুন্দর আখ্যা, কেমন নম্র-ভাবপূর্ণ উপাধি। তারপর না হয় হাল ফ্যসান অনুসারে আমরা যেমন নিজের লাঙ্গুল কাটিয়া স্ত্রীলোকের নামের পিছনে সংযোগ করিয়া দিয়াছি, যথা মুক্তকেশী, চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়, শশীবালা লাহিড়ী, সরলা সান্যাল, এ প্রকার হলেও একটু মানে টানে হয়। কথার মধ্যেও আসে। একি! অর্থ নাই, মানে নাই—শ্যাম চাঁদ নেসা, মান নাই সম্ভ্রম নাই—হাঁটুবন্ নেসা। দেখা নাই শুনা নাই—মস্তবরন নেসা। কাল কি সুন্দর জানা নাই—দেসালাই ওন্ নেসা।"

ঋতুরাজ বাবু হাসিতে হাসিতে চক্ষু দিয়া জল বাহির করিয়া বলিলেন—"মহাশয়! ভাল নাম বাহির করিয়াছেন। শ্যাম চাঁদ নেসা নাম নহে। ওর যথার্থ উচ্চারণ আছে—অর্থ আছে। মুসলমান স্ত্রীলোকের নামের শেষে "নেসা" ব্যবহার হয় খাতুন, বেগম, খানুম কথাও ব্যবহার হয়। সচরাচর—নেসাই কথা।"

হাকিম সাহেব সজোরে দেশালাইয়ের কাটি জ্বালাইয়া চুরুট ধরাইতে ভুলিয়া—অন্যমনস্ক হেতু শুধু কাটীটি জ্বালাইতে জ্বালাইতে বলিলেন,—

"ভায়া—কথাই হউক, আর চলতিই হউক, তাতে আমার কোন কথা নাই। কথাটা শুনে যেন, কানে মনে প্রাণে কেমন কেমন লাগে। এই সকল ঝাড় জঙ্গলে নেসাদের ভাব ভঙ্গি দেখে চক্ষের ভাব ভাল থাকে না। দুঃখ হয়, চক্ষে জল পড়ে। এই বয়সে আরও অনেক জায়গা দেখেছি, অনেক বড় লোক নবাব সুবার মজ্‌লিসে স্থান পেয়েছি। কিন্তু নেসার দলের এত বাড়াবাড়ী কোথাও দেখি নাই। দেখুন দেখি, কুঞ্জ নিকেতনে ফটিকন নেসা, নিকুঞ্জ বনে সোহাগন নেসা, কাঁটা জঙ্গলে কুমিরং নেসা, হাঙ্গরণ নেসা, কচ্ছপন্ নেসা,—এই প্রকার কত নেসা আছে, তার অন্ত নাই। ভায়া, আরও আশ্চর্য্য, এই নেসারা, প্রকাশ্য খোলা মহলে রাজ দরবারে, বিধবা কিন্তু গোপনে ভারি মজা—আর কিছু নয়, শাস্ত্রসঙ্গত সধবা।

"কি মজার কথাই বল্লেন। এক শরীরে দুই ভাব। প্রকাশ্য বিধবা গোপনে সধবা। অতি আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!!"

"হাঁ হাঁ তাই বটে, প্রমাণ দিব। দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইব, বুঝাইব—বাজি জিতিব।"

"আমি ত অবিশ্বাস করছি না। আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে—যা কখনও শুনি নাই—।"

"শুনবেন আর কি? নেসারা সকলেই প্রকাশ্য বিধবা, অর্থাৎ স্বামী নাই। স্বামীকুল এক পরামর্শ হয়ে, এক জোঠ বেঁধে জগৎ হইতে একেবারে সরেছে, জন-সমাজে মুখ দেখাতে ঘৃণা হয় বলে একেবারে জগতের সীমা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। আর এদিকে।—এক এক সার্টিফিকেট সিদ্ধ করে কার্য্য হাসিল করে, টাকা জমিদারী হাতে নিয়ে, যা মনে হচ্ছে তাই কর্চ্ছে। হক নাহক লোকের সহিত বিবাদ, ঝগড়া, মারামারি, কাড়াকাড়ি করে দেদার টাকা উড়াইয়ে, মহাজন মহাশয়ের নিকট খুব পুরু কাগজে—ষ্ট্যাম্প বসান কাগজে মহামহিম পাঠ লিখে, এড় ভাবে নাম সহি করে—টাকার তোড়া ঘরে তুলছেন, গাড়ী বোঝাই করে টাকার ছালা সকল মহাজন মহাশয়গণ পাঠাচ্ছেন। দুহাতে দশ হাতে খরচ করে আবার মহাজন নিকট আশ্রয় নিচ্ছেন। ঋণ জাল ক্রমেই, দুহাত—দশ হাত বেড়ে উঠছে। দেনায় দমিয়া যাচ্ছেন। স্বামী লিখিয়া গিয়াছেন, অন্য পতি গ্রহণ করিলে সম্পত্তির অধিকারিণী থাকিবেন না। ভায়া! এখন ভাবুন দেখি, এক শরীরে দুই ভাব হয় কি না : প্রকাশ্য বিধবা গোপনে সধবা হইতে পারে কি না? শাস্ত্রে আছে, দুই জন সাক্ষী একজন উকীল হইলেই কার্য্য শেষ। আর পাপ তাপ কোথায় কাহার নিকট ঘেঁষিতে পারে? এমন সুযোগ থাকিতে পাপের দায়ে কেন জাহান্নামে বাস করিবে? কাজেই গোপনে "সধবা"। বি. এল., পরীক্ষার সময় যদি প্রশ্ন দিত যে গোপনে সধবা প্রকাশ্য বিধবা—ইহার উত্তর লিখ, তাহা হইলে কাম ফতে। নেসারাত কম লোক নহে, ঈশ্বরের শাস্ত্রে, স্বামী নিদর্শন পত্রে, এবং সয়তানকে ফাঁকি দিয়া দিব্বি চাল চালিয়াছে, মাত হবে না কেন? আচ্ছা ভায়া নেসা কথাটার ভাল করে অর্থ করে আমায় বুঝাইয়া দিন।"

"তা বুঝাচ্ছি। কিন্তু আমি ভাবছি, কি অসাধারণ চালাকি।"

"চালাকি ত আছেই, কিন্তু চালাকিতে কুলায় কোথা? ক্রমেই অধঃপাতে—গোপন কথাটা তিন অক্ষর—থাকেও তিন ঘণ্টা—নয়, তিন দিন। নিতান্ত পক্ষে না হয় তিন দিবস, চতুর্থ দিনেই প্রকাশ—ঢাকে ঢোলে কাটি। কলঙ্কের ডালি। এক থাকের ডালি নয়। তিন চার থাকের ডালি মাথায় করে বহন কচ্ছেন।"

"ভাল কথা। ও জাতের মুখ যত ভোঁতা হয়, ততই আমাদের মঙ্গল। গলাকাটা জাত ভারতবর্ষ হতে, নিতান্ত পক্ষে বাঙ্গলাদেশ হতে, একেবারে উঠে গেলেই দেশের মঙ্গল। যাহক, যে কথা তুলেছেন, সে কথাই চলুক, নেসা কথাটা নেসা নহে—"নেছা"।"

"তাত বুঝলেম। হাতে লিখে মুখে উচ্চারণ করে বুঝিয়ে দিন। তা—কি—না—উচ্চারণে প্রভেদ কি? তাহা লিখে না বুঝাইলে মুখে মুখে বুঝিতে পারিব না।"

"বুঝাচ্ছি লিখিয়া দেখাচ্ছি। একটু অপেক্ষা করুন। আপনার রাম হরি আজ কোথা?"

হাকিম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিলেন--"কুই হায়?"

কোন খোঁজ খবর নাই। কেহ আসিল না। রাম হরির আগমন হইল না। পুনরায় রাগত স্বরে অধিক উচ্চরবে ডাকিলেন, "এহাঁ কুই হায়?"

শাড়া শব্দ নাই। ঋতুরাজ বাবু বলিলেন, "মহাশয়, একটা ঘণ্টা রাখিলে ভালো হয়। এত চেঁচাচেঁচি করে মাথার বেদনাকে নিমন্ত্রণ করে আনবেন না।"

"না মহাশয়। আজকাল ঘণ্টার পরিবর্ত্তে শুনছি সিঙ্গে হয়েছে, একজন বিলাত-ফেরতা বাবু আজকাল সিঙ্গে বাজিয়ে চাকর ডাকেন। আমিও একটি সিঙ্গে কিন্‌ব মনে করছি।"

"সিঙ্গে কিনিবেন কিনুন—কিন্তু সিঙ্গার হাল ত জানা আছে—সকল কাম ফলে বলে, —সিঙ্গা বাজান বলে।"

"ভাল কথা বলেছেন। সিঙ্গা কেনা হবে না। ঢোল বাজিয়ে চাকর ডাকবো।" পুনরায় উচ্চঃস্বরে—"সুয়ার লোক কুই হ্যায়।"

ডাকাডাকি হাঁকাহাকির পর হাকিম সাহেবের প্রিয় খানসামা রাম হরি ঢুলিতে ঢুলিতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে হাজির হইল। হাকিম সাহেব মুখ বাঁকা করিয়া বলিলেন—

"কিরে বেটা, এতক্ষণে বুঝি ঘুম ভাঙ্গিল। রাত্রে কি চুরি করিস্?"

রামাও তুড়ুক জবাব দেনেআলা চাকর—বলিল—"সারা রাত হুজুরদের কাজেই কাটাই—জেগে থাকি—চুরি করবো কোন সময়?"

"সুয়ার, হুইস্কি আওর সোডা ওয়াটার?"

রাম হরি জোড় হাতে বলিল, "হুজুর হুইস্কি নাই, বিলাতি পানিও নাই।"

ঋতুরাজ বাবু বলিলেন, "বলিস কি, রাম হরি তুই বলিস কি? বেটা বলিস কি? লক্ষ্মীর ঘরে অন্নের অভাব? শিবের ঘরে ভাঙ্গের অনাটন? ওরে বেটা, এই সময় এই কথা,—বলিস কি?"

হাকিম সাহেব চক্ষু লাল করিয়া বলিলেন, "হারামজাদা, পাজির পাজি, গরুখোর। (চেয়ার হইতে উঠিয়া ঘুসি মারিতে অগ্রসর, ঋতুরাজ বাবু কর্ত্তৃক বাধা।) আমার ভাণ্ডারে হুইস্কি নাই! কাল মফঃস্বলে যাইবার সময় ক বোতল সঙ্গে দিয়েছিলি? হাঁরে বেটা, তা কি আমি দেখি নাই? শালা চোর। তিন চার বোতল হুইস্কি বাতাসে উড়ে গেল। আমি ক গ্লাস খেয়েছিলাম?"

রাম মাথা নওয়াইয়া বলিতে লাগিল, "হুজুর। আমার কোন কসুর নাই। সাড়ে তিন বোতল সঙ্গে নিয়েছিলাম। আমাদের উপর অবিশ্বাস করে যাঁর জিম্মায় রেখে ছিলেন, তিনি সারা রাত পাহারা দিয়ে বসে বসে হুইস্কি তিন বোতল কাবার করেছেন। হুজুর, যিনি রক্ষক, তিনিই ভক্ষক।"

হাকিম সাহেব আরও চটিয়া উঠিলেন—"কি বলিস আমার হুইস্কি হেড কনেষ্টবল বেটা খেয়েছে। তুই বলিস কি? আজ বলছিস, কাল বল্লি না কেন? আমার হুইস্কি পুলিশে খায়?"

ঋতুরাজ বাবু বলিলেন—"সেত সিড়ি বসিড়ি চলে আসছে। তাতে আর আপত্তি কি? দোষই বা কি? এখনকার উপায় কি?"

রামা কোন কথা না বলিয়া অমনি দৌড়। "কি রাম হরি বাবু। কোথা যাও?" ঋতুরাজ বাবু কত ডাকিলেন, শুনিল না। হাকিম সাহেব বলিলেন, "ডাকবেন না, কার্য্যের দৌড় ভিন্ন অকার্য্যের দৌড় নহে—একটু বিলম্ব হবে।"

ঋতুরাজ বাবু বলিলেন, "হো হো। বুঝেছি বিলম্বের কারণ? বুঝেছি—আচ্ছা, ততক্ষণ নেসার অর্থটা পরিষ্কার হক।"

"নেসা না হলে নেসার আলোচনা করা হবে না। আজ সারা দিনটা একেবারে ফাঁকে ফাঁকে গেছে। আগে কাচারিতে বসেই গ্লাস মুখে দিতেম, তাতে কেউ কেউ আপত্তি করে বসলে!—সম্মুখে নয় কানা ঘুষ। মোক্তার মহলে কানা ঘুষ হইতে আরম্ভ হইল। করি কি—শেষে নাজিরের কামরায় বোতল গ্লাস রেখে উঠে গিয়ে প্রাণটা শীতল কর্ত্তেম। তাও এদেশের লোকের চক্ষে ভার হয়ে উঠলো—সহিল না। কি করি বাধ্য হয়ে তাহাও ত্যাগ কর্ত্তে হলো। স্থানে অস্থানে ঐ কথার আন্দোলন। আমি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করি—সাহেবি টুপি মাথায় দিই—নানা কথার গল্প দশ গুণ বাড়িয়ে আরম্ভ হইল। শেষে দেখি, খবরের কাগজে পর্য্যন্ত ঐ সকল কথা। মনে করেছিলাম—বাসায় গিয়ে এখনি প্রাণটা শীতল করবো, তা হলো না,হেড কনেষ্টবল বেটা ভারি দাগা দিয়েছে। আমার মাথায় হাত বুলিয়েছে। আচ্ছা, আমি পাজিকে হাতে পাইবই—কোন না কোন দিন আমার হাতে আসবেই, এ হাতে পড়বেই। তখন হুইস্কির নীচের স্বাদ সমেত বাহির করবো।"

"আচ্ছা তা করবেন। বলুন দেখি, আমাদের বেগম সাহেব কি প্রকারের লোক? তাঁহার কায়দা কানুন হাব ভাব দেখে অনেক কথাই মনে পড়ে—কিন্তু তাতে আমি কোন দোষের কারণ দেখতে পাই না।"

"দোষ কি আছে? যা আছে, তা সকলেরই আছে। যেমন জ্বালাতন নেসা, পাথরণ নেসা, তেমনি পয়জারণ নেসা, সেই প্রকারের ফটিকন নেসা। ভিন্ন ভেদ কিছুই নাই, তবে বেগম সাহেব ভারি চতুর। চালাকির বেহদ্দ, সরম সকলেরই সমান। লজ্জার ভাগটা প্রায় এক প্রকার। তবে ইহার লেখা পড়া জ্ঞান আছে, মুখ দারাজ—হাত দারাজ, কথা দারাজ, পুরুষের নাক কান কেটে বাজারে বেচতে পারেন। ইচ্ছাটা সকলকেই ফাঁদে ফেলেন, কিন্তু নিজে ফাঁদে না পড়েন।"

"ফাঁদে পড়বেন না এমন কি কথা। সে ফাঁদের নাম নাই। যে ফাঁদ খুব ফাঁদাল, বিশেষ চেষ্টা করিলে ফাঁদ ফাড়িয়া বাহির হওয়া যায়, সেই ফাঁদেই তাঁহার রোগ বেশী। আমাদের সঙ্গে মাখামাখি খাতির তওজা কার্য্য উদ্ধারের হেতু—নতুন ফাঁদ পাতা মাত্র।"

"তাইত দেখ্‌তে পাচ্ছি। শুনি অমুকে ফাঁদে পড়ে আট্‌কা পড়েছেন। অমুক বন্ধু ছট্‌ফট্‌ কচ্ছেন, জল চাহেন। এই ত নিত্য নূতন ফাঁদ—নূতন আমদানী।"

হাকিম সাহেব চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া বলিলেন, "কৈ রামার দৌড় আর ত চক্ষে পড়ে না—সে বেটা ফাঁকি দিয়ে আমাদিগকে বসিয়ে রেখে পালিয়েছে। দেখি, আরও দশ মিনিট দেখি। শুনুন! আমাদের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রায়ই বে-পর্দ্দা, পর্দ্দার নাম কি তাহারা জানে না। দশ হাজারী লোকও হাটে মাঠে ঘাটে বাজারে—সদর আলা, জজ ডিপুটী, মুনসীফ, উকীল, বড় বড় পায়াদার হাকিমের ঘরেও পর্দ্দার ব্যবহার অতি কম। কিন্তু নেসাদের এত পর্দ্দার ভিতর এমন বেপর্দ্দা—এত গোলযোগ, যে তাহার অন্ত নাই। আরও বেশী গোল স্বাধীন জানানা স্বাধীন জমিদার বড় লোক শ্রেণীর মধ্যে। আমাদের মধ্যে পুরুষ

জমিদার মহাশয়েরা মদে ভাঁড়ে, রাঁড়ে এয়ারকি করে, গান বাজনায়, গাড়ী ঘোড়ায় বজরায়, পিনিসে বড় মানুষী দেখাইয়ে, অনিয়ম, অত্যাচারে শীঘ্রই সিঙ্গে ফুঁকে যেখানে সেখানে চলে যাচ্ছেন। বিষয় সম্পত্তি যাহা থাকে, স্ত্রীর হাতে পড়ে। স্ত্রী ক্রমে স্বামীর ঋণ পরিশোধ করেন। নাবালক পুত্র কন্যা যেই থাক, তার পূর্ণ বয়স হ'তে হ'তে ঋণ পরিশোধ হয়ে বাড়ীঘর বিষয় সম্পত্তি দিব্বি, টলটলা হয়ে, সংসারটাও খুব জাঁকাল হয়ে উঠে। আর এই নেসার দলটা একেবারেই তাহার বিপরীত। এদের স্বামীকুল বেশ টাকা মজুদ করে, জমিদারীটা নিষ্কণ্টক করে স্ত্রীর হাতে সুপে দিয়ে জ্বালা যন্ত্রণা হতে সরে পড়েন, "নেসারা" বিবিয়ানা করে—ভালবাসা আমলার যন্ত্রণায়, হক নাহক ঝগড়া বিবাদ বাধিয়ে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঋণে জড়িত হয়ে শেষে বিষয় সম্পত্তি বাড়ীঘর বন্ধক বাঁধার নাম জাকাইয়া তোলেন। মজুদ টাকা কে কোথায় কোন পথে নিয়ে যায়, তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না।"

আবার সেই কথা! ও জাত যত অধঃপাতে যায়, ততই দেশের মঙ্গল। আমাদের কি? আমরা খাব, আমোদ করিব, মজা করিব—কিন্তু খুব সাবধান! ফাঁদে ফেলবো ভিন্ন। ফাঁদে পড়বো না। পেট পুরে, পোলাও, কোরমা, কাবাব, পারাটা, সঙ্গে সঙ্গে সেঙ্গীন, হুইস্কী, পোর্ট, ক্লারেট লিমনেড, সোডা, বরফ, যা ইচ্ছা ব্যবহার করবো। আমরা বসন্তের কোকিল, সুখের পায়রা —যেখানে ভরপুর আমোদ, যেখানে মজাদারী ব্যবহার সেইখানেই জুটি ও তাহারই বন্ধু বলে পরিচয় দেই। কিন্তু এ বন্ধুত্ব আমাদের সমাজে বেশী হয় না,—খাটেও না। নেড়ে জমিদার অথবা নেসার দলেই কি বেশী পশার। কাল পূর্ণ হলে উড়ে যায়। অরাজকপুর ডুবে যাক, দ পড়ুক, আমাদের কি? বেগম সাহেবেরই বা কি বা ধার ধারি? খানম সাহেবেরই বা কি সম্বন্ধ রাখি? খাতুন সাহেবই বা আমাদের কে? নেসার দলই বা আমাদের কে? যাঁর কেলিকুঞ্জ, তার—যার নিকুঞ্জ নিকেতন, তার—যার শান্তিকুটীর হইতে পারে, তার শান্তি—আমাদের আসে যায় কি?" হাকিম সাহেব বলিলেন—

"এ পলিসী মন্দ নয়। তবে, নুন খেলে তার গুণ গাওয়া চাই। গুণ নাই গাইলেম, নিমকহারামীটা ত করা যায় না, তার উপায় কি?"

"তার উপায় অনেক আছে। বেশী দিন আমার ইচ্ছা থাকে, খুব চোট, পাট করবো। বেগম সাহেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য, ভেড়াকান্তকে না হয় দুটি গালিগালাজ দিব। মকর্দ্দমা মামলা হাতে পড়লে, বিপক্ষগণ প্রতি খুব কর্কশ ব্যবহার করিব। যে মকর্দ্দমায় বেগম আসামী থাকবেন, ডিসমিস করি করি ভাব দেখায়। বিপরীত হইলে ডিগ্রী দেই দেই কথা রটাব, কিন্তু আসল যা, তা একেবারে অটলভাবে হৃদয়ে গেথে রাখিব। তার কড়া ক্রান্তিটুকু এদিক ওদিক হবে না, কখনই করবো না।"

"ঠিক বলেছেন মহাশয়। এই ভাবেই চাল দেওয়া, চলাফেরা করা কর্ত্তব্য।" রাম হরি হাঁপাইতে হাঁপাইতে হুইস্কী আর সোডা ওয়াটার লইযা ঘরের বারেন্দায় উঠিতেই—ঋতুরাজ বাবু বলিলেন—

"এইত রাম বাবু উপস্থিত। বা বা! খুব চালাক, ভারি হুসিয়ার। পাঁচ মিনিট মধ্যে ফিরে এসেছে, বেশ বেশ ওকে কিছু বকশিস দিতে হয়।"

হাকিম সহেব রাম হরির পিট চাপড়াইয়া বলিলেন—"জিতা রও বেটা। বকশিস পাবে, খুব মেহনাত করেছ। যেমন রেগে ছিলাম, তেমনি খুসি হয়েছি। যাও প্রাইভেট রুমে গিয়া কিছু চাট এনে গ্লাস চামচ্ কাঁটা ছুরি যা যা দরকার, শীঘ্র শীঘ্র নিয়ে রাখ—আমরা আস্‌ছি। আমি একখানা চিঠি লিখে আস্‌ছি।"

"না না মহাশয়, এখন আর চিঠি চৌপটীর দরকার নাই। সারাদিন কলম চালিয়ে এলেম, এখন দুদণ্ড বিশ্রাম করবো, তাও দেখি আপনি তার বিরোধী। সে কি কথা? চাকুরি বজায় যতটুকে থাকে, ততটুকু কালি কলম চালাবেন—

"না না আপনি গিয়ে বসুন! আমি আসছি। পাঁচ মিনিটের বেশী হবে না। একখানা নিতান্তই জরুরি পত্র।'

রাম হরিসহ ঋতুরাজ বাবু প্রাইভেট রুমে গমন করিলেন। হাকিম সাহেব পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পত্র লেখা শেষ হইল। পত্রখানা এইরূপ লেখা হইয়াছিল। যথা—

"মহাশয়। আপনার গুণ গরিমার গৌরব সৌরব অরাজকপুরে ভরপুর। মন্দ মন্দ বায়ু হিল্লোলে, চার দিক সুগন্ধে আমোদিত। সকলেই হরষিত। কমল দল সদৃশ বিকশিত। আমার সাধ্য কি মহোদয়ার আদেশ ইচ্ছা লঙ্ঘন করি। রাত্র ৮টার সময় অবশ্যই হাজির হইব।

আপনার দর্শনাকাঙ্খী,
প্রাণ যায় যায় দীন হীন,
ভোলানাথ।"

তাড়াতাড়ি পত্র খামে পুরিয়া শিরোনামা লিখিয়া "কুই হায়?" ডাক হাঁকিতেই নাজেম উদ্দীন আরদালী জোড় হস্তে হুজরে খাড়া হইল। হাকিম মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন, "এই চিটী লইয়া বেগম সাহেবের হাবিলীতে যাও। জবাবের জন্য অপেক্ষা কর না। চিঠি দিয়াই চলিয়া আসিবে।"

সেলাম বাজাইয়া আরদালী প্রস্থান করিল। ভোলানাথ বাবু চুরুট ধরাইয়া মৃদু রবে একটি গানের গদ ধরিয়া প্রাইভেট রুমের দিকে চলিয়া গেলেন।

সে গানটির দুই লাইন এই—

"প্রেম আলিঙ্গন হইতে আঁখির মিলন্ ভাল।
হব হব আশা ভাল হলেত ফুরাইয়ে গেল।"

দ্বিতীয় নথি

রাত্রি ১১টা বিশ মিনিট। সবলোট চৌধুরীর বৈঠকখানা ঘরের দরজা বন্ধ। ঘড়িটা দেয়ালের গায়ে টক্ টক্ শব্দে সময়ের গমন সংবাদ দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছেন। সবলোট চৌধুরী সেতার বাজাইতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে ঘড়ির দিকে আড় নয়নে দৃষ্টি করিতেছেন। দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছে। পিতলের দীপাধারে খাঁটি সরিষার তৈলে ডুবিয়া, বাতি দু'ট, মাথায় আগুন, মুখে ছাই করিয়া—গৃহকর্ত্তার হাবভাব দেখিতেছে, মনের ভাব বুঝিয়া ক্ষণে ক্ষণে মিটি মিটি ভাবে চক্ষু টিপি দিতেছে, আবার যেন মৃদু ভাবে হাসিয়া হাসিয়া অন্তঃরের আগন দগ্ দগ্ করিয়া বাহির করিতেছে, মাথা ফুটিয়া ধূম বাহির হইতেছে। সবলোট চৌধুরী সেতারের গদ্ মুখে আওড়াইতেছেন। কারণ এটা তার নূতন শিখা গত। ওস্তাদজী অতি যুবা দেখিতে সুশ্রী। এত অল্প বয়সে সেতার বাজান বিদ্যায় এতদূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন যে দেখিলে শুনিলে অবাক হইতে হয়। গতটী বেহাগ আর সিন্ধু ভৈরবীতে মিশ্রিত, বড়ই কঠিন। সব্‌লোট চৌধুরী মুখে দারা দারা করিতেছেন, সেতারের পর্দ্দায় পর্দ্দায় হাত চালাইতেছেন। ঘড়িটি টক্ টক্ করিতেছে। আর যে জ্বলিবার, পুড়িবার কথা, সে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতেছে। সেতার বাজাইতে বাজাইতে যখন একটু পরিশ্রম বোধ হইতেছে, বড় বালিসে ঠেস দিয়া পেঁচাও নলের মুখ—নলের সহিত মুখালাপ আলাপ করিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছেন। খানসমা খেদমতগার মোসাহেব কেহই উপস্থিত নাই, সকলেই আপন কর্য্যে গিয়াছে।—

"যমের দার" স্থানটি মন্দ নহে। জমিদার মধ্যে অনেকেই স্ত্রীলোক। পুরুষ জমিদার মাত্র একটি। তাহারই নাম সব্‌লোট চৌধুরী—তিনি একা একা বসিয়া সেতার বাজাইতেছেন। তাহার চিত্রই গাজী মিয়াঁ আঁকিয়া দেখাইতেছেন।

সব্‌লোট সেতার রাখিয়া বালিসে ঠেস দিয়া বলিতেছেন,—মনের কথা মুখে প্রকাশ করিতেছেন, তাহার মনোগত কার্য্যগুলির ভাব নয়নে, মুখে, প্রকাশ পাইতেছে—"মারিত হাতী লুটীতো ভাণ্ডার"। বিধবা জমিদার, যারা যমের দারে দুঃখের তুফানে হাবুডুবু খেয়ে বেঁচে আছে—তারা আমার হাতের তলে, কেউ কেউ পায়ের নীচে। একে দিয়া ওকে নড়াচ্ছি। ওকে দিয়া তাকে তাড়াচ্ছি। আবার তাকে দিয়া অপরকে খেদাচ্ছি। উঠতি পড়তি আগন্তুক; স্বার্থের ঘুণ পরিমাণ যেখানে আছে—মারছি, ধরছি, বসাচ্ছি, উঠাচ্ছি, দৌড়াচ্ছি।

আর চাই কি! আমার স্বার্থ সিদ্ধ হইলেই হইল। তারা মরুক বাঁচুক, অধঃপাতে যাক, রসাতলে গিয়ে হাবুডুবু খেয়ে গোল্লায় যাক, কড়ার ভিখারি হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে ফিরে ভিক্ষা করুক, আমার কি? আমার কার্য্য সিদ্ধি হইলেই হইল। আমি মাণিক অঙ্গুরী—আজ তোমার, কাল অপরের, তারপর আরেক জনার। একপক্ষে এ পক্ষে, অন্যপক্ষে অপর পক্ষে। যে দিকে নজর করলেম, স্বার্থময় আঁখিতে যেদিকে তাকাইলেম, সে ফুলে ফেঁপে উঠলো। এম্‌নি ফুলে উঠলো যেন পাউরুটির খামির। দেখতে দেখতে বুক ফুলে মাথা তুলে বেহদ্দ বেড়ে উঠলো। যিনি নীচে নামলেন, এই পায়ে ধরে তেল মাখিয়ে, হিমসাগর তেল মাখিয়ে তার উপর টাকার ছালা ঘাড়ে করে এনে, পায়ের উপর ঢেলে দিলেন। কি—এক তোড়া নোট হাতে করে এনে হাতে তুলে দিলেন—ঘুরে বসলেম। ছিলাম পূর্ব্ব মুখি, হলেম উত্তর মুখি। জিহ্বাও উল্টানো, কথার মাত্রা ফিরে গেল। সুর বদলাল। উল্টা পাকে ইঞ্জিনে চাবি পড়ল, বিপরীত পাকে চাকা ঘুরিয়া উঠিল। আবার কি? যেকথা সেই কাজ।—

"যে পথে দশ হাত এগুয়ে এসেছিলেন, মাথা তোলা দিয়ে বুক ফুলিয়ে দুশ বাহবা পঁচিশ সাবাসী নিয়েছিলেন, মুহূর্ত্তে মধ্যে বিশ হাত তফাতে সরে পড়লেন। উচ্চ মাথা হেট হয়ে একেবারে নীচে নেমে ধরাশায়ী হলেন। রাগে জর্জ্জরিত হয়ে চুপে চুপে কত কি বকাবকি করলেন, তাতে আর কি হবে? সে রাগে, সে কথায় জোনাব আলীর কি হবে? দশ আল ঘুরে, পাঁচ ঘাট হাঁদ্‌লে ফিরে—আবার গাধা, বাহাদুর, এই পদেই এসে আশ্রয় নিলেন—মাথা ঘসলেন, জিহ্বা দিয়ে পায়ের ধুলা চাটলেন, সঙ্গে সঙ্গে রূপচাঁদ বাবাজীকে হাজির করলেন, আবার বাতাস ফিরিল, আবার বাঁশী বাজিল। হুইল ঘুরিল আবার উল্টো পাকে গাড়ী চলিল—জয় জয়কার শব্দ হইল। সেই বা কদিন? সময় হয়ে এলো, বলতে কি? তারতা তারা-তারা তাত্ত্বের তারা তারতা ; তিন পাক দিয়ে ঘুরে বস্‌লেম। এই চালেই জীবন কাটালেম। তারা বুদ্ধির ফকির, আমি বুদ্ধির রাজা। আমার অপেক্ষা তাদের আয় বেশী। আমার আয় কম। হলে হয় কি? আয় ব্যয় কি করে। তাদের চেয়ে আমার মান বেশী—খাতির বেশী—ক্ষমতা বেশী। হাতী ঘোড়া বেশী, দালানকোটা বেশী, বান্দী-দাসী লোকজন বেশী, যে দিকে চাই সেই দিকেই বেশী। তাদের বাড়ী-ঘর দিন দিন অলক্ষ্মীর বাতাসে ভেঙ্গে চুরে খানে খারাব দর খারাব হচ্ছে। খোদার ফজলে আমার দালান কোটা হাসছে—সাদা ধব ধব কচ্ছে। পুষ্করিণী নূতন জলে লহর বেঁধে ঢেউ খেল্‌ছে। কৈ গ্লাসটা কোথা গেল? "বড় বালিসের পিছন হইতে গ্লাস লইয়া ঢোকে ঢোকে চার পাঁচ ঢোক উদরে ঢাললেন। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, হল কি? এত রাত হয়ে গেল—কোন খবর নাই। এ কি কথা?"

এমন সময় গুপ্ত দ্বারে ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন, ধুতি চাদর পিরাণ গায়ে মোসাহেব সাহেব ঘরের মধ্যে অতি সাবধানে প্রবেশ করিলেন, মোসাহেবের নাম মরদুদ খাঁ। মরদুদ খাঁ ঘাড় নওয়াইয়া সেলাম বাজাইয়া, ঘরে অন্য আর কেহ নাই তথায় চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন—

"হুজুর! যে কষ্ট করেছি, যত কথা বলেছি, যত রকমের কথায় মানুষের মন ভুলাতে হয়, তা বলেছি। কিছুতেই কিছু হল না। বলে কি যে, 'তোমাদের কথার বিশ্বাস কি? তিনি ত উড়তি ভেমর, ওগো ভেমর, নয় ভ্রমর, ওগো তাও নয় অলি' এই সকল রহস্য করেই গান ধল্লেন—'অলি আটকা পড়েছে কেতকি বনে।' গান গেয়ে আবার রহস্য। হেসে হেসে বলিলেন—এখন পাখা না ছিঁড়লে বাঁচি। কেতকির কাঁটা বড় শক্ত। গায়ের চাম চিরে যায়, চক্ষুর পাতায় জখম হয়, রসিক জন হলে রক্ত পড়ে, বদ রসিক হলে বদ রক্ত বাহির হয়, অরসিক হলে কেবল কস পড়ে। ওগো? এ বিবিয়া নহে, মালেকা নহে, সাহাজাদী নহে, তস্তরীজান নহে—এ বামুনের মেয়ে, এক সানকিতে খায় না, করমিসি পালোয়া কর্মফটের ককতার ধার ধারে না, জাত দিয়েছি বলে পেঁজখোর গরুখোর নেড়ের কাছে বসবো। ও ছি ছি, গলায় দড়ি বুকে কলসি, ছি ছি। ঘৃণা! ঘৃণা! হুজুর এই রকমে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ কল্লে তার অন্ত নাই। সকল কথা আমার মুখেও আসে না। মনেও নাই। অনেক তোষামদে লোভ দেখালে পর কতক্ষণ চুপ করে রইলেন, কি যেন ভাবিল, হা হুতাশে দীর্ঘ নিশ্বাসও কএকটা ত্যাগ করিল। তারপর ম্লান মুখে বলতে লাগলো, "দেখুন, আপনারা রাজা, হাত ঝাড়লে আমাদের বোঝা। গান বাজনা নাচ এই বতনটাই আমার কাজ। আমি যদি তাঁকে খুসি করতে পারি, অবশ্যই তিনি আমাকে খুসি করবেন। কিন্তু ভাই—"

সব্‌লোট বলিলেন, 'তারপর কি? আসল কথার কথা কি হল? ও সকল বান্দি বোল অনেক শুনেছি।"

"হুজুর কথা হয়েছে কিন্তু—"

মৃদু হাসি হাসিয়া সবলোট চৌধুরী বলিলেন, "আবার কিন্তু কি? ভেঙ্গে বল, হয় হবে—না হয় না হবে।"

"হুজুর টাকা।"

"টাকা ত জানি"।

"হাঁ তাই, কিছু বেশী।"

"বেশী কি? কত চায়?"

"একটি হাজার আগাও। তারপর যাওয়া আসার গাড়ী ভাড়া। তেরাত্রের বেশী এক মিনিটও থাকবে না। তা হুজুর, একবার যদি গরম কাবারের সাদ, কোরমা কালিয়ার আস্বাদন পায়, তখন তাড়ালেও যাবে না। কত দেখলাম,—কত হিন্দুয়ানী এই ঘরে হাত ধোয়ার গাম্‌লায় ডুবিয়ে দিলেম। বদনায় ধুয়ে ছাফ করে নিলেম।"

"কুচ পরওয়া নাই। দিব হাজার টাকা। আজ রাত্রেই টাকার জোগাড় করে দিচ্ছি। তারপর ওদিকের খবর কি?"

"হুজুর সে ত একপ্রকারে ঘরের কথা। খাচার পাখী, পোষা মাছ—যখন হাত বাড়াবেন, তখনই পাবেন।"

"অনেকেই মুখে তাই বলে। হাতে চাঁদ ধরে দেখায়, কিন্তু কার্য্যে তার কিছুই পাইনে। কাজের সময় যা হয়ে থাকে, তাই হয়।"

"অত হতাশ হবেন না। উতলার কর্ম্ম নয়। হুজুর, ঘসে মেজে রূপ আর ধরে বেঁন্ধে পিরীত কখনই হয় না।"

"আরে তা কি আর জানি না। বয়স ত আর উজান যাচ্ছে না, ক্রমে ভাটাই পড়ে যাচ্ছে। ও সকল ভাব লাভ পীরিত প্রণয় কর্ত্তে কর্ত্তেই দাড়ী চুল পাকালেম। তুমি মনে রেখ, 'বামনী' বশে আসবার নয়, খাচায় আটকাবার নয়। ও সিকলি কাটা টিয়া—খাবে নেবে, সময় হলে উড়ে যাবে। আর যাকে তোমরা ঘরের লোক কি আপন লোক বলে খোসনামির ধুয়া ধরেছ, হলেও হতে পারে, ছোলা কলার লোভে, চাল চিড়ের আস্বাদে, পোষ মানিলেও মানিতে পারে।"

"কি বলেন হুজুর? এমন পাবে কোথা। এখনও আপনারই খাচ্ছে, আপনার ভিটায় বাস কচ্ছে, তবে তার যে আপত্তি যে সকল কারণের, সে কথার উত্তর কি হুজুর?"

"কি কথা—কি কারণ—কি বাধা?"

"সে যে সকল কথা বলে, তার কিছুই মিথ্যা নয়। সে যা বলে, তা মুখে আনতে আমার পা কাঁপে।"

"কাঁপা কাঁপি কি? নাচতে হলে আর ঘোমটা কি খাঁ সাহেব? আমার অন্যায় তা আমি বুঝি। আর খাঁ সাহেব। সে মুখখানা আমি বড় ভালবাসি, প্রাণ হতে ভালবাসি। ভালবাসা মুখের রাগ,—বড় মিষ্টি, বড় মজাদার। ভালবাসা কটু কথা—সেও ভালবাসারই বিশেষ লক্ষণ। যা বলেছে বলুক, তাতে আসে যায় কি? সে যা বলেছে অবিকল বল—তা হইলেই বুঝতে পারবো তার টান্ কোন্ দিকে।"

"আচ্ছা হুজুর, তবে আসল ঘটকদিগকেই ডাকি। তারা এখানেই আছে। তাদের মুখেই শুনবেন।"

অত হাঙ্গামায় কাজ কিঁ? তুমিই বল শুনি। শেষে নিতান্তই দরকার হয়, ডাকিয়ে আনবো।"

"হুজুর, সে বলে যে, আমার স্বামী তাঁহার চাকর। ছোট জামাইটী চাকুরির আশায় তাঁরই কাছারিতে লেখাপড়া করে। বড় ছেলেটীর একটি ছেলে হয়েছে। বড় মেয়ের দুইটী সন্তান তারাও সেটের কোলে মাথা তোলা দিয়েছে, বিয়ের বয়স হয়ে এলো। ছেলেমেয়ে নাতি পুতি, ঘর সংসার ছাড়িয়ে, আমাকে নিয়ে এখন বিবি করবেন, সে বিবিগিরি আমার কয়দিন থাকবে? যখন থাকে, যখন লোকে পাগল হয়, যখন কথায় কথায় দিতে চায়, প্রাণ দিতে চায়, বুক চিরে বুকের ভিতর রাখতে ইচ্ছা করে। তখনই থাকে না—আরত্ত এখন তিনকাল গিয়ে শেষ কালের লীলাখেলায়—কার কি হয়ে থাকে বল দেখি?"

"মাগী ত বড় বদরোখা। তা যা হক ওর স্বামী কি বলিল?"

"হুজুর, তারা সকল্‌েই এসেছে। তাদের কথা তারা আপন মুখেই প্রকাশ করবে। আমাকে যে কাজের ভার দিয়েছেন, আমি তাই দিয়েই আছি। গণ্ডাদশেক কাজের ভার নিয়ে একটা হট্টগোল করে যাচ্ছে তাই করা, আমার ইচ্ছে নয়। আসল মালিক সঙ্গে কথার বন্দবস্ত

করুন। মীমাংসা বন্দবস্ত ভাঙ্গচুর খোদে খোদে হক, মধ্যবর্ত্তীর দরকার কি? হুজুর, আমি তোদিগকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

এই বলিয়া মরদুদ খাঁ সেলাম বাজাইয়া প্রস্থান করিলেন। সবলোট আলী সাহেব ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় সেতার ধরিলেন। বাজনার সুরে তালে, লয়ে, নিজ সুর মিশাইয়া গুন গুন রবে বোল বাজাইতে লাগিলেনঃ

"আঁখিতে মজালে আঁখি। ওকি হল কি সখি।"

মন অন্যমনস্ক। বাজনা গান কিছুই ভাল লাগিল না। গুড়গুড়ীর নলে টান দিয়া সুখবোধ হইল না। ধুম পর্য্যন্ত বাহির হইল না। স্বগত বলিতে লাগিলেন—

"টাকার কমি কি? বামনীর জন্য চাই হাজার টাকা। আর আঁখিতে মজানের জন্য অতি কম দুই শত। এই বার শত টাকার দরকার—আজ রাত্রেই দরকার। লাটের কিস্তি। নিলামের দিন। না দিলেই নয়। রাত্র প্রভাত হয়ে সূর্য্য উদয় হলে আর রক্ষা নাই, ওদিকে অস্ত হলে রক্ষা নাই। এদিকে এ পর্ব্বে উদয় হলে রক্ষা নাই। উদয় অস্ত নিয়েই জগতের কাজ। মহাজনের ডিক্রির দেনা নয় যে, কিছু দিয়ে সময় লওয়া যায়। তা হবার যো নাই। বাদসাই হুকুম, কড়া হুকুম—বেরেয়া হাকিম। নগদ দাম নগদ কাম। টাকার ভাবনা কি? যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি, তাতে টাকার ভাবনা কি? সে বিবাদ শীঘ্র মেটবার নয়। এই বিবাদে সর্ব্বস্ব বিনাশ। দফা রফা। একেবারে তিনটী ঘরের ওকর্ম্ম। ছিঁড়িয়া খাতুন, আর জয়ঢাক আলীর বিবাহের মূল কারণই আমি। মায়ের কাছ থেকে ছেলেকে বেগড়িয়ে—শাশুড়ির কান্দে ভর করিয়ে দিবার মূলই এই বান্দা, নাচার খাকসার—নামুরাদ। এখন দুদিক হতে আদর হচ্ছে—তোষামদ হচ্ছে। টাকার কথা হচ্ছে। জয়ঢাকের শ্বাশুড়ীর মনিবিবি। মা হচ্ছেন সোনাবিবি। সোনাবিবির পক্ষে লোক নাই। মনিবিবির দলটাই কিছু বেশী বলবান হয়ে পড়েছে। সোনাবিবি কতগুল ফাত্‌রা (হালকা) পাতা ছেঁড়া, নেকড়া পরা, হাবাতে,—আর শ্যাম নটবর, গোকুলের ধন নীলমণি সোনামণি, যাদুমণি, কাঁচাননী, দুধ ভাইটীকে নিয়ে অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন। মনিবিবি—ধামাধরা, আলকাতরা গায়ে মুচ্ছদী, জামাই ধুম্বলোচন, তিন ঠেঙ্গে লাহিড়ী, জন কত বোকচা বাঁন্দা দড়াটানা, পাতি নেড়ে আর হুড় হুড়ে মাষ্টার বাবুকে নিয়ে, ছোট জামাই জয়ঢাককে কাঁন্দে করে—বড় জামাই ধুম্বলোচনকে দিয়া খুব পিটাচ্ছেন। দশ হাতে বাজনার বোল উঠাচ্ছেন। বিপদে ঝাঁপ দেন নাই—ডুবে আছেন। এখন পোয়াবার কার? এমন সুখ সময়. লম্বা কোচা কার? যার তার—আর আছে কার? জয় সবলোটের—সোবহানাল্লা, কি মজার চালই চালা হয়েছে।"

গুপ্ত দ্বার আবার নড়িল, এবারে খট্ খট্ শব্দ হইল না। অতি মৃদুভাব সরল এবং অতি নম্র শব্দে দরওয়াজা খুলিয়ে গেল। প্রকাশ্য খানসামা প্রাইভেটে গুপ্ত এরার—পাজি খাঁ এবং আঁখিতে মজালে আঁখির গুণধর স্বামী—বেহায়া সেখ প্রবেশ করিল। সবলোট আলী মহা আনন্দে এস এস বলিয়া বেহায়া সেখের হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইলেন। পাজী খাঁকে বলিলেন—'দরজা বন্ধ করে দেও।' পাজী খাঁ দরজা বন্ধ করে বিছানায় অন্য ধারে, বেহায়া সেখের মুখোমুখী হয়ে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন—

"হুজুর, তিনি ত একেবারেই নারাজ। বলেন কি যে বড় মানুষের ভালবাসা, আর জবানী মোল্লার মুরগী পোষা। খাওয়ায়ে দাওয়ায়ে পালন পোষণ। গলায় ছুরি দিয়ে কতক্ষণ? বড় মানুষের পিরীত প্রণয়। সকালে আছে বিকালে নয়। বিশ্বাস কিছুতেই নাই। আজ হাতে সোনা, কাল হয়তো ছাই। তবে যার ধন—যে মালিক, তার যা ইচ্ছে তাই হবে।"

সবলোট আলী দন্তপাতী সমূলে বাহির করিয়া বলিলেন—

"কি সেখের বেটা, কথা কওনা যে? এখানে তুমি আমি ভিন্ন আর ত কেউ নেই। মনের কথাগুলি সমুদায় ভেঙ্গে বল। কড়াক্রান্তি গোপন করো না। আমি তোমাকে আগেও বলেছি। তোমার বিয়ে কর্ত্তে যে খরচপত্র হয়েছে, আবার যে বিয়ে কর্ব্বে, তার খরচ, একখানা বাড়ী, পাঁচ বিঘে ধানী জমি নিষ্কর লিখে দিচ্ছি। হাল লাঙ্গল জন্য ৪টী এঁড়ে গরু, দুধের জন্য একটী ভাল গাই গরু, এক বছরের খোরাকীর জন্য বিশ মণ ধান, কাপড় ১৮ খানা ; গামছা চার খানা, ১২ মণ কলাই, থালা ঘটী বাটী এক প্রস্থ, লেপ দুখানা, বালিশ চারটা, মশারী, ১টা তোমাকে দিচ্ছি। পছন্দমত বিয়ে করে সুখে ঘরকন্না কর। নিতান্ত জেদ কর দুখানা সোনার, তিনখানা রূপার অলঙ্কার না হয় দিচ্ছি। আর কথা কি? আর চাই কি? তারপর তোমার সাবেক গওনা, থালা ঘটী বাটী যা আছে তা তোমারই থাকবে। তার পরনের কাপড়খানা যদি দিতে না চাও, তাও খুলে রেখ। কেবল খাঁটী মানুষটী আমি চাই।"

"হুজুর আপনি রাজা। আমি আপনার খানেজাদ গোলাম। সকলি আপনার। আপনার যখন সুনজর পড়েছে, তখন কি আর আমি রাখিতে পারি? আর হুজুর আপনি যখন নজর করেছেন, তখন আমার রাখিবার সাধ্য নাই। শেষে আম ছালা দুই যাবে। পথের ভিখারী হয়ে চক্ষুর জলে জীবন কাটাতে হবে। সকলি আপনার—যা ইচ্ছা করতে পারেন। এক কথা—সে কিন্তু ভারি নারাজ। কিছুতেই মাথা পাত্‌তে চায় না। বলে—যে আমার তিনকাল গেছে এককাল আছে। নাতী পুতি জামাই মেয়ে ছেলে—সোনার সংসার ছেড়ে জনমের মত যেতে হবে, তা আমি পারবো না।"

হাসিয়া হাসিয়া সবলোট আলী বলিতে লাগিলেন, "সে কি বিলাতে যাচ্ছে—না রেঙ্গুনে যাচ্ছে—না লঙ্কা দ্বীপে চালান হচ্ছে। একই গ্রামে—একই বাড়ী বলিলে হয়। যে বাড়ীতে থাকবে, সে বাড়ীতে জামাই, ঝি, নাতী, নাত্‌কুর সকলেই আসিতে পারিবে। জনমের মত ছেড়ে যেতে হবে কেন? তুমি ভাল করে বুঝিয়ে বল,—তার কোন বিষয়ে অসুখ হবে না, কোন কারণে দুঃখ হবে না। রাজার রাজরাণীর মত সুখে থাকবে। আর তোমার কপালও খুব ভাল। পুরাতন ছেড়ে নূতন পাবে। আর যা যা পাবে তা আগেই বলেছি।"

বেহায়া খাঁ একটু অগ্রসর হইয়া মাথায় চাদরটা ফেলিয়া বলিতে লাগিল,—

"হুজুরের নজর যখন পড়েছে, তখন আর আমার রাখবার সাধ্য নাই। আজ হতে তাকে আমি মনিব বলে মান্য করবো। আমাকে যা যা দিবেন, তা কালকেই লেখাপড়া করে দিন। আমি মাথায় করে কাল রাত্রে হুজুরের পায়ে এনে হাজির করবো। তার ভাল মন্দ হুজুরের হাত, আর তার কপাল।"

"সে বিষয় চিন্তা নাই। তুমি ত আমার ঘাড়ে চাপিয়েই খালাস হলে। তোমার ত পোয়াবার।"

পাজি খাঁ মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল—"এমন কপাল কার? কপাল না হলে কি রাজার চক্ষে পড়ে। মানুষ ত কত আছে—হুজুর।—কে যেন দরজায় আঘাত কচ্ছে—"

দরজার বাহির হইতে বলিতেছে—"হুজুর দরজা খুলুন। বড় জরুরী কাজ। সাহেবজাদা, দামাদ মিয়া, কালো রায়, কটা লাহিড়ী, আলকাতরা সান্যাল, কটা পেস্কার, আরও কয়েকটি এসেছি, বড় জরুরী কাজ। ধর্ম্মাবতার, শীঘ্র দোর খুলুন।"

সবলোট আলী চুপে চুপে বলিলেন, "মনিবিবির লোকজন আসছে। বোধ হয় বিশেষ দায়ে না পড়লে, আর এত রাত্রে আসেন নাই। তোমরা ঐ পার্শ্বে দরজাটা খুলে—সিড়ি দিয়ে উঠে উপরে যাও। নগদ টাকা—যা দিতে চেয়েছি তা আজকেই দিব। লেখাপড়া যাতে যাতে দরকার, তা কাল কাছারির সময় হবে। আমার কাজ আমি করবো। তোমার কাজ তুমি কর।"

বেহায়া সেখ তাড়াতাড়ি যাইতে উদ্যত হইয়া বলিল, "সে একটু নারাজ আছে। তা হুজুরের হাতে পড়লে সোজা হবে।"

"সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। (দরজার নিকট অগ্রসর হইতে হইতে) কত কুন্‌কী বশ কল্লেম, গুণ্ডার পিটে ঝুল চাপিয়ে স্বীকার কল্লেম, কত জাঁহাবাজ বনের পশু বশ কল্লেম, কত আবর, যার গায়ে হাত দিলে চমকে উঠে, নাফানী ঝাপানী করে, পিছড়া ঝাড়ে, নাক পাট পাড়ে, হাঁ করে, কাপড়ে দেয়, তাও ত বশ হয়েছে, আর এত ঘা খেকো ঘরগোলা সোজা পাখী ; পিঁজরায় পুরে, কলা, চাল, রাঙ্গা মরিচ দেখালেই—ঘাড় নওয়ায়ে বসে পড়বে। সে ভাবনা আমার নেই।" পুনরায় দ্বারে আঘাত, বাহির হইতে কথা—'হুজুর বড়ই জরুরি কাজ। শীঘ্র দোরটা খুলুন।" বেহায়া সেখ, পাজি খাঁ এক পাশের দ্বার দিয়া প্রস্থান করিল। সবলোট আলী চক্ষু মুছিতে মুছিতে নিদ্রা হইতে উঠিবার ভান করিয়া দড়জা খুলিয়া দিলেন, এবং বলিলেন, "রাত্রিতে যে একটু ঘুম, তা আপনাদের যন্ত্রণায় যে হবার নয়। এত রাত্রে খবর কি? একেবারে দলবল বেঁধে এসে পড়েছেন। কথাটা কি? রাত্রেও কি গোয়েন্দা চলে? আসুন, ঘরের মধ্যে আসুন।"

একে একে সকলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সবলোট আলী বলিলেন, "দরজাটা খুলে রাখা কোন কথা নয়, আপন সাবধান সতর্কে চলা ফেরা—কাজকর্ম্ম করা সকলেরই কর্ত্তব্য।" দরজা বন্ধ করে সকলেই যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। ঘড়িটা দেয়ালের সঙ্গে টক্ টক্ শব্দে কথা কহিতেছে—জ্বলন্ত প্রদীপ জগতের কাণ্ডকারখানা দেখিতেছে, আর মিটিমিটি করিয়া হাসিতেছে, কাঁপিয়া কাঁপিয়া অন্তরের আগুন বাহির করিতেছে।

সবলোট আলী বলিলেন, "এত রাত্রে কেন? কি হয়েছে কি?" আলকাতরা মাখা ঘর-ভাঙ্গা স্যান্যাল, একটু অগ্রসর হইয়া খুব গাম্ভীর্য্য ভাবে, বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মহাজ্ঞানীর পরিচয় ভাবে কথার আগাগোড়া বেন্দে বলিতে লাগিলেন—

—"ওদিকের কাজ একরূপ কাবার। দাসী বান্দী, চাকর, নেগাহবান যত আছে, সমুদায় আমাদের হাতে। তাঁরা কাজ কচ্ছে, সম্মুখে যাচ্ছে গুপ্ত কথা নিচ্ছে, সব কচ্ছে—অথচ এখনি এসে বলে দিচ্ছে। দোরে দোরে পাহারা বসেছে, তাঁদেরই লোক দ্বারা—তবে আমাদের লোকও দু একজন আছে। পথে পথে পাহারা খাড়া করা গেছে, একটি জিনিস, কি কাগজ, ঘর থেকে বাহির করবার সাধ্য নাই। তাঁর আপনার মধ্যে দাগাদারী ভাইয়ের গাঁয়ের লোক, আর তিন চারটি অন্য অন্য লোক ভিন্ন, তাঁর নিজের বলতে আর কেহ নাই। তাঁরা কতদূর কাকে বিশ্বাস অবিশ্বাস করেন জানি না। আমাদের ত এই বিশ্বাস, এখন কি করা?" সবলোট আলী বলিলেন, "আর কি করা?" মাথা-পাগলা লাহিড়ী মহাশয় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চক্ষু দুটি নাড়াচাড়া দিয়া, কাঁদের চাদরখানা নীচে নামাইয়া একটু কুঁজভাবে হাতনাড়া দিয়া বলিতে লাগিলেন—

"এই কথাটা বুঝতে পাল্লেন না? দাগাদারী ভাই সাহেবকে ঐ ভাবে নজরবন্দী মতেই রাখা হবে—না একেবারে দফারফা কর্ত্তে হবে?"

ক্ষেপা কালকুট রায়, মাথা নাড়িয়া শীঘ্র শীঘ্র বলিতে লাগিলেন (স্বভাবতই শীঘ্র শীঘ্র কথা কওয়া অভ্যাস)—

"মাথা-পাগলা বলে কি? পাগলের মত বল কি? ছি ছি, দফারফা করা—এ সকল কথা কি? যেমন তেমন কথা—তুমি ভাব যারা তোমার হয়ে কথা কচ্ছে, কথা নিচ্ছে, তাদের বিশ্বাস কি? ছোটলোককে বিশ্বাস কি? মুখে যাই বলুক, কাজে কখনই তা করবে না। ওটা বদ্‌লোকের কথা—বান্দী, গোলাম, খানসামা, লাঠিয়াল, সর্দ্দার, নেগাহবান, এই সকল ছোটলোকের কথায়, তাদের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কি এত বড় গুরুতর কার্য্যে হাত দিতে হয়? এমন পরামর্শ কি ভদ্রলোকে দেয়? আর দেখ, যারা বড় বিশ্বাসী হয়েছে, বড় হিতৈষিতা দেখাচ্ছে, তারাই তোমাদিগকে ফাঁদে ফেল্‌বে। আর এ কথা কখনই চাপা থাক্‌বে না, দুদিনও গোপন থাক্‌বে না। কখনই ওকথা মুখে এন না।"

ধুম্বলোচন মনিবিবির জামাই। দিব্বি জামাইয়ের মত চেহারা। বড় বড় আঁখি, বড় বড় কান, মানানসই দাঁত, গোলগাল মাশাল মুখখানি। ভ্রূ-দুটি যেমন কাল, তেমনি যোড়া। পরন পরিচ্ছদের বর্ণনায় নথি বেড়ে যায়, সময়ে দেখা যাবে। একটু থোতারোষভাবে ক্রোধের লক্ষণে যেন অন্তরে আগুন জ্বলিতেছে। বলিলেন ঃ

"মানুষ বুড় হলেই একপ্রকার মানুষের মধ্যেই থাকে না। কি হবে। ওর মত একটা লোককে খুন কল্লে কি হবে। প্রমাণ কি? কে সাক্ষী দেবে? এমন কৌশলে শেষ করা যায় যে একটি "আরওয়াহ"—রও (প্রাণী) খবর হয় না। কল কৌশল অনেক জানা আছে। আমাদের যা মনে আছে, তা করব, এখন—ভাই সাহেবের মত কি, সেইটা জান্‌তে পাল্লেই হয়!" ঘর-ভাঙ্গা সান্যাল বাবু বলিলেন, "করতে পারলে ভালই, কিন্তু আশঙ্কাও অনেক।"

"এখন আপনিও যে আগার মাগারে পাগারে যাচ্ছেন। সে সময় দেখি কুচি কুচি করে, টুকরা টুকরা করে কেটে, পদ্মায় ফেলবেন, কেহ বল্লেন মেঘনায় ফেল্‌বেন, কেহ বল্লেন

একেবারে গঙ্গায় নৈহাটীর ঘাটে দুই আনায় কার্য্য শেষ হয়। এখন দেখি, সকলেই থুমকে গেলেন।"

সবলোট আলী বলিলেন, "আপনারা দেখি সকলেই পাগল হয়েছেন। সকলের চেয়ে দেখি ধুম্বলোচন ভাই সাহেবই বেশী মাথা গোল। জয়ঢাক ভাই আমার ছেলে মানুষ—নাবালক, একে এ সকল কথার মধ্যে না আনাই ভাল। ও সকল কথার পরামর্শ কি এত হট্টগোলে হয়। কথা দুই কানে গেলেই দেশময়,—এ দেখছি আঠার কান। কি ভয়ানক কথা। উহু! কি ভয়ানক কথা! আমি ওসকল কথার মধ্যে নয়। তোমরা যা জান তাই কর। আমি ওর আগের মধ্যেও নয়, পাছের মধ্যেও নয়। একেবারে দফারফা বুঝি। বাপরে বাপ! বৃটিশ রাজ্য মধ্যে। গভর্ণমেন্টের এলাকার মধ্যে এই গুরুতর কাজ। তোমরা সকলেই মজাবে। আমাকেও সঙ্গী করবে। আমি তোমাদের কোন কথা শুনবো না। শুনেছি, তারা অরাজকপুরের ডিপুটি, নচ্ছার জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট, জজের কাছে, পুলিসের বড় সাহেবের নিকটে জানিয়েছে। তারা কয়েদ আছে। সোনাবিবি দাগাদারী ভাই, চোট্টা মিয়াঁ, বেআক্কেল তালুকদার, সেখ চিল্লি, বক্সগাজী, ফটাটীং উল্লা, থুথু খাঁ, জুলমতমীর—ইহাদিগকে আন্দাজ তিন শত লাঠিয়াল দ্বারা, মনিবিবি, সোনাবিবি নব বেয়াইন, নূতন কুটুম্ব। পুরাতন সম্বন্ধে ননদিনী, অর্থাৎ আপন আপন ভায়ের স্ত্রী। আরও খোলাসা—মনিবিবির সহোদরা ভ্রাতা সোনাবিবির স্বামী, সোনাবিবির সহোদরা ভ্রাতা মনিবিবির স্বামী। ইহার মা উঁহার মাতার সহোদরা ভগ্নী। ভগ্নী-জা উভয় সম্বন্ধই বর্ত্তমান। সুখের একশেষ। যতদূর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কুটুম্ব হইতে পারে—উভয়েই উভয়ের রক্তে সমান সমান টান,—তারই লাঠিয়ালে একজনকে অপরে ঘিরে রেখেছে। গভর্ণমেন্টের রাজ্যে এমন হয় নাই। কোন সময় প্রাণ যায়, এই ভাবে জানিয়াছে। খালাসের হুকুম হইয়াছে। পুলিস গিয়ে খালাস করে যথেচ্ছা যাইতে দেয়। এখন এই সকল কথার চিন্তা ভাবনা আগে কর্ত্তে হয়, না দফা রফা আগে কর্ত্তে হয়। ভেড়াকান্ত বিস্‌মার্ক অষ্টেপৃষ্ঠে লেগেছে।" মাথা-পাগলা লাহিড়ী বাবু ঘন ঘন চক, মুখ, মাথা, ভ্রূ-নাড়িয়া বলিলেন,

"ভেড়াকান্ত বিস্‌মার্কের মার্কটুকু মার্গে গিয়ে অর্থাৎ পথে উড়ে গিয়ে আকাশে উঠে কান্ত সহ ভেড়াটুকু থেকে যাবে। এ রাজ্যে কি? বাবা এ শক্ত মুগুর। তোরা হলি নদের, আমরা হলেম সদের, কেউ কম নয়। তাঁর কথা ছেড়ে দিন, আপনি সৎবুদ্ধি সৎপরামর্শ দিয়ে আমাদের সঙ্গী থাকবেন কিনা, তাই বলুন।"

সবলোট আলী বলিলেন, "আমিত আর তোমাদের মত মাথা পাগলা নই যে এত রাত্রে এই হট্টগোল মধ্যে কোন কাজের কথার উত্তর দি। রাত্রি প্রভাত হক, আসবেন, শুনে যা ভাল হয়, করবো। আপনারাও আছেন যা ভাল বোঝেন করবেন। উপস্থিত মাথায় বাড়ী কি প্রকারে ঠেকাবেন, তারই ফিকির করুন। ও সকল দফারফা এখন মন হতে একেবারে দূর করুন। এই শুনুন আমার কথার আভাস।" পেট ভরা—গুহ মহাশয় ভূড়ীটি দোলাইয়া, গজদন্ত দুটি বাহির করিয়া, লক্ষ্মীটেরা চক্ষুটি অলক্ষিত ভাবে নীচে উপর করিয়া বলিলেন—

"বেশ কথা! রাত্র প্রভাতেই ভাল। আরও ভেবে চিন্তে দেখা যাক। আমি খুব সন্ধানে জেনেছি, আজ রাত্রে ঘোড়া বোঝাই করে করে মাল সরাবে।"

মাথা-পাগলা লাহিড়ী মহাশয় সদম্ভে বলিয়া উঠিলেন, "রাত্রে ঘোড়া করে সোনা রূপার অলঙ্কার টাকা-কড়ি সরান সহজ কথা নহে। বাবাজি ছিঁড়িয়া খাতুনের হাত ধরে নিষ্কাষিত অসি হস্তে, খিড়কির খোলা দ্বার দিয়া জনপ্রাণীর সহিত দেখা নাই, কেহ জানে না, কেহ ভাবে নাই, নির্ব্বিঘ্নে মনিবিবির বাটীতে চলে আসার পর আমরা বসে নাই—নাকে কানে চখে মুখে জেগে, দিন রাত সমান খাটা যাচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় পাহারা। ঘোড়ায় মাল পাঠাবে দাগাদারী ভাই? আহ্লাদ আর কি? মরে যাই আর কি? মাল পাঠাবেন? দা-গা ; পরাণ রয়েছে ঠোঁটের উপর, কোন সময় যেন চোখ বুজতে হয়, সেই কয়েদি পাঠাবে ঘোড়ায় করে মাল? সর্ব্বনেশে কথা! আচ্ছা চলুন, আজ যাওয়াই যাক—"

পেটভরা গুহ পুনরায় বলিলেন, "একটু [illegible] করাই ভাল? 'বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি।' চলুন যাওয়া যাক।"

কেহ আদাব, কেহ সালাম, কেহ বন্দিগী বাজাইয়া [illegible] হইলেন। সবলোট আলী—ঘর-ভাঙ্গা সান্যাল মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি একটু বসে যান। তাঁরা যান, আপনি একটু শেষে যাবেন।" ঘর-ভাঙ্গা মহাশয় ছাড়া আর আর সকলে প্রস্থান করিলেন। সবলোট আলী এবং ঘর-ভাঙ্গা একটু ঘেঁসাঘেঁসী ভাবে মুখোমুখী হইয়া বসিয়া বলিলেন,—

"দেখুন! সকলই হবে। আমাকে যা যা বল্লেন, সকলি হবে। কিন্তু আমার নিতান্ত দরকার। আপনার কাছে বল্‌তে আর লজ্জা কি? নিতান্তই দরকার। আমি আজ এত রাত জেগে আছি, কি জন্যে? বলব কি? একটি সম্পত্তি নিলাম হয়ে যায়। আপনারা জানেন কিনা জানি না, গোপনে জোগাড় করে বাইসডানা গ্রামখানা নিয়েছিলাম। এখন সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আপনি মনিবিবিকে বলে রাতারাতি—প্রভাত না হতে হতে ১৪ শত টাকা জোগাড় করে এনে আমাকে গোপনে দিন। টাকা, নচ্ছার জিলায় রওয়ানা করে, কমর বেঁধে আপনাদের কাজে লেগে পড়ি। তা না হলে বুঝতেই পাচ্ছেন। ভেঙ্গে-চুরে আর কি বলব। হাত পাতলেই দুটি হাজার। মুখ দিয়ে বের কল্লেই বাক্সে মজুদ। আজ তাদের তহবিলে দশ হাজার। যেমন ঘোড়া করে জিনিস যাচ্ছে। আবার ঘোড়া করে টাকাও আসছে।"

"টাকা কর্জ্জ করে আন্‌ছে। দিতে ত হবে! দেবার সময় বোঝা যাবে। কর্জ্জ কল্লে, বেশ সহজে বিনাশ্রমে টাকা ছালায় ছালায় আসে ; কিন্তু দিবার সময় প্রাণ ছটাফট, দেহ লটাপট, দেল কটাকট, চক্ষু স্থির, কর্ণ বধির হয়। দেখবেন, এই টাকা শোধ করতে মাথার ঘাম পায়ে পড়বে—পায়ের ঘাম মাথায় উঠবে। যাক! এখন যাতে কাজ হাসিল হয়, তারই জোগাড় কচ্ছি। আমি চল্‌লেম। টাকা গুণ্‌তে যে দেরী। আমি দুই ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আস্‌ছি।"

"দেখুন! ঘর-ভাঙ্গা বাবু। আপনি দুই হাজার টাকার কথাই বলবেন। ছয় শত আপনার, ১৪ শত আমার। ঘর-ভাঙ্গা সান্যাল সেলাম বাজাইয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন। সবলোট আলী দরজা বন্ধ করিয়া সেতার হাতে নূতন গান ধরিলেন। কৈ সে আমার? অভিমানী

রমণী রতন। অন্তরে জাগিছে যার মুখেরই কিরণ। গানের দুই অন্তরা শেষ হইতেই শুনিলেন—দোরে আবার কে যেন আঘাত করিতেছে। সবলোট সেতারটা সম্মুখে রাখিয়া স্থির কর্ণে শুনিতে লাগিলেন—তাঁহার কর্ণে আওয়াজ আসিল—"দোর খুলুন!" ঘর-ভাঙ্গা বাবু এত শীঘ্র যাইয়া আসিতে পারেন নাই। বিশেষ এ নূতন কণ্ঠস্বর। দ্বার খোলেন কিনা? এই চিন্তায় স্থির মনে স্থির ভাবে স্থির কর্ণে শুনিতে লাগিলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

উত্তর হইল, "আমি"। "নাম না বললে হবে না। এত রাত্রে "আমি" বললে চলবে না। নাম বলো।"

আবার উত্তর হইল, "হুজুর আমি—বিশেষ দরকার।"

"তাইত আগে চিন্তে পারি নাই—দাগাদারী?—ও তাইত? দাগাদারী ভাই! রস রস, দোর খুলছি।"

দোর খুলিলে দাগাদারী এবং চোট্টা মিয়াঁ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সবলোট আলী একটু আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া আনিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন, "তোমার পায় পায় শত্রু পায় পায় দুষমন। এত রাত্রে একটি লোক সঙ্গে করে এসেছ—বড় অন্যায়। তোমার ত ভারি সাহস। তোমাদের পক্ষে কেউ নাই। শুন্‌তে পাচ্ছি, তোমরা কয়টি লোক ভিন্ন, সোনাবিবির পক্ষে আর কেহ নাই। বাড়ীর সামান্য চাকর চাকরানীরা পর্য্যন্তও নাকি বিগড়ে গেছে?"

দাগাদারী ভাই একটু ঈষৎ-হাসিয়া বলিলেন, "যত শুনেছেন তত নয়। তবে একটা খাঁটি কথা, আমাদের আপন বলতে কেহ নাই। কেউ আমাদের কথা শুনে না। আপন বাড়ী আপন ঘর, আপন জিনিসপত্র, সম্পূর্ণ যেন পর হয়ে গেছে। কথাতো কেউ শুনেই না। আরো চোখ লাল করে দুই চারটা নগদ কথা শুনায়ে আপন আপন গুমরে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। কার হাতে খেতে আর বিশ্বাস হয় না। কি কৌশলে, কি খাইয়ে একেবারে দফারফা করে ঠাণ্ডা করবে, প্রাণের ভয়েই তাদের হাতে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। বুবুজান (সোনাবিবি) পর্য্যন্ত তাদের হাতে রান্না খেতে আর সাহস করেন না। যারা যারা রাঁধবার লোক ছিল, তারা আর তার মধ্যে নাই। স্ব স্ব স্বাধীন। কেউ কারও কথা শুনে না। কার রান্না কে করে! কার বাড়ী কে দেখে! বুবুজান আর আমার এক পা হেলিবার সাধ্য নাই। বলবো কি? আমরা যাদিগকে টাকা দিয়ে—বেশী টাকা দিয়ে—বিশ্বাস করে চাকর রেখেছি, তারাই আগে তাদের সঙ্গে মিলে আমাদেরই গুপ্ত শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন সময় যেন প্রাণটা যায়! আমার প্রাণ যায় যাক, কিন্তু বুবুসাহেবা অসহায়া, তাঁর প্রাণ যাবে,—ছেলের হাতে মায়ের প্রাণ যাবে, বড়ই দুঃখের কথা। বুবুসাহেবাত কেন্দে কেটে একেবারে অস্থির। ছেলে গেল, বউ গেল, ১০/১২ হাজার টাকার অলঙ্কার গেল—এখন নিজের প্রাণটাও আর থাকে না। আজ খবর পাঠিয়েছে, —মায়ের যে নিজের জমিদারী আছে, সেই জমিদারী যতদিন আমার নামে (জয়ঢাক আলীর নামে) হেবা, উইল, দান—অথবা কাবালা করে আমার দখল কাবেজে না দেও, ততদিন এই অবস্থায় কয়েদ থাকতে হবে। দেখুন দেখি, কি ভয়ানক কথা। শাশুড়ী বাধ্য হয়ে

(মনিবিবি) মায়ের প্রাণ বিনাশে খাড়া হওয়া! পুত্রকে জমিদারী না লিখে দিলে মায়ের প্রাণ যায়, কোন সময় গলায় ছুরি বসায়।"

সবলোট আলী বলিলেন, "কথাটা একেবারে যে মিছে, অথবা কথার কথা—তা মনে করো না। লোকজন আমলা না থাকলে আর করবে কি? আমি প্রকাশ্য ভাবে আর তোমাদের কোন কার্য্য করতে পারছি না। আমার চক্ষে মনিবিবি আর সোনাবিবি দুই সমান। লোকের চক্ষে ধরা পড়বো—খোদাতালার নিকট নান্দা হবো, আমি কারো নিষ্টঅনিষ্ট করতে পারবো না। তবে তুমি নিশ্চয় জেন, আমি তোমার পক্ষে আছি। তোমার যতদূর উপকার—হিত—আমার দ্বারা হবার তা অবশ্য হবে। কোন কথায় ভেব না। সাবধানেই থেক। যত পার, ঘোড়া বোঝাই করে রাতারাতি পার করো। 'চিরাপুঞ্জী' গেলেই পদ্মা পার। বিস্তি কাবার—আর ভয় কি?

সোনারূপার অলঙ্কার বড় বড় দামী জিনিস—যা আমাদের তা সমুদায় চিরাপুঞ্জীতে পাঠান হয়েছে। এমন হয়েছে যে, ওদের পক্ষের পাহারাওয়ালা সর্দ্দার লাঠিয়াল জিনিসপত্র মাথায় করে বয়ে দিয়ে আস্ছে। টাকার অসাধ্য আছে কি? একজনকে দুইজনে ঘুষ দিচ্ছি।"

"ঠিক ঠিক!! টাকার অসাধ্য কি আছে? তাতেই বলি, সাবধান থাকাই ভাল।"

"আমার প্রাণ নিয়ে তাদের লাভ কি? তবে সোনাবিবির মানসম্ভ্রম জাতি—ধনসম্পত্তি—তাঁর নরাধম দস্যু পুত্রের হস্ত হতে রক্ষা করতে যদি প্রাণ যায় জগতেও নাম থাকবে, সাধারণেও দেখবে। সম্পত্তি লিখে না দিলে কয়েদ হতে মুক্তি নাই!—ভাল কথা—যদি বৃটিশ রাজ্যে হয়, যদি ন্যায়বান গভর্ণমেন্টের রাজ্যে হয়, তবে কখনই অন্যায় রূপে এরূপ কয়েদ করে কয়দিন কে কাকে রাখতে পারে?"

সবলোট হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দাগাদারী" মিয়াঁ! মনে রেখ, তুমিই বলেছ টাকায় কি না হয়। সেই কথাটা মনে রেখে যা ইচ্ছা তাই কর। ও সকল কথা থাক—আমি যে একটা কথা সোনাবিবির নিকট বলে পাঠিয়েছিলাম, তার খবর কি?"

দাগাদারী মিয়াঁ বলিলেন, "সে কথাও আছে। আর যদি ছেলেটাকে হাতে এনে দিতে পারেন, তা হলে তৎক্ষণাৎ আর দুই হাজার! তারপর যখন আপনার দরকার হয়, জানাতে বলেছেন।" এই কথা বলিয়া দুই খণ্ড নোট—দুই হাজারের—সবলোট আলীর সম্মুখে রাখিয়া দিলেন, সবলোট আলী অতি তুচ্ছ জ্ঞানে আলিস্য করিয়া খুলিয়াও দেখিলেন না, ছুঁইলেনও না! মুখে বলিলেন—

"লিখে পড়ে দিয়ে পথের ফকির হওয়া চাইতে, দু'দশ বছর হাতে পাতে দাঁতে নেড়ে চেড়ে দেখে শুনে, নিজের ফকির নিজে হওয়াই ভাল। কয়েদ থেকে উদ্ধারের জন্যে চার লাখ টাকার সম্পত্তি বিনা পণে বিনা মূল্যে লিখে দেওয়া—ইহার উপর পুত্রের নাবালকী সময়ের নিকাশের দায়ে মাথা গুঁজে বসে থাকা—বেশ কথা! এইত বিচারের কথা! খবরদার কোন লেখাপড়ার মধ্যে যেও না। দেখ কি হয়। রাত্রও অধিক হয়েছে। সোনাবিবিকে একা রেখে তুমি এত রাত্রে এভাবে বাহির হ'ও না।"

"আমার কি বাহির হবার সাধ্য আছে। দশটি টাকা ঘুষ দিয়ে তবে আপনার কাছে আসতে পেরেছি। কি কাণ্ডকারখানা যে হচ্ছে, তা আর কত বলব।"

সবলোট আলী আশ্চর্যান্বিত ভাবে, আপসোসের সহিত বলিলেন, "আমাদের টাকা আমাদের লোকজনেই নিচ্ছে! কি দুঃখের কথা। সোনাবিবি আর জয়ঢাক, মা ছেলে সম্বন্ধ—এ সম্বন্ধ কখনই যাবে না। মাঝখানে লোকের মুখ চেনাচিনি হবে। ছি ছি, বড় ঘৃণার কথা!! তোমার হাতে তোমার চাকরে ঘুষ নিল? সোনাবিবির টাকা খরচও তাই। এও যার টাকা সেও তার টাকা। এ সকল কথা জেনেশুনেও লোকে জ্ঞান-হারা হয়ে, যা মনে উদয় হয় তাই করে। শেষে লাঞ্ছনা গঞ্জনা, হদ্দ বেহদ্দ বেজায় জায়, কখনও জয়, কখনও পরাজয়, হেসে খেলে কেন্দে সর্ব্বস্ব-হারা হয়ে যা হবার তাই হবে। বড়ই প্রমাদ দেখতে পাচ্ছি। যাও, রাত্রও অধিক হয়েছে—সাবধানে সতর্কে থাক্‌বে। কিছুদিন অপেক্ষা কর জয়ঢাক আলীকে তার মায়ের কাছে নিয়ে দিয়ে আসছি। সোনাবিবি যেন কোন চিন্তা না করেন।"

বিছানা হইতে উভয়ে উঠিয়া দরজার নিকটে আসিলেন। চোট্টা মিয়াঁ কোন কথা বলে নাই। শেষে উঠিয়া আসিবার সময় কথাটা বলিয়া উঠিল, "হুজুর! সকল চিন্তা হুজুরের মধ্যে!"

"না না"—সবলোট আলী একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "না না, আমার মধ্যে কিছু নাই। আমি সকলেরই খয়ের খাই। এর ভালর চেষ্টা করি—ওর ভালর চেষ্টা করি। একেও যে চক্ষে দেখি ওকেই তাই—"

দাগাদারী বলিলেন, "যা বল্লেন তা যদি পারেন, তবে দুহাজার ধরা রৈল। হাতে হাতে বদলাই। আপনিও হাতে দিবেন—আমিও হাতে দিব।"

"যাও ভাই বেশী রাত কর না। সোনাবিবিকে একা ফেলে—খবরদার বাহিরে থেক না, এস না। এখন তোমরাই তার হাত-পা—বাপ ভাই—পুত্র কন্যা—যা বলো। তোমরা চার পাঁচটিই হচ্ছো তার এখন সম্বল—তাই ভেবে কাজ কর্ম্ম কর।"

এই সকল কথা বলিয়া সবলোট আলী, দাগাদারী ভাই আর চোট্টা মিয়াঁকে বিদায় করিয়া দিয়া, আলোটি একটু উচকিয়া দিলেন, এবং পায়চারি করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "প্রায় সাড়ে তিন হাজারের নিকটে নিকটে। চাই কি? দুই ঘণ্টার মধ্যে সাড়ে তিন হাজার। দুই ঘণ্টা ত প্রায় নিকটে। আর ২৫ মিনিট বাকী। ঘর-ভাঙ্গা বেটা ফাঁকী দিল, নাকি? আজ আমাকে ফাঁকি দিলে, কাল ২৪ শত দিলেও কুলাবে না!!"

ফাঁকি কথাটা মনে পড়িতেই বিছানার দিকে আসিয়া নোট দুই খণ্ড—দাগাদারী ভাই দত্ত নোট দুই খণ্ড দুইটি হাজার টাকার—বাতির আলোতে গিয়া ভালরূপে দেখিয়া—এপিট ওপিট দুপিট দেখিয়া হাত বাক্সে রাখিয়া দিলেন। আবার পায়চারি আরম্ভ হইল। কথা ফুটিল—

"আচ্ছা খেলা খেলেছি। মিছামিছি এক কথা তুলে—দেশসুদ্ধ এক গোলযোগ বাঁধিয়ে দিয়েছি। দুই জনেই এই হাতে। জয়ঢাক আমার খুব বাধ্য তাকে যে পথে ঘুরাব, সে সেই পথেই ঘুরিবে। লোকে বলে জয়ঢাক ধম্বলোচনের বড় বাধ্য—সেটা কথার কথা। ওর আগে

কত কি পরামর্শই না করেছিল। দুবছর হতে এর সাজ সরঞ্জাম। স্থূল কথা দুইটি ঘরই বিনাশ হবে। জয়ঢাক আর ছিঁড়িয়া খাতুনের বিবাহই একপ্রকার আমাদের মঙ্গলের কারণ। মনিবিবির যে রাগ সোনাবিবির উপর সাড়ে ষোল আনা রূপ ছিল, তা এই চক্রে উনিশ আনা রূপ ঝাড়া হয়েছে।

"কি দশা। মানুষে মানুষের কিনা করতে পারবে—বাড়ীসুদ্ধ লোক এক দিকে। দশমান চক্রে ভগমান ভূত। আহা! মায়ের কোল থেকে ছেলে কেড়ে নেওয়া হলো—দিনে দুপুরে নাঙ্গা তরবার হাতে করে স্ত্রীর হাত ধরে আপন বাড়ী হতে শাশুড়ীর বাড়ী চলে গেল। কথা রটিল যে সোনাবিবি দাগাদারী ভাইকে অত্যন্ত ভালবাসেন, পেটের ছেলে জয়ঢাককে দেখতে পারেন না। জয়ঢাকও একেবারে নাবালক নহে। খোদার ফজলে ২০/২১ বৎসর বয়স। কার্য্যতঃ সাবালক, আইনত নাবালক—সেও তাই বিশ্বাস করল। তার আঁতে আঁতে কথাটা বসালেম। আগুন জ্বলে উঠলো। সাহায্যকারিণী শাশুড়ী। বেশ হয়েছে—এতদূর ঘটে উঠবে আগে বিশ্বাস করি নাই। খুব হাত দেখান যাবে।"

নিবিষ্ট চিত্তে, একমনে মনের কথা ভাঙ্গচুর কর্চ্ছেন। হাঁ না,—নানা প্রকার উত্তর প্রতি উত্তর হচ্ছে। দরজা বন্ধ করেন নাই। ঘর-ভাঙ্গা সান্যাল আর একটি বাহক, মাথায় টাকার তোড়া ত্রস্তপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সবলোট আলী দেখিয়া অবাক। দরজা কি খোলা ছিল? প্রাণ কাঁপিতে লাগিল—মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "দরজা কি খোলা ছিল?"

ঘর-ভাঙ্গা সান্যাল বলিলেন, "দরজাটা খোলা রেখে বড়ই বুদ্ধির কাজ করেছিলেন।" এই বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বলিলেন, "ভাল করে চিন্তে পাল্লেম না। লাঠি সড়কী হাতে, বাঁন্দা কোমর, প্রায় ২০ জন লোক দশ হাত তফাত থেকে সাঁ সাঁ করে চলে গেল। লোকগুলি যে সোনাবিবির তাতে আর সন্দেহ নাই। এত রাত্রে কি কর্ত্তে কোথা গিয়েছিল? ভাগ্যে তাদের সম্মুখে পড়ি নাই—তাহলে টাকাও যেত, আর যা হবার একরূপ ভালই হত।"

"আপনিই বা এ ভাবে কেন বাহির হলেন! দশ, বিশ জনকে সঙ্গে করে কেন আন্‌লেন না!"

"একটি খানসামা সঙ্গে করে এনেছি, এই অন্যায়। দশ জন আন্‌লে দশটি অন্যায় হত। হুজুর! এখন টাকা নিন আমি যাই। এক তোড়াতেই চৌদ্দ শত আছে।"

"আচ্ছা ঐ তাকের উপর রেখে যান। অরাজকপুরের খবর সর্ব্বদা নিবেন। যা যা যে প্রকারে বলা হয়েছিল, সে সকলের মুখত বন্ধ করা হয়েছে?"

"হুজুর কেউ বাকী নাই। কেবল বুড়র গলায় দড়ি দিতে পারি নাই। বুড়ু ভারি একরোকা। তাতে আর ভয় নাই। কারণ হাত পা বুদ্ধি আর বল—সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। টাকার কাছে আইন লাগে কোথা? কয়েক-খালাসীর হুকুম এলেও দেখবেন কত গোল লেগে যায়। আজ বিদায় হই।" এই বলিয়া ঘর-ভাঙ্গা সান্যাল সেলাম বাজাইয়া ঘর হইতে চাকর সহ বাহির হইলেন। সবলোট আলী টাকার তোড়া হাতাইয়া শেযে বন্ধন খুলিয়া দেখিয়া লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিলেন।

দরজার নিকটে যাইয়া অর্দ্ধ শরীর পর্য্যন্ত দরজার বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন, কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না। দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখত বেটা কি পাজি। রাত প্রভাত হয়ে যায় কোন খোঁজখবর নাই। এরা নিজের লাভ নিয়েই ব্যস্ত; আমার দিকে আর কেউ ফিরে চায় না।"

দূরে ভেড়ুয়া খাঁর কথার স্বর শুনিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বেটা শীঘ্র শীঘ্র আয়! আর কতক্ষণ তোর অপেক্ষায় থাকবো।"

ত্রস্তপদে ভেড়ুয়া খাঁ গৃহ-দ্বারের নিকটে আসিয়া বলিল, 'হুজুর! সে এল না। তার জ্বর হয়েছে।"

"তোর খালা কি বলল?"

"না, সেও আজ আসতে পারে না। তার জামাই, দুই ছেলে নিয়ে, সন্ধ্যার সময় এসেছে।"

"তারপর উপায়?" "উপায় আর কি? শেষে নসার মার কাছে গিয়েছিলাম। সেও এল না, বল্লে, শরীর খারাপ।"

সবলোট আলী রাগত ভাবে বলিলেন, "যা বেটা, তোর মাকে ডেকে আন্।"

ভেড়ুয়া খাঁর ত্রস্তপদে বেগে গমন। এদিকে দরওয়াজা বন্ধ।

তৃতীয় নথি

আজ কুঞ্জ-নিকেতনে বড়ই ধুমধাম্। এটা করো, সেটা করো, নানাদিকে নানা আদেশ, —নানা কার্য্য। কর্ত্রী হইতে চাকরাণী—চাকরাণী হইতে মেথরাণী পর্য্যন্ত কাজে ব্যতিব্যস্ত। এত যত্ন এত আয়োজন কার জন্যে? এত ধুম্ধাম্ কিসের জন্যে? এ রাজ-রাজড়ার কাণ্ড নহে, নবাব সুবার খেয়াল আবদার নহে, সাহী ওজনের কারবার নহে। যে কোন কার্য্যেই হউক, লোকে অবস্থানুসারে অনুষ্ঠান, আয়োজন করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আমাদের বেগম সাহেব বনিয়াদি বেগম নহেন, কোন নবাবের ভগ্নী নহেন, শাহাজাদার জননী নহেন, নাম মাত্র বেগম। কাজেই বেগম সাহেবের মত হাত দারাজ, মুখ দারাজ, পা দারাজ, নজর দারাজ, গলা দারাজ না দেখাইলে, যেন তেন প্রকারেণ জাঁকাল ভাব না ধরিলে, বেগমত্ব বজায় থাকে না। এই হইল মূল বৃত্তান্ত, খাঁটি খবর। বেগম সাহেবের কাণ্ড কারখানা, কার্য্যপ্রণালী, ব্যবহার, ব্যয়বিধান, সকলেই অতিরিক্ত। বড় মানুষি দেখানই স্বভাব। বনিয়াদী চাল।

একটি ভদ্রলোকের আহারের আয়োজন করিতে বসিয়াছেন, দশ রকম রান্নার যোগাড় করা হইয়াছে। বড় বড় দশটি মোরগের প্রাণবায়ু ছুরির অগ্রভাগে বাহির হইয়াছে, কুড়িটা আণ্ডার শরীর ধ্বংস হইয়াছে। ইহার পর, ডালনা, ডাইল, টক্, চচ্চড়ি, লুচি, কচুরী

ইত্যাদিরও যোগাড় করা হইয়াছে। যাঁর নিমন্ত্রণ, তিনি হিন্দু, নাম সাহেব। হাজার হইলেও মাছ চাই, দধি চাই, পায়স চাই, সন্দেশ রসগোল্লা চাই,—ইহার পর—মুসলমানি খানা আজকাল টেবিলের অলঙ্কার ও শোভা, তাহাও চাই। বাদামের "লওজ", "মিঠা চাউল", নানখাতাই, মিঠা নেম্‌কি, পরাটা, ফির্নী, মাকুতি, এ সকল সুখাদ্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন। ঘর দরজা, কৌচ, কেদারা, টেবিল, ছুরি, কাঁটা, গ্লাস, চা-দানী, নূতন রঙ্গীন, সোনালী কাজ করা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইয়া যথা যথাস্থানে সাজান হইয়াছে। সেরী-পোর্ট, সেম্পীন-ক্লারেট, লিমনেড, সোডা ঠাণ্ডা জলে ঠাণ্ডা করিতে ডজন ডজন ডুবিয়ে রাখা হইয়াছে। খানসামা, আরদালী, দরবান, বেয়রা ও আয়া-বয়দিগকে দস্তুরমত পাগড়ি, চাপরাস, পেটি বাঁধিয়া—নূতন উর্দ্দী পরিয়া আপন আপন কাজ-কর্ম্ম করিতে হুকুম হইয়াছে। যে যে স্থানে কেরোসীনের ডিবিয়া জ্বলিত, সামান্য বাতি জ্বলিত, সেই সেই স্থানে ভাল ভাল ল্যাম্প জ্বালিবার আদেশ হইয়াছে। খানার টেবিলে নূতন আমদানী ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভাল ভাল সখের জিনিসে, সৌখিনভাবে—বৈঠকখানা ঘর সাজাইবার আদেশ হইয়াছে। কোন কথায়, কোন বিষয়ে লোকে গরীব না বলে, কৃপন আখ্যা না দেয়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। বাহ্যিক আড়ম্বরে লক্ষপতির পরিচয় হওয়া চাই। জাঁকাল জমকাল দেখান চাই। হাকিম সাহেব রাত্র আটটার পর বেগম সাহেব নিকেতনে পদার্পণ করিবেন। আরও দুই একজন বন্ধুবান্ধবও জুটিতে পারেন, নাও পারেন, কিন্তু হাকিম সাহেবের আগমন—নিশ্চয়।

নিজের পরন পরিচ্ছদ প্রতিও অমনোযোগী হন নাই। অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন। উপযুক্ত সহোদর ভ্রাতাদ্বয়, মন্ত্রের সাধন—কিম্বা শরীর পাতন চেষ্টা করিয়া, নিশি জাগিয়া, লিখা-পড়া শিখাইয়াছেন। সভ্যতা, শিল্প, বিজ্ঞান, চাতুরি, চালাকি, চাউনী, পদনিক্ষেপ, করমর্দ্দন, আঁখিঠার, অঙ্গভঙ্গী, হাসির কেতা বিস্তর শিখিয়াছেন। ভ্রাতাদ্বয়ের মন উচ্চ, কাঞ্চন শৃঙ্গ হইতেও উচ্চ, বেহদ্দ উদার। বিধবা ভগিনীকে মহানগরী কলিকাতা দেখাইয়া, গলিকুচ, বড় রাস্তা, ভাগিরথী, বোটবজরা, জাহাজ, ইডেন গার্ডন, সোনাগাছি, হাড়কাটার গলি, মেছুয়াবাজার, এমামবাগ লেন, চিড়িয়াখানা, দেখাইয়া চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক ফুটাইয়া ফুটিকাটার মত চৌচির করিয়া দিয়াছেন। কোন বিষয়ে বেগম সাহেব অজানা অচেনা নন। বোবা নন্—সকল বিষয় সুদখল আছে। যুগল ভ্রাতার জোড়া উপদেশে, জোড়া শিক্ষায়, জোড়া সংস্কারে ডবল টানে, দ্বিগুণ পরিশ্রমে, পাকাপোক্ত হইয়া, দেশ বিদেশে খ্যাত বিখ্যাত হইয়াছেন। নাম গুণ গরিমা বর্ষাকালীন পদ্মার স্রোতের ন্যায় হু হু শব্দে চারদিক ছুটিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগ ডুবাইয়া মাতাইয়া তুলিয়াছে। আমোদ আহ্লাদ, আলাপ-পরিচয়, কথাবার্ত্তার কেতা, ধরন, দিবারাত্রের পরিশ্রমে, উপদেশে অতি অল্প সময় মধ্যে পাড়াগেঁয়ে ভাব হইতে একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। ভাই দুটি দেখিতে বড়ই সুন্দর, কেতা দুরোস্ত সুচেহারা, মানানসই। দেখিবার জিনিস বটে। ডাক নাম—মা বাপের আদরের নাম—হটু আর নটু। খোস পোষাকী মজলিসী নাম—আরমান আর করমান।

প্রিয় পাঠক! কথার দোকানদারী করিয়া জীবনকর্ত্তন করাই গাজি মিয়াঁর জীবনের উদ্দেশ্য। সংক্ষেপে এইখানে অতিরিক্ত কএকটি কথা বলিয়া রাখি। হটু নটুর সঙ্গে আরও দেখা হইবে। খরিদ "ফরোখ্‌ত" অর্থাৎ কেনাবেচা যে না হইবে, তাহাও নহে। এই সুযোগে আরও একটু বলিয়া রাখি। হটু নটু দুটি ভাই—যেন জুড়ির কানকাই, পেগুর টাটু, মনিপুরী মাদওয়ান, জোড়ের পায়রা, মানিক জোড়, এক বোঁটায় দুটি মাথাল, উভয়েই কৃতবিদ্য, খোলা মন, রসের তুফান, হাসি তামাসা, রগড় ইয়ারকির ফোয়ারা।—এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ। উভয়েই বেগম বাহাদুরের অনুজ। রসিকের শিরোমণি, চিন্তামণি, যাদুমণি, গোকুলের যুগল নীলমণি, মাতালের চূড়ামণি, না পারেন এমন কথা নাই। তাঁহাদের মনে বিশ্বাস—ভবধামে তাঁহারাই রূপবান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধনবান, বলবান, জ্ঞানবান এবং তাঁহারাই ধূর্ত্ত এবং ধুরবাজ। পৈতৃক সম্পত্তি ঋণদায়ে পর হস্তে। সে কর-কমলে, নিজ দখলে, বসত বাড়ীটি ভিন্ন আর কিছুই নাই। কলিকাতার বাহারে যথাসর্ব্বস্ব নীলামে চড়িয়া মাটির দরে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ভরসা ভগিনী। আশা ভরসা, উদরের দায় সমুদায় ঐ লক্ষ্মী স্বরূপিণী প্রিয়তম ভগিনী। ভগিনীর অন্নেই ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ, ভগিনীর অর্থেই অভাব মোচন। তাহাতেই বাবুগিরি, তাহাতেই রকমারী, সেই ধনেই ভেরীমেরী, সেই বলেই ফরফরী, নুকোচুরি। তাঁহারাই ভগিনীর পৃষ্ঠপোষক, রক্ষক, পরিচালক, পথদর্শক। তাঁহারাই প্রিয় দিদিমনিকে নানারূপ শিক্ষা দিয়া ইনলাইটেন করিয়াছেন। নূতন জগতে নূতন ধরনে চলাফেরা করিবার মত খাড়া করিয়া দিয়াছেন। ইংরেজী বাঙ্গালা খবরের কাগজে গুণগান রটাইয়াছেন। শিক্ষিতা মহিলা নাম ডাকে জগৎ জাঁকাইতেছেন, জাগাইয়াছেন কাঁপাইয়াছেন—দিদিমনি আরও ফুলিয়া পড়িয়াছেন। একি কম সাহসের কথা! কম ক্ষমতার কথা? হাকিমান সঙ্গে আলাপ পরিচয়, নিত্য নূতন অভিনয়, দিনেও হয়, রাত্রেও হয়। হাসি তামাশা, তাসপাশা, খেলাধূলা, এয়ারকি, খোশগল্প, মজাদারী রহস্য কৌতুক,—দান দাতব্য খয়রাত, যৌতুক—চলা ঢালা মলা, গলা, ফেরা চলা, একি কম কথা? এ সকল কি যার তার ভগ্নী পারে? হাত দারাজ, হটু নটুর কল্যাণে। কমল কুটিরে গতিবিধি, সেও মাণিকদ্বয়ের প্রসাদে। ব্রাহ্মসভায় গতিবিধি, সেও যুগল ভ্রাতার হিতোপদেশে। বাৎসরিক ২৫ হাজার টাকা আয়, তবুও কুলোয় না। প্রতি মাসেই মহামহিম পত্রমিদং কার্য্যানঞ্চাগে লিখিয়া দিয়া, টাকা উপার্জ্জন, সেও যুগল সহোদরের মন্ত্রণায় ও খরচের দায়ে। ঋণে ঋণে জ্বর জ্বর মরমর, ডিক্রির দায়ে নিলামের সোহরতে, কাঁপে অঙ্গ থর থর, তত্রাচ বেগম ঠাকুরানী বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে, মর্য্যাদা বহাল রাখিতে বড় মানুষি বজায় রাখিতে সর্ব্বদা মুক্ত হস্ত। অবারিত দ্বার। যেখানে লাগিবে দশ, সেখানে খরচ করেন বিশ। যেখানে কিছুই লাগে না, সেখানেও কিছু না লাগিয়ে যায় না। সে ক্ষেত্রেও কিছু খরচ হয়। আজ ত হইবারই কথা। পরম শত্রু ভেরাকান্তকে জব্দ করিবেন, জেলে দিবেন। তাহারই যোগাড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র। ব্যয়ভূষণ হওয়ারই কথা। কিছু বেশী পরিমাণ খরচ হওয়ারই সম্ভাবনা। যার শাস্তিদাতা, তাঁহারই ভোক্তা। তাঁদের শুভাগমনেই, এত ব্যয় বাহুল্য—রাস্তাঘাট পরিষ্কার, ফুল বাগান পরিষ্কার, দেউড়ি,

তোসাখানা, মালখানা, দরবারের কাচারী, ফুলমালায় সজ্জিত—গেট্ হইতে সুন্দর দ্বিতল বৈঠকখানা পর্য্যন্ত দুসারী কদলীবৃক্ষ, সোজা টানা লাইনে দুধারী শ্রেণীবদ্ধ রূপে দেবদারু পত্রে ও লালনীল এক রাঙ্গা বস্ত্রের নিশানে পরিশোভিত, দিব্বি বৈঠকখানা আজ বৈঠকখানার সাজ নয়নের তৃপ্তিকর, বড়ই সুখদ, নিতান্তই জাকাল জমকাল অতি উচ্চভাবে সজ্জিত। দেয়ালে, গেটে, টেবিলে, জোড়া জোড়া বাতী জ্বলিতেছে। অতি উজ্জ্বল ল্যাম্প সকল দেয়ালের গায় বসিয়া রোস্‌নাই বিলি করিতেছে। প্রকাশ্য দ্বারে দ্বারে দ্বারবান সজ্জিত হইয়া উলঙ্গ অসি হস্তে খাড়া পাহারা দিতেছে। ঘড়ি কম হইলেও কুড়িটা। কত দেয়ালে, কত টেবিলে, কত শূন্য স্থানে, অস্থানে, অবস্থিতি করিয়া ঘণ্টায়, অৰ্দ্ধ ঘণ্টায় কোয়াটারে পঞ্চ মিনিটে, সুস্বর বিতরণ করিতেছে। সুরুচিসম্পন্ন টানা পাখা, ঝালরের চাক্‌চিক্য দেখাইয়া গৃহমধ্যে স্থিত শূন্য ও স্থির বায়ু সহিত ক্রীড়া করিতেছে। এক সেকেণ্ড জন্যও বৈঠকখানালঙ্কার টানা পাখার বিশ্রাম নাই। হল্‌কামরার মধ্যে অতি শুভ্র, সুগোল, একখানি শ্বেত প্রস্তরের টেবিল। টেবিলের ধারে পরস্পর সম্মুখিন হইয়া এক নারী মূৰ্ত্তি ও এক নর মূৰ্ত্তি গদীআঁটা, বড় এমেরিকান চেয়ারে বসিয়া মৃদু মৃদু স্বরে কথা কহিতেছেন। নারী মূৰ্ত্তির পশ্চাতে রঙ্গীন চিনা পৰ্দ্দা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পৰ্দ্দায় পতনে কাম্‌রাটি দুই ভাগে বিভাগ হইয়াছে। এক ভাগে পাঠকের দৃষ্টিগোচরে নরনারী মূৰ্ত্তি, টেবিলের নিকটে বাতির সম্মুখে বসিয়া কত কথা কহিতেছেন। অপর অংশে অর্থাৎ পৰ্দ্দার আড়ালে, কি যে আছে—এইক্ষণে অপ্রকাশ্য। তবে এইমাত্র বলিতে পারি। তিনি গুপ্তধন, হৃদয়ের রতন, অন্তরের ভালবাসা মণি—বড়ই গুপ্তকথা তাহাতেই এত সতর্ক সাবধান। অধিকন্তু রূপে পৰ্দ্দার ব্যবহার—কিন্তু আলোর মুখকে আটকাইতে পারে? পৰ্দ্দা ফুটিয়া বড় পালঙ্কের ছত্রি দন্তের ছায়া, মশারির ছায়া, কথঞ্চিৎ ছায়ার আভাস—ছায়ার ন্যায় দেখা যাইতেছে।

নর-নারী মূৰ্ত্তি সম্মুখে টেবিলের উপর দুইটি সাদা ডিকেণ্টর। একটির মধ্যে নীচের অৰ্দ্ধাংশ লাল জলে রঞ্জিত হইয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। পাতলা কাঁচ, ফুতকারে বাজিয়া উঠে। দুই গ্লাসেই কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে, সেটুকু সাদা নহে। নিম্নে সাদা প্রস্তর, উপরে সাদা কাঁচ—সম্মুখে সাদা বাতী, মধ্যস্থানে কিঞ্চিৎ রঞ্জিত জল, বেহদ্দ বাহার। দৃশ্য মনোহর, নয়নমন তৃপ্তিকর।

হলটি নূতন চুনকাম করা হইয়াছে, আলোর বাহারে সুন্দর মানানসই দেখা যাইতেছে। নর পরিচ্ছদ শুভ্র—সাদা সাটিন জিনের কোট, পেণ্টুলন পরিপাটী ইস্ত্রি করা। নরবরের মুখের রং আর মাথার চুলের রং প্রায় একই প্রকার। নারী মূৰ্ত্তির চাঁদ বদনের রঙ্গে, আলোর রঙ্গের সহিত আঁতে আঁতে রগে রগে, ঘাতে ঘাতে সম্পূর্ণরূপে মিল। জ্বলন্ত আলোর প্রভাবে দুই মুখের আলাপ বড়ই শোভা হইয়াছে।—শ্বেত দলে ভ্রমর বসিয়াছে। প্রস্ফুটিত শত শত শ্বেত দলে অবিরাজ বিরাজ করিয়া অতি সংগোপনে মধু পান করিতেছে। কথায় কথায় মুচকি হাসি, প্রকাশ্য হাসির আভাসে পরিষ্কার দন্তরাজির শোভা দেখিবার জিনিস হইয়াছে। একজনের মুখ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ—যেন হাড়ি পাতিলের কালী। দ্বিতীয় মুখ অর্থাৎ নারীমুখ

উজ্জ্বল, শারদীয় পূর্ণ চন্দ্রের আভা, দেখিবার জিনিস বটে। ইঁহারা কে? এ নর-নারী মূর্ত্তি কে? কেহ কি চিনিতে পারেন নাই? অসম্ভব! উভয় মূর্তিই আপনাদের পরিচিত। পূর্ব্ব ঘটনা ও কার্য্যে বিশেষ পরিচিত। কোট্না সিংহের সেই পত্র,—দুই ঘণ্টা পরে জবাব যাইবে। পত্রেই বলিয়াছে যে রাত্র আটটার পর দেখা হইবে।

সেই দেখাই আহারের নিমন্ত্রণ, স্বয়ং কর্ত্রী খেদমতে হাজির, রাত্রি প্রায় সাড়ে দশ। স্বয়ং কর্ত্রী মন দিয়া মান্যের সহিত খেদমত করিবেন। হাকিম সাহেব সময় নষ্ট করেন নাই, সময়ের মূল্য বুঝিয়া ঠিক সময় মত আসিয়া কথাবার্ত্তা খোস্‌গল্পে মন দিয়াছেন। আড়াইটি ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। হাকিম সাহেব ধীর-গম্ভীর ভাবে বলিলেন ঃ—

"আমি আজ এত সুখী হয়েছি যে এক মুখে প্রকাশের সাধ্য নাই। মুসলমান মধ্যে এরূপ এন্‌লাইটেন, এত উন্নত মন, উন্নত চিন্তা, উন্নত আশা, উন্নত চক্ষু, উন্নত হৃদয়, উন্নত বক্ষ, আমি কখনও দেখি নাই। ধন্য শিক্ষা, ধন্য সাহস। শত সহস্র ধন্যবাদ, হাজার থ্যাঙ্ক, হাজার হাজার কোরনিস, হাজার হাজার নমস্কার, আপনার চরণ যুগলে। সত্য সত্যই আমি মহা সন্তুষ্ট হয়েছি। আশ্চর্য্য কাণ্ড! আমার নয়ন-মনের—অন্তরের ধাঁদা ছুটে গেল। কে বলে মুসলমান রমণীরা নোঙ্গরা, ময়লা, অসভ্য? কথা কইবার ক্ষমতা নাই, মাথার ঘোম্‌টা খুলবার অধিকার নাই? ঠিক যেন একটা মানবাকার বাক্‌শক্তিবিহীন জানওয়ার বিশেষ। ধন্য ধন্য! সাধ্য নাই এরূপ শিক্ষায় এরূপ ব্যবহারে কোন মুসলমান মাথা তুলিয়া দুটি কথা আপনার বিরুদ্ধে বলতে পারে? ধন্য ধন্য মেহমুডেন লেডী! এত উন্নত! ধন্য ধন্য পাড়াগায়ের পর্দ্দানিসীন জানানা! এত উন্নত! এ অভাবনীয় ঘটনা, এই নূতন ঘটনা, পর্দ্দানিসীন, জানানা-কাণ্ড আমার পক্ষে নিতান্তই নূতন আমার চক্ষে এই প্রথম দর্শন। জীবনে নূতন ব্যাপার, নূতন কাণ্ড।"

"আপনার যখন দরকার হবে, ডেকে পাঠাবেন, আমি আসবো। দেখবো—শুন্‌বো। যাতে যা হয় তা করবো। ইচ্ছা হলো, কি এক জায়গায় থেকে থেকে নিতান্তই মন্‌টা অস্থির হয়ে উঠলো, পাল্কী করে আমার বাঙ্গালায় যাবেন। সমাদরে মাথায় করিয়ে নিব। খুব কপাল জোর মনে করব। দিনে রেতে যখন যে সময় আপনার ইচ্ছা হয়—ডাকা, যাওয়া, চিঠি লিখার ক্ষমতা, জোরের সহিত—খুব শক্ত ভাবে আপনার রইল। আর ইহাও বলি, আপনার খাতিরে, কি অনুরোধে আমি কখনই ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করব না। যাতে আপনার সন্তোষের কারণ হয়, নিশ্চয় জানবেন, আমি তা করব। দেখবেন, কার্যক্ষেত্রে দেখবেন, এখন বলা বৃথা! অনুমতি হয়ত একবার গলাটা ঠাণ্ডা করি।"

নারীমূর্ত্তি বলিলেন—খুব মিহি সুরে আস্তে আস্তে গোটা গোটা অক্ষরে বলিলেন—সঙ্গে সঙ্গে একটু ইসদ হাসির গোলাপী আভায় রসময় সুরে গায়ের রেশমি, মিহি-চাদরখানা পরিপাটীরূপে বুকের উপর সটান করিয়া দিয়া, মাজাটা দক্ষিণ বামে দুই তিনবার নাড়াচাড়া করিয়া চক্ষে, চক্ষে মুখে মুখে, নাকে নাকে, ভ্রুতে ভ্রুতে মিল করিয়া আবার সেই পূর্ব্ব হাসির সহিত সংযোগে হাসিয়া বলিলেন,

"আপনার অনুগ্রহেই আমার সকল্। জীবন, ধন, মান, জাতি, খ্যাতি শত্রু, মিত্র, জমিদারী, সকলি আপনার দয়া ও অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর।"

নরমূর্ত্তি স্বহস্তে ঢালিয়া, গলা ঠাণ্ডা কার্য্য মনোমত সমাধা করিয়া গদগদ সুরে বলিলেন,

"অবশ্য অবশ্য অবশ্য। আপনার মঙ্গলে আমার সম্পূর্ণ সুখ। আপনার খুশীতে আমি খুব খুশী।"

নারীমূর্ত্তি একটু বিষাদমাখা স্বরে—সেই বড় বড় পটল চেরা চক্ষু দুটি জলে ভাস ভাস করিয়া বলিলেন,

"আমার বিষয় কিছুই আপনার অজানা নাই। নানা কৌশলে—নানা পথে—নানা সন্ধানে আপনি আমার ঘরের খবর পর্য্যন্ত জেনেছেন। আপনার নিকট অধিক আর কি বলিব। সকলি আপনার—"

"আমি দাদার মুখে সুমদয় অবস্থা শুনেছি কোন চিন্তা নাই।" "চিন্তা যা আছে, তা ইহ জীবনে যাবে না। এখন বল ভরসা—হাত পা—সকলি আপনি, দাদার মুখে শুনেছেন, বাকী যা ছিল—শত্রুর মুখে শুনে হয় বিশ্বাস করেছেন, নয় মিথ্যা ভেবেছেন। এখন প্রার্থনা এই যে, যাতে করে থাকতে পারি, এই জঙ্গলময় অসভ্য দেশে যাতে থাকতে পারি, কেউ কিছু না বলে, কোন প্রকারে দৌরাত্ম্য না করে, দেখবেন রক্ষা করবেন। এই আমার প্রার্থনা।"

নরমূর্ত্তি আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বলিলেন, "সেকি? সেকি? প্রার্থনা কি? আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, আপনি যা বলেন, আমি তাই করবো? আপনি স্বচ্ছন্দে নিঃসন্দেহে, জমিদারী কার্য্য করতে থাকুন। চিন্তার কোন কারণ নাই। সকল সময় আমি হাজির আছি।"

"যদি বলেন না হয় আপনার দাদাকে চিঠি লিখে শিমলা পাহাড় থেকে আনাই।"

"না না। তাঁকে কেন কষ্ট দিবেন। শিমলা থেকে এই জঙ্গলময় দেশে আসা কি কম হাঙ্গামার কথা! তাঁর এসে দরকার কি? কেন তিনি আসবেন? না না, আপনি কখনই তাঁকে কোন কথা লিখবেন না। যখন যা হয় আমাকে জানাবেন।"

"তাত জানাবই। আমার শত্রু অনেক। তাগিদকে চিনাতে পারলে, অনেকটা সুবিধা হয়।"

"চিনতে বড় বাকী নাই। ক্রমে অনেক চিনেছি, এই সেদিন কে একজন—নাম বলব না—কোন ভদ্রলোক কথায় কথায় গল্পে গল্পে বলতে লাগলেন যে হুজুর ; আজকাল কুঞ্জ নিকেতনে বড় আমোদ, বাড়ীর মধ্যে বড়ই ধুমধাম। দাদা এসেছেন শিমলা পাহাড় থেকে। এসে বাড়ীর ভিতরে মেয়ে সেজে গোপনে পর্দ্দার ভিতরে—মশারির মধ্যে আছেন। যুব আমোদ—খুব খুশী—খুব মজা—

আমি বল্লাম মহাশয়! ও সকল কথা আমি শুন্‌তে চাইনে। মাপ করবেন। লোক চিনতে বাকী নাই। তবে সংখ্যার এখনও অনেক বাকী!"

নারীমূর্ত্তি ম্লান মুখে অতি বিষাদিত ভাবে বলিলেন, "আপনিই বিচার করে্ দেখুন, আমার শত্রু কেমন ভয়ানক শত্রু। আমার বদনাম তাঁদের জিহ্বাগ্রে। আমাকে পা দিয়ে দলে সর্ব্বনাশ করতে কেহই কম করেন নাই। আমি মনিবিবিকেও চিনি। সোনাবিবিকেও জানি। স্বামী

বেঁচে থাকতেও তাঁরা জ্বালিয়েছেন, অভাবেও জ্বালিয়েছেন। কলঙ্কের কোন পচা খাদে আমাকে ডুবিয়ে জমিদারীটি হস্তগত করবেন, এই চেষ্টাতেই তারা আজ পর্য্যন্ত কত কি রটাইলেন, কত কি বলালেন, সকলি শুনেছেন। আমার বলা দ্বিরুক্তি মাত্র। ভগবান হাতে হাতে ফল দেখিয়ে দিয়েছেন। কড়াক্রান্তি গণনা করে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত দেখিয়ে দিয়েছেন। সকলেই দেখল—সকলেই বুঝল। এদেশে অনেকেই আমার কথা নিয়ে আন্দোলন আলোচনা করে থাকে। তাঁদের মুখে আমার কলঙ্ক অলঙ্কার বিশেষ—দুর্নাম আমার মাথায় মণি। আমি কলঙ্কের বোঝা মাথায় করে কলঙ্ক-সাগরে ডুবে হাবুডুবু খাচ্ছি। ভয় কিছুতেই নাই। যে ভয়, সে আপনার।"

"ছি ছি! আপনি ওভাবে কথা বলবেন না। আমার অজানা কিছুই নাই। আপনি নির্ভয়ে আপন জমিদারী করবেন। আজ রাত্রও অধিক হয়ে এলো, অনুমতি হলে এইক্ষণে বিদাই হই।"

"না না তা কি কখনও হয়। খালি পেটে, শুকনো মুখে, হা-হুতাশ খেয়ে এত রাত্রে কি বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী হতে যেতে আছে? আমি নিজে মেহনত করে সারাটি দিন আগুনে জ্বলেপুড়ে, যৎসামান্য কিছু জলখাবার প্রস্তুত করেছি। তারই কিছু মুখে দিয়ে আমাকে সুখী করুন।"

"ছি ছি! আপনি অত অনুনয় বিনয় কচ্ছেন কেন? আনুন! যা যা হয়েছে, সকলি আনুন্! ভরপুর বোঝাই দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে চলে যাচ্ছি। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ। ধনে জনে মনে সুখে থাকবেন।"

"অখাদ্য খেলে নাকি ব্রাহ্মণের গুণ থাকে না, ব্রহ্মতেজ একেবারেই নাকি নিস্তেজ হয়, অন্তরাগ্নি রোষে মন্দাগ্নি হয়ে দাঁড়ায়! সত্য না কি?"

"কে বলে? এ কথা আপনাকে কে বল্লে? (পৈতা ধরিয়া) এইত ত্রিগুণ বিশিষ্ট নবগুণের সমষ্টি, পৈতে উপবীত যা বলেন, গলায় আছে। পূর্ব্বে জিয়ল হিজল, এই সকল গাছ-গাছড়ার আটার সাহায্যে পরিষ্কার করেছি, এখন হনি উইণ্ডসার সোপে দিব্বি পরিষ্কার করে ফুল ফুলে করে গলায় দিচ্ছি। গোচ্ছার বাহারই বা কত! অখাদ্য খেলে মহা পাপ লিখা যায়, মনুষ্যত্বও থাকে না, সে কথা ঠিক; কিন্তু মানুষে যা খায়, তা অখাদ্য হল কি প্রকারে? মানুষে যা খায় না, মানুষে তা কোন কালেও খায় না। আপনি অখাদ্য বলেন কাকে? আর এটাও জানবেন, আমরা নব্যদল। শতদলে বসে কমল দলের কমল-করে কি অখাদ্যের আশা করতে পারি?"

"তবে আর বিলম্ব করবেন না। আসুন। খানার ঘরে যাওয়া যাক।"

উভয়েই চেয়ার হইতে উঠিলেন। নারীমূর্ত্তি সর্দ্দার বেহারাকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন, "ভজন দাস? বাবু সাহেবকা খানেকা কামরাকে লে যাও! (নরমূর্ত্তির প্রতি) অগ্রগামী হউন, আমি পিছনে পিছনে আসছি।"

নরমূর্ত্তি সর্দ্দার বেহারার পাছে পাছে খানার কামরায় গমন করিলেন। নারী-মূর্ত্তি সেই

চিনে পর্দ্দাটা উঠাইয়া, একখানি পালঙ্কের উপর মাথা হেঁট করিয়া দেখিয়া চলিয়া গেলেন।

আলোর দৌরাত্ম্যে স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল—একটি নরমূর্ত্তি সেই এক হাত গদী শয্যায় শুইয়া আছেন। নিদ্রিত, কি জাগরিত, কি খোঁয়ারী, অথবা অভিমান, কিছুই বোঝা গেল না। নারীমূর্ত্তি পর্দ্দাটা উঠাইবা মাত্র এক নজর দেখিয়াই চলিয়া গেলেন। কোন কথা কহিলেন না। আকার ইঙ্গিতে কোনপ্রকার ভালবাসার ভাবও দেখাইলেন না। বরং বিরক্তির ভাবই যেন চক্ষে মুখে বোধ হইল। হা খোদা একি! হরি বোল হরি একি! নারী-মহলে বিশেষ শয়ন-পালঙ্কে নরমূর্ত্তি! কথাটা কি! লোকটি কে? এত সাহস কার? এত বড় মাথা কার! এত বড় বুকের পাটা কার! কার এত বড় ক্ষমতা যে, একজন মুসলমান পর্দ্দানিসীন, ঘরনী বিধবা স্ত্রীলোকের পালঙ্কে নির্ব্বিঘ্নে শয়ন! লোকটি কে! বড়ই আশ্চর্য্য। ছি ছি! ঘোমটার মধ্যে সখি সম্বাদ!—ওকি! আলনার উপরে কোট ট্রাউজাথ, টুপী, ছাতা, লাঠি, ধরা আছে। এ যেন বহুদিনের বন্দোবস্ত। কথাটা কি! এযে ভয়ানক লুকোচুরি। বিশেষ মাখামাখি ভাব। লোকটা কে? ঐ নারীমূর্ত্তির কি পিতা? না তাই-বা কি করিয়া হয়। নারীমূর্ত্তির পিতা ত ১২৭০ সালে ইহজগৎ ছাড়িয়া গিয়াছেন। তবে কি তাঁহার সহোদর! না তাহাও হয় না। অন্দরমহলে ভগিনীর শয়ন-শয্যায় কেন? ঐ যে পাশ মোড়া দিচ্ছে। হাত পা নাড়া চাড়া করিয়া মাথা তুলিয়া পা তুলিয়া উঠিয়া বসিল। বাতির আলোতে চেহারা ফুটিল। দিব্বি চেহারা। মুখে ঘন দাড়ী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নাক, কান, ভ্রূ, চুল, গোঁপ কপাল মানান সই। গোল বালিসটি কোলে উঠাইয়া বুকে চাপিয়া মৃদু স্বরে বলিতে লাগিলেন।—"কথা বাতাসের আগে আগে ধায়। কে জানে আমি কবে এসেছি। যে ভাবে এসেছি, কারো জানবার সাধ্য নাই। কিন্তু শুনলেম কার মুখে? আমার আগমন সংবাদ শুনলেন কার মুখে? একজন হাকিমের মুখে। দশ মুখ না হলে, আর হাকিমের এজলাস পর্য্যন্ত যায় নাই। কি ঝক্‌মারী! কি গাজাখুরী! আগে ছিল ভাল। এই বাড়ীর লোকজনেই প্রকাশ করেছে। সে দিন নাই, সে শাসন নাই, সে ভাব নাই। ঠকেছি! এসে বেহদ্দ ঠকেছি। মিথ্যা নয়, স্বচক্ষে দেখবার সাধটাই বড় ছিল। দেখলেম। আর নয়, (কান মোড়া খাইয়া) আর নয়। যা হবার হয়েছে। আর নয় (নাক মলা খাইয়া) আর নয়। এক দিন নয়, দু'দিন নয়, তেইশটি বৎসর প্রায় দুই যুগ! উহু! ভাবলেও ভয় হয়। দুইটি যুগ কেটে গেল। শেষ রক্ষা হল না। হারলাম, ঠকলাম। ঠকলাম বা কি? জিতলামই বা কি? যা যা ছিল না, সমুদায়ই করেছি। দালান কোটা বাগান, গাড়ী ঘোড়া সকলই হয়েছে। সোনা রূপার আসবাব তারও কমি নাই। সোনার হার চেইন পাথর বসান চেন মেকেবের ঘড়ী অঙ্গুরী, বড় বড় জমিদার রাজ-রাজড়ার ঘরে যা না আছে, তা আমার ঘরে যথেষ্ট পরিমাণ আছে। শাল, বনাত, রেসমী-পসমী কাপড়, জরীর কাপড়, বারানসী উড়নী সাড়ী, কি না আছে? পঞ্চাশ বছরের জন্য, ছেলে, মেয়ে, পরিবার এবং নিজের সর্ব্বদা ব্যবহারের কাপড় বিনামা ইত্যাদি, কিছুই কিনতে হবে না। কোন দ্রব্যের অভাব নাই। ফুল বাগান, ফলের বাগান, লেচু, পেয়ারা, আম, জাম নারিকেল বাগানের বেহদ্দ বাহার। আর চাই কি? আসা কি মিটবে না। ওদিকেও হয়ে এলো। মধুর ভাঁড় খালি

হয়েছে। আমি চাই নাই। মুখ ফুটে কখনও কিছু চাই নাই। তিনি যেচে দিয়েছেন। গাড়ী বোঝাই করে পাঠিয়েছেন। না গিলে মুখখানি ভারী করে কত কি বলেছেন। এখন আর সে দিন নাই। ফুলদল শুখিয়ে গেছে। রসাল রসটুকু সরে পড়েছে। কে চাইবে? কে কি লোভে কাছে ঘনিয়ে বস্‌বে। আর কেন? মন্! সুস্থির নও! এ পৰ্ব্ব শেষ কর। দিদিমণির উপন্যাসের যবনিকা পতন কর। আর নয়। বুঝতে বাকী নাই। এখন হয়েছে, সেই কথা। থাকে লক্ষ্মী যায় বালাই। উহু! এই চক্ষেই কি দেখলেম—সর্ব্বশেষে বোম ভোলানাথ—তাও দেখলেম। এখন বাঁধ বস্তানী। বাঁধ গাঠুরি। আর ভাল লাগে না। আর বলতে হবে না—বুঝেছি, নূতনে পোড়ে মন,—পুরাতনে অযতন। চব্বিশ ঘণ্টা রাগ, মুখ বাঁকা—কথাটি গায়ে সয় না। পাপ আঁখি আর এ পোড়া মুখ দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না। বুঝেছি, মনে মলা বসেছে। অন্তরে কালকূট বিষ নির্ভর করেছে, জিহ্বার তার বিগ্‌ড়েছে। চক্ষুর সেই ভাব নাই, সে জোড়া ভ্রুর ভঙ্গিমা নাই। চক্ষু রাঙ্গা—চরণ বিটোর। আর কি তেমন হয়? মায়া মমতা ভালবাসা, প্রাণ যায় যায়, মলেম, গেলেম এ সকল সাজ সরঞ্জাম, ভেলী বাজী, চরখী কলের কথা। আর কি বলব, লজ্জার মাথা খেয়ে কি বলব, বুঝতেই পাচ্ছেন কখনও যে কিছু ছিল, তার সামান্য চিহ্নটুকুও নাই। এখন আমার পক্ষে, এ পুরাতন পাপীর পক্ষে ঠিক যেন একখানি যাঁতার পাথর। তবে আর বিলম্ব কেন? এইখানেই ইতি করি। ইসাদী—এই চীন দেশীয় চিত্র বিচিত্র রঙ্গিন পৰ্দ্দা, আর ঐ টানা পাখা ও জ্বলন্ত বাতী। সাক্ষী থেকো সাক্ষী থেকো, স্বচ্ছন্দে চিত্তে বা হোসে বাহাল তবিয়তে লিখে দিলাম। আর নয়। সাক্ষী থেকো, কোল বালিস ও মশারি। আর নয়? এই নাকে খত কানে খত, আর নয়। কিমধিক নিবেদন। ইতি তারিখ ৩০ শে চৈত্র। আগামী প্রত্যুষে যাত্রা—না থাকলেও পরিত্যাগ জীবন, পরিশেষে পরিত্যাগ—"

নর নারী মূর্ত্তি চিনিয়াছেন। ইতি নিবেদন ইতি। তার আর পরিচয়ে দরকার কি?

চতুর্থ নথি

পরস্পর সংঘর্ষণেই ঘটনার উদ্ভব। ঘটনা চক্রেই কার্য্যের উৎপত্তি ও সূচনা। মনুষ্যমাত্রই ভবিষ্যৎ অন্ধ। ইচ্ছা সকলেরই ভাল হইতে। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্যে বাধা দিতে কি তাহার বিপর্য্যয় করিতে কোন প্রাণীর সাধ্য নাই। আমাদের মন দুর্ব্বল। ভবিষ্যৎ জ্ঞানও তথৈবচ। কার্যফল দেখিয়াই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। ভালমন্দ বিচার করিতে বসিয়া যাই। বাহ্যিক ঘটনা ও কার্য্যফল দেখিতে সুখ্যাতি অথবা কুখ্যাতির গান ধরিয়া নীচতা প্রকাশ করি। কিন্তু মনে মনে বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতারই পরিচয় দেই। ধরিতে গেলে আমাদের সুখ্যাতি করাও ঠিক্ নহে, কুখ্যাতির গানও পরিশুদ্ধ নহে। তিনি যে প্রকার বুঝিয়া থাকেন, তিনি

সেই প্রকারেই বুঝিয়া থাকেন। ঘটনা যাহা, তাহা ঘটিয়াই যায়, কপালের লেখা যাহা, তাহা হইয়াই থাকে। অতি সামান্য অংশও বিপর্য্যয় হয় না। হাজার চেষ্টা করিলেও চুল পরিমাণ এদিক ওদিক হয় না।

পর্দ্দানিসীন জানানা পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া কি বলিতেছেন শুনুন।

"সোনাবিবি আমার পর নহে। তার মা, আমার মা উভয়ে সহোদর ভগ্নী। সোনাবিবির সহোদর ভ্রাতা, আমার স্বামী। আমার সহোদরা ভ্রাতা, সোনাবিবির স্বামী। এমন ঘনিষ্ঠ ও মাখামাখি সম্বন্ধের মধ্যে, সোনাবিবি আমার চক্ষের বিষ। আমিও তাঁহার হৃদয়ের কাঁটা। যে চক্ষে আমি দেখি, সেও সেই চক্ষে আমাকে দেখে। সে যাতে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আমি তার চেষ্টা করি। সেও যথাসাধ্য আমার মন্দ কামনা করে। এ ভাব নূতন নহে। ছেলেবেলা হইতে পরস্পর হিংসা, বয়োঃবৃদ্ধির সহিত শত্রুতারও বৃদ্ধি। এখন সেও বিধবা, আমারও স্বামী নাই। শত্রুতা সাধনে আরও বেশী সুযোগ। এত শত্রুতা—মধ্যে আমার কন্যার সহিত তার পুত্রের বিবাহ, নূতন সম্বন্ধ। কথা মনেও ভাবি নাই, স্বপ্নেও চিন্তা নাই যে, সোনাবিবির সহিত আবার নূতন সম্বন্ধ হইবে। কিসে কি হইল? কে উহা ঘটাইল? এখন আর খুঁজে পাই না। তবে একথাটা মনে হয় যে আমার ইচ্ছা ছিল মেয়ে দিয়ে তার পুত্রকে হাতে আন্‌বো, আপন কায়দায় ফেল্‌বো, যাতে বশ হয়, বাধ্য হয়, যাতে আমার মতে চলে, কার্য্য করে, তাই করবো। যখন দেখবো যে উঠতে বল্লে উঠে, বস্‌তে বল্লে বসে, তখন সেই ছেলের হাত দিয়েই মাকে দুরুস্ত করবো। হয় হক্। সম্বন্ধ আবার হয় হক্। সোনাবিবিও বোধ হয় আমার মতই মনে মনে আমাকে জব্দ করবার আশা করে ছেলের বিবাহে মত দিয়েছিলেন। লোকে ভাবল যে, চিরদিনের বিবাদ এই বিবাহেই মিটে যাবে। বিধাতার যা ইচ্ছা তাই হল, বিবাদে আরও বেড়ে উঠলো। চারিদিক হতে বেড়া আগুন যেমন ধূধূ করে জ্বলে উঠে—সেইরূপ জ্বলে উঠলো। সোনাবিবি পুত্রহারা হলেন। তাঁহার কোলের সন্তান আমার কোলে আসল। সময়ে এমনি তাৎপর্য্য যে, পুত্রের মুখে মায়ের কুখ্যাতি, জাতি নাশ কথা, শত শত নিন্দা, হাকিমানের কানে উঠল। যে মা ছেলের মঙ্গলের জন্য বুক চিরে রক্ত দিতে প্রস্তুত, সেই মা পুত্রের চক্ষের বিষ—ঘোর অবিশ্বাসী। যে মা দশ মাস পেটে করে কত কষ্ট ভোগ করেছেন, ঘটনাক্রমে পুত্রের মনে এই কথা যে কোন্ সময় মা যেন বিষ দিয়ে আমার বিনাশ করেন—কি ভয়ানক কথা! এই সকল কথা শুনে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছে, সংসার কি ভয়ানক স্থান!"

মনিবিবি ব্যাধি শয্যায় শুইয়া মনের কথা বলিতেছেন, সম্মুখে পটাপটী পর্দ্দা ঝুলিতেছে। পর্দ্দার ও-পার্শ্বে তাঁহার কার্যকারকগণ মধ্যে কয়েকজন এক বেঞ্চে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন।

মাথা-পাগলা বসু মহাশয় বলিলেন, "হুজুর মাপ কর্‌বেন। দাগাদারীকে না তাড়ালে নয়। সেই বেটাই ঘর নষ্টের মূল, সর্ব্বনাশে কারণ, জাতিনাশের হেতুটি, তিনটি ঘর মাটি করার আসল শনিই ঐ নচ্ছার, বেঈমান, সয়তান দাগা! ওকে না তাড়ালেই নহে। দাগার মাথাটা যদি কেউ গোপনে কেটে এনে দেয়, তবে তাকে বোঝা বেন্দে দেই, আর কত খুশী

হই, আবার তারই জন্যে দুঃখ করি, এর অর্থ কি? হুজুর! এত বিষম লেটা।"

মনিবিবি কিঞ্চিৎ ক্রোধযুক্ত স্বরে উচ্চরবে বলিতে লাগিলেন, "বাবু! ঘরের কথা, আপন মায়ের কথা, পরের কানে না দিলে কি আর শক্রতা সাধন হয় না? অন্য পথে কি আর শক্র জব্দ হয় না। আজ সোনাবিবির দশটী নিন্দার কথা, হাটে, ঘাটে, বাজারে, স্কুলে, সভায়, খবরের কাগজে, জজ ম্যাজিষ্টার, কমিশনার, লাট সাহেবের কানে দিয়ে, ছাতি ফুলিয়ে, গোঁপে তা দিয়ে, মাথায় পাগ্ বাঁধিয়ে। হাত পা তুলে, মুচ্‌কে হেসে, হাতে তালি সহ দুশ বাহবা হাচ্ছিল কল্লেন, হয়ত কাল আমরাই শত কুকথা এই মানুষের মুখে তাওয়ায় হিংসার আঁগুনে ক্রোধের উত্তপ্ত বালুকায় খৈয়ের মত চট্‌পট্ করে ফুটে ফুটে তাওয়া উভয়ে চারিদিক্ ছিট্‌কে পড়বে। বাবু! এ সংসার আশির নকল, ছায়ার খেলা। হাত তুল্লেই হাত তোলা দেখতে হয়। চক্ষু টিপলেই চক্ষু টিপুনি খেতে হয়। তবে দক্ষিণ আর কম, এই মাত্র প্রভেদ। এ পথ ছাড়া কি আর অন্য পথ ছিল না?"

"হুজুর! মাপ করবেন, 'মারি অরি পারি যে কৌশলে।' পাঁচটা সত্য মিথ্যা না সাজালে কি শক্র জব্দ হয়। লোক জানাজানি, কান ভাঙ্গানী, ঢাক ঢাক গুড় গুড় চুপ চুপ এখন নাই। দেশময় দাগাদারী ভায়ের দাগারি কথা। সোনাবিবির সোনা ভায়ের সোনা কথা। আমরা লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে, দাঁতে দাঁত দিয়ে মুখ কান বুঝে থাক্‌লে কি হবে? যাদের নিয়ে কথা, তারাই যদি সামলে চল্‌তে না জানল, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করল, মান ইজ্জত হুরমতের ভয় না রাখল, দিন নাই, দুপুর নাই, অন্ধকারের অবসর নাই, প্রকাশ্যে কথাবার্ত্তা, যেরূপ ভাব—আমরা কি করব? মর্ম্মকথা ঈশ্বর জানেন, কিন্তু ব্যবহারটা অতি জঘন্য। সন্তান—পেটের সন্তান—যুবা—সে বালক নহে, জয়ঢাক বাবাজী এখন ছেলে মানুষ নহে আবার ছেলের মতই দেখ্‌তে হয়। পুতের মুখ ভূতের মুখ, পুত্রবধূর মুখ চাঁদমুখ, তাকেও ভালবাসতে হয়, গোলাম বাঁদী নহে, পেট ভাতা মোস্তা খোরা নহে, দূর বল্লে আর চলে গেল। মাথাটি নাড়বার জো নাই। উঠ্‌তি কাল, তাদেরও সক আছে, ইচ্ছা আছে, ধরতে গেলে সকলি তাদের,—অথচ তারা কেউ নয়, একটি পয়সার জন্য ভিখারী। একটি পয়সার প্রয়োজন হলে, দাগাদারী ভায়ের হুকুম না পেলে তাদের পাওয়ার আশা নাই, কথাটি বলবার ক্ষমতা নাই। রাজার পুত্র রাজা, রাজ-পুত্রবধূ রাণী। তারাই চাকর চাক্‌রাণীর হাততোলা খায়, কটু কথা শুনে, বলুন ত কদিন বরদাস্ত হয়? ঝুপঝাপ চাচাজীর সময় এত দূর ছিল না।

তিনি দুনিয়ার হাওয়া বুঝে নৌকা চালাতেন, পাল উড়াতেন। জলের ঢেউ বুঝেই হাল চালাতেন, লগী ধরতেন। যত বেল্লিক কাণ্ড, যতখানে খারাপের নমুনা, যত অধঃপাতে যাওয়ার লক্ষণ, যত কেলেঙ্কারী ঝক্‌মারী ব্যাপার, এই দাগাদারীর সময় হয়েছে। এত বড় সংসারের কর্ত্তা হয়ে ভুলে উল্টে পড়েছে, তার চক্ষে দুনিয়াজাহানে মানুষই আর নাই। তিনিই বুদ্ধিমান, বিদ্বান, শ্রীমান, রূপবান, গুণবান, মান্যবান। বাড়াবাড়িই পতনের লক্ষণ। অতি দর্পে হত লঙ্কা। আর কি বলব? সাধ্য নাই। আমার ক্ষমতা থাকলে এক হাতে আপন জান, অন্য হাতে দাগাদার ভায়ের প্রাণ। (মাঝে অস্ত্রে থাকুক বা না থাকুক) জয়ঢাক বাবাজী কি

সহজে ফুলে ঢাক হয়েছে। মনের খেদে, মনের বিরাগে, নানা প্রকারে অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করে, শেষে বাটীর বাহির হয়েছে।”

মনিবিবি একটু নরম সুরে বলিতে লাগিলেন, “হাঁ হাঁ, তাত ঠিক। তবে ভয় হয়, এই বয়সে আমরাই-বা কি কুচ্ছা রটায়? বিচিত্র কি!!”

“হুজুর! তাতে ভয় করবেন না। মানুষের মুখ ছাগলের মুখ। যা পায় তাই খায়। যা মনে ধরে চক্ষে পড়ে, তাই চিবায়। ওর জন্য চিন্তা কি? দশ জনে এক দিক এক পক্ষে বলবে, বিশ জন ভিন্ন দিকে ভিন্ন পক্ষে বল্‌বে। লোকের কথায় কি আসে আর কি যায়? যাক্। এখন আসল কথাটা কি? যার জন্য আমরা সকলে এসেছি।”

“ওখানে কে কে আছেন?”

“হুজুর! আমি আছি, ঘর-ভাঙ্গা দাদা আছেন, দুশমন চেহারা ভাই আছেন, উলটপালট খাঁ চাচা আছেন, তড়পিদার ভায়া আছেন. পেটভরা গুহ মশাই আছেন, ঘসা-পয়সা দাদা ঠাকুর আছেন, আর আমাদের বাবাজী ধুম্বলোচন আছেন, আমরা সকলেই একটা কথার জন্য এসেছি। কথাটি কি? দাগাদারী ভাইকে একেবারে দূর কর্ত্তে না পাল্লে কোন কাজই সফল হচ্ছে না, কোন কলই খাট্‌ছে না। কোন মন্ত্রই কারী হচ্ছে না। কোনই কিছু হচ্ছে না। উপায় অনেক করেছি, ষড়যন্ত্র জোগাড়. যা যা কর্ত্তে হয়, কিছুই বাকী রাখি নাই, কমি করি নাই। এখন হুজুরের হুকুমের অপেক্ষা—”

মনিবিবি বলিলেন, “আমার হুকুম কি আর এখন কাজে লাগবে? কোন্ সময় যেন দম বাহির হয়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাই। এখন শেষ দশায় আর ওসকল হুকুমের মধ্যে যেতে চাইনে। তবে আপন আপন মাথা বাঁচিয়ে যা কর্‌তে হয় কর। তোমাদের মতেই আমার মত। ধুম্বলোচন বাবাজী আছেন, চিটে গুড়. নালী দলো, মাতাজীরা আছেন, যখন যা আবশ্যক হবে, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন, আমার চেয়ে ভাল উত্তর পাবেন, কাজ-কামে সুবিধা হবে।”

ধুম্বলোচন বাবাজী চক্ষু টিপিয়া, ঠোঁট কাঁপাইয়া, মাথা নাড়িয়া হাত নাড়া দিয়া সরিয়া বসিয়া—ইয়েগে—ইয়েগে—ইয়েগে গেপে।

পাঠক। ধুম্বলোচন বাবাজী কিছু থোতা—কথা কহিতে বাধিয়া যায়। এমনি বাধে যে, সে দশ ঘোড়ার জোরে টানিলেও নড়ে না। নড়াবার জোগাড় হচ্ছে ইয়েগা—ইয়েগা। ইয়েগা শব্দ ব্যবহার করিতে করিতে কথা বলিতে থাকে। কাজেই উপরে ইয়েগা শব্দ আসিয়াছে।

“ইয়েগা—ইয়েগা—তাঁর শরীর আজ বড়ই খারাপ। ইয়েগা ইয়েগা—ইইইয়ে ইয়েগা—ডাক্তার বাবু কথা কহিতে ইয়েগা ইয়েগা নিষেধ করেছেন। যা যা কর্ত্তে হয় সমুদয় আমরা কর্‌বো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে প্রয়োজন কি?”

জামাই বাবুর কথা শেষ না হইতেই, ঘসা পয়সা দাদা ঠাকুর মাথা চুলকাইয়া কথায় ওজনের তালে তালে, মাথাটা ঘুরাইয়া দক্ষিণ বামে মাথা হেলাইয়া বলিলেন, “মাথাটা ধরেই আছে। এখন প্রতিবারে ১৮২টি ডুব দিতে হয়। ১১ বার স্নান কর্ত্তে হয়, তবু মাথাটা ঝনুঝনু

কুলুকুলু ঘুনুঘুনু ঝিম্‌ঝিম্‌ ধিনাতিং ধিনাতিং করে যেন ঘুরতে থাকে। জলের বিচার নাই। পচা, কাদা, গন্ধধরা, পোকা-পড়া, দামপচা, পানাপচা, পগারের, কুপের যে প্রকার জলই হউক, তাতেই ডুবব। কোন শঙ্কা নাই। মাথাটা ডুবাতে পাল্লেই যেন রক্ষা, প্রাণ বাঁচল। ছেলে দুটি কাতর। যে ঠাকুরাণীটি ছেলে দুটিকে লালন পালন কচ্ছেন, ধর্ম্মাবতার! তাঁর গুণ কি বলবো। (রুমালে নাক মুছিয়া) সে বেচারী, দিন রাত শরীর খাটিয়ে ছেলে দুটকে রক্ষা, ঘরকন্না রক্ষা, বাড়ীঘর রক্ষা, যোল আনা রূপে আমায় রক্ষা কচ্ছে। দিন রাত আমারই সংসারে শরীর খাটিয়ে শরীর মাটি করে ফেলেছে, তবু তার যশ নাই। আত্মীয় স্বজনেরা মনে করেন যে, ওর জন্যেই গোলযোগ। সংসার বড় বালাই, কার ভাল কেহ চক্ষে দেখতে পারে না। যেখানে যাই সেই খানেই গণ্ডগোল, গোলযোগ। সুখ কোন স্থানে নাই। কোন সংসারে নাই। মনিব, রাজা, সকলের মাথার মণি, তাঁর ঘরেও কেলেঙ্কারী, ঝক্‌মারি, পয়জারী, নুকোচুরী দাগাদারী। আর যাই কোথা? এ মাথা রাখি কোথা? হুজুর! দাগাদারী অনেককে দাগা দিয়েছে, অনেক ঘরে নুকোচুরি করে—একেবারে সারা করেছে। দেখ্‌ছেন, বেগম সাহেব আজকাল ভারি জাঁদার, বড় বড় হুমরো চুম্‌রো সাহেব সুব, তার বড় তার বড় হাকিমান, হুকুমের তাঁবেদার ফরমা বরদার দিনকে রাত কচ্ছেন। রাতকে দিন কচ্ছেন। দুপ্রহরকে সন্ধ্যা করছেন। আবার সন্ধ্যাকে অতি উষা, কাক ডাকে, দয়েল ডাকে, শেষে চকাচকি ডাকিয়ে বিরহ গেয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। ভাই দাগা—তার উপরেও দাগা দিয়ে মজাবার ফিকির করেছিলেন, ভাগ্যে বেগম সরে পড়ে, দৈবাৎ পা পিছলে কালীদয়ে ডুব দিলেন, দাগাদারীর মনে আগুন জ্বলে গেল। কত কাণ্ড কারখানাই হলো, শেষে তুমুল যুদ্ধ, কথা কিনা—ধর্ম্মের লড়াই! হুজুরের সকলি জানা আছে—আর কি বলব—"

উলটপালট চাচাজি, দাড়ীটা নাড়া দিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আচ্ছা! এইবারে দেখা যাবে? তবে মহাজন জুটেছে ভাল। ঘড়ায় ঘড়ায় ঢালবে। এইত এরই মধ্যে দুইটি ঘোড়া বোঝাই হয়ে এসেছে। জলের মত খরচ হচ্ছে। মাল মোফত দেলে বেরহম। সোনাবিবির নিজের যা যা ছিল, নগদ টাকা অলঙ্কার সোনারূপার আস্‌বাব, দামি জিনিস, সমুদায় পার হয়েছে। হুজুর! এঁরা মনে কচ্ছেন যে আমরা কৌশলে আটক করেছি। বমাল আটক করে রেখেছি। হেবানামা না লিখিয়ে কখনই ছাড়বো না। ওদিকে প্রায় পার হল। যারা এদের চাকর, বিশ্বাসী—তারাই দাগাদারী ভায়ের প্রাণের প্রাণ—পরম হিতৈষী। আবার তারা মাথায় বয়ে, রাত্রে রাত্রে চিরাপুঞ্জীতে পার হচ্ছে।"

ঘসা-পয়সা ঠাকুর বলিলেন, "বলি ভাই হে! লোক পাই কোথা? বিশ্বাস করে তোমায় খাড়া কল্লেম, তুমি লোভ সামলাতে পাল্লে না। মিলে মিশে ও কর্ম্ম আরম্ভ কল্লে! কি করি যা হক, এখন যত শীঘ্র শীঘ্র হয়, কবালা, কি হেবা, কি যে কোন প্রকারের হক্‌, হস্তান্তর পত্র শীঘ্র শীঘ্র লিখে কার্য্য শেষ করাই ভাল। দশ হাজার টাকা আয়—কম কথা! এই সম্পত্তি পরের হাতে যায়, বড়ই দুঃখের কথা। পেটের সন্তান, সে হল পর, আর পর হল আপন, কি কেলেঙ্কারী—কি দাগাদারী!"

মাথা-পাগলা বসু মহাশয় রেগে লাল হয়ে বলে উঠলেন, "বুড় হলে সত্যই মাথা-পাগলা হয়। কোন্ সময় কি কথা বলে তার কিছুই ঠিক থাকে না।"

ঘসা-পয়সা ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওরে পাগল? এখানে আর লোক কে আছে? আমরাই ত সকল। আচ্ছা যাক্—ও কথা ছাড়লেম। একেবারে দফারফা, দাগাদারীকে একেবারে—দফারফা করাটা?"

মাথা-পাগলা আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "না মশায়, আমি আর এখানে বস্‌বো না। এ কি কথা? এই সময় এই কথা—"

কথা হইতেছে—বাহির বাটীতে বড়ই গোলযোগ। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বেল্লিক মুন্সী আসিয়া বলিতে লাগিল, "হুজুর! দাদাঠাকুর, ধুম্বলোচন, জামাদ মিয়াঁ ভাই, বুবুজানেরা, ঘর-ভাঙ্গা, মাথা-পাগলা, উলটপালট, শুনুন! নিশ্বাসের উপর নিশ্বাস। হাঁপানীর উপর হাঁপানী।"

ঘর-ভাঙ্গা ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "খবর কি? স্থির হও, সামলে নাও, হাঁপ ছাড়, সুস্থির হয়ে বল—কি হয়েছে? খবর কি? এত ব্যস্ত কেন? কি হয়েছে?"

"হয়েছে, ঘসা-পয়সা দাদা! হয়েছে, দুশমন, চেহারা চাচা! ওদিকে হয়েছে, এসেছে। উলটপালট বসু ওদিক ফতে। পুলিশ—পুলিশের লোক ঘর ভরে গেছে। ফতে! লড়াই ফতে! ধরেছে বেঁদেছে, ও কর্ম্মও হয়েছে (ঘন ঘন শ্বাস)।"

বেল্লিক মুন্সী সাহেব আসল কথাটা ভাল করিয়া বলিতে পারিলেন না। শেষে এক বলিতে দশজনে এসে কথাটা ভেঙ্গে বলে দিলে—

"কথাটা কি?—অরাজকপুরের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ১২ জন কনেষ্টবল, ৪ জন হেড কনেষ্টবল, ২ জন দারগা সঙ্গে করে এসে দাগাদারীকে গ্রেপ্তার করেছে। মনিবিবির কার্য্যকারকগণ চক্রান্ত করে একটা মিথ্যা মোকদ্দমা সাজায়ে দাগাদারীর নামে ওয়ারেন্ট বাহির করে তাকে পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করেছে। উদ্দেশ্য সোনাবিবির কাছ থেকে দাগাদারীকে তফাৎ করা। দাগাদারী তফাৎ হলেই সোনাবিবি একা হলেন, তার পক্ষে অন্য কেহ নাই। বাড়ী সমেত লোক বিপক্ষ। দাগাদারীকে দূর কর্তে পাল্লেই কার্য্যসিদ্ধি। যে প্রকারে ইচ্ছা, সোনাবিবি সম্পত্তি লিখে নিতে পারেন। এই কল্পনাই সকলের মনে। জয়ঢাকেরও ইচ্ছা যে দাগাদারী তফাৎ হলেই একখানা দলিল প্রস্তুত হতে পারে। মায়ের হাঁ না কথায় কি পায়?"

উলটপালট খাঁ চাচা বলিলেন, বলি, ও বেল্লিক ভায়া! কথাটা কি আর পরিষ্কার হল না?

"হবে কি ভাই! মাথায় লাল, পাগড়ী গায়ে কাল মেঘ। হাঁ-হাঁ করে এসে দালানে ঢুকলো, আর ঝনাৎ ঝনাৎ করে টাকার তোড়া পড়তে লাগলো। সোনাবিবির মুখে যেন আগুন বর্ষাচ্ছে। কি সাহস, বাপরে! দালান ভেঙ্গে পলো বোধ হচ্ছে।

"দাগাদারী ভাই বসে আছেন, কনেষ্টবলগণ চারদিক রুল হাতে বাঁধা কোমরে ঘেরা। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব নাঙ্গা তরবারী হাতে দালানের বারান্দার ছাতি ফুলায়ে পাহারায় খাড়া,

সে দিকে কাহাকেও যেতে দিছেন না। যেমন মজা, তেমনি সাজা, বেশ হয়েছে। হুজুর! আমি বক্‌সিস চাই।"

আমলাগণ উঠিতে পড়িতে, কেউ খড়ম স্থলে জুতা, জুতা স্থলে খালী পায়ে, কাছা কোঁচা দুরুস্ত করিতে করিতে, বাহির বাড়ীর দিকে দৌড় দিলেন, কেহ ত্রস্ত পদে মাজায় চাদর জড়াইতে জড়াইতে চলিলেন।

বেল্লিক মুন্সীর তখনও হাঁপ ছাড়ে নাই। বলিতে লাগিলেন, "হুজুর! আমার বক্‌সিস? আমি এই দাগাদারী কাণ্ডের মকদ্দমায় ফরিয়াদি হুজুর? তিনি কেন জয়ঢাক বাবাজীর বাড়ীতে থাকেন? তাহার অধিকার কি? সেই মকদ্দমা, তাতেই ওয়ারেণ্ট। আমার বক্‌সিস? হুজুর আমি আস্ত আগুনে হাত দিয়েছি।"

মনিবিবি বলিলেন, "এতে আর বক্‌সিস কি? কার্য্য উদ্ধার হক্, বক্‌সিস পাবে। ব্যস্ত হচ্ছো কেন?"

"হুজুর! ব্যস্ত যে কেন, তার আর কি বলব? বড় মানুষের মন বড় ভয়ানক। কাজের সময় তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার জান্ কাজ ফুরালে পিটটান। অধিকন্তু লবেজান, হায়রান, পেরেসান, আন্‌চান। মেজাজ খারাপ। আর কি? হুজুর তাতেই এত হাঁপানী?

পঞ্চম নথি

কথাটা খোলাসা হয় নাই। সোনাবিবির উপরে এত অত্যাচার, এত দুর্নাম রটান, ইহার মূল কারণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে—খোলাসা হয় নাই। সবিস্তারে বর্ণনা করা যায় নাই। পাঠক! ক্রমে বুঝিবেন, ক্রমে জানিবেন, জগৎ কিরূপ ভয়ানক স্থান। আর এই দেব তুল্য পরমাত্মা বিশিষ্ট দ্বিপদ মানব জাতির আচরণ কি ভয়ঙ্কর! সোনাবিবি বিধবা, স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক, একটি মাত্র পুত্র—নাম "জয়ঢাক"। জয়ঢাক আইনতঃ নাবালক, নাবালকের সম্পত্তি, মাতার হস্তে। মনিবিবির ইচ্ছা—জামাই জয়ঢাকের সম্পত্তি আর সোনাবিবির হস্তে না থাকে। এবং সোনাবিবির নিজ সম্পত্তি যাহা আছে, তাহাও তাঁহার হাতে না থাকে, কৌশল করিয়া জয়ঢাকের নামে একটা লিখাপড়া করিয়া লওয়া হয়। মনিবিবির কন্যা ছিঁড়িয়া খাতুন, তাঁহারই সঙ্গে জয়ঢাকের বিবাহ দিয়াছেন। বিবাহ দিয়া কয়েক মাস মধ্যেই, জয়ঢাককে মায়ের কোল-ছাড়া করিয়াছেন। আমলা চাকর চাকরাণীদিগকে বিগড়াইয়া আপন দলে আনিয়াছিলেন। সোনাবিবির পক্ষে আছে মাত্র ৪টি লোক। তাঁহার মধ্যে প্রধান দাগাদারী। দাগাদারী সোনাবিবির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সম্পর্কে ভ্রাতা। দাগাদারী বড়ই তুখড় লোক। তাহাকে জব্দ করিতে না পারিলে সোনাবিবি বশ্যতা স্বীকার করে না। কৌশল করিয়া সম্পত্তিও লিখিয়া লইতে পারেন না। তাহাতেই সোনাবিবির উপর অত্যাচার, দুর্নাম রটান, এবং মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া দাগাদারীর প্রতি ওয়ারেণ্ট বাহির করা হইয়াছে।

ওয়ারেন্ট গ্রেপ্তার হইয়া, দাগাদারী সোনাবিবির হাত ছাড়া হইলে আর বাধা প্রতিবন্ধক কিছুই থাকিবে না। যথেচ্ছা একটা লেখাপড়া করিয়া লইয়া সম্পত্তি দখল করিতে পারেন। সোনাবিবি আপন বাড়ীতে আছেন বটে, কিন্তু এক প্রকার কয়েদী। অরাজকপুরের পুলিশ ইনস্পেক্টর তেছমার খাঁ দলবলে দাগাদারীকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। বাহির প্রাঙ্গণে পুলিশের লোক, দর্শক, আমলা, মোক্তার উপস্থিত। দাগাদারী ভাই গ্রেপ্তার হইয়াছেন, এখন কি উপায়ে অরাজকপুর হাকিম সাহেবের নিকট লইয়া উপস্থিত করিবেন, ইহারই মন্ত্রণা হইতেছে।

মনিবিবির পক্ষ হইতে পান খাবার সুপারী, মশলা, তেছমার খাঁর পকেটে দেওয়া হইয়াছে। ওয়ারেন্টের আসামী ১১ মাইল পথ হাঁটাইয়া লইয়া যাওয়াই তাঁহাদের ইচ্ছা। দর্শকগণ মধ্যে উভয় পক্ষের লোকই আছেন। স্বার্থে নিঃস্বার্থে এপক্ষ ওপক্ষ উভয় পক্ষের লোকই আছেন। কেহ বলিতেছেন "এমন কি গুরুতর অপরাধ যে একেবারে খাড়া ওয়ারেন্ট!"

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব বলিলেন, "অপরাধের বিষয় আমি জানি না। ডেপুটি সাহেব জানেন, হুকুম পাইয়াছি,—ধৃত করিয়াছি, এখন লইয়া যাইব। আপনারা এখানে বেশী গোলযোগ করিবেন না। এখন আসামী আমার জিম্মায় আছে। কোন প্রকার গোলযোগ করিয়া আসামী ফেরার হইলে শেষে আমি মারা যাইব! আপনারা ভদ্রসন্তান এখান হইতে চলিয়া যান!" জনতা কমিয়া গেল।

সোনাবিবি পর্দ্দার আড়াল হইতে বলিতে লাগিলেন "বাবা দারগা সাহেব। আপনি হাকিম। দাগাদারী কি অপরাধ করেছে যেত, তাহার প্রতি এত কড়া হুকুম! সে খুন করে নাই, সে ডাকাতি করেন নাই যে তার হাতে দড়ী দিয়ে, পায় হাঁটিয়ে হাকিমের নিকট হাজির করবেন!" তেছমার খাঁ বলিলেন, "আমি কি করিব। হাকিমের হুকুম, ওয়ারেন্টের আসামী। যেরূপে আমার বিশ্বাস হয়, আমি সেইভাবে লইয়া যাইব।"

"সকলি আপনার এক্তেয়ার আছে। মনে করলে, মান-সম্ভ্রম রক্ষা করে নিয়ে যেতে পারেন, অপমানের সহিতও নিতে পারেন। দেখুন! আমার পক্ষে একটি লোক নাই যে, আমার হয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলে। আজ ১৫ দিন আমাকে কয়েদ করে রেখেছে। পেটের সন্তান—হায়! হায়! পেটের সন্তান, লোকের কথায় ভুলে, আমার কত দুর্নাম রটিয়ে শেষে কয়েদ করে, কত প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা দিচ্ছে। চাকর, চাকরাণী, দাসী, বান্দী কেউ আমার নহে। সকল মনিবিবির বাধ্য—এই বাইরের দালানটি ছাড়া আমার অন্য স্থানে যাওয়ার অধিকার নাই। বাড়ীর চারিদিকে পাহারা। দালানের চারিদিকে খাড়া পাহারা। কষ্টের এক শেষ—দুঃখের কথা কত বলব? নিজে রান্না করে খেতে হয়, বিশ্বাস না করুন দেখুন। এই ঘরেই আমি নিজে রান্না করে পোড়া উদর পরিপূর্ণ করে, অতি কষ্টে বেঁচে আছি মাত্র। দাগাদারী, বে-আক্কেল, আরসুলা, ধরিবাজ—এই চারটি লোক আমার নিজের। আজ পর্য্যন্ত এরা বিগড়ে বিদ্রোহী দলে যোগ দেয় নাই আমার বিশ্বাস, তবে তাদের মনে কি আছে,

খোদাতালা জানেন। তাদের বুদ্ধি কৌশলেই আমি বেঁচে আছি। এরা হাতছাড়া হলেই আমার মরণ নিশ্চয়! আপনি আমাকে এ কয়েদখানা হতে উদ্ধার করে—অরাজকপুরে নিয়ে যান, আমি আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি।"

তেজমার খাঁ মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "সে কি কথা! অসম্ভব। সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনার বাড়ী—আপনার ঘর—আপনার রাজত্ব—আপনারই সকল—কার সাধ্য—আপনাকে কয়েদ রাখে, কষ্ট দেয়? তা যা হক, আমার সাধ্য নাই—আমার প্রতি কোন হুকুম নাই যে, আপনাকে অরাজকপুরে লয়ে যাই। আপনি হাকিমের নিকট জানান—পরে দেখা যাবে। আর বিলম্ব করিতে পারি না—শীঘ্রই বিদায় করুন। আপনার বাড়ী আপনার ঘর—আপনি কয়েদী, এ কথা কোন হাকিমে বিশ্বাসই করবে না।"

"দেখুন! বিশ্বাস না করলে কি করব? এখন আপনি যা ভাল জানেন করুন। একটু এগুয়ে এলে আমি আমার মনের কথা আরও খুলে বলতে পারি।"

তেছমার খাঁ সাহেব একটু অগ্রসর হইয়া, চেয়ারখানি পর্দ্দার নিকট লইয়া বসিলেন। সোনাবিবি কাগজ জড়াইয়া একতাড়া কাগজ তেছমার খাঁর হাতে দিলেন, তেছমার খাঁ চারিদিক নজর করিয়া, ছাফাই হাতে অতিত্রস্তভাবে কাগজগুলি পকেটে রাখিলেন এবং গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি ইহার উপায় করছি। বলুন! আপনার এজাহার কি? কি কারণে শত্রুতা—কি কারণে আপনাকে কয়েদ করে? দাগাদারী প্রতিই-বা মনিবিবির এত আক্রোশ কেন? জয়ঢাক বাবাজীই বা কেন আপনার উপর বিরক্ত? কিরূপ কষ্টে আপনাকে রেখেছে—কয়দিন পর্য্যন্ত আপনি কয়েদ অবস্থায় আছেন? সমুদয় খুলে বলুন। আমার রাইটার বাবু আপনার এজাহার লিখে নিবেন। আমি শীঘ্রই আপনাকে খালাস করব। কিন্তু আজ নহে। হুজুরে এত্তেলা দিয়ে কল্যই আপনাকে কয়েদ হতে খালাস করব। নিতান্ত অন্যায়! একজন পর্দ্দানিসীন জমিদারের কন্যা জমিদারের স্ত্রীকে এরূপভাবে কয়েদ রাখা নিতান্তই অন্যায়। এমন আশ্চর্য্য ঘটনা কখনই শুনি নাই। পেটের সন্তান হয়ে, মাকে কয়েদ করে, সম্পত্তি লিখে নিবার জন্য এরূপ কষ্ট দেয়! হায়! কলিকালে কিনা হল!! আচ্ছা আমি বাইরে যাচ্ছি। রাইটার আপনার এজাহার লিখে নিবেন। আর দাগাদারী ভাইকেও আপনার নিকট পাঠাচ্ছি—যা যা বলতে হয় বলে বিদায় করে দিন। ঐ ওয়ারেন্ট কিছু নহে। অরাজকপুরে যাবামাত্র জামানিতে খালাস দিব।"

এই সকল কথা বলিয়া ইন্‌স্পেক্টর তেছমার খাঁ বাহির হইয়া বলিতে লাগিলেন, "কৈ চৈইত সিংহ, হনমান সিংহ, বানর সিংহ, ভল্লুক সিংহ, উল্লুক সিংহ কোথায়? দাগাদারী ভাইকে এইখানে নিয়ে আইস। আর লম্বোদরকে দোত, কলম, কাগজ নিয়ে আসতে বল—সোনাবিবির এজহার লিখে নিতে হবে।"

দাগাদারীসহ কনেষ্টবলগণ ইন্‌স্পেক্টর সাহেব নিকট আসিলে, ইন্‌স্পেক্টর সাহেব অতি সমাদরে দাগাদারীকে চেয়ারে বসাইলেন। লম্বোদর রাইটার বাবু সোনাবিবির এজাহার লিখিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন।

মনিবিবির পক্ষের "ঘর-ভাঙ্গা" মাথা-পাগলা বসু মহাশয় দুই এক পদ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের নিকটে আসিয়া বলিলেন—দেখিলেন, বাতাস আর উত্তরমুখী নাই দক্ষিণে বহিতেছে। দাগাদারীর হাতকড়া দিয়া লইবেন, পায়ে হাঁটায়ে অরাজকপুর লইবেন, সে কথার নামও নাই—ইন্‌স্পেক্টরের মুখের ভাব-ভঙ্গী ভিন্নরূপ, অন্য আকার ধারণ করিয়াছে।

চুপি চুপি ঘর-ভাঙ্গা বলিলেন, "আসামী কি অবস্থায় যাইবে?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "দেখুন! আপনারা ভদ্রসন্তান, আমিও ভদ্রসন্তান, দাগাদারী ভাইও ভদ্রসন্তান। হাতে পলেই অপমান করা, ভদ্রলোকের কার্য্য নহে। অনেক হয়েছে—আর কেন? বিশেষ দাগাদারীর যেরূপ ভাব, পাল্কী ভিন্ন অরাজকপুর পর্য্যন্ত যাওয়া নিতান্তই কষ্টকর। কি জানি দৈবাৎ কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘট্‌লে, আমি সুদ্ধু মারা যেতে পারি।"

মাথা-পাগলা বলিলেন, "আসামীর হাতে হাতকড়া দিলে মারা যাবেন কেন? ওয়ারেণ্টের আসামী—পায় হেঁটে গেলে, আপনার বদ্‌নাম হবে কেন?"

"তা ত বুঝি। চলুন—সবলোট সাহেবের নিকট পরামর্শ করে যা হয় করব। তাঁর অভিপ্রায়টাও জানা দরকার। আপনারা যান—আমি দাগাদারীকে ঘরের বাহির করে নিয়ে আসছি।"

ঘর-ভাঙ্গা এবং মাথা-পাগলা সেলাম বাজাইয়া চলিয়া গেলেন। তেছমার খাঁ সাহেব পুনরায় সোনাবিবির ঘরের মধ্যে পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "হুজুর! পাল্লেম না, পাছে লোক লেগেছে। যা বলেছিলেন—পাল্লেম না। হাতে হাতকড়া সম্বন্ধে যাই হক, পাল্কী করে নিতে পাল্লেম না। ঘর-ভাঙ্গা মহাশয় ভারি চটে গেছেন। আমার নামে দরখাস্ত দিবেন, আমি আসামীকে পাল্কী চড়িয়ে নিয়ে গিয়েছি বলে হাকিমের নিকট দরখাস্ত দিবেন। যা বলতে হয়, শীঘ্র শীঘ্র বলে দাগাদারীকে বিদায় করে দিন। দাগাদারী সাহেব পর্দ্দার এ পিঠ হতেই বিদায় হন। আর পর্দ্দার ভিতরে যেতে পারবেন না।"

"ইনস্পেক্টর সাহেব! বলেন কি? আমি দাগাদারীর মুখখানা ভাল করে দেখতে পাল্লেম না। হায়! হায়! দাগা—আমার দাগা, কখনও পায় হাঁটে নাই। দশ কদম যেতে হলেও পাল্কী না হয় ঘোড়াতে গিয়েছে। একটু উনিশ বিশ হলে, সে কি আর মানুষের মধ্যে থাকে। হাঁপিয়ে, মাথা ঘুরে, দড়াম করে পড়ে যায়। কত গোলাপ জল ঢালি, কত ঠাণ্ডা করি, তবে সে ঠাণ্ডা হয়। সে ননীর পুতুল, তার গায়ে ধুপ বরদাস্ত হয় না, মোমের মত গড়ে পড়ে। হায়! হায়! সেই আজ এই ধুপের মধ্যে অরাজকপুরে হেঁটে যাবে? আপনার পায় ধরি। ইনস্পেক্টর বাবা! তুমি আমার বাবা! মিনতি করে বলছি, ওকে হাঁটিয়ে নিও না। একটি বার আমার নিকটে আসতে দেও, আমি মুখখানা ভাল করে দেখে নিই। বাবা, তোমাকে আরও পাঁচ শত দিছি, তুমি পাল্কি করে নিয়ে যাও—"

"ছি ছি! আপনি অমন কথা বলবেন না। যা দিতে হয়, আমার রাইটার কনষ্টেবলকে দিন, তারাই সঙ্গে যাবে। আমি আগে চলে যাই, তারা যে প্রকার ইচ্ছা নিয়ে আসুক, আমি যেন কিছুই জান্‌লেম না। আমি আপনারই লোক, যা বলবেন রাজী আছি। কিন্তু পর্দ্দার

আড়ালে থেকেই যা বলে দিতে হয় বলে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করে দিন। ওয়ারেণ্টের আসামী আর ভিতরে যেতে দিতে পারি না।"

দাগাদারী পর্দ্দার মধ্যে মুখ দিয়া অবশিষ্ট অঙ্গ বাহিরে রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, —বুবুজান। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি খুনি আসামী নহি। আমি কোন অপরাধে অপরাধি নহি, যে ভয় করবো। হাকিমে তলব করেছেন, যাব। ভয়ের কোন কথা নাই। অপরাধ করলে ত ভয়? আমি চল্লেম, দোয়া করবেন।"

"এই নিন্। বাবাজি এই নিন্। দাগাদারীকে আপনার হাতে সুঁপে দিলাম—এই নিন্।" পুনরায় এক তাড়া কাগজ পর্দ্দার আড়াল থেকে ফেলিয়া দিলেন—কাগজগুলি সাদা কাগজ নহে।—তাহার মূল্য আছে।

দাগাদারী সোনাবিবির নিকট হইতে বিদায় হইয়া চলিলেন। তেছমার খাঁ সবলোট সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার বাটীর দিকে চলিলেন। কনষ্টেবল ও রাইটার বাবু দাগাদারীকে লইয়া ঘরের বাহির হইয়াই চৈত সিংহ ঝোলা হইতে হাতকড়া বাহির করিয়া হাতে রাখিল। লম্বোদর বাবু কর্কশ মুখে বলিলেন, "চলুন সাহেব—"

আগে পাছে পুলিশ প্রহরী, মধ্যে দাগাদারী। ওদিকে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব সবলোট সাহেবের বৈঠকখানায় গিয়া সালামআলিক দিয়া খাড়া হইলেন—বসলেন না। মুখে বলিলেন—

"হয়েছে ত? এখন আর কথা কি?" মনিবিবির কার্য্যকারকগণ জলপানি লইয়াই খাড়া ছিলেন। জল এবং পান দিয়া তেছমার খাঁকে বিদায় করিলেন। তাঁহারা জানিলেন, হাতে হাতকড়া দিয়া পদব্রজেই দাগাদারীকে অরাজকপুরে যাইতে হইবে। সেই জন্যেই আবার জলপানি—কিন্তু কিছুদূর যাইয়াই দেখা গেল—দাগাদারী পাল্কীর মধ্যে পুলিশ ভায়ারা সম্মুখে এবং পশ্চাতে।

ষষ্ঠ নথি

গাজী মিয়াঁর বস্তানীর মধ্যে না আছে এমন কথা নাই। দুনিয়া-জাহানে যাহা আছে, সংসার-ক্ষেত্রে যত প্রকার বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, গাছা, অগাছা, পরগাছা, বিশাল, রসাল, মিষ্ট, কটু, কষায়, টক, অম্ল, মধুর, বড়, সর্ব্বাঙ্গ কণ্টক, সর্ব্বাঙ্গ মধুমাখা, নয়ন মনের তৃপ্তিকর, বিরক্তিকর যাহা যাহা আছে, গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে তাহার অভাব নাই। নথি সূত্রে প্রত্যেক নথি পৃথক পৃথক গাথা। আবার সূত্রে সূত্রে সংযোগ। নথি সাজান। একটু চিন্তা করিয়া নথি উল্টাইলেই বুঝিতে পারিবেন। পাঠক! আমাদের বেগম সাহেবকে সেই নিমন্ত্রণ ব্যাপারে ছাড়িয়া আসিয়াছি......মহাশয় বিরক্ত হইয়া "আর নয়, আর নয়—যথেষ্ট হইয়াছে" বলিয়া

পিটটান দিয়াছেন। বেগম সাহেব ইজিচেয়ারে অর্দ্ধ শয়ন, অর্দ্ধ উপবেশন অবস্থায় থাকিয়া কি বলিতেছেন—শুনুন—বয়স দোষে চক্ষে ঘোর দেখেন, তাইতে সর্ব্বদা নাকে চসমা। সুন্দর সুদীর্ঘ নাকের উপর কখনও ষ্টীলের বাঁট, কখনও স্বর্ণ বাঁটের, কখনও রৌপ্য বাঁটের চসমার কামানী বিরাজ করিতে করিতে নাকের উপর বিশেষ একটি দাগ বসিয়া গিয়াছে। শয়নেও চক্ষু পরকলার আবরণে ঢাকা থাকে। ২৪ ঘণ্টা চসমার আদর—বন্ধু বান্ধবেরা জানেন যে, "নিউ ফ্যাসন" মতেই অর্থাৎ নব্যসম্প্রদায়ের বিধি বিধান অনুসারে চসমার সহিত এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যাহা হউক, শ্রীমতীর মুখের উক্তি শুনুন—কান পাতিয়া শ্রবণ করুন। হস্তে রুমাল সাদা রেশমী রুমাল সময় সময় চসমার নিচে যাইয়া চক্ষু দুটি পুঁছিয়া বাহির হইতেছে। সুতরাং বলিব, মনের দুঃখে চক্ষে জলের ন্যায় কি যেন ঝরিতেছে। বাস্তবিক সে কি জল? যে হৃদয়, চির ভালবাসা স্বামী বিয়োগে কাতর হয় নাই, সন্তান বিয়োগে অধীর হয় নাই, যাহাতে কোনরূপ দাগা বসিতে পারে না। কারণ ভালবাসার অঙ্গ অনেক। এক দুই তিন—তাহাও নহে—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান তাহাও নহে—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তাহাও নহে—তবে আঘাত লাগিবে কেন? মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন, মিনিটে মিনিটে বদল—উলট পালট—উপস্থিত ক্ষেত্রে, উপস্থিত বুদ্ধি, উপস্থিত দরদ, উপস্থিত মায়া মমতা ভালবাসা—হায়! সে হৃদয়ও আজ গলিয়াছে, বিচ্ছেদ হুতাশনের উত্তাপে গলিয়া, মোমের বাতির ন্যায় আগুন জ্বলিয়াছে, আগুনের মাথার ধূমে বাষ্প জমিয়াছে, টানাভুরুর অতি নিকটে চক্ষু পথে ফোটায় ফোটায় বাহির হইতেছে। ঝরিতেছে—মনের কথা মুখে ফুটিয়াছে।

"হা বদ্‌বখত! বদ্‌বখত কম নছিব। জালেম! বেওফা কমিন, কমজাত, নিমকহারাম! রে বিশ্বাসঘাতক, কপট ধার্ম্মিক, নরাধম, পিচাশ! গরু, মুরগী, শুকুর-খোর নাস্তিক! ওরে ডেবিল ড্যাম কুল! ওর নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর পাথর কলজে—নিরেট পাথর! তবে মনে এই ছিল? ওরে পাষণ্ড দুরাচার। বদ্‌মাস, জুয়াচোর—তোর মনে এই ছিল? হাঁরে? পাজী হারামখোর, শেষে এই করলি? পোড়া মুখ, বা—নর, অথবা—শাখামৃগ, আগে হাতে হাতে চাঁদ তুলে দিয়ে শেষে চম্পট। ওরে লম্পট! লম্পট শিরোমণি? রমণী প্রাণে আঘাত করে একেবারে গঙ্গাপার। অবলা প্রাণে সাত বাণ্ডিল সূচ, ১৭ বাণ্ডিল আল্পিন বিঁধাইয়া হুগলি নদীপার। দুপায়া ব্রিজ পার! বুকে আগুন, মুখে আগুন, অন্তরে দ্বিগুণ ত্রিগুণ নবগুণ আগুন অনল জ্বালায়ে সেতু পার! পারে গিয়েও আগুন, কাল কয়লার আগুন সঙ্গে করে, দিয়াশলাই পকেটে পুরে মুখে আগুন ধরিয়ে আগুনে ধূম বার করতে করতে একেবারে অদৃশ্য। হায়রে! কিছু বাকি রাখি নাই। ভুলেই গোপন করি নাই। যা জানতেম, যা ছিল—যত্ন করে রেখেছিলাম, সকলি দিয়াছি। কথায় পড়ে, প্রণয়ে ভুলে, মাথায় জড়িয়ে সকলি দিয়ে ফেলেছি। কিছু রাখি নাই। (গদ্‌গদ্ স্বরে) ওরে কিছু রাখি নাই—সোনার স্বামীকে যা দেই নাই—সে যা পায় ধরে পায় নাই, তাও সেদে, সাধ করে পায় ধরে হাতে তুলে দিয়েছি। কিছু নাই—হায় হায়! কিছু নাই। এ শরীরে কিছু নাই, এ দেহে কিছু নাই। আছে কেবল কএকখানি শুকনো গো হাড়, আর কতখানি চাম্‌ড়া। ওরে! বেহায়া পেটুক। দুই হাতে মুখে ভরে—গালিপুরে খেয়েছো।

আর কি আছে? এখন খালি ভাড়, মধু শূন্য—শূন্য হাঁড়িকে কে জিজ্ঞাসা করে, তাই উড়ে গেছো? রে শিক্‌লী কাঁটা। তাইতে পাখা মেলে রম্ভা দেখিয়ে উড়ে গিয়েছো। তনু নিলে, দেহ নিলে, প্রাণ নিলে, ধন নিলে, আর যা কেউ পায় নাই তাও নিলে, শেষে লঙ্কা দেখিয়ে মর্ত্তমান রম্ভা দেখিয়ে, শিক্‌লি কেটে উড়ে গেলি? রে টিয়ে কাটা শিকল! তুই নিরেট জিঞ্জির। তোর হৃদয় নাই, তোর প্রাণ নাই। তোর কিছুই নাই, তুই কামারের হাতুড়ীর ঘা-খেক লোহা। কত সাধলেম, কত সাধ্য সাধনা কল্লেম, কত মিনতি কল্লেম, পায়ে ধল্লেম, মাথার চুলে পায়ে ঘসে ঘসে কটা করলেম, বুকে মুখে, বুক মুখ মিশালেম, কতবার লম্বা চৌড়া দীর্ঘ প্রস্থ পঞ্চ প্রকারের নিশ্বাস ফেল্লেম, আর বশে আসল না। আর হৃদয় পিঞ্জরে বসল না। আগুন পোড়া বুকের কত প্রকারে তা দিলাম পাখি আর পোষ মানল না। দুবাটি দুধ দেখালাম, পোড়ার মুখ ফিরেও চাইল না। আয় সোনা! আয় সোনা! বলে কত রকমারি বুলিতুড়ি দিয়ে হাতে পায়ে ঝাড়লেম। হায় রে ফিরেও চাইল না। তখনও চক্ষে জল! এখনও চক্ষে জল! সে জলে বুক ভেসে গেল—বুকের উপরি গরম, কিছু ঠাণ্ডা হলো, কিন্তু ভিতরের আগুন হু হু শব্দে উঠলো। শেষে বললাম—তুই যা চাস্ তাই দিব। তুই সোনার পাখা চেয়েছিস্, তাই গড়িয়ে দিব। হীরে মানিক বসান টোপর চেয়েছিস, তাই দিব। ছাতু খেতে সোনার বাটি চেয়েছিস, তাই দিব। ফের ফের, দোহাই তোর ধর্ম্মের ফের, সে কি আর ফেরে? মানুষ ত নয়, বনের পাখিও নয়, কথায় ভুলবে। এ টিয়ে কাটা শিকল, মাথা ঘুরিয়ে লেজ নাড়া দিয়ে ঝনাৎ ঝনাৎ করে বলে গেল—দূর! দূর! হতভাগিনী! খালি হাড় চাটে কে? দূর হ! হতভাগিনী তোর পানে আর তাকায় কে? তোকে চায় কে? তোর কাছে বসে কে? তোকে পোছে কে? কত রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, শেষে বলে গেল কি? ও বেগমী ঠাকরুন? তোতা কি শুধু রাঙ্গা মরিচ দেখে ভুলেছিল? দুধ আলো চাল দেখে মেতে ছিল? না সাদা ধবধবে ভাদ্র মাস দেখে ডুবে ছিল। বুঝতে পার নাই? বুঝবে ক্রমে বুঝবে, এই সকল কথা, আরও কত কথা বলে দুপা তুলে নাথীর আভাস দিয়ে, চক্ষু লাল করে ছুটে পালাল। কিছুদূর গিয়া ঘাড় ফুলায়ে, ঠোঁটে ঠোঁটে ঠক্‌ঠকী বাজায়ে বলে গেল—তুই যদি ফিরে আমার নাম করবি? তোতা, শিকলি কাটা বলে কথা মুখে আন্‌বি, একশত দুইশত তিনশত পয়জার মেরে পয়জারন্নেসা নাম রটিয়ে চলে যাব। এই হল শেষ ফল—প্রণয় পরিচ্ছেদের যবনিকা পতন। আচ্ছা! আমিও মানুষ! এখনও আমি আমিই আছি। দেখবো কতদিন মনে না করে বসে থাকে। ভণ্ড জুয়াচোর বলে গেল, আমার কিছু নাই। ভাদ্র মাস, এ কথার নানা অর্থ? আমি কচি খুকি নই। বেশ বুঝেছি। ভাদ্র কি শ্রাবণ, কি আষাঢ়, ওকে দেখাব, ভাল করে দেখাব। যাক, এতদিন চাল ছোলা পুষে ছিলাম, এখন ভাগল। ভাগল ত ভাগল—এক চোটে ভাগল...”

“কিছুই কি নাই? “বাম পার্শ্বে বৃহৎ আকার আরসীতে সর্ব্ব অঙ্গ মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত দেখিয়া বলিলেন, “আমার কি কিছুই নাই? হীরে মানিক, মুক্তা এখনও কত আছে। এই নিকুঞ্জ-নিকেতনে, রাধিকা সেজে, শ্যাম নটবর দল সাজায়ে তাদের সঙ্গে জলকেলী,

রসকেলী, বেতাল কেলী, কদম্ব কেলী, বোট কেলী, বজরা কেলী, নানা কেলী করে জীবন কাটাব। হলধর, জলচর, নলচর, বনচর, যামিনী, কামিনী, নাগিনী, বসন্ত, কোকিল সহচর হবে। সদা বসন্ত বিরাজ করবে। শীত, বর্ষা, হেমন্ত, নিদাঘে বসন্ত, বসন্ত বাহারে মিলেমিশে এক হয়ে থাকবো। কিসের পাওয়া?"

বক্ষের দিক মুখের দিক দুই তিনবার তাকাইয়া "ক্যাবাত, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। কিসের কমি? সাহসেই লক্ষ্মী। হাঁ দীনবন্ধু! অনাথবন্ধু! অনাথের নাথ! সর্ব্বেশ্বর ভোলানাথ! রক্ষা কর। শিব! শিব! বোম ভোলানাথ! রক্ষা কর! তোমারই সাহস—"

চেয়ার হইতে উঠিয়া আরসীর নিকটে গিয়া গায়ের বডীটী ভাল করিয়া কসিয়া বান্ধিলেন। দক্ষিণ বামে কিঞ্চিৎ হেলিয়া দুলিয়া ঘৃণার সহিত বলিলেন, "ছি ছি! পাজী নচ্ছার বেহায়া জুতোখোরের জন্য কি না করেছি। সর্ব্বনেশে ভরা পড়া বিষের হাঁড়ির জন্য কি না করেছি, কি না খেয়েছি, কোন স্থানে না গিয়েছি। জাতি নাশা পাৎখাঁড় রাস্কেল জন্য, ধুরবাজ ধূর্ত্ত বেল্লিক বেহায়ার জন্য কার সঙ্গে না কথা কয়েছি, জাত কুলমান সম্ভ্রমে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে গঙ্গা যমুনা পদ্মা গৌরী গর্ভে ডুবিয়েছি। যা কখনই করি নাই, স্বামীর জন্য যা কখনই করি নাই, ঐ পাজীর জন্য তা করিছি। একদিন আগুনের কাছে গিয়ে যদি কিছু ভাজাভূজা, নাস্তা, পিটে তয়ের করেছি, গুণবর বোকা স্বামী কত বকেছেন, রঙ্গ খারাপ হবে, গায়ে গন্ধ বসবে, কাপড় অপরিষ্কার হবে, মুখে হাতে ছাই মাটি ভরবে, কত বিরক্ত ভাবে বারণ করেছেন, আর পোড়া কপালের জন্য নিজে উনন ধরিয়ে কত রান্নাই রেন্ধেছি, তার সীমা নাই। আবার তাড়াতাড়ি একখানা বারসোপ তিনখানা উইন্ডসর সোপ খরচ করে গায়ের মলা, হাতের মলা, মুখের ময়লা সাপ করেছি। আবার ভাল উইণ্ডসর হনি ঘসে ঘসে ক্ষয় করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধুয়ে পরিষ্কার করে, তখনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ধুতিখানি জড়িয়ে, খানার টেবিলে এসে বসে যোগ দিয়েছি, ভাল রান্নাটি এই পোড়া হাতে তুলে কত আদরে মুখে তুলে দিয়েছি। উইলসনের বাড়ীর কত খানা আনিয়া টেবিল সাজিয়ে রেখেছি। বি. কে. দাসের দোকান হতে ধারে হীরার অঙ্গুরী এনে, হ্যামিল্টনের বাড়ী হতে সোনার ঘড়ির চেন এনে, কাল সর্পকে মনের মত সাজিয়েছি। দোগাছির ফিতে পেড়ে ধুতি এনে রাত্রবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আমার মাথা আর মুণ্ডু, প্রতি শনিবারে ১০/১৫ টাকার বাজার করে নিমকহারামের বাড়ীতে রেল গাড়ী ভাড়া দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। মনের কথা বমির মত উগরে উগরে উঠেছে। পোড়া মুখর কষ্টিক পোড়া, টিনটিনে ক্ষণক্ষণে ঝন্‌ঝনে হাড়ের পাঁজা গিন্নি-মনির ও বাঁদরামুখ ছেলেমেয়েরই বা কত আবদার সহ্য করেছি। কত টাকাই না তাদের জন্য মাটি করেছি, ক্ষয় করেছি। একটি আইবুড় মেয়েকে বিবাহ দিয়েছি। তার ঘর আমার ঘর কম হলেও ২০ দিনের পথ—এত দূরদেশে রান্না জিনিস ডাক গাড়ীতে পাঠিয়ে মনের ক্ষোভ জ্বালাযন্ত্রণা বেদনা ক্লেশ নিবারণ করেছি। আরে কৃতঘ্ন নারকী! তোকে যেদিন যমের দ্বারে খুন করতে চেয়েছিল—নাঙ্গা তরবার হাতে করে সারারাত্র খাড়া পাহারা দিয়েছি। কত গঞ্জনা, কত লাঞ্ছনা, কত ঘৃণা, কত অপবাদ, কত বদনাম সহ্য করেছি। তার ফল হাতে

হাতে ফলল। ভাল—চাই না—বাঁধলাম মন। পাষাণে বাঁধলাম। চক্ষু! আর কেন? দেখ, মন বাঁধতে পারি কিনা? আমি পাষাণী। লোহার পোড়া ক কড়া—" (একটু থামিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস)।

বেগম সাহেব চক্ষু রুমালে মুছিয়া পিছন ফিরিতেই দেখিলেন তাঁহার প্রিয় সহচরি পঞ্চকল্যাণী মিটমিট মিষ্ট হাসী হাসিয়া হাত নাড়া নোলক নাড়া দিয়া আসিতেছে। বেগম সাহেব মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "কি কল্যাণী পঞ্চভূত একত্র হল, না পাঁচ জায়গাতেই রইল?"

কল্যাণী উত্তর করিল, "এক না হলে দুই হয় না। দুই না হলে তিন জন্মায় না, কাজেই চার না হলে পাঁচ হয় না। ভাবনা কি? একেই দুই, দুয়েই তিন, তিনেই চার, চারেই পাঁচ। আজ নাহয় কাল, কাল নাহয় পরশু, সে দিনেও নাহয় আর একদিন। পাঁচেই এক, একই পাঁচ হবেই হবে। ভাবনা কি? চিন্তা কি? কোটনা সিং এসেছে।"

"আসতে বলো—না—না—তুমি আগে আমার কথাগুলি ভাল করে শুন। আমার আজ মনের মিল নাই। রগে রগে গরমিল, পশমে পশমে উলট পালট, আঁতে আঁতে তারের খবর, বিজলির লেখা। অন্তরে আগুন, ভিতরে বিষম আগুন, শরীরে আগুন, অস্থির, মহা অস্থির কিছুই ভাল বোধ হচ্ছে না। তুমি দশটা মোরগ নিয়ে, পাঁচটি সিককাবাব, পাঁচটির রোষ্ট, দুটি পাতি হাঁসের ষ্টু, খাসীর কবাব আর যে কলিকাতা হতে গরুর মাংস আনা হয়েছে, তার ব্যঞ্জন লবদার—কলিজার দো-পেয়াজা, রুই মাছটি কাঁটা মজিয়ে পাক করবে। কটলেটের কথা ভুল করেছি, যা সকল সময়ে দরকার, ১০টি মুরগীর বড় বড় কটলেট করবে। পোলাও দুইতিন রকম যতদূর জুটে ওঠে। পরাটাও অতি কম ১৬টা, কোপ্তা ৩০টা, ইহার পর মিটা চাউল, ফির্ণী অতি স্বল্প পরিমাণ। মিষ্টির তত দরকার নাই,—তবে একটা নিয়ম রক্ষার জন্য দুপদ বাড়াতে হয়। আর আর যা দরকার হবে, আমি রান্না ঘরে গিয়ে সমুদায় ঠিক ঠাক করে দেব। নাজীর, উজীর, মৃধা, পেস্কার মুন্সীকে ডেকে বলে দাও যে, ।০ সের ঘৃত, ৪ সের বাদাম, ৪ সের কিস্‌মিস্‌, জ্বালানী ভাল কাঠ, আর সাত ঝুরি কয়লা, যত শীঘ্র শীঘ্র হয় এনে দিক্‌। বিলম্ব হলে চাবুকে পিঠ লাল হবে, আর তিন মাসের মাহিয়ানা জরিমানা হবে।"

"আরও কয়টা জিনিস বাকী রৈল।"

"কি কি বাকী রৈল, আমার মনে হয় না—হাঁ হয়েছে, দুট মেটে কলসী আর যমুনার জল। আর চারগাছা দড়ি।"

"না, না-আর বাকী—কালী চুন পান সুপারী।"

"দূর হতভাগী! কালী চুন নহে, কলী চুন। আচ্ছা আচ্ছা বলেছ, শীঘ্র শীঘ্র আন্‌তে বল, খাবার জিনিসপত্রগুলি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চাই।

"আরও ভুলে হয়েছে। ফুলেল তেল নাই। অম্বুরী তামাক নাই। বোতলে সিরকা নাই।"

"তাতে কি! তুই ভাই যা—আমার মন ভাল নয়। ফুলেল তেল নাই, মধ্যম নারায়ণ

আছে। অম্বুরী তামাই নাই, চাবুক আছে। সিরকা নাই, লাল রঙ্গের অন্য আর কিছু আছে, যা খায় দেওয়া যাবে।"

"তবেই ত যমুনার জলের বিশেষ দরকার। মাথা ঘুরে বমি নেকারের সময় কেউ নাই—ডাক পঞ্চকল্যাণী। কাজেই যা যা দরকার হবে, সেগুলির ফর্দ্দ দিন। সাবান, বেসন, আর এক ডজন তৌলিয়া"—

"দূর! দূর! (একটু হাসি মাখা ভাবে) দূর দূর! রান্নার যোগাড় কর গিয়ে, ভাল হওয়া চাই, আজ নূতন আমদানী। ইনিয় হাকিম—তবে পূর্ব্বের তিনি নন।"

পঞ্চকল্যাণী চলিয়া গেলে, বেগম সাহেব আবার আরসীর নিকটে যাইয়া চুলগুলি পরিপাট করিলেন। দুই চারগাছা চুল বেকেতা হইয়া যে ললাটের উপর পড়িয়া ছিল, তাহা সরাইয়া দিলেন। এদিকে কোটনা সিংহ উপস্থিত হইয়া বলিল, "খামিন্দ সেলাম!"

কোটনা সিংহের বিশ্বাস—খামিন্দ শব্দটা বড় উচ্চদরের। বেগম সাহেব ফিরিয়া ঘুরিয়া খাড়া হইলেন, কোটনা সিংহ বলিতে লাগিল ঃ

"হুজুর! উকিল বাবু চিট্‌ঠি পড়কে হাসাত রাহা। আওর মধ্যে মধ্যে শির ঝুমাত রাহা, ঝুমাত রাহা, দাহনে বাঁয়ে ঘুমাত রাহা, হাসাত হাসাত বোলাত রাহা, "হামরা সালাম দেও, চিটঠিকা জবাব নেই।"

বেগম সাহেব মুখখানি ভারী করিয়া বলিলেন, 'কি! পত্রের জবাব দেয় নাই। সে কি কথা? জবাবের বিশেষ দরকার।"

"খামিন্দ! ওহাঁ বড়া কি আছে। বহুত আদমী ছালা ছালা রূপাইয়া, কত ভদ্র অভদ্র একটা মুখের কথার ওয়াস্তে খাড়া, দুপায়েরসে খাড়া।"

"আচ্ছা আচ্ছা যাও, তোমরা পাহারামে যাও, কোই আওনেসে বোলদিজ আজ কা চেরি হোগা নেই। বেগম সাহেব কা শিরমে দরদ হায়। আওর কোই বাড়া আদমী আনেসে বোলদিজ, পেটমে দরদ হায়।"

কোটনা সিংহ সেলাম করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলে,—বেগম সাহেবের মনে হঠাৎ কি কথার উদয় হইয়া, "উহু! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা! শেষে এই হলো। যা কখনও ভাবি নাই, তাই হলো, ঐ আলনার উপর কমবক্ত নিমকহারামের টুপীটি ধরা আছে। হাতের সেই সরু বেতখানা যাতে সোনার টোপর দেওয়া আতর-দান মাথায় করে আছে, তুলা মাখান আতরও ধরা আছে, লোক নাই। উহু কি নিমকহারামী। শেষে ফাকি দিয়ে পালাল। যাক এই প্রতিজ্ঞা—স্থির প্রতিজ্ঞা—আর মনে করবো না মুখে আনবো না, কথাটি ঘুণাক্ষরেও আর তুলবো না। বাস এই শেষ—বাবু ভেবেছেন, তাঁর অদর্শনে, অপরশনে, ত্রাহি মধুসূদন দেখব। তা হবে না। হবে না হবে না। এই আমার শেষ। কথায় বলে—তালাক বায়েন। দু ফোটা জল, চক্ষের দু ফোটা জল—এই শেষ। পান চিরে ফেললাম। বাস ইতি ১৭৮৪।"

বাহিরের গেটে বড়ই গোলযোগ। কোটনা সিংহ বলিতেছে, "নেই বাবু। আজ মুলাকাত হোগা নেই, শিরমে দরদ, পেটমে বেথা, কালেজামে জখম—আজ চলে যাইয়ে।"

আগন্তুক বাবু বলিলেন, 'এ বেটা বলে কি? এ মেড়ুয়াবাদী বলে কি? তোর কথায় ফিরে যাব? তুই গিয়ে বলনা যে আয়া।"

"আরে ভালা বাবু! বেগম সাহেবকা মেজাজ ঠিক নাই। বাড়া বিমার ভায়া। কৌন বাবু, নাম কেয়া, বাতাও ত।"

"তোম যাও, বাবু আয়া, বাস এই বাত বলো—তোমরা নামসে ক্যা দরকার।"

"হাম তোমরা এয়সা পাগল নেহি—বাবু আয়া। যাব হামরা খামিন্দ পুছেগা, ওসকা নাম ক্যা—তাব ক্যা জবাব দেগা বোলোতো বাবা?'

"আরে বাবা! তুই গিয়ে বল। তোর বেগম সাহেব জানেন্ আমি আজ আসবো।" এই গোলযোগে পঞ্চকল্যাণী দেউড়ীর গেটে আসিয়া দেখিয়া গিয়া বেগম সাহেবকে বলিল, "ঋতুরাজ বাবু আসিতেছিলেন, কোটনা সিং তাকে ধমকে ধমকে ভারি জ্বালাতন করছেন।" বেগম সাহেব ক্রোধে অধীর হইয়া "বেটা মেড়ুয়াবাদী কাকে কি বলে চিনে না। সর্ব্বনাশ! যার হাত আমার এত কাজ, সাড়ে তিন হাজারের মামলা, তাঁর সঙ্গে ঝগড়া—সর্ব্বনাশ! কি হলো? কি হবে! পঞ্চকল্যাণী! তুই দৌড়ে যা শীঘ্র শীঘ্র যা। তিনি ফিরে গেলেন কিনা? শীঘ্র শীঘ্র যা—ডেকে আন—আর সেই কোটনা বেটাকেও ডেকে আন।"

পঞ্চকল্যাণী ত্রস্ত-পদে যাইয়া কোটনা সিংহকে সঙ্কেতে ডাকিয়া চুপি চুপি কানে কানে বলিতেই কোটনা সিংহ যেন মরার মত হইয়া, আগন্তুক বাবুর নিকট যাইয়া বলিল, "দোহাই ধর্ম্ম অবতার হাম পাহচানা নেই।"

"নেই নেই, হাম নাম না বোলনেসে তুম কেমন করে পাহচানতা।" ঋতুরাজ বাবু এই কথা বলিয়া মৃদু মন্থরগতিতে আসিতে লাগিলেন, সদর গেট পার হইয়া অন্দর মহলের চাবী দ্বার গেট পার হইয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোটনা সিংহ মাথাটি হেঁট করিয়া বাবুর পিছনে পিছনে আসিতেছে, মুখে কথাটি নাই। গোঁপে চাড়া নাই, মাথায় পাগ্‌গর নাই।

বেগম সাহেবের খাশ কামরায় ঋতুরাজ বাবু ঢুকিলেন। ঋতুরাজ বাবু প্রকাশ্য নূতন, কিন্তু বেগম সাহেবের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় আছে। ঋতুরাজ বাবুর পরিচয় পাঠকগণের জানা আছে, তিনি অরাজকপুরের ২য় .....। বেগম সাহেবের বিরুদ্ধে সাড়ে তিন হাজার টাকার দাবীর কএকটা মকর্দ্দমা তাঁর এজলাসে আছে, তাইতে এত খাতির। ঋতুরাজ বাবুর বাসায় বেগম সাহেবের যাওয়া আসা আছে—নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ক'দিন ক'রাত্রে বেগম সাহেব ঋতুরাজ বাবুর বাসায় পায়ের ধূলি ফেলিয়াছেন। একদিন গায়ের বডী, পায়ের বিনামা পর্য্যন্ত ফেলিয়া আসিয়াছিলেন।

কোটনা সিংহের প্রতি বেগম সাহেবের নজর পড়িতেই, কোটনা সিংহ জোড়হাতে বলিল, "ধর্ম্মাবতার হুজুর মাই—বাপ, মাতারী, খামিন্দ! হাম বাবুকো পাছানা নেই।"

ঋতুরাজ বলিলেন, তাঁতে হয়েছে কি? বেশ ত, অচেনা অজানা লোক হঠাৎ আসতে দেবে কেন? আমি ভারি খুশী হয়েছি, এইরূপ কড়া দরবান না হলে ভদ্রতা রক্ষা রক্ষা পায় না।"

বেগম সাহেব বলিলেন, 'এ কথাটা আপনি বুঝবেন, কিন্তু এদেশে অনেকের সে আক্কেল নেই। অনেকেই বাধা পেয়ে চটে পেটে একেবারে লাল হয়ে ফিরে যান। সিং, আপনা দরজা মে যাও কেই ভালা আদমী বড়া বাবু আনেছে খবর দিজো—আওর রোকো মত—হামরা তাবিয়াৎ কুচ ভালা হুয়া।"

কোটনা সিং সেলাম বাজাইয়া, পরে ঋতুরাজ বাবুকে ডবল সালাম করিয়া প্রস্থান করিলে বেগম সাহেব বলিলেন, "আসুন আসুন! কোথায় বসাই? কোন আসনে স্থান দেই? সকল প্রকার আসন এখানে উপস্থিত, যে আসনে ইচ্ছা, তাতেই উপবেশন করুন।"

"তাত দেখতে পাচ্ছি—পদ্মাসন, কাষ্ঠাসন, কৌচাসন, চেয়ারাসন, আরও আসন, হৃদয়াসন, বহু আসন, বর্ত্তমান—কোন আসনে উপবেশন করি।"

"যাতে ইচ্ছা, যাতে অভিরুচি, যাতে মন বসে, যাতে দেলখোস হয়, যাতে আরাম বোধ হয়—সকলি হাজির।"

"এই গুণেই ত মেরে রেখেছেন। মারতে বসেছেন, দাদা ত ছটপট কচ্ছেন। ভোলা দাদা নাকে মুখে হাজার রকমে গুণগান কচ্ছেন—বক্কেশ্বর ভায়া আইঢাই করে যাই যাই হয়েছেন। যাক্, আপনার মঙ্গল ত?"

উভয়ে একখানি সার্টিন-মণ্ডিত কৌচে মুখামুখি অথবা পাশাপাশি হইয়া উপবেশন করিলেন। টানা পাখা চলিতে লাগিল। সন্ধ্যাদেবী অন্ধকার করিয়া জগৎ ঢাকিয়া দিলেন। কুঞ্জ নিকেতনেও অন্ধকার। অন্ধকারের কি আর শত্রু নাই? স্থানে স্থানে আলো জ্বলিয়া ঘোর আঁধার অনেকটা বিনাশ করিল।

ঋতুরাজ বাবু বলিলেন, "কে যেন বলছিল আপনার মাথায় ব্যথা, পেটে ব্যথা, বুকে ব্যথা, গায়ে ব্যথা ; ভাল কথা, কি প্রকারের ব্যথা? শুনে বড়ই ব্যথা লাগল, তাই ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছি। সত্যি সত্যি ব্যথা না কোন কথা আছে? না মাজেরা আছে?"

"হাকিম মহলে কেবল মাজেরা নিয়েই কথা। প্রাণ যায় আর থাকে না—ব্যথা না হবে কেন? আমার ব্যথা চিরকাল। কোন কালেও সুখ নাই। আর সুখ চাইনে। কারণ সকলি জানে—এ জীবনে সুখ আর হবে না। যদি মরে আবার নারী জনম পাই, তবে বলতে পারি না—ব্যথা সারে কিনা? ব্যথার জন্যে কোন কথা নাই, কোন আপত্তি বাধাও নাই। বলুন ত, তার কি হলো? কথাটা আগে শুনে নেই।"

"আমার হাতে থাকলে অবশ্যই হবে। ভেড়াকান্ত ভারি ধূর্ত্ত, আমার হাতে রাখে কিনা সেইটা সন্দেহের কথা—বোধ হয় উপরে জানিয়ে উঠিয়ে নেবে।"

"সে কি কথা। আপনার হাত থেকে উঠিয়ে নেবে?"

"হাকিমের হুকুম। আমার সাধ্য কি?"

"আর একটি কথা ছিল, তার কি হলো?"

"সে এক প্রকারে ঠিকঠাক্। বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন হাতে পেলেই হয়। আমার কথায় ভোলানাথ দাদা ঐক্য হয়েছেন। বলেছেন চাঁদ দারগা আমার নিকট বলেছে,

যে ভেড়াকান্তকে জেলে না পূরলে আর এদেশ রক্ষা পায় না। ভারি বদ্‌লোক। এখন পথ পেলেই হয়, তাও নাকি হয়েছে, ক'একদিন পরেই শুনতে পাবেন। আপনার মনস্কামনা সিদ্ধি হবে।"

"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। ভেড়াকান্ত আমাকে বড়ই লাঞ্ছনা দিয়েছে। আমার মনের আগুন জ্বালিয়ে সরে পড়েছে।"

'তা পাওয়া যাবে। ঐ পর্য্যন্তই ও কথায় ইতি করে অন্য কথা হক্।"

"আজ যে জুড়িদার দেখি না। না কুঞ্জ-নিকেতনে এই নূতন পদার্পণ বলে সঙ্গে জোটে নাই?'

"না না, সে কথা নয়, ভাগী থাকলেই মহাগোল, ভারি লেটা। যেখানে ষোল আনা, সেখানে আট আনা। তা যাক্—বেদনাটা কি প্রকারের? আর ওদিকের খবরটা কিরূপ?"

"এই পান নিন্। (পান হস্তে দিয়া) খবর কি কখনও ঝুটা হয়। যা শুনেছেন, তাই।"

"ওহো! এতকাল চাল ছোলা খেয়ে, শেষে লোহার সিকল কাট্‌লো। হায় রে হৃদয়! হায়! হায়! রে মন!"

"অনেক বেহ্ম ভায়াদের স্বভাবই ঐ প্রকার। পুরুষের ব্যবহারই তাহাই। হাজার দেও, হাজার ভালবাসা ভবি ভোলবার নয়, পোষ মানবার নয়। যাক্, ও কথা মুখে আনবেন না প্রতিজ্ঞা করেছি। ভালবাসা, প্রণয়, মাখামাখি, যা কিছু ছিল, যমুনার জলে ডুবিয়ে গঙ্গা পার করে দিয়ে এসেছি।"

"যাক কথা বনে, হুকুম হক্ যা আছে তোমার আমার মনে।"

বেগম সাহেব ঘণ্টা ধ্বনি করিতেই পঞ্চকল্যাণী বোতল গ্লাস লইয়া উপস্থিত। বেহারা সোডা ওয়াটারের বোতল হস্তে সম্মুখে হাজীর। পঞ্চকল্যাণী বোতল গ্লাস টেবিলের উপর রাখিয়া মৃদু মৃদু স্বরে বলিল।

"এই নিন্, ওদিকে মৌলবী সাহেব আপনার ব্যথার খবর পেয়ে দেখতে এসেছেন। দেউড়ি পর্য্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে আছেন।"

ঋতুরাজ বাবু বলিলেন, "সর্ব্বনাশ? মৌলবী সাহেব এলে কি আর রক্ষা আছে? কোন কোন সময় কথার ঠারে ভারে তিনি কত কি বলেন, ইসারা ইঙ্গিতে কত কি বুঝান, আমি সে কথাতেই কান দেই না। আর চার চক্ষে একত্র হয়ে ছয় চক্ষুর সহিত দেখাশুনা হলে কি আর রক্ষা আছে? আমি না হয় অন্য পথে মাথায় কাপড় জড়িয়ে চলে যাই।"

"না না মহাশয়! আপনি যাবেন কোথা? আমাকে দেখতে এসেছেন দুটি কথাবার্ত্তা বলি, শেষে যাবেন। বরাত থাকে, তবে কিঞ্চিৎ জলযোগ করবেন। আজ কিছু নাই। রান্না কে করে—নিজেই অস্থির, তা আপনি কোন ভাবনাই ভাববেন না। দেখুন! এই যে পর্দ্দা সম্মুখে ঝুলছে—এই পর্দ্দাই সর্ব্বনাশের গোড়া, মান রক্ষার উপায়, সম্ভ্রম, বজায় রাখবার সহায়—প্রধান সহায়—যত কারিকরি যত চাতুরি, ঐ পর্দ্দাই তার মূল। এখনই পরীক্ষা হবে, প্রত্যহ প্রমাণ পাবেন। আমরা যে পর্দ্দানিসীন, তার হাতে হাতে ফল দেখবেন। (পর্দ্দা টানিয়া

ফেলিয়া)—এই নিন্, কে কার ধার ধারে? পর্দ্দাখানা ফেলে দিলেই সাত খুন মাপ। গাড়ী হাঁকাচ্ছি। জোড়া জোড়া, জোড়া বেন্দ, জুড়ি হাঁকাচ্ছি। গড়ের মাঠে হাওয়া খাচ্ছি। খোলা বাতাসে, ঘোড়া গাড়ীতে খুলে বসে আছি। উত্তপ্ত বক্ষে শীতল বাতাস লাগাচ্ছি। ইডেন গার্ডেনে হাঁটাহাটি ছুটছুটি কচ্ছি। কান কথা, সেক হান্ড কচ্ছি। মিস্ সেজে, শিস দিচ্ছি। ঘরে এসে পর্দ্দা টানলেম, সব মিটে গেল। এখন সর্ব্বদোষ অপহারী, মান সম্ভ্রম রক্ষাকারী, পটাপটি পর্দ্দা আমাদের সহায় থাক্তে, আপনার চিন্তা কি? পর্দ্দার বাহিরে কিরূপ সাজা, আর মধ্যেই বা কিরূপ মজা, আজ দেখুন! ডাক মৌলবী সাহেবকে। ছোট হলেও হাকিম, বাপ্রে তাঁকে কি আর ফিরান যায়।"

সব ডিপুটী মৌলবীর নাম বিয়ে পাগলা হাকিম—খট্খট্ শব্দে আসিয়া উপস্থিত। পর্দ্দার বাহিরে আসন, সেলাম বাজাইয়া উপবেশন।

সেলাম কথা শুনিতেই বেগম সাহেব অতি মৃদু ও কাতর স্বরে বলিলেন, "ভাই আমার সেলাম, ভারী অসুখ।"

মৌলবী বলিলেন, "তাই শুনে এলেম, কি অসুখ হয়েছে?"

"উহ—ভারি ব্যথা—কমরে দরদ, মাথাতেও আছে। বেশী কথা বলতে পারি না।"

"তবে ত ভারি লেঠা। ডাক্তার কবিরাজকে দেখান হয়েছে?"

বেগম সাহেব একটু হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ভাইজান! টাকা পাই কোথা? ডাক্তার কবিরাজ বিনা সেলামীতে আসে কৈ? এখন খালি হাত। খালি হাড় চাটে না। মধু না থাক্লে মাছি যে মাছি, সেও উড়ে বসে না। তারপর বুড় হয়েছি। ঔষধ আর ধরে না। তারাও মন মত ঔষধ দেয় না। আমি দিতে পারি না, তারা দেবে কেন? আর কার জন্যে বাঁচবো? স্বামী নাই যে তিনি দেখে সুখী হবেন, মলে তাঁর কষ্ট হবে। সন্তানের ভাবগতিক ত দেখতেই পাচ্ছেন। জেন্ত গোর কাফন দিলে সে রক্ষা পায়। দেখুন, ভাই। ভারি কষ্ট পাচ্ছি। ঔষধ যে না খাচ্ছি তা নয়। এই এখনি নিজ হাতে এক ডোজ ঔষধ পেটে ঢাললেম। কিছু হচ্ছে না। বেদনা বাড়ে বই আর কমে না। নিজেই ঢাল্‌ছি নিজেই খাচ্ছি। দাসী-বাঁদীর জাত বেম পীড়া হলে আর কাছে ভেড়ে না। আমার কপালে যা আছে হবে, আপনার নূতন বিয়ের কি হল ;

"আপনিও দেখেন বিয়ে! ও সকল বিয়ে কি আমরা কর্ত্তে পারি। বেড়া নেড়ে গেরস্তের মন বোঝা। তারা কি আমাদের মত স্বামী পছন্দ করে? তারা লিখাপড়া জানা মেয়ে নভেল নাটক পড়া মেয়ে। তারা দিব্বি স্বামীটি চায়। গোঁপের রেখা থাকবে, দাড়ী উঠ্‌লে হবে না। কেবল গোঁপের রেখা হওয়া চাই। মাথার চুল সাজান, কোঁকড়ান্ ফ্যাসনাবল মেঘের মত কালো হবে। গায়ের রং দুধে আলতা গোলা, দাঁত পরিপাটি ভ্রূ দুটি জোড়া কিন্তু ভ্রমর হতেও কালোর দরকার। মোটের উপর খুব সুশ্রী হওয়া আবশ্যক। তার পর কিছু ইংরাজী বাঙ্গালা জানা চাই। পদ্য লিখতে পারে—গান গাইতে, হারমোনিয়ম বাজাতে জানে, রসিকতার মার পেঁচ বোঝে, বিষম সম্পত্তিতে নীট আয় ছয়টি হাজার। বাড়ীতে খড়ের

ঘরের নাম থাকবে না। হাতে না গড়লে আর এমন মন মত বর পাওয়া কঠিন। দুনিয়া জাহানে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। এখন ভাবুন, আমরা কোথায় লাগি। যা শুনছেন কিছু নয়—ও ঘরের নাম কর্ত্তে গা শিউরে উঠে।"

"হাঁ হাঁ শুনেছি, আপনার সম্বন্ধ হয়েছে কোন এক নবাব ঝাড়ীতে। তিনি নাকি বেশ লিখাপড়া জানেন। চিঠিপত্র পর্য্যন্ত আপনার নিকটে প্রায়ই আসা যাওয়া কচ্ছে। টেলিগ্রাফ টেলি ফোঁ দেদার হচ্ছে। আপনি নাকি টেলিগ্রাফেই মন সপে বসে আছেন। লোকে ত এই বলে।"

"এ কথাও ঠিক নহে। তারা বাহিরে মেয়ে দেয় না।"

"মেয়ে ইচ্ছা কল্লে না দিয়ে করে কি?"

'আসলেই সে কথা নয়। হবে যে তার বিশ্বাস কি?'

"হবে হবে হবে। ফটো পাঠান হয়েছে, তাঁরও মন লেগেছে, চক্ষে ধরেছে। আপনিওত ঝাঁকরে পর্দ্দা উল্‌টে এক নজর নাকি দেখেছিলেন? লোকে বলে, সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জানেন। আপনিও পাগল, তিনিও সেই প্রকার।"

"যাক ও কথা যেতে দিন—আপনাদের ভাবনা ভাবুন। ঘরে আগুন রাখা বড় দায়। কোন দিন দপ করে উঠবে। একটি নয়—দুইটি নয়—চারটি।"

"এ দেশে সকলেরই একটা অভিনয় আছে।"

"আমি সে অভিনয়, পর্দ্দা, সিন, নট, নটী, প্রবেশ, প্রস্থান, সমাসীন, আসীন, স্বগত, নেপথ্যে, অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক, যবনিকা পতন, এর একটিও বলি না। আপনাদের অভিনয় নিয়ে আপনারা সুখে থাকুন। তবে সমাজের মস্তক হেঁট। দেখুন দেখি, লাল আলু কি কাণ্ডকারখানাটা কল্লে। দাম্পত্য স্বত্ব সাব্যস্ত, কি ঘৃণা! একি মানুষে করে! কি সর্ব্বনেশে কথা। মাসিক বেতন যার ৩ টাকা, সেই দাবী করে মনিবিবিকে—মাঝে আপনারাই আছেন?"

"না না—ভাই? দোহাই ধর্ম্মের, আমি ওর মধ্যে, নাই।"

"তা যাক্, আপনার বাহিরে বড়ই গোলযোগ হচ্ছে। শুন্‌ছেন না। আমি তবে বিদায় হই। ঐ শুনুন, ঘোড়ার দাপট মানুষের গোল। আপনার এই ঘরের পার্শ্বেই বেশী গোলযোগ। আমি উঠলেম। ঐ শুনুন! কোন উকিল বাবু ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন। এমন সক ত দেখি না! এই রাত্রে ঘোড় চড়া, আবার পড়ে যাওয়া। তা যা হক আমি বিদায় হলেম, আদাব—বোঝা গেছে। সকল ঘরেই শনি ঢুকেছে।"

এই বলিয়া মৌলবী সাহেব বিদায় হইলেন। পর্দ্দা উঠিল—ঋতুরাজ বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মুন্সফী আদালতের উকিল—সে কি কথা! আর এক মুহূর্ত্তও এখানে দাঁড়াতে পারি না। এখন বাহির হই কোনপথে?"

"এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? খাওয়া দাওয়া কিছুই হল না।"

"আর কি খাবার শক্তি আছে, মুন্সফী আদালতের উকীল। ঘোড়ায় চড়া আপনার দরজায় হাজির। আর সাধ্য নাই।"

বেগম সাহেব মহাব্যস্ত হইয়া ঘণ্টায় আঘাত করিতে লাগিলেন—কার কথা কে শোনে। বাহিরের গোলযোগে সকলেই সেই স্থানে গিয়াছে। কাহারও সাড়া-শব্দ নাই। কেবল বাহিরে ধর, মার, কোই হ্যায় ইত্যাদি।

ঋতুরাজ বাবু অস্থির হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"ব্যাপারখানা কি? কোনপথে যাই? মুন্সফী আদালতের উকীল এত রাত্রে ঘোড়া চড়া—পড়ে যাওয়া, সর্ব্বনাশ—কোথা যাই—কোন পথে পালাই?"

"মুন্সফী আদালতের উকীল দেখে এত ভয় কেন? সে কি কাম্‌ড়াবে? না খেয়ে ফেল্‌বে?"

"তাইত বিবি সাহেব! ও কথাই নহে, আপনি আমাকে একটা পথ দেখিয়ে দিন, আমি সেই গুপ্ত পথে সরে পড়ি। সদর রাস্তায় সদর দেউড়ি দিয়ে আমি কিছুতেই যাব না।"

বাহিরে অত উচ্চস্বরে মাতালের বোলে বলিতেছে, "খবর দাও। সিং জি খবর দেও। তোমরা বেগম কা পাছ সংবাদ পাঠাও। টিকিট ভেজ দে, তোমরা উকিল বাবু আয়া।"

"ঐ শুনুন! বেগম সাহেব, আপনার পায় ধরি, আর আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বেন না। শুনুন উকিল বাবুর দাবী। দেখা হলে আমার মাথা কাটা যাবে।"

পুনরায় মাতালের বোলে, "ডেম সুয়ার জালদি খবর পাঠাও—বোলদেও তোম্‌রা বাবা উকিল বাবু আয়া—তৈয়ার হকে আয়া।"

ঋতুরাজ বাবু আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। উকিল বাবুর দেউড়ি ভাঙ্গিয়া অন্দরে প্রবেশ করিবার উপক্রম দেখিয়া ঋতুরাজ বাবু পায়খানার দ্বার দিয়া পাট বন ভাঙ্গিয়া একেবারে জলা ভূমিতে পড়িলেন। কোথায় বিনামা, কোথায় ছড়ি, কোথায় চাদর—কাদা জলে ভিজিয়া একাকার! অন্ধকার রাত্রে পড়িতে উঠিতে মাঠ পাড়ি দিয়া রাস্তায় উঠিলেন। এদিকে কোটনা সিংহ বেগম সাহেবের নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিল, "খামিন্দ! উকিল বাবু বমি কিয়া, বড়া বমি কিয়া।"

পঞ্চকল্যাণী হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, 'উকিল বাবু বমি করেছেন, চিৎপাত হয়ে ধূলো বনে পড়ে আছেন। একবার উঠছেন, আবার পড়ছেন। মার্‌তে আসছেন, কামড়াতে যাচ্ছেন! ছি ছি, কি কাণ্ডটাই হয়ে গেল!"

বেগম সাহেব রাগে অধীর হইয়া "তোরা হাস্‌ছিস্‌—ভদ্র সন্তান পড়ে মারা যায়! কোন উকিল বাবু? কেউ নাম জানিস্‌নে?"

কোট্‌না সিংহ যোড়হাতে বলিতে লাগিল, "খামিন্দ ঐ বাবু! জেন্‌কা নাম মে দোস্ত লাগ্‌তা হায়। বাঙ্গালী আদ্‌মীকা দোস্ত রাজ রাজেশ্বর।"

বেগম সাহেব বলিলেন, "যাও হাঁকা দেও। ধরাধরি করে রাস্তায় ফেলে দেও কোথাকার রাজেশ্বর—এখানে এসে পড়েছে।"

কোটনা সিংহ অবাক! এত আলাপ, এত জানা-শুনা এত মাখামাখি, তাকে কিনা রাস্তায় টেনে ফেলে দেয়। কোট্‌না সিংহ কি বলিবে, কিছুই বলিতে পারে না।

পঞ্চকল্যাণী বলিতে লাগিল "কাকে টেনে ফেলে দিচ্ছেন? সে যে অকালের বঁধু।"

বেগম সাহেব বলিলেন, "তবে কি আমাদের উকিল বাবু?"

"হাঁ হাঁ, আমাদের বড় উকিল বাবু!"

"মুন্সেফী আদালতে কথা কে বলল?—ছি ছি! শীঘ্র শীঘ্র যা, কোলে করে নিয়ে আয়। আমিও আস্‌ছি। সর্ব্বনাশ! রাত্রি প্রভাত হলে, আর মুখ দেখাতে পারবো না। তিনি বল্‌বেন কি?"

পঞ্চকল্যাণী বলিল "আর বলবেন কি, পাট বনে ঘোড়া ছুটিয়ে যে আছাড় খেয়েছেন, কাপড় চোপড় কাদা মাটিময়। পাতলা ফিন্‌ফিনে ধুতি পরনে ছিল, ফেড়ে ছিঁড়ে একাকার হয়েছে।"

বেগম সাহেব বাতি ধরিয়া যাইতে লাগিলেন, এদিকে সকলে ধরাধরি করিয়া উকিল বাবুকে বাড়ীর মধ্যে আনিলেন।

"হা সর্ব্বনাশ! এ যে আমাদের উকিল বাবু! জজ কোটের উকিল বাবু! হাইকোটের উকিল বাবু! সুপরিম কোটের উকিল বাবু! মুনসফী আদালতের উকিল বাবু—"

উকিল বাবু বলিতেছেন—"বেগমজি সেলাম। আমি পদব্রজে গমন করেছি।"—উঠিতেই ছড়পাড় করিয়া ভূমিতে পতন। সকলে ধরাধরি করিয়া বারান্দায় বসাইয়া মাথায় অনবরত কলসী কলসী জল ঢালিতে লাগিলেন। উকিল বাবু সেই সময় একটি গান গাহিলেন—গানটি গাজী মিয়াঁর দপ্তরে, ভিন্ন কাগজে পাওয়া গিয়াছিল। যথা—

আমি আজ ফড়িং ধরেছি
ঘোড়ায় চড়ে দৌড়ে আস্‌তে ;
(পথে) আছাড় খেয়েছি।।

"কৈ বাজিয়ে কোথা? নেপুর কোথা? সে দিনের সে পান কোথা? ডুগি বাঁয়া কোথা—বোতল কোথা—গ্লাস কোথা।"

মাথার ব্যথা—পেট ব্যথা—বেশী ব্যথা বুকে পেয়েছি।"

বেগম সাহেব বলিলেন, "ঢাল জল—ঢাল জল—ঢাল জল। মাথায় গরমী চড়েছে—ঢাল জল।"

সপ্তম নথি

সময় অল্প কথা অনেক। তবে যেখানে মধুমাখা সুমিষ্ট বোল্ নাই, এয়ারের দল নাই, —খোলা প্রাণ গড়ের মাঠ নাই, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার নাই, রস-রসিকতা নাই, রূপচাঁদ রুধির নাই, তরতাজা মজা নাই, অন্তরভেদী হা-হুতাশ নাই, আক্ষেপ নাই, হাসির তুফান, রহস্যের ঢেউ, আনন্দের লহরী নাই, সেখানে গাজী মিয়াঁ সংক্ষেপে সারিয়া সরিয়াছেন।

পুলিশ কর্ত্তৃক দাগাদারী হাকিম সাহেবের সম্মুখে আনীত হইলে, সাহেবের ইচ্ছা হাজতেই পোরেন, কিন্তু মক্তার ধিন্‌তা ধিনা বাবু আর ধামাধরা সরকারের বক্তৃতায় বাদ-প্রতিবাদে, বিপক্ষ পক্ষের মক্তার ধরিবাজ ঠাকুর, উনু পাঁজুড়ে ঘোষ, কীল চোরা বাগছি; মহাশয় নিরস্ত হইলেন। আইন নজীর দেখাইয়া, ধিন্‌তা ধিনা বাবুর চক্ষে ধূলা দিতে পারিলেন না। হাকিম সাহেবও বে-আইনী করিতে সাহসী হইলেন না। অনেক ঘসা-মাজার পর, শেষে: পাঁচ শত টাকার জামিনের হুকুম দিলেন। তখনি জামিননামা দাখিল হইল। শুনানীর দিন পড়িল। দাগাদারী ভাই, ধিন্‌তা ধিনা মক্তার বাবুর হাত ধরিয়া হাসিমুখে হাকিম সাহেবের বাঙ্গালা হইতে বাহির হইলেন। সদর রাস্তা পার হইতেই, মামার জয় আরদালী খুড়, সেলাম বাজাইয়া যো' হাতে সম্মুখে খাড়া হইল। কিছু বক্‌সিসের প্রার্থনা। মামার জয় আরদালী খুড়র বর্ক্সিসের মার নাই। হাজতে গেলেও বক্‌সিস, জামিনিতে খালাসেও ইনাম। এক পক্ষ হাতে থাকিবেই থাকিবে।

ধামাধরা বাবু বলিলেন, "ওদের কিছু দিতে হয়। ওদের দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যায়। বিশেষ মামার জয় আরদালী খুড় বড় ভাল লোক। হাকিমের বাঙ্গালায় গেলে, আমাদের খুব খাতির করে। চক্ষে পলেই বসিবার একটি মোড়া কি একখানা বেঞ্চ আনিয়া হাজির করে। সদা সর্ব্বদা হাকিমের নিকটে থাকে। বাঙ্গালী হাকিম, বাসায় গল্প-গুজব খুবই হয়, তাক্ বুঝে, দুই-এক কথা মন্দ বলে, কিছু না না কিছু কর্ত্তে পারে—ওকে কিছু দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

দাগাদারী ভাই পকেটে হাত দিয়া খুড়োকে বিদায় করিলেন। কিছু দূর যাইতেই ভেড়াকান্ত সহিত দেখা হইল। ভেড়াকান্ত সহিত অনেক কারবার অনেক কথা আছে—এই সুযোগে তাহার পরিচয়টা দিয়া রাখি। দাগাদারী ভাই, মক্তার বাবুদ্বয়, ভেড়াকান্ত সদর রাস্তার এক পার্শ্বে অশত্থ বৃক্ষ মূলে দাঁড়াইয়া মনের কথা ভাঙ্গচুর করিতে থাকুন, এই অবসরে ভেড়া-কান্তর কথাটা শুনুন!

ভেড়াকান্ত লোক মন্দ নয়—কিন্তু বড়ই ব্যস্তবাগীশ। দোস্ত দুশমন জ্ঞান নাই। নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য নাই। কাল কি খাইবে, কি ঘটিবে, কি হইবে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। খরচপত্রে হিসাব নাই, তবে যা বলিবে, যথাসর্ব্বস্ব ক্ষয় হইলেও তা রক্ষা করার চেষ্টা করিবে। তোষামোদ, বরামোদ জানে না। মিথ্যা প্রবঞ্চনার কাছেও যায় না। অন্যায় অত্যাচার দেখিলে, যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা পায়। নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়া পরের উপকার করে। নিবাস গঙ্গার পার। কার্য্য গতিকে অরাজকপুরে বাস। অধিকাংশ লোকেই মুখে ভালবাসে, ভক্তিও করে। হাকিমান মহলেও পরিচিত। কিন্তু স্থানীয় জমিদার জ্বালাতন নেসা ভেড়াকান্তের নাম শুনিতে পারেন না। কোন কারণে জ্বালাতন নেসা ভেড়াকান্তের পরম শত্রু। জ্বালাতন নেসার চির ভালবাসা বেগম সাহেব! বেগম সাহেবের ক্ষমতা অসীম। হাকিমান্ মহলে খুব আদর। জ্বালাতন নেসার বিশেষ উপরোধে বেগম সাহেব ভেড়াকান্তকে জব্দ করিতে, জেলে পুরিতে মহা পণ করিয়াছেন। সেই কৌশলেই, বর্ত্তমান হাকিম সাহেব ভেড়াকান্তের উপর অন্তরের

সহিত চটা। বেগম সাহেবের ব্যয় বিধানে, কোরমা পোলাওয়ের গুণে, ভেড়াকান্তর মাথার উপর খাঁড়া ঝুলিতেছে। আবার সোনাবিবির পক্ষে থাকায়—মনিবিবি, ধুম্বলোচন, জয়ঢাক এবং অন্য অন্য আমলাগণের চক্ষুর শূল, হৃদয়ের কাঁটা, প্রধান শত্রু মধ্যে গণ্য। জ্বালাতন নেসার অনুরোধে বেগম সাহেব চটা। বেগম সাহেব চটা, কাজেই হাকিম সাহেব চটা। এদিকে মনিবিবি, ধুম্বলোচন, জয়ঢাক প্রভৃতি হাড়ে চটা। ভেড়াকান্তের পৃষ্ঠপোষক একমাত্র সোনাবিবি। সোনাবিবিও কয়েদ। কয়েদ হইতে খালাস করার জন্য ভেড়াকান্তর বিশেষ চেষ্টা।

গাছতলায় দাঁড়াইয়া অনেক কথা হইল। ভেড়াকান্ত বলিলেন, "খালাসের হুকুম আইসা মাত্র এখান হইতে পাল্কী বেহারা কুলি মজুর সকলি যাইবে। যে যে কথা বলা হইল, সেই মত কার্য্য করিবেন। আর একটি কথা আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি। আমাকে ফাঁদে ফেলিতে—চারদিক হইতে ষড়যন্ত্র হইতেছে। জ্বালাতন নেসার কল্যাণ—বেগম সাহেব আমাকে এদেশ হইতে দূর করিতে, কি জেলখানায় পূরিয়া মারিয়া ফেলিতে কত কি করিতেছেন। আবার আপনাদের পক্ষে আছি বলিয়া মনিবিবির চাকরেরা কেবল সুযোগ সুবিধা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে--যাতে আমাকে জেলে দিতে পারে। সকলের উপর হাকিম সাহেব চটা। সেই চটাতেই বেশী ভয়। ঈশ্বর আছেন।"

"আরও কথা শুনিলাম। জোর জবরান করিয়া হউক, অত্যাচার করিয়া হউক, হেবানামা কি কাবালা সোনাবিবির দ্বারা নিশ্চয় লিখিয়া লইবে। জয়ঢাক নাবালক, নাবালক পক্ষে যে অছি আছেন, সে অছিঅতি হইতেও খারিজের দরখাস্ত করিবে, অথচ বলপূর্ব্বক সোনাবিবির নিজের সম্পত্তি ও নাবালকের সম্পত্তি, যাহা এইক্ষণে তাহার হাতে আছে, তাহা সমুদায় কাড়িয়া লইবে। যদি হাতছাড়া হয়, যদি সোনাবিবি হাতছাড়া হয়, কয়েদ হইতে উদ্ধার পায়!"

দাগাদারী বলিলেন, "ঈশ্বর সে দিন ত দেন, পরে বোঝা যাবে। ডাকাতদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে, শেষে বাঁচিবার পথ অবশ্যই একটা বাহির হইবে।"

ভেড়াকান্ত একটু মিহি আওয়াজে বলিলেন, চেষ্টাত কম করা হয় নাই। জেলার হাকিম কেউ বাকী নাই। জজ, ম্যাজিষ্টার পুলিশ, সকল স্থানেই দরখাস্ত করা হয়েছে। অদ্য নিশ্চয়ই হুকুম আসবে। তেস্‌মার খাঁর হাতে কাজ—তাতেই যে বিলম্ব হক্। তাতেই বা কি? উপর আওলার হুকুম তিনি তামিল না করে কি বাঁচতে পারেন! নজরানা কিছু বেশী পরিমাণ সম্মুখে হাজির করলে—তিনি নিজের ঘাড়ে বহন করে—বাড়ীর বাহির করে দিবেন। যাক আর বিলম্ব করে কায নেই। ওদিকে এতক্ষণ কি হলো, কি ঘটল, ঈশ্বর জানেন। পথে—আপনার যাওয়ার পথে যে কোনরূপ আপদে বিপদ নাই—একথা মনে করবেন না। মনিবিবির পক্ষের প্রায় দেড়শত লাঠিয়াল, জমদ্বারের মাঝামাঝি পথে গোপন ভাবে আছে।"

দাগাদারী বলিলেন, "আমি একেবারে নেকা খোকা নই, আমাকে দেশ ছাড়া করবেন, ভালোই, আমি প্রস্তুত আছি—চললাম। যা ঘটে, জানতেই পারবেন।" এই কথা বলিয়া দাগাদারী ভাই বিদায় হইলেন।

দুই পক্ষেই গোয়েন্দা আছে। দুই পক্ষেই চোগলখোর গুপ্ত সন্ধানী আছে। পুলিসও কম

সতর্ক নহে। বিশেষ একটা গোলযোগ বাধিলেই পোয়াবার। সন্ধানে কোন পক্ষেই কম করেন নাই—সকলেই সাবধান সতর্ক হইয়া চলিলেন। পথে কোনরূপ গোলযোগ হইল না। আপন, আপন বাঁচাও পথ—সকলেই সাব্যস্ত করিয়া নির্ব্বিবাদে চলিয়া গেলেন। আমাদের দাগাদারী ভাই—পাল্কীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া জীবনের অতীত ঘটনা, ভাবীফল, বর্ত্তমান অবস্থা, আশা, আশঙ্কা, নিরাশা, ভালবাসা, প্রণয়, স্বার্থ, অর্থ, সম্পত্তি, প্রাণের আশঙ্কা, হেবানামা, নিজের ভরণপোষণ, ইত্যাদি নানাবিষয়ে মনে উদয় হইতে লাগিল। তিনিও একে একে কল্পনার সূত্রে আশা-কুসুমে মালা গাঁথিয়া কত গলায় পরিতে লাগিলেন। কত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কত গাঁথিতে গাঁথিতে চলিলেন।

পাঠক! চলুন, আমরাও যাই। কল্পনার রথে চড়িয়া সোনাবিবিকে যাইয়া দেখি। ঐ দেখুন, সোনাবিবি সামান্য ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া, নীরস মুখে, রুক্ষ কেশে, মলিন বেশে, কি বলিতেছেন, শুনুন! মনোযোগ সহকারে শুনিতে থাকুন—

"কি কপাল নিয়ে এসেছিলাম। টাকাকড়ি, ধন দৌলাত জমিদারীর অভাব ছিল না। কোন বিষয়ে কষ্ট ছিল না। এক প্রকারে সুখেই ছিলাম। কোন দিন যে কথা স্বপ্নে ভাবি নাই, তাই ঘটিল। অল্প বয়সে স্বামী দুনিয়া ছাড়া হলেন। কত লোকের চক্ষু পড়ল, পুড়ল। কত আত্মীয় স্বজনের অন্তরে হিংসা-দ্বেষ উপস্থিত হয়ে বিশেষ কাল হয়ে দাঁড়াল? অবলা অসহায়ার জীবন-যৌবন রক্ষার দিকে কাহারও চক্ষু ঘুরল না, পড়ল না। কি করলে, কিসে কি কৌশলে, সম্পত্তির অধিকারী হবেন, আমাকে হস্তগত করবেন, জীবন যৌবনের মালিক হয়ে সকল প্রকারের ইচ্ছা যথেচ্ছা ভাবে পরিপূর্ণ করবেন, তারই সুবিধা ও সকল পথ খুঁজতে লাগলেন। দূর সম্পর্কীয় এবং সম্বন্ধ বিহীনদিগের ত কোন কথাই নাই। তাঁদের চক্ষে আমার একমাত্র ছেলেটেই বিষম বাধা—ও বিষম লেঠা হয়ে দাঁড়াল। পিতৃহীন শিশু-সন্তানের প্রতি স্নেহ চক্ষে কেহই দেখলেন না। সাবধান হলাম। হৃদয়ের ধনকে অতি সাবধানে রাখলাম! কোন কথায় কান দিলাম না। অতি সাবধান সতর্কে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতে লাগলাম। বহু যত্ন, বিশেষ চেষ্টা, বহু লোভ, বহু কথা, বহু প্রলোভন, বহু কলকৌশলেও যখন পড়লাম না, মনের সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গলাম না, ভগ্ন হল না, তাঁরাই পরাস্ত হলেন। থোতা মুখ ভোঁতা করে অন্য চালে মনকষ্ট ও জব্দ করবার নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করলেন। সত্য-মিথ্যা মকর্দ্দমা উপস্থিত করে অপারগ হয়ে শেষে নিরস্ত হলেন। চারিদিকে তখন ধন্য ধন্য রব উঠল। জয় জয়কার ঘোষণা হল। বুদ্ধি ক্ষমতা বিবেচনার কত প্রশংসা হল। শত মুখে গুণ-কীর্তন করে কত যশ, কত খোশনাম কত সুখ্যাতির কথা, দেশ-দেশান্তরে হাকিমান মজলিসে, জেলায় মহকুমায় রটাল। দিন দিন উন্নতি! হায়! হায়! এদিকে বাবা জয়ঢাক বড় হয়ে উঠল, গোপের রেখা মুখে দেখা দিল। ভাবলাম আমার মনের আগুন শীতল হবে, এত দিনের দুঃখ একেবারে দূর হবে, সুখের মুখ দেখব। মনে কতই আনন্দ, কত আশা। কতই সুখ-স্বপ্ন দেখলাম! আশাকুহকে সুখের দোলায় দুললাম। চিরশত্রু মনিবিবি, তাঁহার নাফানী ঝাঁপানী ষোল আনা মাটি করব আশাতেই তাঁহার কন্যার সহিত

সোনার চাঁদ পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হলাম। আমার মুখে আগুন, মুখে ছাই, আমার কপাল পুড়ল। যে শরিষা দিয়ে ভূত ছাড়াব, সেই শরিষাকেই ভূতে পেল। মেয়েকে বশে রাখব, না উল্‌টে ছেলেটিই কোলছাড়া হল! যাদুকরিণীর এমন মায়া, পেটের এমনি প্রভাব, শিক্ষার এমনিই গুণ যে, আমার সোনার চাঁদ জয়ঢাক,—জয়ঢাকের মত ছেলেকে এক্‌তালা খঞ্জনী করে তুলল! আমার হৃদয়ের ধন পর হলো! আমার জীবনের জীবন অপরের হাতে গেল! হায়! হায়! এমন পোড়াকপাল কার। তিনটি মাসও কাটল না, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে অলক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়ল। এমন জাঁকাল জমকাল সংসার বনিয়াদী ঘর—তাতে বেড়া আগুন জ্বালিয়ে মিথ্যা কথার ভনিতা গেয়ে কবিতা বেঁধে, বাছার মনে কালী বসিয়ে, বাবার হাত ধরে দিনের দুপুরে, গরু-বাছুরের গলায় দড়ী দিয়ে যে ভাবে টেনে নেয়, সেইরূপ টেনে হেঁছড়িয়ে লয়ে পালাল! শুধু পালাল। আমার কোল খালি করে, সর্ব্বনাশের সূচনা এঁটে—বেশী দামের কাপড়, ভাল ভাল জিনিসপত্র, এক বাক্‌স সোনা অলঙ্কার নিয়ে—খিড়কির দ্বার খুলে পালাল। পোড়া কপাল। অরে সর্ব্বনাশী। মায়া ফাঁদ পেতে আমার কোলের ধনকে পর করে দিল। শাশুড়ীর অনুগত হয়ে, আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াল। হায়! হায়! আমি বুন্‌লেম কি, হল কি? পেটের সন্তান দুদিনে চক্ষু উল্‌টিয়ে, কত কথা, কত মিথ্যা রটনা দেশময় রটিয়ে দিল। পেটের সন্তানের মুখে মায়ের কুচ্ছা, মায়ের কলঙ্ক, জাতি যাওয়ার কথা, কত অপকথা! আমি তার শত্রু, প্রাণ-বিনাশে কত যত্ন এই তার বিশ্বাস! উহু! কি ভয়ানক কথা! বাবা! জয়ঢাক, তুই যা ইচ্ছা তা বলিস্। যার নিকট যা বলে তোর ভাল হয়, আমার নিন্দে করে যদি তোর লাভ হয়—তুই তা করিস্, আমি বারণ করব না। তুই একবার আমার কোলে আয়! আমার অন্তর শীতল হউক। তুই পেটের সন্তান, আমার সর্ব্বস্ব ধন, চক্ষের মণি, একবার আমার বুকে আয় বাবা! তোর যাই ইচ্ছা তুই তাই কর বাবা, মা বলে একবার কোলে আয়। বাপরে! তুই আমার বুদ্ধি, বল, ভরসা, সহায়! তোরই সকল। তোর যা আছে তাও তোর; আমার যা আছে তাও তোরই। আমি কাকে দিব বাবা! তুই ছাড়া আমার আর কে আছে? তুই পরের কথা শুনে তোর অনিষ্ট তুই করিস্ না! আমার সম্পত্তি লিখে দিই নাই বলে আমাকে এত কষ্টে রেখেছ, কষ্ট দিতেছ, আমি মলে তোমারই সকল। আমার আর কে আছে? সকলি তোমার। সহজে লিখে না দিলে জবরানে লিখে নিবে, বাবা! তুই আপন ভাল যখন বুঝবি, সম্পত্তি রক্ষা করতে শিখবি, আপন ইচ্ছায় আমি তোকে লিখে দিব! এত কষ্ট কি আর সহ্য হয়? লোক নাই, জন নাই, এক গেলাস পানি দেয় এমন একটি লোক নাই! দুইদিন উপাসের পর নিজে উনন্ তয়ের করে, চারটে চাল জ্বাল দিয়ে খেয়েছি। করি কি? খোদায় যেই ভাবে রাখেন সেই ভাবেই থাকতে হয়। এখন কেউ এসে যদি গলা টিপে মেরে ফেলে রেখে যায়—দেখ্‌বার লোক একটিও নাই। সকলি আমার কপাল! সময়ের এমনি তাৎপর্য্য যে, দুঃখের কথা কেহ বিশ্বাস করে না। এই সকল কথা উল্লেখ করে হাকিমানের কাছে কত দরখাস্ত দিলাম, কাঁন্দাকাটি করলাম, কিছুতেই কিছু হল না। কেহই আমার কান্না কানে করলেন না। কেহই শুন্‌লেন না। শেষে নাচার হয়ে জিলার

বড় বড় হাকিমের নিকট দরখাস্ত দিয়েছি, ভেড়াকান্ত আমার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে। খোদা তার ভাল করুন। সে সুখে থাক্। এত লোকের নিকট দুঃখের কান্না কাঁদলাম—কেহই শুনল না। কেবল ভেড়াকান্ত আমার পক্ষে থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে, দেখি কি হয়—আল্লা ভরসা, সেই পাক পরওয়ার দেগার ভরসা ও আশা।"

সোনাবিবি এই রূপে আত্মীকথা দুঃখিত ভাবে নিজে নিজে বলিতেছেন। এমন সময় তাঁহার পক্ষের লোক বে-আক্কেল মুন্সী উপস্থিত হইয়া সেলাম বাজাইয়া পর্দ্দার আড়ালে খাড়া হইলেন এবং বলিলেন যে, "হুজুর! আমি বে-আক্কেল!"

"কি বাবা' খবর কি? কোন খবর কি এসেছে?"

"না, কোন খবর পাওয়া যায় নাই। আপনি চিন্তা করবেন না। নিশ্চয় জামিন হবে।"

"আমার যে কপাল, কিছুই বিশ্বাস হয় না।"

"না হুজুর! আইনে যা আছে, তা ছাড়া হবে কি করে?"

"ভাল বাবা! আজকাল কি আর আইন আদালত আছে? মফঃস্বলের হাকিমের হুকুমই আইন। তাঁদের ইচ্ছাই বিধি ব্যবস্থা। তাঁরা না পারেন, এমন কার্য্য কি আছে? বাবা, মান্-সম্ভ্রম জাতি গৌরব আজকাল সকলই তাঁহাদের হাতে। তারা এক কাজ করে ছেড়ে দিলে আর ধরে কে! কথা বলে কে? রাতকে দিন কল্লেই বা আটকায় কে?"

"হুজুর, খুব ধীরভাবে থাকতে হয়। আর, হুজুর, যেখানে যাই সেইখানেই দাগাদারী ভাইজানের নিন্দা—সঙ্গে সঙ্গে হুজুরেরও নিন্দা।"

"বাবা বে-আক্কেল! আমি কার কি করেছি? নিজেরই বা কি করেছি? হাঁ—পেটের ছেলেকে বশে রাখতে পারি নাই। তা বাবা! কলিকালে কয়টি ছেলে মা-বাপের অধীনে থাকে? যেই বিবাহ হয়, কান্ কথা শুনতে থাকে, আর মা-বাপ, ভাই-বেরাদর পর হতে থাকে। সময় মন্দ হলে পেটের ছেলে পর্য্যন্ত পর হয়ে যায়—তা পরে নিন্দা করবে তাতে আর কথা কি? বাবা! আমি এটা মনে ঠাই দিয়ে রেখেছি যে, পূর্ব্বে আমি কারও কোলের সন্তানকে মার কোলছাড়া করেছিলাম তাইতে আমার সন্তান আজ আমার কোলছাড়া হলো।"

"হুজুর! এ কথাটা অনেকেই বলে থাকে যে, আপনিই আপনার দেবর পুত্রকে ফুসলিয়ে, চক্রান্ত করে, তার মার কোল খালি করেছিলেন। আজ খোদার আপনার কোল অতি আশ্চর্য্য এবং অভাবনীয় ভাবে খালি করলেন। চড়টি পড়লেই চাপড়টি খেতে হয়, ছিটে পড়লেই গুত সহ্য করতে হয়, মুখ নেড়ে হেসে হেসে কত লোকে এই কথা বলে।"

"পরের মুখ আর কি দিয়ে বন্ধ করি। যার যে ইচ্ছা তা বলুক, কান আছে শুনতে থাকি।"

"হুজুর! আর এক কথা,—হেবানামা লিখে না দিলে, আপনাকে কিছুতেই এরা ছাড়বে না। আট্ ঘাট বন্ধ করেছে, চার আল দশ দিক বেন্ধে এরা বসে আছে। হাজার চেষ্টাতেও কিছু হবে না। হেবানামা লিখে দিতে হবে।"

"নিজের প্রাণ নিজে বাহির করব, তবুও হেবানামা কি কোন প্রকারের দলীল আমি লিখে দিব না।"

"দাগাদারী ভাইজানকে থাক্‌তে দিবে না। আপনি রাখতে পারবেন না।"

"ঐ রকম একটি কার্য্যের লোক দিলেই ত আমি তাকে দূর করে দিতে পারি। এখন গোলমালের লেশ থাকতে তাকে তাড়াতে পারি না। তার পরিশ্রম কার্য্য সকলি ত তোমাদের জানা আছে। সম্পর্কে সে পর নহে। ভাই। আমার দুধ-ভাই। তাকে তাড়িয়ে তার মত আর একটি বিশ্বাসী লোক পাই কোথা।"

এই কথার মধ্যে বেহারীদিগের চলতি বোলের শব্দ শুনা গেল। আর কেহ নহে, দাগাদারী ভাই মামলা এক প্রকার ফতে করিয়া আসিতেছেন। যাহা অনুমান, তাহাই নিশ্চিত। পাল্‌কী আসিল। দাগাদারী পাল্‌কী হইতে নামিয়া আসিতেই, মনিবিবির পক্ষের লাঠিয়ালেরা হো হো শব্দ করিয়া চলিয়া গেল। দাগাদারীকে যে পথের মধ্যে একেবারে জীবনের মত সরান কথা ছিল, তাহা আর পারিল না। দাগাদারী খুব সাবধানে সতর্কে সাহসের সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী আসিলেন।

অষ্টম নথি

গাজী মিয়াঁ বলিতেছেন, তাই ইংরেজ আমাদের রাজা। তাই ইংরেজ সাগর মহাসাগর পার, দূর দেশান্তরে থাকিয়া, ত্রিশ কোটি লোকের উপর আধিপত্য করিতেছেন, তাই ইংরেজ আমাদের ভক্তির ভাজন, তাই ইংরেজ আমাদের মাথার মণি, তাই ইংরেজ আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তাই ইংরেজ দেবতা, অসীম ক্ষমতা। তাই ইংরেজ রাজ্যে সূর্য্যের অস্ত নাই, তাই ইংরেজ রাজ্যে সূর্য্যদেবের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। ইংরেজ চক্ষে অবিচার অত্যাচার স্থান পায় না। বিচার-ক্ষেত্রে বিচার-বিভ্রাট মহাকণ্টক বিষ-লতার—অঙ্কুর দূরে থাকুক—নাম পর্য্যন্তও শুনা যায় না। সে ক্ষেত্রে রাজা, প্রজা, ধনী, দীন, সবল, দুর্ব্বল, সুশ্রী, কুশ্রী, বালক, বৃদ্ধ, নর, নারী সকলই সমান। উপরোধে অনুরোধে, পরের কথায়, হক নাহক, বিবেকের বিপর্য্যয়, বোধ হয় কখনই ঘটে না। কেহ ঘটাইতে পারে না। বিচারে অন্যায় রটে না ধর্ম্মাসনের অপমানও সম্ভবে না। তাই ইংরেজকে হৃদয়ের সহিত নমস্কার। মাথা নওয়াইয়া, দুহাতে হাজার হাজার বার নমস্কার। ইংরেজ রাজ নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করুন, জগৎ শাসন করুন, সমগ্র ধরার আধিপত্য লাভ করুন, কায়মনে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি।

কথায় বলে, সকল চাল বাইশ পসুরী নহে। সকল ফল রসাল নহে। সকল ফুল খুস্‌বুদার নহে, সকল দেবতা দয়ালু নহে। দেশীয় হাকিমগণ মধ্যে কেহ একগুঁয়ে, কেহ খামখেয়ালী, কেহ বদরোকা, কেহ কান পাতলা, কেহ দোচখো, কেহ বেজায় হট্‌কারী, কেহ সফরিবৎ ফরফরায়তে, কেহ নিরেট, কেহ যোলে অম্বলে, কেহ দোপিটে, কেহ হবুচন্দ্র, কেহ গবুচন্দ্র, কেহ আর কিছু, কেহ সাক্ষাৎ যম, কেহ ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরাত্মা, কেহ একেবারে মাটির মানুষ, কেহ যথার্থ বিচারপতি, কেহ বিচারাসনের মণিময় অলঙ্কার, কেহ ধর্ম্মাসনে প্রকৃত ধর্ম্মের অবতার।

সোনাবিবি কয়েদ,—কষ্টের এক শেষ। জবরানে দলীল লিখিয়া লওয়ার চেষ্টা—কৃতকার্য্য না হইলে একবারে জীবন শেষ করার পরামর্শও আছে। চাকর-চাকরানী অন্যের কুপরামর্শে বিদ্রোহী। আত্মীয়স্বজন স্বার্থে অন্ধ। কেহ পূর্ব্ব শক্রতা সাধনে খড়্গহস্ত, সুযোগ-সুবিধা পাইলে বিষের প্যালা মুখে ধরিতেও প্রস্তুত। পুত্র পুত্রবধূ ঘোর বিপক্ষ, ভয়ানক শক্র। তাদের কৌশলেই কয়েদ। প্রতিবাসীর চক্রেই আপন গৃহে বন্দী। সবলোট্ সাহেবের অনুগ্রহেই এই দশা। এ সকল কথা দেশ মস্হুর। কোণের কনে বউ, রাস্তার বালক, আঙ্গিনার অঙ্গনা, বাহিরের বৃদ্ধ যুবা, কাহারও শুনিতে বাকি নাই। পুত্রের হাতে মায়ের কয়েদ, অন্নজল পর্য্যন্ত বন্ধ, মিনিটে মিনিটে প্রাণের আশঙ্কা! যে শুনিতেছে, সেই দুঃখ করিতেছে। কিন্তু অরাজকপুরের হাকিম বাহাদুর জানিয়া শুনিয়া আপনে গুমরে বিভোর।

"উহু, ও কথাই নহে, হতেই পারে না, কখনই হতে পারে না, বিশ্বাস হয় না, কিছুতেই মনে ধরে না, কানে লাগে না, মাকে ছেলে কয়েদ কবতে পারে না। আপন বাড়ী আপন ঘর, একথা কখনই সম্ভবে না। মিথ্যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দরখাস্ত অগ্রাহ্য।"

সোনাবিবির পক্ষের উকীল মক্তার গলবস্ত্রে যোড়করে "হুজুর! হুজুর!" হুজুর শুনিবা মাত্র অমনি নামঞ্জুর। প্রতিদিন দরখস্ত পড়িতেছে—হুজুর বাহাদুরের বিচারে প্রতিদিনই অগ্রাহ্য হইতেছে। হায়রে স্বার্থ? হায়রে অর্থ! এমন রাক্ষসের হস্তে রাজদণ্ড। ক্রমেই এক পক্ষের অত্যাচার বৃদ্ধি। দালান ফাটাইয়া গগনভেদী উচ্চরব করিয়া কাঁদিলে কে শুনে? প্রাণ যায়, কখন কি হয়। এই ভাবে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিতেছে। দেশীয় হাকিম শুনিলেন না। এত কাকুতী মিনতিতেও তাঁহার মনে দয়ার সঞ্চার হইল না। ধন্য ইংরেজ! সেই ইংরেজ বিচারপতির কর্ণগোচর হইয়াছে। যেই ভেড়াকান্তের কৌশলে এই অত্যাচার-কাহিনী তারযোগে জিলার বিচারক সাহেবের গোচর হইয়াছে, তখনি আদেশ, তখনি হুকুম, তখনই কয়েদ খালাসের আজ্ঞা, তখনই রাজকীয় আদেশ, লিখিত পরওয়ানা, খালাসের হুকুম। সোনাবিবি যেখানে যাইতে ইচ্ছা করেন, বিশেষ হেফাজতের সঙ্গে পাঠাইতে আদেশ আসিয়াছে। তেছমার খাঁ ইন্সপেক্টর সাহেবের উপর তাগীদ হুকুম জারি হইয়াছে। ইন্স্পেক্টর সাহেব উভয় দলের কার্য্যকারগণকে পৃথক পৃথক রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অতি সংগোপনে হুকুমের কথা শুনাইয়া দিলেন। দুই দলের লোকই জানিল যে, ইন্স্পেক্টর সাহেব আমাদের পক্ষে, আমাদেরই হাতে। রাত্র প্রভাত হইতে হইতে পুলিশ দলবলসহ ঘটনাস্থানে যাইয়া কয়েদ খালাস করিলেন। তখনই কথা চারদিক ছড়াইয়া পড়িল, ক্ষণকাল মধ্যে দশ মুখে রটিয়া গেল। হাকিম, আমলা, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার—অরাজকপুরের স্থানে অস্থানে, রাস্তায়, ঘাটে, পথে, দোকানে, বাজারে সকলেই শুনিল, জানিল যে, জিলার সাহেব শুনিবামাত্র সোনাবিবিকে কয়েদ হইতে খালাসের হুকুম দিয়াছেন। ধন্য ইংরেজ, ধন্য তোমার সুবিচার। সকলের মুখেই ঐ কথা—ধন্য ইংরেজ, ধন্য তোমার সুবিচার—একটি ভদ্রমহিলার প্রাণ বাঁচিল। এদিকে পুত্রপক্ষ এবং মাতাপক্ষের শৃগাল, কুকুর, শকুনী, রাক্ষস, অসুর, আমলা কায়াধারী তদবিরকারক হিতৈষী বাবু লোকেরা, একপক্ষ বাধা, অপর পক্ষ খালাস বিষয়ে

ছলা পরামর্শ, কি আকারে, কি প্রকারে, কিরূপে, কিভাবে ঘটিবে—হইবে. তাহারই মীমাংসা ও স্থিরসিদ্ধান্ত জন্য, আপন আপন উকীল মোক্তারের বাসা, মন্ত্রদাতার বাসা, এবাসা ওবাসা যাওয়া আসা আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যদেব প্রায় অদৃশ্য হইতেছেন। সময় নাই। হাকিম সাহেব, এজলাশ বরখাস্ত করিয়া বাসায় গিয়াছেন। কি করি, সাত-পাঁচ ভাবিয়া মনিবিবির মোক্তার তুড়ুক পাছাড় রায় হাকিম বাহাদুরের বাসগৃহেই চলিলেন। সকল অবস্থা বলিলেন। কোর্ট ফি আঁটিয়া একখানা দরখাস্ত দাখিল হইল। তখনই হুকুম লিখা হইল। হাকিম সাহেব চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া চুরুট মুখে কথা চিবাইয়া চিবাইয়া, তুড়ুক পাছাড় রায় মহাশয়কে বলিলেনঃ

"মহাশয়! এই ভেড়াকান্তটাকে ফান্দে ফেলতে পাল্লেন না? আমি জানি ঐ বেটাই এই বিবাদ বাধাবার গোড়া। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি, ঐ বেটাই সোনাবিবিকে পরামর্শ দিয়ে বাটীর বার করছে। তারই কৌশলে জিলার হাকিমানের কানে এই কয়েদের খবর গিয়াছে। আপনি জানবেন, ভেড়াকান্তের কৌশলেই খালাসের হুকুম এসেছে। ভয়ানক ধূর্ত্ত। এখানকার যত খবর কলিকাতায় লিখে। ওকে জব্দ না কল্লে আপনাদের ভালাই নাই। আমি শীঘ্র ওর মাথা খাচ্ছি। এখন আপনারা কোন প্রকারে একটা যেমন তেমন ফরিয়াদী খাড়া করে দিলেই আমি একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করে দিব। আমার কোন অনিষ্ট করে নাই। তবে আমার অনেক কাজে বাধা দিয়েছে। তা যাক, তাতে আমার মনে কিছুই নাই। নাবালকের ঘর একেবারে মাটি করতে বসেছে। দেখুন! আর কোন সময় আসবেন, ওর সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে—বলবো।"

রায় মোক্তার যোড়হাতে বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! হুজুরের হুকুম আমাদের শিরোধার্য্য। শীঘ্রই হুজুরের হাতে দিচ্ছি। আমরা সে চেষ্টায় প্রাণপনে লেগে আছি। আর কত দিন! সময় ঘনিয়ে এসেছে। হুজুর! হুকুমনামাখানা?"

"সে কথা কি আর বলতে? প্রভাত হতে হতে খাস আরদালী প্যাদার দ্বারা রওয়ানা হবে।"

মোক্তার বাবু সেলাম বাজাইয়া বিদায় হইলেন। বাসায় আসিয়া, পত্র লোক যেখানে যাহা পাঠান আবশ্যক সেখানেই পাঠাইলেন।

সোনাবিবির পক্ষের লোকেরা ভেড়াকান্ত মহাশয়ের মন্ত্রণায় কুলী মজুর, পাল্কী বেহারার জোগাড় করিতে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। অতি অল্প সময় মধ্যে সমুদায় জোগাড় করিয়া রাত্র ১২টার পূর্ব্বে সোনাবিবির নিকট সংবাদ পাঠান হইল। সংবাদ পাইয়া সোনাবিবি দাগাদারী ভাই মহাখুসী। ভেড়াকান্ত মহাশয়ের বহুত তারিফ। ভারি চালাক্। খুব তুখড়। খুব চতুর। পঞ্চমুখে সুখ্যাতি। তাহার পর বাক্স, পেটারা, তোরঙ্গ, আলমারী খোলা জিনিস পত্র গাঁঠুরি, বোঁচকা বাঁধা, এক বাক্সের জিনিস অন্য বাক্সে রাখা ; যাহা মাথায় যাইতে পারে, বাঁকে লইতে পারে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার ধূম পড়িয়া গেল। সোনারূপার আসবাব, দামি জিনিস, দলীল দস্তাবেজ, তামা, কাঁসা, পিতল,—ঘোড়া বোঝাই করিয়া গোপনে গোপনে নিশিযোগে চিরাপুঞ্জিতে পার করিয়া, যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাই ছোট

ছোট বাক্সে, পেটারায়, পোর্টমানে, গাঁঠুরিতে, যাহা মাথায় চলে, সেইরূপে বাঁধিয়া বন্ধ করিয়া চাবি দিলেন। কত দড়ী দিয়া, ছালা জড়াইয়া, খুব কসিয়া বাঁধিলেন। কোন বাক্সে জমা-খরচ, কোন বাক্সে সাল তামামী, কোন বাক্সে অন্য কাগজ, প্রজার দত্ত কবুলিয়ত, কোন পেটারায় গ্রাম গ্রাম জরিপী চিঠা, কোন গাঁঠুরিতে শাল বনাত। আমার বোঁচকার মধ্যে মূল্যবান জিনিস, উপরে ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া লেপ। এই প্রকার বাঁদন ছাঁদন জড়ান আরম্ভ হইল। ছেঁড়া নেক্‌ড়ায় জরির পোষাক ঢাকা পড়িল। কত বাক্স লোহার পেরেগে একেবারে বন্ধ করা হইল। কত ছালাজাত হইল। বাড়ীতে যাহা থাকিল, তাহার কোনটার মধ্যে ছেঁড়া নেকড়া, কোন বাক্সের মধ্যে পচাখড়, কোন সিন্দুকে সুরখির গুঁড়া। কোন পেটারায় রাবিস ছাই, কোন আলমারীতে ইন্দুরের মাটি, ধানের তুষ, বড় বড় ইঁট, মাটির ডেলা, খোলা খাপরা পূর্ণ করিয়া তালাচাবিতে বন্ধ করা হইল। এই প্রকার বাঁধা ছাঁদা করিতে করিতে আকাশে শুক্‌তারা দেখা দিল। এদিকে ভেড়াকান্ত প্রেরিত পাল্কী বেহারা মুটে মজুর অরাজকপুর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল—তৎপরেই প্রভাত। ঊষার আগমন। ঊষা দেবী ঘোমটা খুলিয়া সোনাবিবির ভবিষ্যৎ অদৃষ্টফলকের অপূর্ব্ব চিত্র দেখিতে দেখিতে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎপর দিনমণির প্রকাশ। সঙ্গে সঙ্গে তেস্‌মার খাঁ ইন্‌স্পেক্টর একজন জমাদার, পাঁচজন কনেষ্টবল সহ নির্দ্দিষ্ট জমাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। হুলুস্থুল ব্যাপার।

সোনাবিবি আজ কয়েদ হইতে খালাস হইবেন, যথেচ্ছা চলিয়া যাইবেন। দালান-কোঠা জিনিসপত্র এমন কি, রাজার রাজভাণ্ডার ফেলিয়া, পুত্রের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া, স্বামীর মৃত্যুকালীন আদেশ-উপদেশ বিধি-ব্যবস্থা অবহেলে, আত্মীয়-স্বজনের মুখে চুন্‌কালি মাখাইয়া, দেশময় কলঙ্ক রটাইয়া, ঘৃণা, ক্রোধ, অভিমান, রোষ, সন্তোষ, পরিতোষ এবং অহঙ্কারের মিছে কুহকে মজাইয়া মিছা মায়াজালে জড়িত হইয়া, বোধ হয় জীবনের মত জমদ্বার পরিত্যাগ করিবেন। আর আসিবেন না। জয়ঢাক বাবাজি কিছুতেই চলন্ত ঢাক বাজাইতে দিবেন না। মনিবিবি সাহায্যকারিণী, কিছুতেই যাইতে দিবেন না। খুন-জখম সকলি স্বীকার, বন্দুকের গুলি বুক পাতিয়া লইবে। তরবারের আঘাত, লাঠির বাড়ি মাথায় ধরিবে, সড়কির খোঁচা অকাতরে সহিবে, তত্রাচ স্বর্গাদপি গরিয়সী জননীকে, যাহাকে লইয়া এত কথা, যাহার জন্য এত কেলেঙ্কারী, তাহার সঙ্গে পুলিসের পাহারায় হাসিতে খেলিতে, কিছুতেই বাড়ীর বাহিরে হইতে দিবে না। দিনে দুপুরে দুহাজার চক্ষুর গোচরে দাগাদারীর হাত ধরিয়া, পাল্কীতে উঠিয়া চলিয়া যাইতে কোন মতে দেখিতে পারিবে না। কেমন করিয়াই বা দেখিতে পারে? রক্ত-মাংসের শরীরে কেমন করিয়াই বা এ গমন সহ্য হয়? পুলিসকে বশে আনিতে কতক্ষণ? শূন্য—শূন্য—শূন্য! ধরিতে গেলে জগতে প্রায় সকলি শূন্য। শূন্যে শূন্যেই উড়িয়া যাইবে। কোথাকার হুকুম কোথায় পড়িয়া থাকিবে। নিতান্ত নাছোড় হন, কয়েদ খালাস হইবে, বাড়ীর বাহিরও হইবেন, কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরে। যে বন্দী সেই বন্দী। যাইতে পারিবেন না; একত্র যাইতে পারিবেন না। একত্র থাকিতে পারিবেন না। স্বেচ্ছাধীন চাল্ চলিতে পারিবেন না। যে কয়েদ সেই কয়েদ। পুনরায় কয়েদ। তবে

স্থান ভিন্ন, ঘর ভিন্ন। এই মাত্র প্রভেদ। মানুষ থাকে ত ইহা না হইয়া যায় না। বুদ্ধি থাকে ত না আটকাইয়া ছাড়িবে না।

কেহ বলিতেছে, "অত হাঙ্গামার কাজ কি? বেহারাগুলিকে মেরে ভূত ভাগানের মত ভাগিয়ে দিলেইত সকল দিক ফরসা হয়।"

উত্তর, "অহে ভায়া! তাইবা কোন্ না হবে? এখনই দেখবে, কোন দিকের বাতাস কোন দিকে বয়! মারধর ধরপাকড়, কিছু না কিছু হবেই হবে। নির্ব্বিঘ্নে বাড়ীর বাহির কখনই নয়, কখনই নয়। একটা গোলযোগ নিশ্চয় নিশ্চয়।"

সাধারণ লোকের মুখে এই সকল রসভাবের নানা আভাস। পুলিসের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি। ক্রমেই জনতার ভিড়। বহু সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ঘটনার রহস্য দেখিতে, সোনাবিবির বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গণে, কাছারি ঘরের আঙ্গিনায় ক্রমে আসিয়া খাড়া হইল।

আজ সোনাবিবির কক্ষ মধ্যে কখনও হাসির লহরী খেলিতেছে, খুসী, খোস-মেজাজের প্রবাহ ছুটিতেছে.... কখনও ক্রন্দনের সুরও শুনা যাইতেছে। বন্দীগৃহে কখনও হাসি কখনও ক্রন্দন—কারণ কি? এ হাসি হাসে কে? এ কাঁদা কাঁদে কে? এ সময় এমন গঙ্গা-যমুনার ভাব আনে কে? এমন কঠিন সময় সন্ধ্যা-প্রভাতের দৃশ্য দেখায় কে? যে মুখে হাসি সেই মুখেই ক্রন্দন। একা এক মুখে হাসি খেলে না, ক্রন্দনের বেগও স্বভাবসিদ্ধ বেগ হইতে একা একা বেশী হয় না। উত্তেজনার লোক চাই। পঞ্চমে চড়াইবার উপকরণ চাই।

সোনাবিবি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। প্রতিবাসী রমণীগণ মধ্যে কাহারও আগমনে মনের কথা রস রহস্যে ভাঙ্গচুর, কাহারও আগমনে আক্ষেপ, কাহারও আগমনে মাঝামাঝি ভাব। যাহার সহিত যেমন ভাব, সেই ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণই হাসি কান্না, মধ্য ভাব। পাঁচির মা আসিল, রঙ্গের উপর রঙ্গ মিশাইয়া রসের উপর রস ঢালিয়া কথা আরম্ভ হইল।

"শিকল কাটিয়াছে, ডানা বাহির হয়েছে। এই উড়ি, বেশী বিলম্ব নাই। বোধ হয় আর এক ঘণ্টা আড়াই। যমদ্বার মুখে সাতশত উনিশ, তার উপর শতকরা এক "ফাও" ঝাঁটা খাঙ্গরা জোড়ে বিজোড়ে গণে মেরে, কারও কারও মুখে জলে গোবরে ছড়া ঢেলে, স্বাধীন ভাবে উড়ে বেড়াব। মনের সুখে দিন কাটাব। ঢাক ঢাক গুড় গুড় দরজা দেও ; বাবাজি এলেন পর্দ্দা ফেল; নায়েবজি এলেন, আড়ালে যাও; দেওয়ানজী গেলেন, সরে বসো ; কলেজারজী পরাণেরজী একটু গড়াবেন, উঠে যাও; মুনসীজী পত্র শুনাবেন, সরে এসো; এ সকল দায় হতে সরে পড়বো। বলতো পাঁচির মা, এ খুসী রাখি কোথা? তবে ডাক্ হাসি, আয় হাসি। থাক হাসি। হক্ হাসি। সুতরাং হাসি খুশী খেলা ও মেলা। আর দোদেল বান্দা, দোমুখো শাইখানী, দোধারের শাখের করাত, দো ঘরের মাসী, কনের পিসী, পাড়া ঢলানী মুখে সরল মুখে গরল মামানী জান, এবং বুবুজানেরা আসলেই, পুরন কথা পুরাতন আলাপ, পুরন ভালবাসা, উথলি উঠে ; তাতেই আত্মমর্যাদা, তাতেই বুকচেরা ক্রন্দন, তাতেই আকাশ-ফাটা নাক্‌সাট, তাতেই বহু দিনের বাঁধা মায়া-বারি নাকে মুখে চোখে জল হয়ে বাহির। সঙ্গে সঙ্গে হা-হুতাশ"।

এদিকে তেসমার খাঁ ইন্‌স্পেক্টার সহিত দাগাদারী ভাই সাহেবের কথোপকথন হইয়া গিয়াছে। সেখানেও শূন্য এখানেও শূন্য। শূন্যে শূন্যে .... পৌঁছাইয়া দিবেন। বিপক্ষ দলেরও অভিনয় আছে। সে ক্ষেত্রেও শূন্য। শূন্য শূন্য শূন্য লইয়া যাইবেন। সংসারে অভিনয়ই সার। এখানেও অভিনয়, সেখানেও অভিনয়। ক্রমে ডাক বাড়িতেছে—"নওশ রোপায়া, নওশ রোপায়া এক। —নওশ রোপায়া দো" ডাক চড়িতেছে। কথাও চলিতেছে।

যান্ নিয়ে যান্—যেখানে ইচ্ছা চলে যান। জলে, স্থলে, জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে সাগরে, দ্বীপে, যেখানে মন চলে, চলে যান, কোন আপত্তি নাই। কিন্তু একটু বিলম্বে। বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি! এ কথার অর্থ কি? ভাবই বা কি? এ বিলম্বের কারণই বা কি? লাভ কি?"

উত্তর "দেখিতে পাইবেন। এখনই স্বচক্ষে দেখিবেন। কয়েদী খালাস করুন। সঙ্গে লইয়া যাউন—আমাদের কোন আপত্তি নাই ; কিন্তু কাতরে করজোড়ে সবিনয় প্রার্থনা—একটু বিলম্বে।"

"কেন? এ বিলম্ব কিসের জন্য?" চতুর ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তবে কি আপনাদের মনে অন্য কিছু আছে? যা আছে, তার যোগাড় হয় নাই, লোকজন জোটে নাই। তাহাতেই কি বিলম্ব প্রার্থনা?"

উত্তর, "না, না, তা নয়, আপনি যা ভাবিয়াছেন, তা নয়। সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকিবেন। কোনরূপ বে-আইনি, কোন প্রকারে অন্যায় কার্য্য করিয়া, গোলযোগ করা হইবে না। খাঁটি খবর! নিশ্চয় কথা।"

একটু বিলম্ব করিলে এক পক্ষ সন্তুষ্ট হয়, অথচ কোনরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামের আশঙ্কা না থাকে, বেশীর ভাগ খাতির রক্ষা হয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে মুঠা ভরা, হাত পোরা, চিড়ে মুড়কি, মণ্ডা মতিচুরের ব্যবস্থা থাকে, তবে পুলিশের পাল্লায় আসে কে? তার কাছে ঘেঁসে কে? হটাৎ মন্দ বলে কে? পুলিশের এই "বিলম্ব" কথাটা বড়ই মূল্যবান। এর চেয়ে সুপ্রশস্ত পথ আর নাই। বিলম্ব হইলে—পুলিসের দোষ কি? মালামাল গোছাইতে বাক্স পেটারা মুটিয়া মজুরদিগের জিম্বা করিতে বিলম্ব হইল। হাজার হউক স্ত্রীলোক, কারণে অকারণে চক্ষের জল ফেলিতে, বিদায়ী সূচক দুটো দুঃখ মাখা কথা বলিতে বিলম্ব হইল।

সময়ে কথা গোপন রহিল না। জয়ঢাক পক্ষ হইতে ইনস্‌পেক্টর সাহেবের নিকটে আপত্তি উপস্থিত হইল। সোনাবিবি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইতে পারেন, কিন্তু নাবালকের কোন সম্পত্তি অর্থাৎ অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া যাইতে পারিবেন না। বাটীর বাহির করিতে পারিবেন না।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কথাত ঠিক। শুনতেও ভাল। কিন্তু আটকাবার পথ কৈ? তারা আমার কথা শুনবে কেন? আপন দখলে আছে—বল করে নিয়ে গেলে, জয়ঢাক বাবুর জিনিস বলে ত আমি আটক করতে পারবো না।"

উত্তর, "সেই জন্যই আপনার এত তোষামোদ। হুজুর! সেইজন্যই ত এত কথা। যাতে আপনার ক্ষমতা জন্মে, যাতে আপনি আট্‌কাতে পারেন, তার উপায় হলে ত আপনি পারবেন?"

"হাঁ, তাতে কি আর কেউ কাছে আসতে পারে। আট্‌কাবার কোন পাকা উপায় কর্ত্তে পারেন, যাতে আমারও কোনরূপ বদ্‌নাম না হয়, তাহলে আর যায় কোথা?"

কথা বাতাসের আগে আগে ধায়। এক কানে উঠিতে দশ কানে যায়। এক মুখে নাড়াচাড়া হইতে হইতে দেখিতে দেখিতে বিশ মুখে হইয়া পড়ে। সোনাবিবি শুনিলেন, দাগাদারী শুনিলেন। শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। দাগাদারী ভাই ক্রোধে চক্ষু দুটি লাল করিয়া কর্কশ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "কার সাধ্য সোনাবিবির বাক্স পেটারা আট্‌কায়? কার সাধ্য দাগাদারীর জিনিসের গায়ে হাত দেয়? কোন্ পিতার কত বড় পুত্র, কার এত বড় বুকের পাটা যে, আমাদের জিনিসপত্রে মোজাহেম দেয়? কার এত বড় মাথা। এই সকল বাঁদা প্যাঁক করা মাল এইখানে রাখে?"

সোনাবিবি পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ "কোন্ পাজী, কোন্ বেইমান, কোন্ হারামির বাচ্ছা বলে এ সকল মাল আমার নয়? আসুক, সে হারামজাদা আসুক, আমার সম্মুখে এসে বলুক, যে এ সকল মাল আমার নয়। আমি এখনি বাহির হব, আমি এখনি উঠ্‌বো। আমার বাক্স পেটারায় কে হাত দেয় দেখি? আমি এখনই বাহির হব। কৈ দাগা। দাগাদারী কৈ? আমার কিসের লজ্জা! কিসের মান! কিসের ইজ্জত, কিসের পর্দ্দা! নিয়ে আয় পাল্‌কী। মুটিয়ার মাথায় আগে বাক্স পেটারা সকল চাপিয়ে দিয়ে রওয়ানা কর—তারপর আমি উঠ্‌বো। এ ঘরে আর থাক্‌বো না।"

এই সকল কথা রাগে, ক্রোধে, মহাক্রোধে বলিতে বলিতে পর্দ্দার বাহির হইয়া পাল্কীতে উঠিলেন। দাগাদারী ভাই, রক্ত আঁখি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তর্জ্জন গর্জ্জনে দালান কাঁপাইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

"কৈ মুটিয়ারা কোথায়? উঠাও বাক্স। উঠাও পেটারা। উঠাও ঐ গাঠুরী। দেখি! দেখি কে বাধা দিতে আসবি আয়? যে আমার জিনিসের গায়ে হাত দিবি, কি কাছে আস্‌বি—তার মাথা ভাঙ্গবো।"

মুটিয়াগণ একে একে, আপন মোট নির্দ্দিষ্ট করিয়া মাথায় তুলিতে উদ্যত হইলে, সবলোট সাহেবের গুপ্ত উত্তেজনায় ও পরামর্শে, মনিবিবির পক্ষের লোকেরা, কেহ বাঘের মত গর্জ্জিয়ে, কেহ সিংহের মত লাফাইয়া, কেহ খেঁকির মত সাদা দাঁত বাহির করিয়া, ইনস্পেক্টর সম্মুখে, মার মার শব্দে আসিয়া পড়িল। মুটিয়াদিগের কাহার ঘাড়ে গর্দ্দানে, কাহাকে কীল, কাহাকে লাথি, কাহার মুখে চড়, কাহাকে ঘুষী, কাহাকে ধাক্কা দিয়া চিত্‌পাত্, কাহাকে বিষম পাক, পাকের উপর পাক, হাত ধরিয়া পাকে বিপাকে ঘুরাইয়া—বাক্স, পেটারা, বোঁচকা, গাটুরি কাড়িয়া লইল।

দাগাদারী ভাইও মহাতেজে একেবারে পঞ্চমে উঠিয়া আসরে নামিলেন। ঐ সকল জিনিসপত্র পুনরায় মুটিয়াদিগের মাথায় চাপাইয়া দিতে অগ্রসর হইলেন, মুখে বলিলেন, "কি? এত বড় বুকের পাটা? এত বড় ক্ষমতা? ধর, বেটাদের মার! নে কেড়ে!" সোনাবিবির পক্ষের লোকও ঝুঁকিল। কিন্তু জয়ঢাকের গভীর গর্জ্জনে, তুমুল আরবে, মহা মিষ্ট সুমধুর সম্বোধনে, অতি উচ্চভাবে, সম্মান রক্ষার ভাব অবলোকনে, মনে মনে একেবারে দমিয়া গেলেন। তখনি খেয়াল হইল—যে জয়ঢাক মুখ তুলে কথা কহিতে সাহস পায় নাই, চক্ষু তুলে উঁচু নজরে তাকাইতে ক্ষমতা হয় নাই, সাত ঘা চাবুক কসিলে যে কথাটি বলে নাই, ঘটনাক্রমে চক্ষে চক্ষে নজর পলে, কোথায় যে নুকাবে, কোন্ কোণে পালাবে, তার পথ খুঁজিয়া পায় নাই, সেই জয়ঢাক, সেই দুধের ছেলে জয়ঢাক, আজ আমার সম্মুখে সমান ভাবে খাড়া। সমান বলি কেন? অভদ্রোচিত, বদ্‌জবান, লাজবান, যা কখনও শুনি নাই, সেই সকল বোল মুখে করিয়া, গরম নজরে খাড়া, চক্ষুতেড়া—ক্রোধে কম্পিত, চক্ষু লাল, চেহারা গরম দন্তে দন্তে পেষণ। দশ কথা জিজ্ঞাসিলে যে একটি কথা মুখে আনিতে পারে নাই, তারই মুখে আজ লম্বা-চওড়া কথা। ভয়ানক বিপরীত ভাব। প্রাণ যাইবার লক্ষণ। এই সকল ভাবিয়া মনে মনে দমিলেন,—কিন্তু কমিলেন না। ক্রমেই কথার বৃদ্ধি। উত্তরে অপমানের মাত্রা বেশী। এমন সময় অশ্বারোহণে, হাকিম সাহেবের—অরাজকপুরের হাকিম সাহেবের খাস আরদালী প্যাদা একখানি লেফাফা হস্তে হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই কাড়া কাড়ি, গালাগালি, বাক্-যুদ্ধ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনই হুকুম জারি হইল। পুলিসের উপরেও একখণ্ড জারি হইল।

যে কারণে বিলম্ব, যে বিলম্বের জন্য পুলিসের পদতলে, বোতল বোতল তেল, জল জলপান, পান, তামাক, অতি উচ্চভাবে অভ্যর্থনা, তাহা সম্পন্ন হইল। আশা পুরিল, সোনাবিবির সর্ব্বনাশ হইল।

হাকিম বাহাদুরের আদেশ, সোনাবিবির প্রতি আদেশ যে, নাবালক জয়ঢাকের কোন মাল, কোন অস্থাবর সম্পত্তি, তিনি সঙ্গে না লয়েন, বাড়ী ছাড়া না করেন। পুলিস প্রতিও হুকুম—তবে একটু ভিন্ন ভেদ্—নাবালকের কোন অস্থাবর যদি কেহ তাহার বাড়ী হইতে স্থানান্তরিত করে কি করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহাকে ৩৮০ ধারায় রীতিমত হাতে হাতকড়া দিয়ে চালান দেয়।

আর পায় কে? আর কথা বলে কে? সোনাবিবির মস্তকে পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। দাগাদারী ভাই এবং তেনাচেরা খাঁ, বে-আক্কেল প্রকৃতির মুখে কথাটি নাই। ম্লান মুখে নীরব। কি করিবেন, কি ভাবিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সোনাবিবি পাল্কীতে উঠিয়াছেন। দাগাদারী ভাই পাল্কীর পার্শ্বে নিজ পাল্কীর ছাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হাকিম বাহাদুরের হুকুম—ইন্‌স্পেক্টার সাহেব উচ্চরবে সোনাবিবিকে শুনাইয়া দিলেন—এক ব্যাপার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যাপার আসিয়া এক পক্ষের রাগ, হিংসা, দ্বেষ, দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল। পরিণাম ফল যাহা হইয়া থাকে, তাহাই ঘটিল। পুলিসের চক্ষের উপর অত্যাচার স্বেচ্ছাচার আরম্ভ হইল।

সোনাবিবি, দাগাদারী পুলিসের সম্মুখে, কত মিনতি, কত কান্নাকাটি করিয়া বলিলেন, "এ সকল অস্থাবর সম্পত্তির একটিও জয়ঢাকের নহে। সকলি আমার আর দাগাদারীর।"

পুলিসের ঐ বান্দা কথা। "হাকিমের হুকুম—আমি কি করিব। হাকিম বাহাদুর যখন অস্থাবর মাল লইয়া যাইতে নিষেধ আজ্ঞা জারি করিয়াছেন, তখন আমি কি করিব? যার মাল সে লইবে, কোন বাধা নাই। আপনার মাল হয়, আপনি নিন্। জয়ঢাকের মাল হয়, জয়ঢাক নিন। আমি শান্তি ভঙ্গ হইতে দিব না। আপনার মাল আপনি রাখিতে পারেন রাখুন, লইতে পারেন লইয়া চলুন—কিন্তু হাতাহাতি, কাড়াকাড়ি, মারামারি এ সকল দাঙ্গাহাঙ্গামা কখনই হইতে দিব না।"

অন্যদিক হইতে শুষ্ক কণ্ঠে উচ্চরবে, এক প্রকার বাড়ি দেওয়া আকারে চিৎকার হইল। "দোহাই মহারাণীর! দোহাই পুলিসের! মেরে ফেল্লে—কেড়ে নিল, আমার বাক্স পেটারা মনিবিবির সর্দ্দারেরা কাড়িয়া লইল।" অন্য স্বরে—"আমার গায়ের রেপারখানা টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া গেল। এ বাক্স তোমাদের নয়। ওগো ও পোটমান আমার, ওটা নিও না। ও পেটারা বে-আক্কেলের। ও চাচা! ও তেনাচের চাচা! তোমার শালখানা চিরে ফেড়ে কেড়ে নিল! ওরে ও গাঁঠরী দাগাদারী ভাইজানের।"

উচ্চৈঃস্বরে ঘোর কাতরে বলিতে লাগিল, "ইন্স্পেক্টার সাহেব! আমরা মলেম। জমাদারবাবু! দেখুন। আমাদের সকলই কেড়ে নিল। তোষক, বালিস, গায়ের চাদর, মাথার টুপী, পায়ের জুতা পর্য্যন্ত গেল। আপনারা উপস্থিত থাকিতে দিনে দুপোরে এই অত্যাচার।"

লোক দেখাইয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া "কৈ কি হলো! কৈ কৈ কোথা গেল? কে কে? ধর্ ধর্" এই সকল বাঁদুটি বোল মুখে আউড়াতে আউড়াতে, রুল হাতে পেটী কোমরে কসিতে কসিতে, ঘটনা স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল।

"দোহাই মহারাণী! দোহাই ভারতেশ্বরী! তোমরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিও না। কাড়াকাড়ি, মারধর করিও না।"

কার কথা কে শুনে। পূর্ব্বেই গড়াপেটা হইয়া আছে। হাজার বার মহারাণী, মহারাণী, বলিলে তারা শুনিবে কেন? মনিবিবির পক্ষের সর্দ্দার লাঠিয়াল, খান্সামা, খেদমতগার, যার হাতে যে পড়িল, সোনাবিবির পক্ষের লোকজনের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দিল। সোনাবিবির পক্ষের লোকজন কিছু বলিলেই পুলিস আসিয়া মহাজেম হয়, বাধা দেয়, —কিন্তু মণিবিবির পক্ষের লোকেরা পুলিসের সম্মুখে দিনে দুপোরে ডাকাতি করিল। পুলিস নিবারণ করা দূরে থাকুক, বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, চক্ষেই যেন দৃষ্টি হইল না, কথাও সরিল না। ধন্য বিচার! ধন্য শান্তিরক্ষা! ধন্যরে পুলিস! ধন্য হাকিমের হুকুম।

এই পর্য্যন্তই কি ইতি হইল, তাহা নহে। অত্যাচারের কাহিনী যে এখানেই শেষ হইল, তাহা নহে। লোকে শিখাইয়া দিয়াছে, উৎসাহ দিয়া দিয়াছে, জয়ঢাকের কানে মন্ত্র ফুঁকিয়াছে যে, তোমার মাতা পাল্কীর মধ্যে অনেক মূল্যবান পাথর, মতি, জওহেরাত, জরির কাপড়, সাল, রূপার আসবাব গোপনে তুলিয়াছেন। হাঁ—চক্ষু ঠাঁরিয়া হাঁ—দেখ। ইত্যাদি ইঙ্গিতেই

জয়ঢাক, জগঝম্প বা ইংরাজী ঢাকের দ্বিগুণ ফুলিয়া, মায়ের পাল্কীর নিকটে নামিয়া যাহা করিল, যেরূপ আচরণ আরম্ভ করিল, তাহা মায়ের সন্তান কখনই চক্ষু পাতিয়া দেখিতে পারে না। হায় রে সমাজ! হায় রে বঙ্গের মুসলমান সমাজ! ধিক্ স্বার্থে। ধিক্ অর্থে! শতধিক মন্ত্রদাতা মন্ত্রিগণে! সহস্র ধিক নিমকহারাম হিন্দু আমলাগণে! এতদিন সোনাবিবির অন্নে প্রতিপালিত রক্ষিত হইয়া, আজ তাহার কি দুর্দ্দশা করিলি। স্বার্থ সাধনে তাঁহাকে কোন কূপে না ডুবাইলি! হায়! জগৎ। আর তোমার চিত্র দেখিতে চাহি না।

সোনাবিবি পাল্কীর মধ্য হইতে কাতর স্বরে বলিতেছেন "ওরে জয়ঢাক! আমায় বেইজ্জত করিস্ না, আমার গায়ে এভাবে হাত দিস্ না। আমার গায়ে কিছু নাই। ওরে আমার কোমরে কিছু নাই, উহু! ধাক্কা দিয়া আমার পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিস্ না, আমার বিছানার নিচে কিছু নাই, ওখানে খালি তোষক, ছেঁড়া তোষক, পাল্কীর মধ্যে কিছু নাই। ও বাবা! আমার মাথার চুলের মধ্যে কিছু নাই বাপ্। আমি তোর কোন জিনিস লই নাই। ওরে! ওখানা আমার পরনের কাপড়। দোহাই তোর বাপের ওরে! দোহাই তোর খোদা-রসুলের! আমাকে উলঙ্গ করিস্ না। এত লোকের মধ্যে পাল্কীর দরজা ভেঙ্গে ফেলেছিস্, নাথি মেরে ভেঙ্গে বেশী ফাঁক করে ফেলেচিস্ ভালই করেচিস্। আমি তোরই মা। ওরে আমি তোরই জন্মদাতার ভালবাসা স্ত্রী। ও জয়ঢাক! তোর পায় ধরি বাবা। আমার পরনের কাপড় টেনে আমাকে বেআব্রু করিস না। তুইত সকলি নিয়েচিস্। পাল্কীর মধ্যে যা যা ছিল সকলি নিয়েচিস্। পানি খাবার একটা কাঁচের গ্লাস ছিল, তাও আছড়ে ফেলে ভেঙ্গে দিয়েছিস্। পানের একটা খাসদান ছিল, তাও আছড়ে তিন চার খণ্ড করে ভেঙ্গে সানে আছড়ে আছড়ে পা দিয়ে দলিয়ে ফেলে দিয়েছিস্। কিছু নাই। ওরে আমার পিঠের পাশে-বালিসের নীচে কিছু নাই। তুই লোকজন সরিয়ে তফাত কর, আমি পাল্কী হতে নেমে ঝাড়া দিচ্ছি, তুই তন্ন তন্ন করে দেখ, আমার কাছে কিছু নাই। ও বাবা! তোর দুখানি পায় ধরি বাপ্! আমার পরনের কাপড়খানা কেড়ে নিস্ না। আমি উলঙ্গ হলেম। শীতকাল—গায়ে একটা ছেঁড়া কোরতা ছিল, তাও কেড়ে নিয়েচিস্! গায়ের চাদরখানা টানাটানি করে ফেড়ে ফেলেচিস। মাত্র একখানা ছেঁড়া কাপড় আমার পরনে আছে। তাও কি তুই কেড়ে নিবি? ওরে এইজন্য কি তোকে দশ মাস দশ দিন এই পোড়া পেটে কত কষ্টে রেখেছিলাম। ওরে, এইজন্য কি পুত্র কামনায় কত রোজা কত দান, ঔষধ, কত তাবিজ, কত প্রকারের কষ্ট, খেয়ে না খেয়ে সহ্য করেছিলাম। এই জন্যই কি ওরে! এই জন্যই কি বুকে চিরে ফকিরের আস্তানায় রক্ত পাঠায়েছিলাম। বাবা! আমার গায়ের কাপড় কেড়ে নিস্ না। কত মল, কত প্রস্রাব, এই দু-হাতে ঘেঁটেছি। শীতে রাতে, বুকখানির মাঝে রাখিয়া এই শরীরের রস দিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছি। বুকের তাপ বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করিয়াছি। বাবা, আমায় উলঙ্গ করিস্ না। তুই যে দিন জগতের মুখ দেখিয়াছিলি সে দিন তোকে কে বাঁচাইয়াছিল। তোর অঙ্গের সেই ঘৃণাকর দুর্গন্ধময় পুঁজ রক্ত কে সরাইয়াছিল? কে ঐ সকল সমেত যতনে তুলিয়া বুকে রাখিয়া, কে মুখে চুমা দিয়াছিল? ও জয়ঢাক, একটু দয়া কর! একটু শান্ত হ। হায়! হায়! পেটের সন্তান,

তুই আমার শরীরের সার—প্রাণের সার—কলিজার অংশ। হায়! হায়! তোর এই কাজ। তুই এই করিলি। আজ যে হাতে, যে বলে, জবরানে মায়ের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলি, সে বল সে হাত, তুই কোথা পাইলি? হায়! হায়! আমার কপালে আগুন। আমার অদৃষ্টে শত শত ঝাঁটা! পেটের সন্তান হয়ে মাকে উলঙ্গ করে পরনের কাপড় নিতে চায়। হা অদৃষ্ট!

"উহু! মলেম! মলেম! তুই আমার পা ছেড়ে দে! এ, প্রাণ-ঘাতক ভক্তি তোকে কে শিখাল? ওরে ছেড়ে দে! আমাকে টেনে পাল্কীর বাহির করিস্ না! এমন ভক্তি তোকে কে শিখাল! বুঝেছি বুঝেছি, এ তোর পৈতৃক নহে। তুই তোর বুদ্ধি পিতার প্রস্রাবেই জন্মেছিস্, তাতে সন্দেহ নাই। তবে তোর এত গুণ কিসে হল? কে শিখাল? তোর জন্মদাতা ত এত নিষ্ঠুর ছিল না? তবে তুই কোথায় শিখলি? বুঝেছি, ওরে বুঝেছি। দুরন্ত জালেম খুনে, ডাকাতের পুত্র তোর শিক্ষাগুরু, তারই এই শিক্ষা। আমি তোর দুখানি পায়ে ধরে বলি, ওরে আমাকে ছেড়ে দে। আর সহ্য হয় না, ছেড়ে দে!"

পাঠক, মনে করিবেন না যে, গাজী মিয়াঁর কল্পনার চক্ষে এই মাতাপুত্রের চিত্র আঁকিয়াছেন। জয়ঢাকের মন্ত্রদাতা মহাশয়গণের সৎবিবেচনারই এরূপ ঘটিয়াছে। জোরে জবরানে, মাকে জড়াইয়া ধরিয়া পাল্কী হইতে টানিয়া লইয়া ঘরে পুরিতে পারিলেই কথা রটিবে যে, হাজার হোক মা আর ছেলে। জয়ঢাক কাঁদাকাটা করিয়া মায়ের পদতলে পড়িতেই মায়ার বেগ উথলিয়া উঠিল। পুত্রস্নেহ বারি নাকে-মুখে করিয়া মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। আর যাওয়া হইল না। এ সকল চক্রের চক্রিই সবলোট সাহেব, আর ঘরভাঙ্গা ও মাথা-পাগলা হিন্দু আমলা।

কল খাটিল না। কৌশল টিঁকিল না। সোনাবিবির আর্ত্তনাদে, ইন্‌স্পেক্টার তেস্‌মার খাঁ আসিয়া জয়ঢাককে টানিয়া তফাত্ করিলেন। সোনাবিবি খালি হাতে ছেঁড়া কাপড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কী উঠাইতে বলিলেন। আগে পাছে পুলিশ, মধ্যে সোনাবিবি আর দাগাদারী ভাই সাহেবের পাল্কী। দর্শকগণ মধ্যে কাহারও নয়নে অজস্র বারি, কাহারও মুখ ভারী। কেহ আনন্দে ঢল ঢল, কেহ মনে মনে অতি প্রফুল্ল। অনেকে নয়ন-জল বস্ত্রাঞ্চলে পুঁছিতে পুঁছিতে সোনাবিবির পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর যাইয়া, পুরাতন হিন্দু আমলাদিগের চদ্দো পুরুষের নামে শ্রাদ্ধ করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। সকলের মুখেই ঐ কথা—আমলারা আপন স্বার্থ সাধন জন্য সাবলোট সাহেবকে পালের গোদা করিয়া সোনাবিবির এই সর্ব্বনাশ করিল। মনিবিবি আর জয়ঢাকই যে সেই ক্রুর বুদ্ধি, দুরাচার খল বিশ্বাস-ঘাতক হিংস্র হিন্দু আমলাদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবেন, তাহা নহে। সময় ও সুযোগ পাইলে দংশন করিবে, উল্টা মন্ত্রে বা উল্টা ভাবে বিষ ঝাড়িয়া ছারেখার করিবে।

সকলেই মনে করিয়াছিল যে সোনাবিবি চিরাপুঞ্জীতে যাইবেন। কিন্তু দেখা গেল, পাল্কী চিরাপুঞ্জীর পথে না গিয়া অরাজকপুরের বাঁধা রাস্তা ধরিল।

নবম নথি

হাকিমের চটা কথাটা বড়ই মারাত্মক ; বিশেষ মফঃস্বলের হাকিম, যাঁর পরে সেখানে আর কেহ নাই, যাঁর হুকুম রদ করিতে সংশোধন করিতে সে স্থানে অন্য কোন বিচারপতি নাই ; তিনি চটিলে, তাঁর বিষ-নয়ন পড়িলে, হক-নাহক কোন কারণে তাঁর অপ্রিয় ভাজন হইলে, আর নিস্তার নাই। রাজা, জমিদার, মধ্যবর্ত্তী, সাধারণ প্রজা, যেই কেন হউক না—তার বিপদ পদে পদে। এরূপ চটাচটির ভাগটা অধিক পরিমাণে প্রায় কালা বাঙ্গালী হাকিমের মেজাজেই দেখা যায়। ঘরাও কথায় বাহিরের কাজে খাম ধরা তোষামদে. মোকতা-খোরা মসাহেব বাবুর কান কথায়, তাঁহাদেরই বেশী লক্ষ্য। "ডেপুটির বড় ছেলেটা বড় বেআড়া, ঘোড়াটা বেজায় মুখ-জোর, ঘড়িটা খাঁটি ইংলিশ নয়, হাতের লিখাটা এমন বদ যে সহজে পড়া যায় না। চব্বিশ ঘণ্টা হ্যাট কোট ব্যবহার করেন, কিন্তু সাহেব খুব দেখলে, চোগা চাপকান টুপীর আশ্রয় লয়। সাক্ষীদিগেকে তুই তুকারে তুড়ে যাচ্ছেতাই বলেন।" যেই এই সকল কথা কানে উঠিল, অমনি মেজাজ গরম হইল। দাউ দাউ করিয়া ক্রোধানলে অন্তর-উননে জ্বলিয়া উঠিল। আর কি রক্ষা আছে! যেমন দেহ ছাড়া ব্যাধি নাই, তেমনি শত্রু ছাড়া শরীর নাই। কর্ত্তার মন যোগাইতে প্রিয় পাত্র হইতে, দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ কাল গত হইতে না হইতে, ফরিয়াদী জুটিল, দরখাস্ত দাখিল হইল, অন্তরের সেই সঞ্চিত ঝালি ঝাড়িবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিল। এরূপ ঝালি-ঝাড়া, আগুনে পোড়া, নাগের হাঁড়, বোধ করি পূর্ব্ববঙ্গেই বেশী জন্মায়—শেষে বাঙ্গলা দেশময় গড়ায়।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের কপাল পোড়া, তাই এখন মফঃস্বল বিচার আসন পবিত্র কানন,—সিভিল শতদলে আর শোভা পায় না, সুবিচার সৌরভেও সাধারণ মন মোহিত হয় না। কেয়া, অশোক, কিংশুক, পলাশে, দেশ জুড়িতেছে, সুবিচার-উপবনের গৌরব-সৌরভ ক্রমেই লোপ পাইতেছে।

ঐ দেখুন! হাকিম বাহাদুর সেই পুরাতন আস্তানার গাড়ী-বারান্দার বৃহৎ সিঁড়ির কিঞ্চিৎ অদূরে ক্ষুদ্র টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া, চা চামুচ পেয়ালা ওষ্ঠে জিহ্বায়, হস্তের সহিত ক্রীড়া করিয়া ঢোকে ঢোকে গলাধঃ করিতেছেন, সময় সময় ফুৎকারও দিতেছেন, হাঁ হু করিয়া সময় সময় মাথাও নাড়িতেছেন, কোর্ট বাবু দাঁড়াইয়া রিপোর্ট পড়িতেছেন। হাকিম সাহেব হঠাৎ কি মনে করিয়া অধর ওষ্ঠের ক্রীড়া বন্ধ করিলেন, কান পাতিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিলেন। আবার চোঁ চোঁ করিয়া প্যালার অর্দ্ধাংশ উপরে দিয়া বলিলেন,

"এই ত হাতে পড়েছে। এবারে যাবে কোথা? সেই মাতাল জমাদারটা নয়, যে আমার বোতলের হুইস্‌কি চুরি করে খেয়েছিল?"

"আজ্ঞা! সেই বোতল-চোর এই। মফঃস্বলে নৌকার উপর হুজুর তার জিম্বায় রেখেছিলেন, তিনি রক্ষা করবেন কি নিজেই বোতল দুয়ের ওকর্ম্ম করেছিলেন।"

"আচ্ছা! আচ্ছা! তুমি মুখে বল, পড়ে দরকার নাই। যদি আবশ্যক হয় পরে শুনে নেব।"

কোর্ট বাবু কাগজ উল্টাইয়া ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "হাতপাতা থানার চাঁদ দারগা লিখেছেন যে, মাণিক জমাদার স্বর্ণ পেসাকরের বাধ্য হয়ে, তারই কথামতে গোলাপী পেসাকরের প্রতি নানা প্রকারে অত্যাচার করেছে। গোলাপী চোরা-মাল রাখে, গোপনে মদ বেচে, এই সকল মিথ্যা অপরাধের ধুয়া ধরে, হুজরে চালান দেবার ভয় দেখিয়ে তাহার নিকট নগদ পঁচিশ টাকা চাহে। গোলাপী নগদ টাকা চাহে। গোলাপী নগদ টাকা দিতে পারে না। তার কমরের চন্দ্রহার, দুগাছা মল, সোনার একটা তাগা, এই তিন দফা মাল, জমাদার বাবুকে দেয়। জমাদার বাবু ঐ তিন দফা গহনা বাজারে বিসখা গোয়ালিনীর নিকট বন্দক রেখে ২৫ টাকা নিয়েছেন, সাক্ষী প্রমাণ অনেক আছে।"

"এমন রাত নেই যে মাণিকের হল্লা কানে এল না। এমন দিন নেই যে মাণিকের কোন অপরাধের কথা শুনা গেল না। সেদিন রাত্রে খোশমণি গুণমণি, তার দরজাটা নাথি মেরে ভেঙ্গে ফেল্লে। মদের দোকান হতে জবরানে মদের বোতল নিয়ে গেল। তারপর সেই মুক্তবাড়ীর চৌধুরীর, সবচুলে. নুল দেওয়ানের সঙ্গে, গঙ্গার ঘাটে হাজার লোকের সম্মুখে দিনে দুপুরে ওর সেই স্বর্ণ, দেওয়ানজীর বাইজী, আরও তিনটে, সকলে মদ খেয়ে মাতলামি করে, শেষে উলঙ্গ হয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে কাণ্ড কল্লে—সে আর মুখে আনা যায় না।"

"আচ্ছা এইবারে আমি ওর মাথা একেবারে খেয়ে দিচ্ছি! 'এ' ফরমে চালানের হুকুম লিখে, আসামী উপস্থিত হলে আর কথাটি বলবে না, আমার হুকুম রইল, ঐ লাল ঘরে পুরবে বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত হাজতে থাকবে। আর কি আছে?"

"হুজুর! উৎপাত থানার চিৎপাত জমাদার লিখেছেন যে, যমদ্বার গ্রামের মনিবিবি, ঐ গ্রামের সোনাবিবির নামে অনেক কলঙ্ক রটায়। বোধ হয়, তারই উত্তেজনায় ও খরচের সাহায্যে রাঙ্গামাটির লাল আলু মোল্লা মনিবিবির নামে স্ত্রী-স্বত্ব সাব্যস্ত দখল পাওয়ার প্রার্থনায় ঘোল-অম্বলের চৌকিতে আরজি দাখিল করায়—মনিবিবি লাঠিয়াল দ্বারা, মোল্লাজীকে ধরিয়া প্রাণে মারিতে, কি আটক করিয়া আচ্ছামতে হজিমৎ দিতে প্রস্তুত হয়েছে। সোনাবিবির নিযুক্তির লাঠিয়ালেরা মোল্লাজীর সাহায্যে আসিয়া জমাত বস্ত হইয়াছে। উভয় পক্ষে শীঘ্রই একটি দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া খুন-জখম হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।"

হাকিম সাহেব চুরুটের ধুম ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "এ বিষয়ের হুকুম বিশেষ বিবেচনা করে কাল দিব। মূল কথা—ওর মূল ধরে টান না দিলে এ সকল ডালপাতায় কিছুই হবে না।"

"হুজুর যা ভেবেছেন, ঠিক বুঝেছেন। ওর মাঝে জন কয়েক দুষ্ট বদলোক পড়েছে—তারা

শাসন না হলে যমদ্বারের খুনখুনী মিটবে না। দেশও ঠাণ্ডা হবে না—”

“আরও আছে নাকি?”

“হুজুর, আল্লাদগঞ্জের পেল্লাদ যমাদারের রিপোর্টে, বড় দারগার মন্তব্য আছে। কথাটা বড় পেঁচাও, আমি সংক্ষেপে নিবেদন কচ্ছি। জমদ্বারের সোনাবিবির মনিবিবির মনান্তর—জয়ঢাকের বিবাহের পর, মনিবিবি ও সবলোট সাহেবের কুমন্ত্রণায় জয়ঢাকের মনে নানা সন্দেহ। শেষে মাতাপুত্রে শত্রুতা, কয়েদ। কয়েদ হইতে মুক্তি। এইক্ষণ সোনাবিবি, অরাজকপুরের বাটীতে দাগাদারী সহ স্থিতি। এ পর্য্যন্ত হুজুরের অবিদিত নাই। নূতন কথা এই যে, তিনি বিশেষ সন্ধানে জানিয়াছেন, সোনাবিবির নিজ জমিদারী ও পুত্র জয়ঢাকের জমিদারী, যাহা জয়ঢাক সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সোনাবিবির দখলে থাকিবে, এ কথা জয়ঢাকের পিতার লিখিত বিধান। রাজাদেশেও নাবালক জয়ঢাকের মাতা সোনাবিবিই তাহার গার্জ্জীয়ান। মনিবিবির ইচ্ছা যে, সোনাবিবি তাঁহার নিজ জমিদারী ও পুত্রের জমিদারী, এই উভয় জমিদারীতেই হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন। জবরানে বেদখল করা। সোনাবিবির ইচ্ছা, প্রজার প্রতি অত্যাচার হইতে না দেওয়া, আপন স্বত্ব বজায় রাখা। উভয় পক্ষেই পশ্চিমে গড়ো গোয়াল, কাশীর গুণ্ডা, বরিশালের ডাকাত, ঝালুকাটে চোর, দেশের বদমাইশ সর্দ্দার লাঠিয়াল বহুতর জোঠবদ্ধ হয়েছে, প্রজা ধর পাকড়, খাজনা আদায় লইয়া বিশেষ একটি দাঙ্গা হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। খুন-জখম নিশ্চয়, স্থানে স্থানে, জলে (নৌকায়) স্থলে, দলবদ্ধ হইয়া এক এক আড্ডা করিয়া রহিয়াছে।”

“আর বলতে হবে না। আমিও শুনেছি। উহার মধ্যে যাহারা প্রধান, যাহাদের কথামতে এই সকল কাণ্ড হচ্ছে, সে কথাও শুনেছি। আমি যে ঐ সকল বিষয়ে চিন্তা না করছি তা নয়। আমার ইচ্ছা অন্যরূপ। উপরে জানিয়ে বিশেষ রূপে গোড়া এঁটে শীঘ্রই উহার প্রতিবিধানের উপায় করব।”

“হুজুর! আরও কয়েকটা বিষয় ছিল। তাহা আর এইক্ষণে পেশ করিব না। ঋতুরাজ বাবু—কালাচাঁদ বাবু—(বড়বাবু) মানিক জমাদারের পিতা বৃদ্ধ উকিল বাবু, মোক্তার দলের মধ্যেও দুই তিন জন দেখিতেছি, হুজুরের এখানেই আসিতেছেন। এখন এই পর্য্যন্তই থাকুক। বোধ হয় মাণিক সম্বন্ধে কিছু বলিতেই আসিতেছেন। হুজুর আমি বাসায় যাই।”

“আচ্ছা, তুমি একটু ত্রস্তপদেই যাও, বুড়কে আর মোক্তার বাবুদিগকে একটু মিষ্টি ভাবে বল যে, বিশেষ কোন পরামর্শ জন্য ঋতুরাজ বাবু আর বড় বাবুকে ডাকা হয়েছে, আপনারা বিকালে কোন সময়ে আসবেন। আজ ত রবিবার।”

কোর্ট বাবু ত্রস্ত হাতে কাগজ-পত্র গোছাইয়া এই পথেই বাহির হইলেন। হাকিম সাহেবের আদেশ ও উপদেশ মত কার্য্য করিয়া, বৃদ্ধ উকিল ও মোক্তার বাবুদিগের গতির পরিবর্তন করিয়া এক সঙ্গে নানা কথা কহিতে কহিতে চলিলেন। এদিকে বাবুদ্বয় হাকিম সাহেবের প্রাতঃবৈঠক গাড়ী-বারান্দায় উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না। হাসি-তামাসা রগড় চলিতে লাগিল। পটাপট দীপ-শলাকা পুড়িয়া পুড়িয়া

মুখে কালি মাখিয়া কোটনা অৰ্দ্ধ অঙ্গ পৰ্য্যন্ত খাকে পরিণত করিয়া মৃত্তিকায় অঙ্গ ঢালিয়া দিল। চুরুটে আগুন, মুখে আগুন, কাহার কাহার মনে আগুন, এক প্রকার আগুনেরই খেলা আরম্ভ হইল।

হাকিম সাহেব বলিলেন, "ভায়া! আকর্ষণের শক্তি দেখেছ? দাগাদারী বমাল দাসী বাঁদী সহ অরাজকপুরে উপস্থিত।"

ঋতুরাজ বলিলেন, "দাগাদারীর মত কপাল কার? দেবতার ভোগ দানবে খায়।"

বড়বাবু বলিলেন, "যজ্ঞের ঘৃত কুকুরে চাটে।"

হাকিম সাহেব বলিলেন, "গোপালভোগ ক্ষিরশেপাতির মজা দাঁড়কাকে লোটে।"

ঋ,"—এক পদ বেশী হল যে?"

হাকিম সাহেব বাম চক্ষুর বাম কোণ ঈষৎ ঠারিয়া, বড় বাবুর দিকে ইসারায় দেখাইয়া আপন ললাটের মধ্য ভাগে তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "কপাল ; কপাল ; কপাল—"

বড়বাবু বলিলেন, "মহারাজ! যে সময় শরীরে বল ছিল, রক্তের তেজ ছিল, মানুষকে মানুষ বলেই জানতেম না, সে সময় অদৃষ্টকেও মানতেম না। কপালের কথা কথায় কথায় কেহ উত্থাপন কল্লে, ধাঁ করে বলে ফেলতেম, কপালে আছে কি? লিখার কথা বলছো, সে লিখার অক্ষর কি? অর্থ কি? কোথায় সে লিখা? কোন ভাষায়—কি ভাবে সে লিখা? চামড়ার উপরে কি ভিতরে? হাড় ঘেঁসে লিখা? না হাড়ের উপরে লিখা? সংস্কৃত—না বাঙ্গালা—না ইংরেজী? কত হাসি-তামাসা করছি। ভাইরে! যত রক্তের তেজ কমিতে আরম্ভ হইল, শরীরের বল যখন ক্রমে কমিতে লাগিল, পদে পদে ভুল, দেখে, শিখে, ঠকে, বেশ বুঝতে পেরেছি, মানুষের কোন হাত নাই। সকলই সেই দয়াময়ের ইচ্ছা। তিনি ছোটকে বড় করেন, বড়কে ছোট করেন, সকলি তাঁর মহিমা। আমরা না বুঝে পাগলের মত কি বলি।"

ঋতুরাজ বাবু একটু মিষ্ট হাসির আভা দেখাইয়া বলিলেন, 'ও সকল তর্কের কথা। যাঁর যতদূর ধারণা ক্ষমতা, তিনি সেই পৰ্য্যন্ত গিয়াছেন। যতদূর বুঝিবার শক্তি, ততদূরই বুঝিয়াছেন। ভায়া! শুধু তাবিজের ভরসায় থাকিলে হয় না। শুধু তাবিজ কখনই ছেলের মুখ দেখা যায় না। অরে ভায়া! এই জগৎ কারণেরই কারণ, কারণেরই কার্য্য। আর কি বলিব।"

হাকিম সাহেব হো হো শব্দে হাসিয়া—"ব্রেভো! ডিয়ার ব্রাদার বা ফিলোজাফার! মাঝে কিছু চাই? ঠিক বলেছ ভাই। মাঝে কিছু চাই। আমারই ভুল। শুধু কপালের খেয়ালে থাকলে কিছু হয় না, মাঝে অবশ্যই কিছু চাই! বড় দাদা! শুধু মাদুলির জোরে কিছু হয় না। এ সম্পূর্ণ ঠিক। মাঝে কিছু চাই। বিনা কারণে কবে কোন কার্য্য ঘটেছে—অথবা সম্পন্ন হয়েছে?"

বড়বাবু বলিলেন, "আচ্ছা ভায়া। গত রাত্রি যে নব উপাধি প্রাপ্ত রাজা বাবুর কাচারিতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলে, জানত! তাঁর আদি অন্ত গোড়ার খবর কিছু জান? সাত বোঝা কারণ, তার উপরে আবার ১৫ বোঝা চেষ্টা করিলেও ত অতদূর হয় না। কেউ কি বিবাহ

করে না? কেউ কি বিবাহ করে স্ত্রীধন হাতে পায় না? দেখ দেখি, ভায়া! এমন কপাল জোর কার? সম্বল নাই, কম্বল নাই, কিছু নাই, এখন তিনিই হলেন রাজা বাহাদুর।"

হাকিম সাহেব বলিলেন, "জানি জানি, রাজপদক লাভে আনন্দে খেলাত পেয়েছেন, তাইতেই উৎসব। আসল ধাক্কা যেখানে,—কি চতুর! কি মাথার তেজ! রাজা বাহাদুর হওয়ার পূর্ব্বে, কি চমৎকার চাতুরী খেলেছিল। আসলে কিছুই নয়—বারফটকা বড় মানুষী, সঙ্গে সঙ্গে দেশ হিতৈষী। সেখানে নাকি খুব লাগিয়েছিল। কবিরাজ হলেই যে ধন্বন্তরী হবে, তাত নয়। বোল চেনা চাই, ঔষধের গুণ জানা চাই। গুণ ছিল, জোর ছিল, ক্ষমতা ছিল, বুদ্ধি ছিল, হয়ে গেল। শুনেছি, সেখানে হাতী মুতেছে, ঘোড়া যা করবার করেছে, ছাগল নেদেছে. বানরে নেচেছে, কত সেম্‌পীন উড়েছে, কাক ছুটেছে। কত কমলিনীর কমল-পদের কমলাঘাতে কত কমলাকান্তের মাথা ঘুরেছে। বঙ্গাধিপের আদর, পারিষদ মোসাহেবেরই জয়। লক্ষ্ণণ সেন বয়সে বৃদ্ধ, অন্ত-দন্তহীন, মোসাহেবদিগের হাতেই আহার, পর-চক্ষেই দৃষ্টি। তাঁদের কানেই শোনা। তাঁরা যা বলেন তাই ব্রহ্মার বেদ। কিছুই না, কোন কিছু নাই, অথচ মোসাহেবগণ বলেছেন, অমুক কাণ্ডে বিশ হাজার—অমুক ক্ষেত্রে দশ হাজার—তাহা কি আর মিথ্যা হয়! যা হয় নাই, তাও বল্লেন, যা ঘটে নাই, তাও ঘটালেন—আর চাই কি? রাজাত রাজা—কোন দিন শাহীতক্তের দাবি করে বস্‌বেন। এ সকল কি? দেখত ভায়া! কোথাকার জল কোথায় গড়ালো। সাহস চাই, বুদ্ধি চাই, উৎসাহ চাই, সঙ্গে সঙ্গে কপালের কথাটা থাকুক। কিন্তু ভায়া। তেজ না হলে, কখনই কিছুই হয় না। খালি বন্দুকে চোট হয় না। বিনা কেপে আগুন উঠে না ফোটে না। মেঘশূন্য আকাশে জলের আশা করা যায় না। আবার বিনা মেঘে চপলা খেলে না, চঞ্চল চমকে না, চক্ষেও ধাঁদা লাগে না, মুযল ধারে জল পড়েও প্রাণ কাঁপে না, ত্রাস জন্মে না।"

ঋতুরাজ বাবু টেবিলের উপর সজোরে চপেটাঘাত্ করিয়া মুখে বলিলেন "বাবা! বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা! বহুত তারিপ! চমৎকার বর্ণনা শক্তি! অহে নটবর! তুমি কি স্বভাব-কবি?"

বড়বাবু বলিলেন, "কবি নহে কপী। কপী নহে, বিপিন-বিহারী, শ্রীমধুসূদন, রাধিকা-বিনোদন, কেলী কানন, কুঞ্জ নিকেতন। রাধা শ্যামের একত্র মিলন। শ্বেত শত-দলে ষট্‌পদের গুঞ্জন। না হে না। আমাদের মত কোন বেল্লিক কপী গাহিয়াছেন—

বাঙ্গাল মনুষ্য নয় ঐ এক জন্তু।
লাপ্ দিয়ে গাছে উঠে লেজ নাই কিন্তু।"

ঋতুরাজ বাবুর বাসস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ শ্রীহট্ট। বড়বাবুর বসতিস্থান, রাঢ় অঞ্চল কাঞ্চননগর। কথাটা রঙ্গরসে আমোদের মুখে চলিলেও ঋতু বাবুর মনে বিশেষ আঘাত লাগিল। হাকিম সাহেবও তথৈবচ। কারণ তিনি আরও পূর্ব্বের। বাঙ্গালের বাঙ্গাল—তস্য বাঙ্গাল। বাঙ্গালকে বাঙ্গাল বলিলে, সে বাঙ্গাল হাড়ে হাড়ে চটে। উভয় মুখেই হৃদয়াঘাতের ভাব প্রকাশ।

ঋতু বাবু একটু মিঠে অথচ কিঞ্চিৎ কড়া স্বরে—কথঞ্চিৎ হাসির আভাসে তখনি বলিলেনঃ

"বৰ্দ্ধমান বীরভূম, কাঞ্চননগর।
কয়টি মানব আছে? সকলি বানর।"

হাসির তুফান উঠে গেল। দালানের ছাদ ফাটা ফাটা বোধ হইল। দুই মিনিট পর্য্যন্ত হাসির বেগ। পরস্পর সকলেই বুঝিলেন, কিছু নহে। একটা সয়তানী বাতাসের সহিত কোন হাসকুটে কবির প্রেত আত্মার আবির্ভাব হয়ে হাসির তুফান তুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল। মধ্যস্থ মহাশয় বলিলেন, "বোঝা গেল, দুইজনেই সমতুল্য কবি। ছড়া কাটান বন্দ করে আসল কথার আলোচনা হক্।"

ঋতুরাজ বলিলেন ঃ "আচ্ছা, বহুত আচ্ছা, তাই হউক। কিন্তু রাজা বাহাদুরের জীবন কাহিনীটা, ভাল করে, ঘোর পেঁচ ভেঙ্গে, যতদূর জানেন, আগে বলুন, তারপর অন্য কথা। শুন্তে আমার বড়ই সাধ হয়েছে।"

"ভায়া! বলব, বিস্তারিত রূপে তোমায় সে আশ্চর্য্য কাহিনী সময়ে শুনাব। কিন্তু আজ নয়। অনেক কাজের কথা আছে।"

বড়বাবু বলিলেন, "ঠিক ঠিক ঠিক! এ কথার মত কথা। রবিবার বলে কি সময় মত চারটে ভাত উদরে দিবে না?"

ঋতু—"আচ্ছা তাই হক্, কাজের কথা হক্, আমারই অন্যায় হয়েছে, কার্য্যের লোকের কাছে অকাজের কথা শুন্তে চেয়েছি। না হয় 'ফাইন' করো।"

হাকিম সাহেব বলিলেন, "ছি ভায়া! মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।"

ঋতুরাজ—"হাঁ মনটা যোগ করে কানটা ভাল করে পেতে, স্থির হয়ে আপনার বাক্য-সুধা পান করতে, জিব্‌টা লক্‌লকিয়ে, ঘোমটা দিয়ে এই বস্‌লেম। কোন দিক্ তাকাব না, কার পানে চাইব না, কার চেহারা বা ছায়া এখন মনে তুলবো না। যা যেখানে যেমনভাবে আছে, তাই থাকবে এবং রাখব। বলুন ধর্ম্মাবতার। শুনুন হুর্জুর। নারায়ণ নর—"

হাকিম সাহেব চারিদিকে তাকাইয়া কেহ কোথায় আছে কিনা দেখিয়া মৃদু মৃদু স্বরে বলিলেন, "সেই বেগম সাহেব।" বলিলেন, "সেই বেগম সাহেব।" বুঝেছ, আমাদের সেই বেগম সাহেব।"

কথা ফোটে ফোটে, ফোটে না। পাপকথা মুখে আসে আসে. আসে না। দুইটি বিদেশী শিক্ষিত উচ্চপদস্থ লোকের সম্মুখে চির কলুষিত অন্ধকার হৃদয়ের ভাব মুখে প্রকাশ হয়, হয় না। ধরিতে গেলে তিন জনই এক। অথচ কেহ কাহারও খবর রাখেন না। রাখিলেও মুখে আনেন না। মনেই জাগে। তবে বড়বাবু কিছু বেশী দূর গড়াইয়াছেন। কিন্তু বড় চাপা, ভারি গম্ভীর, বিশেষ বর্ণচোরা। হাকিম সাহেব—২য় শ্রেণীর। ঋতুরাজ—তৃতীয় শ্রেণীর—কিন্তু মুখে প্রথম শ্রেণীর উপর—প্রাইভেট "সেলুন'। এখন যেন এক স্থানে. মনের সুখে হরি হর-নারায়ণ আত্মায় কাল কাটাচ্ছেন। এক প্রাণ এক মন হইয়া, আমোদ-আহ্লাদ করিতেছেন।

আমোদের অঙ্গ একই স্থানে, একই টেবিলে, একই গ্লাসে রস-সুধা, একই হস্তে পান কচ্ছেন। এক সুডৌল গোলালু কমল হস্তে এক সময়ে এক আঘাতে না হউক, তিন গালে তিন আঘাতে—চপেটাঘাত খাচ্ছেন, তবে ভিন্নর মধ্যে এই,—পৃথক মধ্যে এই কথা, যে মানময়ীর মনের আকর্ষণের তারতম্যে ভালবাসার ইতর প্রভেদে আঘাতেরও ইতর বিশেষ আছে। চারু লোচনের চাউনিরও গ্রেড ভাগ করা রহিয়াছে। ঘাত-প্রতিঘাতেরও উনিশ বিশ আঠার সতর আছে। কিন্তু পরাধীন জীবন, পরের তাঁবেদার। চিরকাল এক স্থানে, এক মহকুমায় থাকিবার আশা নাই, ক্ষমতাও নাই। চাকুরিয়া, চক্রের দাস, বদলীর অধীন। এখানে সেখানে, বহরমপুর—মেদিনীপুর—অরাজকপুর—ঘুরপাক খাওয়াই স্বতঃসিদ্ধ। ছাড়াছাড়ি হলে, কার মনের ভাব কোথায় যায়, কিরূপ দাঁড়ায়, সেই চিন্তাতেই, সেই সন্দেহেই, কথা ফোটে, ফোটে না। অনেক কষ্টে বলিলেন ঃ

"সেই আমাদের প্রিয় প্রাণ ভগিনী আদর্শ রমণী বেগম সাহেব!"

ঋতুরাজ বাবু হো হো শব্দে হাসিয়া মাথা নাড়া দিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ। সেই সাত মরদের গ্রীবা-ভঙ্গকারিণী, এটর্নী উকিল বারিষ্টারের মনোহিনী, চটালো কালোপেড়ে সুচিক্কন শুভ্র দশ গজা ধুতির নিম্নে সামিজ ধারিণী, পরিধান বসনের পারিপাট্য দেখাইতে কোমল দেহের মলাএম ও স্থূল ক্ষীণ, মাংসাল মানানসইর প্রমাণ করিতে, স্থানে স্থানে সুবর্ণ রঞ্জিত মক্ষিকা প্রজাপতি। ভ্রমর আকৃতির ব্রোচ ধারিণী, বিশাল নিতম্ব দোলানী, হস্তিদন্ত বিনিন্দিত শুভ্র বদনী। সরল সুচিক্কণ—তাম্রতার সদৃশ, সাবান ঘসা,—হস্ত পরিমিত অতিরুক্ষ মৃদু কেশিনী, অর্দ্ধচন্দ্র পরাজিত ললাটে চমৎকার শোভিনী, ঘোর কৃষ্ণকায় জোড়া ধনুকান্তি শোভিত আকর্ণ বিস্তৃত ভ্রু-ভঙ্গিনী! চিপিটাকার ক্ষুদ্র মণিপুর নাসোপারি সুবর্ণ বাঁটযুক্ত চশমাধারিণী, কৃষ্ণ রেখা বিশিষ্ট চেটাল চৌড়া দন্তপাতি ধারিণী, দীর্ঘ প্রস্থ প্রায় সমশরীর আয়তনী, পদযুগল ষ্টকিং সহ লেডী বুটে আবরিণী, শ্বেত মাকাল পরাজিত দিব্য আঙ্গিনী, কোকিল বিনিন্দিত বাক্য-সুধা কাকস্বরে বর্ষিণী, নানা ফাঁদে নানা ছাঁদে প্রেম ফাঁদ পাতনী, বক্ষস্থল হেলাইয়া কর্ণ দুল দোলাইয়া গোলাকার আঁখি গোলমালে ঠারিয়া, "আমি তোমারই" ইঙ্গিতে জানাইয়া কার্য্য উদ্ধারকারিণী, হাকিমানের সৌভাগ্য স্পর্শমণি। বিদ্যায় বীণাপাণি, ক্ষমতায় সিংহবাহিনী, প্রকাশ্যে পতি-বিয়োগিনী, গোপনে নিত্য নব সিমন্তিনী, ধনে অলক্ষ্মীর সহচরী, বুদ্ধি বিবেচনায় পাগলিনী হটুনটুর ভগিনী, কার্ত্তিক গনেশের জননী, জীবনের চিরসঙ্গিনী—রুহিণী, দেবাদিদেব মহাদেব—বোম্ ভোলানাথ, নীলকণ্ঠ, অনাথ নাথ, দীনবন্ধু, দীননাথ, অনাথ বন্ধু, পরেশ নাথ, সাগর সিন্ধু, ইন্দু বিন্দু, রাধেশ্বর সর্ব্বেশ্বর, রমণী চরণ, কামিনী পদ বল্লভ দুর্লভ রাজ-রাজেশ্বর মহাপ্রভুর প্রণয়িনী, অন্তঃপুরবাসিনী, ঘোর আমোদিনী,—সে চরণ কমলে শত শত দণ্ডবৎ। সে যুগ পদে হাজার হাজার নমস্কার!! হাঁ তার কি? সে স্বগুণে গৌরবিনী মহোদয়ার কথাটা কি? খুলে বলুন। আধো আধো ভাবে রসনা সঞ্চালন কেন? ধর্ম্মাবতার, খুলে বলুন। দন্তে দন্তে চিবিয়া চিবিয়া মিশিয়া কেন? মনের কপাট দোর জানালা খিড়কি গবাক্ষ খুলে বলুন। চক্ষের পর্দ্দা উঠাইয়া আমার মুখ পানে চাহিয়া হাসিমুখে, চার চক্ষে মিল

রেখে, আস্তে আস্তে প্রকাশ করুন। তাঁর কি? কোথায় কি?”

“ওহে ভায়া! তোমার দীর্ঘ বক্তৃতায় আমি সব ভুলে গেছি, ‘থ’ হয়েছি। কি আশ্চর্য্য, কি বলি? আর কিছু নয়—কথাটা তুমিও না জান তাহা নহে। তাঁর বিশেষ উপরোধ, হাত ধরিয়া প্রাণের সহিত অনুরোধ—সেই ভেড়াটার পায় বেড়ী, কোমরে দড়ী দিয়ে খুব টানা হেঁচড়া টানে নাজেহাল, বদহাল করে একেবারে গঙ্গা পার করে দেওয়া তাঁর ইচ্ছা। রাজ শাসনে, আইনের বিধানে, ভয়ে তিনি কিছুই পারেন না। আমরা ব্যবসাদার—আমাদের হাতে তীক্ষ্ণ ধার বিধান অস্ত্র। আমাদের দ্বারা হইলে আর কে কি বলিতে পারে? অথচ কার্য্যও সিদ্ধি—দফাও রফা। একটা দিন ঘানি গাছে জুড়তে পাল্লেই, তাঁর আশা পূর্ণ। করি কি? হটাৎ ধরে এনে জেলে পুরে বেগম সাহেবের সাধ তো মিটাতে পারি না, চাকুরীটাতো বজায় রাখ্‌তে হবে। কি করি! এই আশা দিয়ে কত খেয়েছি, কত মজা করেছি, আজ ন মাস হতে একই ভাবে চালিয়েছি, এখন লজ্জায় মুখ তুলতে পারি না।”

বড়বা বলিলেন, “তাতে ঠিক। সে কথা ত ঠিক। এত খানা এত পিনা, এত আনাগনা, এত ভালবাসা, এত ঘেঁষাঘেঁষি, এত মিশামিশী, মাখামাখি করে, করারে আবদ্ধ হয়ে, কিছু না কল্লেও ত মান বজায় থাকে না, নিমকের সত্য আদায় হয় না। এর জন্যে সে কিনা করেছে। ঐ গজ কচ্ছপ শরীরে হাত তুলে পা তুলে তালে তালে নেচেছে। ঢেলেছে, ঢলিয়েছে, খেয়েছে, এঁটো করে প্রসাদী দিয়েছে। ঘুমিয়েছে, ঘুম পাড়ায়েছে। যখন যা চেয়েছে দিয়েছে। কত টাকা খরচ করেছে। আশা ত তার ঐ। যাতে ভেড়া খোঁয়াড়ে পড়ে, যাতে ভেড়ার ডাক বন্দ হয়, মুখ বন্দ হয়, তার পরিবার পরিজনের আত্মনাদ, হৃদয়ভেদী ক্রন্দন স্বর তাঁর কানে যায়—এই ত তাঁর আশা। আপনারা কি করিলেন?”

ঋতুরাজ বাবু বলিলেন, “ভাই হে! আমি ফরিয়াদী—তুমি সাক্ষী—আর শ্যাম নটবর বিচারপতি হন, তাহলেই কুপকাত। তাহলে প্রথম চালেই ভরা ঘরে কিস্তি মাত। আমাদের হলো, ধরি মাছ না ছুঁই পানি, নমঃ নমঃ নমঃ, উড় খই গোবিন্দায় নমঃ—পরে পরে অন্য পথে কিছু হয়ে যায়—ভালই, তখন বুক ফুলিয়ে, ছাতি বিস্তারিয়ে, হাতে মুখে নাকে চোখে বাহাদুরী জানিয়ে কুঞ্জকাননে বলব গিয়ে, হরি বোল হরি, দেও হরি পীরের সিন্নি। এ ভিন্ন আমি ত আর কিছুই পারি না—”

হাকিম সাহেব বলিলেন, “ভায়া! ভয় কর কেন? পিছনে হাঁট কেন? যোগাড় হয়েছে, পরে পরেই হবে। শুন! শুনে, বুঝে, বিবেচনা করে, কিংকর্ত্তব্য স্থির কর। সেই জন্যই ডেকেছি।”

“তবে এতক্ষণ বাজে কথা বলে সময় নষ্ট কল্লে কেন?”

“তা হক। দুদণ্ড আমোদ আহ্লাদ হাসি তামাসা খোস গল্প না কল্লে মনের গরমি ছোটে না, ক্লেদ বাহির হয় না, মাথা ঠিক থাকে না। শুনুন! (একটু চুপে চুপে) ভায়া শুধু ঘুমই নহে। উপর পর্য্যন্ত এমনই কৌশলে জানিয়েছি যে, মাতাপুত্রের বিবাদ-বিসম্বাদের মূল

কারণ যা কিছু, সকলই ঐ ভেড়া আর ভাই দাগা। উপর হতে পাকাপাকি করে, বান্দুনী না এঁটে, খামখেয়ালী গোছের, লাগে লাগে না লাগে ভাবের, কোন কাজ কর্ত্তে চাইনে। তার পক্ষে লোক আছে। এখানে আছে, অন্যখানেও আছে। রাজধানীতেও আছে, শুনেছি লণ্ডনেও আছে। পেরিসেও আছে। আর খবরের কাগজ পরিচালক দল ত তার প্রিয় বন্ধু! সেই সকল ভেবেচিন্তে—উপরের বাহাদুর পর্য্যন্ত চটিয়ে গোড়া এঁটেছি। ভাল করি নাই? সুযোগের উপর সুযোগ। চক্রের উপর চক্র। বুদ্ধীশ্বর বিস্‌সার্ক হলেও এ চক্ষে ভেদ করে এর মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে পারবেন না। সংক্ষেপেই বলি। আমাদের এক সিঁড়ি উপরের প্রভু জানতে চাইলেন, মনিবিবি ও সোনাবিবির জয়ঢাকের এই উপস্থিত বিরোধের মধ্যে, কার পক্ষে কোন জমিদার, কার পক্ষে কে? কার পরামর্শ মত তারা কার্য্য করে? কোন পথে কে ইহার মন্ত্রদাতা? কোন পক্ষ বিবাদে বেশী অগ্রগণ্য? যাক্, এই সকল নানা কথা জিজ্ঞাসা হওয়ায়, যাহা কলমে আসল লিখলাম। সোনাবিবিই কলহপ্রিয়, বিবাদ করতে কোমর বেঁধে রণে খাড়া হয়েছে। মন্ত্রদাতা বুঝতেই পার—ইত্যাদি লিখলে উত্তর আসল। ভেড়াকান্তকে আমরা বহুদিন হতেই জানি। সে রাজভক্ত বিশেষ আমাদের ভারি ভক্ত। সে থাকতে কখনই বে-আইন হবার সম্ভাবনা নাই। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সাহেবগণ তার প্রশংসা স্মরণ পুস্তকে লিখে গিয়েছেন। একজন লিখেন নাই। এদেশীয় যিনি আমার পদে ছিলেন, তিনি লিখেছেন : তাহার পূর্ব্বে যিনি ছিলেন, তিনি লিখেছেন, তার পূর্ব্বে যিনি ছিলেন, তিনি আরও বেশী লিখেছেন। তুমি ভাল করে তদন্ত করে লিখবে। তাকে ডেকে আপসের কথা বললে নিশ্চয়ই যদি তার মন্ত্রণায় ইহা ঘটে থাকে, আর একপক্ষ যদি যথার্থ বাধ্য থাকে, তবে অবশ্যই আপসে মিটে যাবে।

"কি করি বড় গোলে পড়লাম। সাহেবের মনের গতি ফিরাই কি প্রকারে, বাতাস উল্‌টা বহাই কি কৌশলে, সেই ভাবনায়ই প্রবল হল। কার গরজ, কার মাথার ব্যথা, কে মাথা কচ্‌কচি করে সময় নষ্ট করে, বিশেষ আমার মনের ভাব থাকল অন্য প্রকার। উপরি উপরি ভাবে, হয়, হয়, না হয় গোপনে কোন লোক দ্বারা ভিন্ন কথা যাই হউক, উভয় পক্ষের উকিল মোক্তার কার্য্যকারক সকলকে ডেকে, সাহেবের মনের ভাব জানিয়ে দিলাম। কিন্তু—কাওকে ডাকলাম না, কিছু বললাম না। কাজেই সেও নিজের গুমরেই রয়ে গেল—নিষ্পত্তির দিকে মনোযোগ করল না। আপসে নিষ্পত্তি হল না। তারপর লিখে পাঠালেম যে, বহু চেষ্টা বহু যত্ন করেও দুটি লোকের জন্য কৃতকার্য্য হতে পারলাম না। মনিবিবির পক্ষে নিষ্পত্তি করতে কোন আপত্তি নাই। কেবল সোনাবিবির মন্ত্রদাতা এবং সর্বময় কর্ত্তা দাগাদারীর জন্য এই ভয়ঙ্কর বিবাদ মিটল না। বিশেষ সোনাবিবির পক্ষে অর্থ সাহায্যকারী ধনকুবের, এই অল্প সময় মধ্যে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা সোনাবিবিকে কর্জ্জ দিয়াছে, অর্থের অনাটন নাই। কার্য্যকারকগণও সবল, বিশেষ ভেড়াকান্ত মন্ত্রদাতা, কিছুতেই আপস নিষ্পত্তির মধ্যে আসা দূরে থাকুক, সে কথাই কানে করল না। এই রিপোর্ট যাওয়ার পর, যাহা এসেছে, ঐ দেখ!"

হাত বাক্স হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া উভয়কে দেখান হইল। তিনজনে স্থির ভাবে মনে মনে পাঠ করিলেন। বড় বাবুর চক্ষু স্থির। ঋতুরাজ নিস্তব্ধ। হাকিম সাহেব পত্রখানি পুনরায় বাক্সে রাখিয়া পরস্পর মুখ চক্ষু নির্ব্বাকে নিরীক্ষণ করিলেন। পত্র পাঠে কার মনে কি ভাবের উদয় হইল, কে বলিতে পারে?

ঋতুরাজ বলিলেন—"তবে আর চিন্তা কি? কার সাধ্য এ চক্র ভেদ করে? রথ দেখা কলা বেচা দুই হবে। এক তীরে তিনটি পাখি পড়বে। এদিকে পোয়াবারো। ওদিকে পঞ্জা ছক্কা, আবার অন্য দিকে কি কিস্তি মাত। যদি ইচ্ছা করেন, ঘোড় গোড়ং বড় বড়েং পীল চক্র অশ্ব চক্র যা করেন সকলি সম্ভবে। এখন সমুদয় আপনার হাতে। যদি খেলাতে পারেন তবে আরও কয় দিন আমোদ্ চলবে। বলিহারি যাই তোমার কলমের খোঁচা!! তারপর পরামর্শ কি কথার?"

"তাও বলি। আমি নিজ মুখে মোক্তারের দলে স্পষ্ট ভাবে কিছু বল্‌তে পারি না। তুমি তোমার কোন নিজের লোক দ্বারা কোন কৌশলে এমন করে কথাটা, বসাবে, শীঘ্রই যেন আমি হাতে পাই। তুড়ুক পাছাড়কে বলে ঠকেছি। আমি জান্‌তেম, তুড়ুক পাছাড় মনিবিবির মোক্তার, সকল কথাই ভাঙ্গচুর করা যায়। কিন্তু শেষে বিশ্বাস সূত্রে জেনেছি, ভেড়াকান্তের অহিত অনিষ্ট তুড়ুক পাছাড় কিছুতেই মনের সহিত করবে না। কারণ তাদের দুই জনে বহু দিনের আলাপ! দাদা! মানুষ চেনা বড়ই কঠিন। কাকে কি বলব—শেষে হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে।"

"আচ্ছা! দেখা যাবে। আমাদের কিছুই কর্ত্তে হবে না। আমি একটু ঝুনঝান পেয়েছি, এক রকম শুনেও থাকব। জোগাড় হয়েছে। বোধ হয় আস্‌ছে কাল কাচারিতেই দেখতে পারেন। যেদিন সূত্রপাত হবে, সেই দিন বেগম সাহেবের পকেট থেকে ডবোল ডিনার আদায় করবো।"

"তোমার কি! গোবিন্দ, পেট পুরলেই আনন্দ। শোন না—আরও কথা আছে। আমি এই চালে চলতে চাই যে, দরখাস্ত দাখিল হলে, যেন ওটা কিছুই নয়, আমার যেন তত গ্রাহ্যই নাই, এই ভাবটা আগাগোড়া দেখাতে চাই।"

"পারলে ভালই। কিন্তু রক্তমাংসের শরীর, বিশেষ আমরা বাঙ্গালী, মাথা ঠিক রাখা, রক্ত ঠাণ্ডা রাখা, মুখের ভাবে অন্তরের ভাব গোপন করা সহজ কথা নহে। পারলে ভালই। বেশী দূর যেতে ইচ্ছা করবে না, তদবির পক্ষেও তত মনোযোগী হবে না। তারপর—যা—তা মনেই আছে।"

"সেও তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে। আজ হতেই সেকথার সূত্রপাত করা গেল। সকলে মিলে মিশে—বেগম সাহেবের মন রক্ষা— মান রক্ষা প্রতিজ্ঞা, রক্ষা করতে হবে।"

বড়বাবু বলিলেন, "নটবর থামহে থাম। ঐ দেখ। সবডিপুটী ভায়া, ননীর পুতুলটির মত গণে গণে পা ফেলে, মাথাটি হেঁট করে, হেলতে দুলতে যেন নবাব পুত্রের মত আস্‌ছেন। আমাদের কথা এই পর্য্যন্তই আজ রইল। তারপর সময় বুঝে ফের মিটিং-এ বস্‌বো।"

ঋতুরাজ বাবু বলিলেন, "সবডেপুটী আজকাল বড় গোলযোগে পড়েছে।"

"কি গোলযোগ? দিব্বি মাগটি পেয়েছে, দেখতে নাকি পরমা সুন্দরী।"

"পরমা সুন্দরী হতে পারে। কিন্তু বড় গোলযোগ—যদি শুনতে চাও, কোন সময় সে গুপ্ততত্ত্ব তোমাকে শুনাব : —এখন ওর সঙ্গে দু চার কথা না কয়ে, শুধু শুধু উঠে গেলে, মনে মনে ভাববে যে, কি গুপ্ত কথা হচ্ছিল আমাকে দেখে কথা বন্দ করে উঠে গেল।"

"ভায়া! নেড়ে জাত্ আমার চক্ষের শূল। আমার ক্ষমতা থাক্‌লে বাঙ্গলা দেশ থেকে সব মুসলমানগুলোকে তাড়িয়ে দিতাম।"

"বেগম সাহেবকেও?"

"সে কি মুসলমান? মুসলমান কুলে জন্ম কিনা জানি না। আত্মীয় স্বজন ভাই ব্রাদার মুসলমানের নামে পরিচয় দেয় বটে কিন্তু তারা মুসলমানের মত নহে।"

"ওহে! চুপ চুপ। এই যে। সেলাম সেলাম! আইয়ে মৌলবী সাহেব, বাইটিয়ে সাব।"

ডিপুটী সাহেব বসিলেন—গায় গায় ঘেঁসাঘেসী করিয়া আদর আহ্লাদে যেন কত পীরিত, কত প্রণয় ভাব দেখাইয়া, গায়ে গায়ে মিশিয়া বসিলেন, বসাইলেন। কিন্তু মনে মনে তিন হাত ফাঁক্। বিদ্বেষের ভাবও খুব আছে। তবে বাহিরে নয়, হৃদয়ের অভ্যন্তরে। হিন্দু মুসলমানের জীবনের শত্রু। তবে যে ভাব, ভালবাসা, মুখের মায়া, 'আমি তোমারই', সে কেবল আপন লাভ আর স্বার্থসিদ্ধির জন্য। ঋতুরাজ বাবুর সহিত সাবডেপুটীর প্রকাশ্যে খুব মেলামেশা, বন্ধুত্ব ভাব। হাসিতামাসা আমোদ-প্রমোদ রঙ্গ-রহস্য অনর্গল চলিয়া থাকে। চুরুট দেয়াশালাই দ্বারা অভ্যর্থনা হইল। তাহার পর কথা ফুটিল। ঋতুরাজ বাবুর মুখই আগে ফুটিল।

"দাদা। ঠিক বলবে তো? বলত—নূতন গিন্নির সহিত গরমিল ঘটিল কেন? তুমি থাক বাহিরে, তিনি থাকেন অন্দরে। খাওয়া দাওয়া দেখাশুনা হয় না কেন? মুখের কথাটি পর্যন্ত বন্দ হয়েছে। এত ভালবাসা, এত প্রণয় বিপরীত পীরিত। শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে মাংসে মাংসে সংযোগ। অস্থিতে অস্থিতে, কলিজায় কলিজায় এক। একের শ্বাস, অপরের প্রশ্বাস। একের ক্ষুধা, অপরের আহার, তাহাতেই ক্ষুধিতের পরিতোষ সন্তোষ। সময় সময় তাহাতেই নাকি অজীর্ণ দোষ। একের পিপাসা অপরের পান, উভয়ের পিপাসা নিবৃত্তি। একের নিদ্রার আবেশে শয়ন, তাহাতেই নাকি নিদ্রা সুখে তৃপ্তি। এমন মধুমাখা অতি উচ্চদরের প্রণয় মধ্যে কেন এমন বিপরীত ভাব প্রবেশ করিল? বার মাস না ঘুরিতেই বিরহের বীজ ফুটিয়া শিকড় দাবাইল। হৃদয়ক্ষেত্র ফুটি ফাটার ন্যায় ফাটিয়া চৌচির হইল! দাদা! বলত ইহার কারণ কি? আমরা তো তোমার শত্রু নহি। ভাব এখানে আমরাই তোমার ভাই, আমরাই তোমার বন্ধু!"

সবডেপুটী সাহেব একটু চড়ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ভাইরে! স্ত্রীলোকের মনের ভাব, গতি, কখন যে কোন দিকে যায়, ধায়, কোন কথায় কি হয়, জানি না। কিসে সন্তোষ,

কিসে অসন্তোষ, বিরোধ, জন্মায় বুঝিতে পারি না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আগাও পাইনে গোড়াও দেখি না।"

"গোড়া থাক্‌লে ত আগা। আসলে গোড়ায় ভুল, আগা ধল্লে কি হবে? সে আগা ধরবে কি করে? দাদা! চটোনো, এরূপ অসামঞ্জস্য পীরিত প্রণয়ের পরিণামে, আরও অনেক রকম কণ্টক আছে, বিষ আছে, আরও অনেক কথা আছে, তা আর আজ বলবো না। অনেক বেলা হয়েছে। তবে সংক্ষেপে এই বক্তব্য যে বর্ণপরিচয় আরম্ভ। এরপর দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ। তার পরে বোধের উদয়। কিসে কি হলো, কি কারণে সরল প্রাণে গরম মিশল, কিছুই বুদ্ধিতে আসে না। যা শুনি, সেও বিশ্বাসের কথা নয়। ইহার মধ্যে, ভায়া, তোমাদের দুই জনার মধ্যে, কোন কিছু অবশ্যই আছে।"

সবডিপুটী সাহেবের মনের মধ্যে বিদ্যুতের বেগ পরিচালিত হইল। হৃদয়কন্দরে, যেখানে অহোরাত্র টক্ টক্ করিয়া শব্দ হইতেছে, সেইখানে আঘাত লাগিল, শব্দের শক্তিও বৃদ্ধি করিল। "তোমাদের দুই জনার মধ্যে অবশ্যই কিছু আছে," এই কথাটাতেই যেন ডিপুটী সাহেবের সুন্দর মুখ-কান্তি মলিন হইল। ওষ্ঠাধর পরিশুষ্ক হইল। মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত বিদ্যুৎবেগে শোণিত সঞ্চারিত হইয়া মহা যন্ত্রণা উপস্থিত করিল।

কচি খোকা নহে, নূতন ব্রতী নহে, পাকা ঝানু। তখনি সামলিয়া বলিলেন, "বলিব, সকল কথাই বলিব। আজ বলিব না।"

"তবে উঠা যাক্। বেলা প্রায় ১২টা—রবিবার বলে কি আহার কর্ত্তে নাই?"

সকলেই এক সঙ্গে উঠিলেন। হাকিম সাহেবের করমর্দ্দন করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

দশম নথি

প্রিয় পাঠক! পূর্ণ জ্ঞান, সম্পূর্ণ শক্তি, অভ্রান্ত চিন্তা, অদ্বিতীয় ক্ষমতা, অকাট্য বিধান, নিখুঁত কার্য্য, নিষ্কলঙ্ক ও নির্মল ভাব এবং নির্ভুল কৌশল কাহার? কে এই অনন্ত গুণরাশির পূর্ণাধার?

দেবলোকে, স্বর্গ-লোকে, গোলকে, ভূলোকে, পরলোকে, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্রলোকে, তেজোময় সূর্য্যলোকে, বায়ু ব্যোম, সর্ব্বলোকে, তন্ন তন্ন করিয়া তত্ত্ব কর, সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান সহায়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্ধান কর, কে এই মহা গৌরবের অধিকারী? স্বর্গীয় দূত—দেব দানব—না রক্ত মাংস শরীরধারী মানব?

মুক্তকণ্ঠে যুক্তস্বরে, পশুপক্ষী, জীবজন্তু, বৃক্ষপত্রে, সাগর বারি পর্ব্বত নির্ঝরে, বালুকণা মেঘধারে, পদ পদার্থের প্রতি অণু পরমাণু এবং মৃত্তিকার স্তরে স্তরে সমস্বরে সপ্রমাণে বলিবে, "না, না, তাহা নহে। ও কথা যথার্থ নহে।"

সেই অদ্বিতীয়, অনাদি অনন্ত, অক্ষয়, অনন্ত, দয়াময়, অনন্ত সৃষ্টিকর্ত্তা, "এলাহি" ভিন্ন ঐ অনন্ত গুণ গরিমায় অন্য কোন জীব গুণান্বিত নহে। চিরঅন্ধ মানব, অনর্থক জ্ঞান, বুদ্ধিচিন্তা, শক্তি, কার্য্য কৌশল এবং ক্ষমতার প্রাধান্য দেখাইয়া, মিথ্যা গৌরবে মাতিয়া, অযথা অহঙ্কারে, একেবারে গলিয়া পড়ে। পদে পদে ভ্রম। পলে অনুপলে ত্রাস। শ্বাস-প্রশ্বাসে হৃদকম্প। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শক্তিহীন। আজ আছে কাল নাই, এই ছিল এখনি গেল। প্রত্যক্ষ প্রমাণে জানিয়া স্বকর্ণে শুনিয়া, তত্রাচ অত্যাচার, অবিচার, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ এবং অসার আশা দুরাশার বশবর্ত্তী হইতেছে। কোন সূত্রে কাহার সূত্রে কাহার সর্ব্বনাশ করিবে, কোন অস্ত্রে কাহার মুণ্ডপাত করিয়া রক্তের স্রোত বহাইবে, তাহারই সুপ্রশস্ত পথ আবিষ্কার করিতেছে। কি কৌশলে কাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে, তাহারই উপায় খুঁজিতেছে। কোন্ বিধান অবলম্বনে কাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া ফাটকে আটক করিবে, জীবন্তে মৃত যাতনা ভোগ করাইবে, তাহারই উপকরণ আয়োজনে রহিয়াছে। কাহার প্রাণের প্রাণ, চির ভালবাসা, ধর্ম্ম-পত্নীর সতীত্ব হরণ করিতে, কত মন্ত্র কত তন্ত্র কত তুক্ তাকের আশ্রয় লইতেছে। এই প্রকার, কত লোকে কত প্রকার পাপসাগরে অহরহ ডুবিয়া, পরিণাম-ফল ভুলিয়া হাসিতে হাসিতে শত শত পাপের বোঝা মাথায় ধরিতেছে। আজীবন মনের সুখে, সে দুরন্ত ভার মস্তকে স্কন্ধে পৃষ্ঠে বহিয়া, অন্তিম কালে কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত ভাব, জগৎ চক্ষুর গোচর করিয়া, সজল নয়নে, "হায় হায়! কি করিলাম! কি করিতে কি হইল। সাথী সঙ্গী কে কোথায় রহিল! কোন পথে কাহার সঙ্গে চলিয়া গেল।" এই অনুতাপ হৃদয়াগ্নির মহাতেজে দহিতে দহিতে ধন জন প্রিয় পরিজনগণকে রাখিয়া একা এক শরীরে জগৎ হইতে সরিয়া পড়িতেছে। মানব স্বচক্ষে দেখিতেছে, তত্রাচ অন্ধ, তত্রাচ অজ্ঞান, তত্রাচ মদমত্তে বিষয় ভোগে মাতওয়ারা—বিভোর!

পাঠক। মাথা-পাগলা রায় মনিবিবির অবৈতনিক চাকর! তাঁহার সহিত কথা হইয়াছে—মনিবিবি জয়ঢাক, ধূম্বলোচনের কথা হইয়াছে যে,—সোনাবিবির সম্পত্তি জবরানে লইতে পার, দাগাদারীকে তাড়াইতে পার, কি একেবারে হুগলী নদী পার করিয়া নিমতলার ঘাটে ভস্মে পরিণত করিতে পার, সোনাবিবির পক্ষের লোকজনকে, পথে অপথে, মাথায় বাড়ি দিয়া এদেশ হইতে, কি জগৎ হইতে, একেবারে দূর করিতে পার, সর্ব্বোপরি ভেড়াকান্তকে জেলে পুরিয়া ঘানিগাছ টানাইতে পার, তাহার প্রিয় পরিজন সন্তান সন্ততি শিশু সন্তানগণকে অজস্র ধারে কাঁদাইতে পার, তার অতি প্রিয় সহ ধর্ম্মিণীকে ধুলায় লুণ্ঠিত করাইয়া, তারই হস্তে, হস্তস্থিত বলয়াঘাতে মস্তক হইতে রক্তের ধারা বহাইয়া চক্ষুজলে বক্ষস্থল ভাসাইতে পার,—তাহা হইলে তোমার চাকুরী ধরা রহিল, প্রধান কর্ম্মচারী পদ বাঁধা থাকিল। এই আশায় মাথা-পাগলা রায়ের জমদ্বারে মনিবিবির অন্দরমহলে যাওয়া আসা। কার্য্যকারকগণ মধ্যে গণমান্য। তিনি চক্ষু উল্‌টাইয়া কথা কহেন, জোড়া ভ্রু সর্ব্বদা কুঞ্চিত করিয়া কি যেন চিন্তা করেন। লোকটা ইংরেজী-নবীস! কথায় কথায় ইংরেজী বুক্‌নি। বাঙ্গালা বোলে সর্ব্বদাই ইংরেজীর মিশাল। লোকে জানে, ভারি কর্ম্মঠ, কার্য্যে

পটু। মনিবিবি এবং তাহার কন্যাগণ জানেন, ভারি বিদ্বান। আইন নজীর কণ্ঠস্থ মুখস্থ। প্রধান প্রধান কার্য্যকারকগণ, মনিবিবির ও জয়ঢাকের দেওয়ান, মুচ্ছদ্দী, উকীল, মহকুমার মোক্তার বাবুরা জানেন, মাথা-পাগলা বাবুর কিঞ্চিৎ ঈষৎ ছাঁট আছে, নামের শেষ তিন অক্ষরের কিঞ্চিৎ আভাস আছে। গাজী মিয়াঁ বলেন, মাথা-পাগলা বাবুর উচিত কথা বলবার ক্ষমতা আছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে তুড্ডুক জবাব দিবার অভ্যাস আছে।

মাথা-পাগলা বাবু মনিবিবির অন্দর মহলে সেই পূর্ব্ববর্ণিত পর্দ্দার আড়ালে একখানি বেঞ্চে বসিয়া বলিতেছেন। ঘর-ভাঙ্গা ও বদ-হজম দক্ষিণ বামে উপবিষ্ট। পর্দ্দার অন্তরালে মনিবিবির এবং কন্যাগণ কান পাতিয়া শুনিতেছেন।

"বেশ হলো, ভাল হলো, খুব রগড় রহস্য হলো, মজা হলো, মজা হলো। সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস, আরব্য উপন্যাসের এক পালা আরম্ভ হল। ঢাক ঢোল মাদল, কাড়া, ডগর ডুগডুগী তমুল তালে বেজে উঠল। জয়ঢাকের নাম জাঁকিয়া জম্‌কিয়া চারদিক্ আলোড়িত করল। সোনাবিবির বস্ত্রহরণের পালা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ অপেক্ষা চিরস্মরণীয় হল। জমিদারের জননী হওয়া, যুবা পুত্রের কথামতে না চলা, চিরশত্রুর সঙ্গে নূতন সম্বন্ধের খেলা খেলা, আপন পায়ে আপন কুড়াল মারা, নালা কেটে ঘরে জল আনার ফল—হাতে হাতে পাতে পাতে, আঁতে আঁতে দেখিয়ে গেল। মাঠাকরুণরা মনে মনে মনকলা খেয়ে, ঝাঁপে ঝোঁপে লুকচুরি খেলে, ধর্ম্ম কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে, সদা আঁখি ঢুল ঢুল ভাবে, ঢলে ঢলে, পা পিছলে ভালবাসার পদতলে, গড়িয়ে গড়িয়ে আছাড়ী পিছাড়ী করে শেষে আবল তাবল বোলে, গুন গুন রবে চলে যান, ঘরকন্না, পুত্রকন্যা, আত্মীয়-স্বজনের মুখে চুনকালি মাখান,—এইটি বড়ই কলঙ্কের কথা, দুঃখের কথা—শত শত বার আপ্‌সোসের কথা। এ বদনাম হল কার? এ দুর্নাম হ্রদে ডুবল কে? দুর্যোধন না গান্ধারী? রাম না সীতে? যেই ডুবুক, এ কলঙ্কে মুখে কালী মাখালে কে? এ দেশজোড়া বদনাম পোরা কাল ছালা মাথায় উঠল কার? সমাজের চক্ষে ঘৃণার পাত্র হল কে? দশ হাত মাটি তলে দাবল কে? বড় বড় জমিদার, বড় বড় হাকিমানের নজরে মাথা হেঁট হল কার? আমার না তোমার? ও ঘর-ভাঙ্গা দাদা! কথা কও-না যে? মাথাটী হেঁট হলো আমার না তোমার? কি বল বদহজম চাচা?

(সুরের সহিত) উচ্চ মাথা হেঁট হইল,
জগতে কলঙ্ক রইল,
হায়! হায়! হায়রে কপাল।
না বুঝিয়া করে কাম,
শেষে হয় বদ্‌নাম,—
পরিণামে বিষম জঞ্জাল।
ওরে ভাই দাগাদারী,

করে এই ঝক্‌মারি,
ভেঙ্গে নিলি মরিচের ঝাল।
পুড়ক্‌ জ্বলুক তোর,—
ক্ষতি নাই কিছু মোর,
ক্রমে হবে আরো নাজেহাল।
তোর বুদ্ধি আছে ছাই
কপালেতে কিছু নাই,
বোকা গাধা গরুর রাখাল।
যার কক্ষে পড়ে যেই,
ঠুকে মজা মারে সেই,
আজ নহে দেখিবিরে কাল"
ঢাকে ঢোলে বাজে কাঠি
তুই ত ধোঁকার ঠাঠি,
লাঙ্গলের মুখে চাই ফাল।
তবে ত মেদিনী ফাড়ে,
চাষেতে ফসল বাড়ে,
ভোঁতা মুখে শুধু গোলমাল॥
আরে ভাই হয়ে দড়,
তবে গে ঘোড়ায় চড়,
চাবুকেতে পিট করো লাল।
তা নাহলে পড়ে তলে,
মুখ মুণ্ড যাবে গলে,
বাঁচিলেও যাবে পাছা ছাল॥"

কবিতা পাঠ শেষ হইলে পর্দ্দার অন্তরালে হইতে জানেরা অর্থাৎ মনিবিবির কন্যাগণ এবং মাথা পাগলের দক্ষিণ-বামের ঘর-ভাঙ্গা ও বদহজম চাচা হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। এ হাসির বিরাম নাই। বাহিরে থাকিলে পর্দ্দার মধ্যে,—পর্দ্দার মধ্যে নূতন স্বরে বাহিরে—বাহিরে থাকিলে পর্দ্দার অভ্যন্তরে—কখনও মিহি স্বরে, কখনও মোটা স্বরে আরম্ভ হয়। ঈশ্বর ইচ্ছায় বুবুজানেরা বার ভগিনী—কমি কিসে? একে একে মিঠে-কড়া উচ্চ-মৃদু হাসি হাসিলেও বার প্রকার হাসির লহরী খেলিবে। মাঝে মাঝ ভারী আওয়াজের খাদে মিশানো হাসি খোদ কর্ত্রী, মনিবিবির। মনিবিবির পীড়িত শয্যায় পড়িয়া মাথা-পাগ্‌লার কথা শুনিতেছিলেন। হঠাৎ কবিতা শুনিয়া হাসিতে যে পারে না, তবু কষ্টের সহিত কৃষ্ণ হাসি হাসিলেন। বুবুজানদিগের অনুরোধে মাথা-পাগল বাবুকে পুনরায় কবিতাটি

আওড়াইতে হইল। কবিতা আওড়াইয়া মাথা-পাগলা বাবু বলিলেন, "চাচা! আপনিই বলুন, বিচার করে বলুন, মাথাটা হেঁট হল কার?"

"বাপু, তুমি বলে ফেল। মনিব জমিদার সম্বন্ধে কথা—ভেবেচিন্তে বলতে হয়। বাপু! তুমি যে ভাবে বল্‌তে পার, আমাদের মুখে ও ভাবে অত বাহির হয় না? আমরা পারিও না। হাজার হক্ বাবু, তুমি ইংরাজী নবীস্। তোমার মুখের তেজ অন্য প্রকার, কথার ভাব ভিন্ন আকার, ওজন মাত্রা অন্যরূপ। মিষ্টির কথা আর কি বলব—ঠিক যেন খেজুরের তাতরস। রসনা খুব রসাল, গলার স্বরও চমৎকার। দাঁতেও বিষম ধার। কাট্ ছাঁট্ সহজেই হয়। শুনতেও ভাল লাগে। বাপুহে, তুমিই বুঝিয়ে দাও। খুলে বলো।"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মাথা-পাগলা বলিলেন, "কথাটা হচ্ছে কিছু কর্কশ। কর্কশ রসাল, না বুঝি তা নয়। চাচা, তার উপর হক কথা নিতান্তই কর্কশ—ধারাল বাব্‌লা কাঁটার মত কলিজায় বিদ্ধ হয়। পুলিশ পাহারায় দাগাদারীকে নিয়ে বাহির হইলেন। দেশের লোক দেখিল। মাথাটি হেঁট হলো, কার? আমারও নয়, তোমারও নয়। ধুম্বলোচন ভাই সাহেবেরও নয়। ধরিতে গেলে, দাগাদারীও নয়। সত্য কথা বলাই মানুষের কর্ত্তব্য। তাতে কেউ বেজার হন্, চটে লাল হন, নাচার! লজ্জা, এঁরও নয়, তাঁরও নয়। তবে বলি কার? যার বেশী লাগে তার। বুঝতে কি বাকি থাকিল। তা বলে আর ফল কি? তাঁরা ত বাড়ী ছাড়লেন, দরিয়া পাড়ি দিয়ে পার হলেন। এখন করি কি? উপায় কি?"

পর্দ্দার আড়াল হইতে মনিবিবির বড় কন্যা, ধুম্বলোচনের স্ত্রী বলিলেন "দেখুন, আপনারা রায় বাবুকে যাই বলুন, তিনি খুব ভাল কথা তুলেছেন, তাঁরা বাড়ী ছাড়লেন, ঘর দোর ছাড়লেন, এতেই যে আমাদের কাজের ইতি হলো, তাত নয়। বেশ কথা তুলেছেন, আপনারা পরামর্শ করে স্থির করুন, এখন কি কি কাজ কর্ত্তে হবে।"

ঘর-ভাঙা বাবুর শরীর স্থূল, কথা গভীর, দন্তপাতী প্রায় ওষ্ঠের বাহির—বোধ হয় যেন দিন রাত হা করিয়াই আছেন। কথায় কথায় চক্ষু ঠারেন্। সেটা নাকি তাঁর চির অভ্যাস। চক্ষু ঠারিয়া বলিলেন ঃ

"হুজুর! দাগাদারী কাণ্ডে সকল কাজ আমাদের মত নিয়ে করা হয় না। যখন ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন যা আমাদের বিদ্যায় বুদ্ধিতে কুলায়, তা নিবেদন করি! কার্য্য সম্পন্ন করা না করা হুজুরদের ইচ্ছা। 'আমরা হচ্ছি হুজুরের নিজ তাঁবেদার। জয়ঢাক সাহেব যদিও আমাদের হাতে আছেন, কিন্তু তাঁর আম্‌লা মুচ্ছদ্দী দেওয়ান কারকুনের অভাব নাই। তাঁর ষ্টেটের কার্য্য তারাই দেখে শুনে কচ্ছেন। আমরা কোন কথা বললে, তাঁরা কিছু বিরক্ত হন। তাঁরা সোনাবিবির পক্ষ হতে বিগ্‌ড়ে জয়ঢাকের পক্ষে এসেছেন, কাজেই তাঁদের কথা অন্যথা করতে পারেন না। জানি কি পাছে বিগ্‌ড়ে আবার উল্‌টা মন্ত্রে বিষ চালান দেন। তাঁরা আছেন, আমার এই প্রিয় দাদা আছেন, বদ্‌হজম চাচাজি আছেন, ওরাই এখন কি কর্ত্তব্য স্থির করবেন। স্থির করে শেষে জিজ্ঞাসা করেন, যা জানি যা বুঝি, প্রকাশ কর্‌বো—শুনা না শুনা আপনাদের ইচ্ছা, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও ইচ্ছা। এই দেখুন, আমরা

অনেক দিন বলেছি, হেবানামাখানা লিখা হল : ষ্ট্যাম্পে চড়ান হলো, কিন্তু দস্তখত করান হলো না, রেজীষ্টিএও হলো না। এখন আর কি হবে? তারা দিব্বি আপন কাজে গুছিয়ে এদের চক্ষে ধুলা দিয়ে চলে গেল। হাত ছাড়া হয়ে স্বাধীন জায়গায় চলে গেল। এঁদের হাতে আট্‌কা পড়ে, তারা বিপদে পড়েছিল। এঁরা ফাঁদ পেতে আটকে রাখতেই চেষ্টা কল্লেন, খাম্‌-খেয়ালি করে আসল কাজের দিক একটি প্রাণীও লক্ষ্য কল্লেন না। দলিলখানা দস্তখত করিয়ে নিলে আর কি কথা ছিল? এখন পাখি হাতছাড়া হয়েছে, সে আশাও উড়ে গেছে।"

মাথা-পাগলা বলিলেন, "ওরে দাদা! কথা বলতে ঐরকমই বলা যায়। আপন মুখ আপন জিহ্বে যে দিক টান, সেই দিকেই যায়, যে পাকে ঘুরাও, সেই পাকেই ঘোরে। দস্তখত জন্যে কি চেষ্টা করা হয় নাই? খুন কবুল। দস্তখত জন্যে তার কাছে সাহস করে দলীল নিয়ে যায় কে? দস্তখত করি বলে হাতে নিয়ে ফেড়ে ফেল্লে কি হত? দাগাদারীকে কাছছাড়া কর্ত্তে পাল্লে এক প্রকার সাহস করলেও করা যেত। কিন্তু তাত হলো না। কত চেষ্টা কত যোগাড় করা গেল, কিছুতেই কিছু হলো না।"

ঘর-ভাঙ্গা আঁটিয়া বসিয়া জোরে জোরে বলিতে লাগিলেন, "ওরে ভায়া। বাঁকা খাম বুঝি ঘরে লাগে না? দস্তখত না করলে বুঝি হয় না। সোনাবিবির হাতের লিখার মত বুঝি আর লিখা যায় না?"

মাথা-পাগলা—"আচ্ছা মানিলাম, দস্তখত হতো দাদা ঠাকুর! রেজাষ্ট্রি হত কি প্রকারে?"

ঘর-ভাঙ্গা হাসিয়া উচ্চহাসি হাসিয়া বলিলেন, "খুব বলেছ! ভায়া—লাখ কথার এক কথা বলেছ। আচ্ছা দস্তখত সম্বন্ধে এক নম্বর ভুল স্বীকার করো। মাথা নাড়লে হবে না—ও নেকা চালাকী কল্লে হবে না। মুখে স্বীকার কর, আমরাও শুনি, বুবু সাহেবরাও শুনুন। মুখে স্বীকার কর যে দস্তখত সম্বন্ধে ভুল হয়েছে। তারপর রেজাষ্ট্রির কথা বলি।"

মাথা-পাগলা কি করেন, যখন ভুল করিয়াছেন, ঠকিয়াছেন—স্বীকার করিতে হইল, "ভুল হয়েছে।" তখন ঘর-ভাঙা বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা ভায়া! দস্তখত হইল। ফি দাখিল হইল, সাব রেজাষ্ট্রার সাহেবের বারবরদারী দাখিল হইল। অবশ্যই গ্রহিতার যত্ন চেষ্টাই অগ্রগণ্য। তোমরাই আপিসে গিয়া দলীল দাখিল করিলে, সাব রেজাষ্ট্রার আসিলেন। খুব মনোযোগ করে শুনে যেও। সাব রেজাষ্ট্রার আসিলেন। দলীলদাতা কি সাব রেজাষ্ট্রার সাহেবের সম্মুখে দস্তখত দেখিয়া স্বীকার কর্ত্তেন? না এইরূপ পর্দ্দার আড়ালে থেকে দলীলের দস্তখত দেখিয়া স্বীকার কর্ত্তেন? একথা স্বতঃসিদ্ধ। তিনি যখন পর্দ্দানিসীন জানানা, জমিদারের স্ত্রী, জমিদারের মাতা, রেজাষ্ট্রারের সম্মুখে কখনই আসিতেন না। পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়াই সকল কাজ সারিতেন। আচ্ছা দাদা! সাব রেজাষ্ট্রার কি কথার আওয়াজে চিনিতেন যে সোনাবিবি পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া কথা বলিতেছেন? সোনাবিবি সোনাবিবির ঘরেই থাকিতেন। অন্য ঘরে অন্য এক সোনাবিবি বসাইয়া দিতাম। সে স্বীকার করিত—সে

বলিত আমার নাম সোনাবিবি—জয়ঢাকের মাতা—পিতার নাম—এই, স্বামীর নাম এই—। সনাক্ত করিতেন স্বয়ং জয়ঢাক, আমাদের জামাই বাবু। বুবুজানদিগের মধ্য হতে একজনকে সেখানে বসাইয়া দিতাম। তিনিও সনাক্ত করিতেন, সাক্ষী হইতেন, দলীলে সাক্ষীর শ্রেণীতে নাম সহি করিতেন। আচ্ছা! যদি বল সাব রেজাষ্ট্রার সন্দেহ করিলে কি হইত? এটা এখন তুমিই বুঝিতে পার—সাব রেজাষ্ট্রার সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য। যেখানে নিষ্কণ্টকে এক—এখানে কাঁটা ছিল, সন্দেহ ছিল, তার জন্য ত্রিগুণ চতুর্গুণ পঞ্চগুণ বেশী বাড়াবাড়ি দেখিতাম—এক হাঁকে দশগুণ দিতাম। তার উপর ইনাম দিতাম, বক্‌সিস দিতাম, খোরাকী দিতাম, বারবরদারী দিতাম, জলখাবার দিতাম, পান তামাকের জন্য ভিন্ন করিয়া দিতাম, না হয় আরও দিতাম, রেজাষ্ট্রার বাবুর স্ত্রীর জন্য হীরার অঙ্গুরী দিতাম, সোনার হার দিতাম, সঙ্গে সঙ্গে বারাণসীর একখানি সাড়ীও দিতাম। এতেও কি রেজাষ্ট্রী হইত না? এত যত্ন করিয়াও কি একখানা দলীল রেজাষ্ট্রী করিতে পারিতাম না? এ খবর সোনাবিবির কানেই যাইতে দিতাম না। অথচ নির্ব্বিঘ্নে দলীল রেজাষ্ট্রী হইয়া যাইত। কেহ কোন কথাটি বলিতে পারিত না। যদি বল, তারপর? তখন কিছুই নহে। এতগুলি লোক মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইয়া, কেবল একা সোনাবিবিই কি সত্যবাদিনী হইতেন?"

মাথা-পাগলা ক্ষণকাল স্থির-ধীর, যেন তিনি সেখানে নাই, এইভাবে থাকিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "দাদা! আর বলনা। কাজটা নিতান্তই অন্যায় হয়েছে। হাতে এসে হাতছাড়া হয়েছে। এখন পাতালে আর কি হবে? যা ঘটবার ঘটেছে, এখনকার পরামর্শ কি? উপায় কি?"

ঘর-ভাঙ্গা, "যা করিতে হবে, তাত এক প্রকার গড়া পেটা, রসান্ করা, ঠিকঠাক আছেই। এখন তোমরা সেধে উঠ্‌তে পাল্লে হয়।"

মাথা-পাগল—"জবরানে দখল। নাবালকের সম্পত্তি, সহজেই দখল হবে। প্রজার দোমনা আছে, কিন্তু লাঠির আগে ও দোমনা টিক্‌বে না। ধরুন, আমরা সব একমনা করে দখল কল্লেম, খাজনাও আদায় হল। বাকী রইল সোনাবিবির নিজ সম্পত্তি। তাতেই কিছু কলবল খাটাতে হবে। দাদা! জোর জবরানের কাছে লাগে কে? লাটির কাছে আসে কে? ভেড়ে কে? একদিকে মারধর অন্যদিকে মকর্দ্দমা চাপান। চাষার জাত, দশ বিশটা মিছে মকর্দ্দমা ঘাড়ে চাপলে কয়দিন বশে না এসে থাক্‌তে পারবে? তারপর মান-ইজ্জতের ভয় কার না আছে? নিতান্ত বেআড়া, কথার অবাধ্য, তার মধ্যে প্রধান প্রধান দুই চারজন মণ্ডল সরকার তালুকদারকে ধরে এনে, দেউড়িতে ফেলে, মুগুর পেটা কল্লেই সোজা হবে। যে যেমন, তাকে সেই ভাবে হাত করতে হবে। কার গায়ে হাত বুলিয়ে, কার মাথায় হাত ঘসিয়ে, কার নাকমলা কান মলার ভয় দেখিয়ে, কার বাড়ীঘর লুট্‌তরাজ করে, কার পাকা ধানে জোড়া জোড়া মই জুড়িয়ে, কার বাড়ীতে লাল দামড়া দাবড়িয়ে, বেড়া আগুনে ছারখার করে, "অলরাইট" করে দিতে হবে। পুলিশে বিশ্বাস নাই। যাতে কাজ পাওয়া যায়, যাতে বাধ্য থাকে, যা বলি তা শুনে, মনোমত চলে, তাই করে কাজ উদ্ধার করতে

হবে। যিনি হর্ত্তা, যিনি এদেশের কর্ত্তা, যাঁকে করে বেশী ভয়, তিনি ত এ পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষেই আছেন। তাকে ঠিক রাখতে বেগম সাহেবকে বিশেষ করে বলতে হবে। সোনাবিবি বেগম সাহেবের সাহায্য পাবেন না। বেগম সাহেব কখনই সোনাবিবির দিকে যাবেন না। মুখে আলাপ মাখামাখি ভাব, অন্তরে খুব ফাঁক। প্রকাশ্যে মিষ্টি, অন্তরে বিষ আগুন, যা বলো সকলই সম্ভবে। বেগম সাহেব তাঁর জেলায় চিরকাল জ্বলে পুড়ে খাক হয়েছেন, এমন সুযোগ পেলে কি তিনি ছেড়ে কথা বলবেন? কখনই না, কখনই না। আর চাই কি।"

ঘর-ভাঙ্গা—"আর চাই কি? হল তোমাদের কাজের ইতি।"

"না না—ইতি হলো বলছি না। এদিকের এই বন্দবস্ত। তারপর আদালতের পালা। নচ্ছার জিলায় লোক পাঠাতে হবে। যাতে সার্টিফিকেট ক্যান্‌সিল হয়, তার বিশেষ যোগাড় কর্ত্তে হবে।"

"যোগাড় কিছু নয়। ফরিয়াদী হবে কে।"

"ফরিয়াদী ঠিক আছে। এক ফরিয়াদী কেন? তিন-চার জনে, তিন-চার প্রকারে সার্টিফিকেট কেন্‌সিলের মকর্দ্দমা উপস্থিত করবে।"

ঘর-ভাঙ্গা বলিলেন, "আরও কথা আছে—এখনও—ছয় সাত দফা কথার আলোচনা করতে বাকী রইল। মাঝে একটা কথা বলি—ধনকুবের টাকার সাহায্য করবে নিশ্চয়। বুঝেছ ত এরই মধ্যে, অর্থাৎ কয়েদ, ধরপাকড়, এরই মধ্যে বার হাজার দিয়ে ফেলেছে। আরও দেবে।"

"কি সাহসে এত টাকা দেবে?"

"কি সাহসে দেবে? সম্পত্তি আছে, টাকা দেবে, ভাবনা কি? সোনাবিবির সম্পত্তির মূল্য অতি কম হইলেও চার লাখ। ধনকুবের সে দিন সকলের সম্মুখে বলেছে, আমি দু লাখ পর্যন্ত দিব। ভাব দেখি ভায়া। দু লাখ টাকা কম কথা?"

মাথা-পাগলা একটু রোষ ভাবে বলিলেন, "দাদা? তুমি আমার বয়সে বড়, কোন কোন বিষয় বুদ্ধিতে বড়। দু লাখ টাকা এক দমে ঘর থেকে বের করে দেওয়া সহজ কথা নহে! নিজের পরমায়ু আর পরের ধন, মানুষে কখনই কম দেখে না। তিনি ইচ্ছা কল্লে দিতে পারেন। কিন্তু বিনা স্বার্থে কে কাকে একটি পয়সা দেয় দাদা? আজ্ঞা মান্‌লেম তাঁর স্বার্থে আছে। সোনাবিবির নিজ সম্পত্তি কালে তাঁরই হবে এই ত আশা! আচ্ছা আমরা আর এক কল খাটাই না কেন?"

ঘর-ভাঙ্গা বলিলেন, "কি কল খাটাইতে চাও?"

মাথা-পাগলা একটু নরম অথচ ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "শুনুন। ধনকুবের পক্ষে সোনাবিবি যেমন, জয়ঢাকও তেমনি। মাতা-পুত্রে লড়াই। আমরা হাকিম সাহেবের নিকট এই কথাটা বলি যে, দেখুন হুজুর। মা-বেটা লড়াই। আপস নিষ্পত্তি হওয়াই সকলের ইচ্ছা। বিবাদ বিসম্বাদে ঘরটি একেবারে মাটি হবে। যে সকল লোক ইহার মধ্যে পড়েছে

সহজে নিষ্পত্তি হতে কখনও দিবে না। কারণ আপস হলে, তাদের স্বার্থের মাথায় আঘাত পড়ে। কাজেই নিষ্পত্তির আশা নাই। তার উপর কথায় বলে 'একে মনসা দেবী, তার আবার ধুনার গন্ধ।' সোনাবিবির হাতে টাকা নেই। ধনকুবের টাকা দিবেন। একের উপর নিগ্রহ, অপরের উপর অনুগ্রহ। তিনি যদি সোনাবিবিকে টাকা কৰ্জ্জ না দেন, তবে একদিনে কেন, এক মুহূর্ত্তে আপস হয়। তিনি যদি টাকা না দেন, তবে মা বেটায় এখনি মিলন হয়, একটি পুরাতন ঘর রক্ষা পায়। তাঁর চক্ষে সোনাবিবি আর জয়ঢাক একই পদার্থ। স্নেহ-মমতা উভয় প্রতিই সমান। জয়ঢাক তাঁর নিকট কি অপরাধ করেছে, সোনাবিবিই-বা কি উপকার করেছেন যে, টাকা দিয়া জয়ঢাকের সর্ব্বনাশ করবেন। ধনকুবের এ দেশের সকলের মাথার মণি, সকলের মান্যের পাত্র, সকলের ভক্তির ভাজন। তিনি এই ভয়ানক অনল সহজে নির্ব্বাণ করে দিবেন, না তিনিই টাকা দিয়ে আরও উস্কে দিচ্ছেন, আত্মকলহ কৌশলে বাড়াচ্চেন। ধনকুবের যাকে যা বলবেন, সে তা শুনে, সাধ্য নাই অবহেলা করে, মাথা নেড়ে অসম্মতির লক্ষণ দেখায়। তা না করে এক পক্ষকে নির্য্যাতন, অপর পক্ষকে পরিবর্দ্ধন পোষণ করে, একটি পুরাতন ঘর—নাবালকের সংসার একেবারে মাটি করতে বসেছেন। তিনি সাহায্য না করলে টাকা না দিলে কখনই দাঙ্গা ফেসাদ হয় না। আপনাকেও সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হতে হয় না। খুনজখম নিশ্চয়। ধরতে গেলে, তর্ক স্থলে বলতে গেলে, এ খুন জখমের মূল কারণই ধনকুবের। আপনি আপস নিষ্পত্তির জন্য অন্তরের সহিত যত্ন কচ্ছেন। যদি ধনকুবেরকে টাকা কৰ্জ্জ দেওয়া নিষেধ করতে পারেন, তা হলে কোন পক্ষকেই কোন প্রকারে বিপদে পতিত হতে হয় না? দেশ ঠাণ্ডা হয়—প্রজা রক্ষা পায়। আপনারও সুখ্যাতি হয়।"

ঘর-ভাঙ্গা বলিলেন, "ভাল কথা বলেছ, তোমার এই কথার মূল্য অনেক। আরও কথা আছে। যদি ধনকুবের হাকিম বাহাদুরের কথা না শুনেন, তাহা হইলে আরও ভাল হয়? হাকিম বাহাদুরে মনে একটু রাগের সঞ্চার হবে। আমাদেরও কার্য্য উদ্ধারের সুপ্রশস্ত পথ নূতন প্রকারে অন্য আকারে দেখা দিবে।"

"সে কেমন?"

"তা কি আবার ভেঙ্গে বলবো?"

"না বল্লে যে মাথায় আসছে না।"

ঘর-ভাঙ্গা বলিলেন, "তবে শুন! হাকিম সাহেব ধনকুবেরকে বলিলেন যে, আপনি টাকা কৰ্জ্জ না দিলে সকল দিক রক্ষা পায়, খুন জখম দাঙ্গা-হাঙ্গমা হইতেও উভয় পক্ষ বাঁচিয়া যায়। তিনি শুনিলেন না। শুনিবেনও না, কারণ তাঁহার স্বার্থ আছে। হাজার বুদ্ধিমান বিচক্ষণ হইলেও স্বার্থের নিকট অন্ধ। স্বার্থান্ধে তিনি হাকিম বাহাদুরের কথা মানিলেন না। আমরা হাকিম বাহাদুর দ্বারা জিলার হাকিমের নিকট সবিস্তারে লিখাইব—আরও দুইচার কথা অলঙ্কার যোগে দিব্বি সাজে সাজিয়ে, হাকিম সাহেবের দ্বারা জিলার হাকিমানের নিকট পাঠাইব। জিলার হাকিমানের চেষ্টাও ত আপসে নিষ্পত্তি করা। তাঁহারা ঐ রিপোর্ট

পাইলে নিশ্চয় ধনকুবেরকে লিখিবেন। ধনকুবেরই এই বিবাদের মূল ভিত্তি কারণ, জিলার হাকিমানের মনে অবশ্যই সে ধারণা হইবে। তাঁহারা এ কথাটা অতি সহজ জ্ঞানে বুঝিবেন যে, ধনকুবের টাকা দিয়াই এই বিবাদ আগুন গুরুতররূপে জ্বালাইয়ে দিচ্ছেন।"

"অতি উত্তম! অতি উত্তম। দেখুন, আর একটা কথা যোগ করলে আরও ভাল হয়। যদি জিলার হাকিম পর্য্যন্তই যেতে হয়, তা হলে এ কথাটাও হাকিম সাহেবের দ্বারা লিখাইতে হবে যে, নাবালকের সম্পত্তি দায়ে আবদ্ধ করে সোনাবিবি উপস্থিত বিবাদের সূত্রপাত কচ্ছেন। সোনাবিবির উপরেও জিলার হাকিম এরূপ ভাবে হুকুমজারি করেন যে তুমি টাকা কর্জ্জ করতে পারবে না।"

ঘর-ভাঙ্গা বলিলেন, "সেটা ধরাতে পাল্লে আর আমাদের বেশী দূর যেতে হবে না। যেমনই মাথা তোলা, অমনি লাঠির আঘাত। সব দিক পরিষ্কার। কিন্তু, ভায়া কথাটা ত আর গোপন থাকবে না। সোনাবিবির উকিল মোক্তারে হাকিমকে বুঝিয়ে দিবে যে, তাঁর নিজ সম্পত্তি দায়ে আবদ্ধ করে টাকা নিচ্ছেন। নাবালকের সম্পত্তি দায়সংযুক্ত কেন করবেন। তখন?"

"অরে দাদা ঠাকুর! টাকা কর্জ্জ করতে পারবে না এই কথাটা ত আগে হাকিমান মুখে বাহির হক, পরে দেখা যাবে। সে চিন্তা শেষে করবো।"

ঘর-ভাঙ্গা বলিলেন, "ও কথা ত গেল—এখন দাগাদারীর মকর্দ্দমার সাক্ষী প্রমাণ যোগাড় করা—সেই এক কাজ। আর হাকিম সাহেবকে খুব গোপনে বলে আসতে হবে যে, দাগাদারী মকর্দ্দমা আপনার হাত থেকে উঠিয়ে অন্য বিচারকের হাতে নিবার জন্য ভেড়াকান্ত সহিত বিশেষ পরামর্শ করেছে। শীঘ্রই রাজধানীতে লোক পাঠাবে।"

"ওহো! দাদা, আসল কথাই ভুলে গেছি! আমাদের মূল শনি প্রধান শত্রু ভেড়াকান্ত সম্বন্ধে কোন কথার আলোচনা করা হয় নাই।"

"তার আর নূতন কথা কি? সমুদায় সাব্যস্ত হয়েছে। ওদিকে বোধ হয় দরখাস্ত দাখিল করেছে। আজকেই খবর পাব। আপাতত 'ছেপখেক' গ্রামের ভিমরুল আর আর্শুলাকে ফরিয়াদী সাজায়ে দুই নম্বর উপস্থিত করা হয়েছে। এর পোষাকে আরও কিছু কর্ত্তে হবে। আচ্ছা ভেড়াকান্তর উপরে হাকিম বাহাদুর এত চটা কেন? কিছু সন্ধান পেয়েছে?"

"তা কি আর বাকী রেখেছি! হাকিম বাহাদুরের দৃঢ় বিশ্বাস ভেড়াকান্ত কিছু টাকা উপার্জ্জন করবার জন্যই সোনাবিবির পক্ষ সমর্থন করেছে। আর তারই কুমন্ত্রণাতে এই বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। তারই বদ্ সলা বদ্ পরামর্শতেই বিবাদ নিষ্পত্তি হচ্ছে না।"

"ওহে না! আরও কোন কারণ থাকতে পারে।"

"হাঁ, আরও কিছু আছে। তাও বলি, সেটা হলো মনের রাগ। সে রাগ প্রকাশ করার রাগ নয়। কথাটা কি? হাকিম সাহেবের বিরুদ্ধে—'মধুবনী' আর ধন্বন্তরী খবরের কাগজে কি যেন ছাপা হয়, তাতে হাকিম সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভেড়াকান্ত কৌশল করে কোন লেখক দ্বারা লিখিয়েছে। তাতেই মনের মধ্যে হিংসার আগুন ধুয়াচ্ছে। কোন দিক হতে একটু বাতাস লাগলেই দপ করে জ্বলে উঠবে।"

"ভেড়াকান্ত কি নিজে লিখতে জানেন? সে অপরের দ্বারা লিখবে?"

মাথা-পাগলা বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া দেখাইয়া ব্যঙ্গভাবে বলিলেন, "সে বিষয় ঘণ্টা। লেখাপড়া তথৈবচ। চিটীখান চৌপটীখান লিখতে টিকতে পারে, কিন্তু খবর লেখা সহজ কথা?"

"হাঁ, এই আসল মার-পেঁচের হাত এইখানে রয়ে গেছে। হাকিম সাহেবের মনে খুব আঘাত লেগেছে। হাতে পেলেই ভেড়াকান্তকে ডাকিয়ে ছেড়ে দিবেন।"

ঘর-ভাঙ্গা বলিলেন, "শুন, একটু এগুয়ে শুন। সকল কথাই হলো, একটা কথা আর বাকি থাকে কেন?"

মাথা-পাগলা এগুয়ে গিয়া শুনিতেই বলিলেন, "আমি উপস্থিত কচ্ছি। কি বল বদহজম চাচা, আমিই উপস্থিত করি।"

বদহজম—"আচ্ছা তবে আমি এখন উঠে যাই।"

বদ্‌হজম উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, মনিবিবিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হুজুর! আমি এখন বিদায় হই—অন্য সময় আস্‌বো।"

বদ্‌হজম চলিয়া গেলেন। মাথা-পাগলা পর্দ্দার নিকটে গিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "হুজুর! ওখানে কে কে আছেন? একটা গোপনীয় কথা বলতে চাই।"

পর্দ্দার অপর পার্শ্ব হইতে কথা আসিল, "বলো। এখানে আর কেউ নাই। আমরাই কয়েক জন আছি।"

"হুজুর! লাল আলু মোল্লাজীর মকদ্দমার কথাটা শুনেছেন। তারপর আমরা তাকে একেবারে জীবনের মত দেশ ছাড়া কর্ত্তে যোগাড় করেছিলাম। তা পুলিসের দৌরাত্ম্যে ঘটে নাই। এখনও সোনাবিবি স্বাধীন ভাবে অরাজকপুরে বসেছেন। তাঁর পক্ষের লোকজন মোল্লাজীর সাহায্যে দাঁড়িয়েছেন, কাজেই পূর্ব্বকথা বাতিল করে, এখন আপস রফা করার কথাই ধরা গেছে। যাতে আপসে মিটে যায়, সেইটিতে কর্ত্তে হয়।"

মনিবিবির কন্যা ক্রোধ-যুক্ত স্বরে বলিলেন, "সামান্য মজুর! তাকে পার কর্ত্তে পাল্লেন না, তাইতে দাগাদারীকে কি প্রকারে দেশছাড়া কর্ত্তে চেয়েছিলেন? যাতে হয়—ও নিমক-হারাম পাজিকে একেবারে দুনিয়া ছাড়া কর্ত্তে হবে।"

মনিবিবির রুগ্ন শয্যায় শুইয়া বলিলেন, অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "দেখ। একজনকে প্রাণে মারতে নেই। হাজার শত্রু হক—মানুষ। হক্ নাহক্ মাথায় বাড়ি দিয়ে মারাটা ভাল হয় না। যাতে নিষ্পত্তি হয়, যাতে মিটে যায়,—তোমরা এ কথাটা নিশ্চয় জেন, লোকে কখনই বিশ্বাস করবে না। যার মাথায় খোদা কিছু দিয়েছেন, সে কখনই এ কথা বিশ্বাস করবে না যে, তার সঙ্গে আমার নেকা হয়েছে। সোনাবিবি শত্রুতা করে যে এই মকদ্দমা উপস্থিত করিয়েছে, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। মোল্লাকে গোপনে ডেকে এনে বুঝিয়ে বল যে, সে কেন এমন পাগলামি কর্ত্তে বসেছে? আমি শুনেছি, সোনাবিবি তাকে এক হাজার টাকা দিয়েছে। মকর্দ্দমার খরচও সেই চালাচ্ছে। বদকথা যাতে বাড়াবাড়ি হয়, ততই বেড়ে

উঠে। আর বাড়াবাড়ি করে কাজ নেই। যত তাড়াতাড়ি হতে পারে, মিটিয়ে ফেল, সে মকদ্দমা মিটিয়ে নিক। তাতে যদি কিছু চায়, তা তাকে দেও। কলঙ্ক কথা—এমন টাট্‌কা মিছে কথা—বলতেও পাপ, শুনতেও পাপ। আমি তোমাদিগকে বার বার বলছি। তাকে ডাকিয়ে এনে কিছু দিয়ে মিটিয়ে ফেল।"

ঘর-ভাঙ্গা বলিলেন, "হুজুর! তাকে কোন লোক দ্বারা আপসের কথা বলা হয়েছিল। মনের খাঁটী ভাব পাওয়া যায় না। মুখে অনেক কথাই বলব। বোধ হয়, কিছু বেশী টাকা পেলে মকদ্দমা ছেড়ে দিতে পারে।"

মনিবিবি বলিলেন, "যাতে হয়, যে প্রকারে হয়, মকদ্দমা যাতে না চলে, তারই উপায় কর। মারধর, মাথায় বাড়ি কথাটা ভাল নয়। গরীব মানুষ—কিছু বেশী লোভ দেখালে অবশ্যই পড়ে যাবে।"

"হুজুর! আমরা চেষ্টার ক্রটি করি নাই। কিন্তু সে এখানে আসতে সাহস করে না। করবেই-বা কি করে? কাল তার প্রাণ বাহির করতে কত ফন্দী-ফেরের কল্লেম, আজ আমাদের কথায় বিশ্বাস করে,—এখানে আসবে? সে কি গরু যে কথায় ভুলে যাবে?"

মনিবিবি বলিলেন, "সে কি কথা! আহা! মানুষ! মানুষ!! তাকে কি গরু বলতে হয়? যাতে যে প্রকারে যে কৌশলে পারো, হাত কর। না আনতে পার, নিজে তার বাড়ীতে যাও। তোমাদের সঙ্গে কথা হলে অবশ্যই জানতে পারবে, সে কি চায়? নিতান্ত পক্ষে তোমাদের কথা না শুনে, আমার নাম করে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো, দেখি আমার কথা—কি প্রকারে? আমি বার বার বলছি, মোল্লাকে কেন, কারও প্রাণে আঘাত কর্ত্তে কখনই প্রস্তুত হয়ো না। তোমাদের মাতা-পিতার দোহাই, কোন লোককে প্রাণে মেরো না।"

কথা হইতেছে, এমন সময় এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি "দিন সত্যি, দিন সত্যি" শব্দ মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে মনিবিবির বাসগৃহের নিকটে আসিয়া খাড়া হইল। ঘর-ভাঙ্গা ও মাথা-পাগলা বাবু নারীমূর্ত্তির অপরূপ রূপ দেখিয়া মনিবিবিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হুজুর, এক ভিখারিণী এসেছে, দেখুন! আমরাও বিদায় হই। অনেক বেলা হয়েছে!"

এই বলিয়া কার্য্যকারকদ্বয় দস্তুর মত সেলাম বাজাইয়া বিদায় হইলেন। যাইবার সময় ভিখারিণীর প্রতি আড়নয়নে চাহিতে চাহিতে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। ভিখারিণী নাম শুনিয়া বুবুজানেরা অর্থাৎ মনিবিবির কন্যাগণ ত্রস্তহস্তে পর্দ্দা উঠাইয়া ত্রস্তহস্তে ভিখারিণীর সম্মুখে আসিয়া অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে খাড়া হইলেন।

ভিখারিণীর মাথায় লম্বিত জটাভার—গলায় নানা রঙ্গের কাচ, পাথর ও সোলেমানী দানার ৭/৮ ছড়া মালা। গায়ে গেরুয়া বস্ত্রের খেলকা—স্কন্ধ হইতে পদ পর্য্যন্ত ঢাকা। এক হস্তে রৌপ্য কড়া সংযুক্ত করঙ্ক, অন্য হস্তে ঘোর কৃষ্ণকায় আবলুস কাষ্ঠের আশা। কানে হাড়ের দুল। সোনা, রূপা লোহা, তামা এই চার ধাতুর অতি সরু সরু সাতটা

বলয়ই দুই হাতের অলঙ্কার। পায়ে রূপার খড়ম। মুখাকৃতির গম্ভীর। বর্ণ গৌর। ললাট অতি পরিপাটী, অথবা উজ্জ্বল। ললাটের উচ্চভাগে তিল পরিমাণ পরিসর রক্ত-চন্দনের সারি সারি তিনটি ফোটা। ফোঁটাত্রয়ের উর্দ্ধভাগে জটাসংলগ্ন সিন্দুরের সুদীর্ঘ দুইটি উচ্চ রেখা। নয়নদ্বয় প্রশস্ত ও উজ্জ্বল। টানা ভ্রু। নাসা সরল ও সুশ্রী। নাসাগ্রে চন্দনের সুদীর্ঘ তিলক। হিন্দু কি মুসলমান—চেনা ভার। কারণ ভিখারিণীর পরিচ্ছদ, আভরণ, সাজ-সজ্জায় দুই ভাবই বর্ত্তমান। সমুজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়, কখনও বামে কখনও দক্ষিণে, কখনও উর্দ্ধে ঘূর্ণায়মান। দৃষ্টি অতি চঞ্চল, অথচ প্রখর। মুখে কোন কথা নাই। কেবল গুন গুন শব্দে কি গাইতেছে—তাহা সেই জানে, ভিখারিণীই বোঝে। বিস্তারিত আঁখি দুটি যেন জলভরে ছলছল করে—আবার সরিয়া যায়। আরও আশ্চর্য্য! চন্দ্রমার পূর্ণ কলেবর দৈবাৎ কোন সাধারণ মানসচক্ষে পতিত হইলে, সে অতি বদ্ রসিক অপ্রেমিক পাষাণ পরাণ হইলেও দৃষ্টির স্থিতিকাল একটু দীর্ঘাকারে—না হয়, ফিরিয়া ফিরিয়া অন্তত দুই তিনবার দৃষ্টি করে। ভিখারিণীর সম্মুখে অর্দ্ধচন্দ্রাকার একযোগে বারটি পূর্ণচন্দ্র প্রকাশ, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে আপন মনেই সন্তোষ।

মনিবিবির দ্বাদশ কন্যা। দ্বাদশ পূর্ণচন্দ্র অতিরিক্ত বর্ণনা, কিন্তু দ্বাদশ চাঁদ-বদন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভিখারিণী দ্বাদশ চাঁদ-বদনের চাউনি পরাস্ত করিল। চাঁদে কলঙ্ক। সুতরাং চাঁদ-বদনে যে দু একটি কলঙ্ক-রেখা না আছে, তাহা নহে। কাজেই কলঙ্ক-রেখার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। ভিখারিণী নিষ্কলঙ্ক। অর্থাৎ তাহার সুগোল কমল-বদনে কোন চিহ্ন নাই। কলঙ্ক বিহীন চন্দ্র অন্য কোন জগতে আছে কিনা জানি না! এ জগতে কমলে কীট, চাঁদে কলঙ্ক—ইহা নিশ্চয়। তবে ভিখারিণী দ্বাদশ চাঁদবদনের দিকে একবারও নয়ন নিক্ষেপ করে না কেন? সে কি? ঈশ্বর-প্রেমে ভিখারিণী? না শুধু প্রেমের ভিখারিণী? মুখে কথাটি না ফুটিলে, বুঝি কি করিয়া? তবে যে ভাব, যেরূপ অপরূপ রূপ, নয়নের জ্যোতি, ললাটের চাক্‌চিক্য—কখনই শুধু প্রেমের ভিখারিণী নহে। তবে কি উদরান্নের ভিখারিণী? না, হইতে পারে না, অতি অসম্ভব। তাহা হইলে সম্মুখে সুবর্ণ রঞ্জিত, হীরক খচিত রজতে জড়িত, সুকান্তি প্রভাষিত, মাখন পরাজিত, সুকুমারী, কুমারী-অকুমারী, লক্ষ্মীরূপিনী দ্বাদশ ভগিনী বিরাজিত—ভিখারিণী চাহিলেই ত পায়। যা চায় তাই পায়। তবে চায় না কেন? লজ্জা? কিসের লজ্জা? ভিখারিণী রমণী, চাঁদবদনীরাও কামিনী। তবে লজ্জা? রমণীর লজ্জা কবির কল্পনায়—লেখকের মজ্জায়, আর লজ্জাবতী লতার গায়। স্পর্শ কর—শিহরিয়া উঠিবে, টোকা মার—অবনত হইবে, জড়িয়া ধর—পড়িয়া যাইবে। তবে কি ঈশ্বর-প্রেমে ভিখারিণী? তাই কি নিশ্চয়? রূপার খড়মেই যে বেশী সন্দেহ। ক্রমেই সময় ক্ষয়। যা হক। এক প্রকার ভিখারিণীরই জয়। কারণ ছিড়িয়া খাতুন বলিয়া উঠিলেন, "আপনার বাড়ী কোথায়?"

উত্তর নাই

তাঁহার বড় যিনি, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি চান্?"

উত্তর নাই।

তাঁহার বড় যিনি, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি হিন্দু না মুসলমান?"

ভিখারিণী একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন,

"একই পিতার দুই সন্তান।
কে হিন্দু কে মুসলমান?"

যাঁহার কথায় ভিখারিণীর উত্তর—তাঁর বড় যিনি, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আপনি কি জাতি?"

উত্তর—"নারী জাতি।"

চাঁদ-বদনীরা খলখল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ভিখারিণীও হাসির মাত্রাটা পূর্ব্ব হইতে একটু বেশী করিয়া, মধ্যম চাঁদ-বদনী অর্থাৎ যিনি একজনের ছোট তাঁহার হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তোমার কপালে বর নাই।"

ভগ্নীগণ অবাক্ হইলেন, সকলেই হাসির বেগ থামাইয়া ভিখারিণীর মুখের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ভিখারিণী সর্ব্ব-কনিষ্ঠা ছিঁড়িয়া খাতুনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি স্বামী পাইয়াও সুখী হও নাই।"

আর আশ্চর্য্য। ভিখারিণী মনের কথা মুখ দেখে বলে দেয়। আর আশ্চর্য্য। বার ভগ্নীর মধ্যে সকলের বড় যিনি, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। আর সকলের ছোট যিনি, তিনিও স্বামীর মুখ দেখিয়াছেন। যিনি পঞ্চম, তিনিও পতি লাভ করিয়াছেন। অবশিষ্ট আর নয় চাঁদ-বদনী কুমারী অবস্থায় জীবন কাটাইতেছেন। এরূপ ঘটিবার কারণ? পিতা নাই, মাতাও অন্ধ, চক্ষু থাকিতে অন্ধ—জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহের পর ক্রমে শ্রেণীমত বিবাহ না দিয়া কেবল স্বার্থ সাধন জন্য সর্ব্ব কনিষ্ঠা ছিঁড়িয়া খাতুনকে জয়ঢাকের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছেন। পঞ্চম চাঁদ-বদনী ইচ্ছা-বর গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আর সকলেই কুমারী। ভিখারিণীর কথায় সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কেমন করিয়া বলিল,—ছিঁড়িয়ার মুখ দেখিয়া কেমন করিয়া বলিল, "তুমি সুখী হও নাই।"

"আচ্ছা এই বার—বার বার এই বার।"

যিনি ইচ্ছা-বর লইয়াছেন, তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া চাঁদ-বদনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বলুন তো, এই কুমারীর কোন্ বর?"

ভিখারিণী পঞ্চম চাঁদ-বদনীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তর করিলেন, "ইচ্ছা-বর। আশ্চর্য্য বর। ক্ষুদ্র নটবর। কম নয় দ্বাদশ বৎসরের ছোট বর।"

ভিখারিণীর কথা কয়েকটি চাঁদ-বদনী আঁতে আঁতে বসিয়া গেল, ঘাতে ঘাতে মিলিয়া গেল, ভক্তি-রসের ফোয়ারা ছুটিল। মনিবিবিকে শয্যা হইতে উঠিতে হইল। যাতে হয়, যে কৌশলে হয়, হাত ধরিয়া হক, পা ধরিয়া হক, ভিখারিণীকে নিতান্ত পক্ষে আজিকার

দিনটা রাখিবেন, মনের কথা মন খুলিয়া বলিবেন, উত্তর শুনিবেন, ভাবি ফলাফল জানিয়া লইবেন, পীড়া কঠিন—আরাম হইবেন কিনা এ কথাও জিজ্ঞাসা করিবেন। সমুদায় অঙ্গে গলিতকুষ্ঠ ফুটিয়া ফাটিয়াছে, কষ্টের এক শেষ। যে মনের কথা জানে—সে সকলি জানে। বহু কষ্টে উঠিয়া বসিলেন—চাঁদ-বদনীদিগকে ইসারায় ডাকিলেন—ভিখারিণীকে সঙ্গে করিয়া ঘরের মধ্যে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

ভিখারিণী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিশেষ সমাদরে মনিবিবি তাঁহাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নিজ শয্যার পার্শ্বে আসন পাতিয়া দিলেন, ভিখারিণী সে আসনে বসিলেন না। মনিবিবির চাঁদ-বদনী নন্দিনীগণ নানা প্রকার স্তুতি মিনতি করিয়া, অতি উচ্চ আসনে বসাইতে চেষ্টা করিলেন—তিনি কিছুতেই সে আসনে উপবেশন করিলেন না। হাসিতে হাসিতে মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন। ভিখারিণী মাটিতে বসিলে সকলেই মাটিতে বসিলেন। মনিবিবি ব্যাধি শয্যা ছাড়িয়া ভিখারিণীর নিকট মাটিতে বসিবেন, ইচ্ছা করিয়া উঠিলেন—কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ মাথা ঘুরিয়া তক্তপোষ হইতে নামিতে পারিলেন না। ভিখারিণীও নিষেধ করিলেন।

ভিখারিণীরও পান-আহার জন্য বহু যত্ন করা হইল। তিনি কাঁচা আহার, ফল মূল দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কোন পাকা আহার করেন না, রুটির অন্ন ব্যঞ্জন আহার করা দূরে থাকুক স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না, ভাবে প্রকাশ করিলেন। ক্রমেই ভক্তি, ক্রমেই আদরের চূড়ান্ত। একদিন পরে একদিন আহার, তাহাও দিবসে নহে, রাত্রে। আজ আহারের দিন নয়। যদি একদিন এই স্থানে অবস্থিতি করেন, তবে আগামী রাত্রে ইচ্ছা হইলে, দুধ, কলা, যাহা সুবিধা হয়, আহার করিতে পারেন। আহার সম্বন্ধে কোন চিন্তা হইবে না—আয়োজন, জোগাড়েরও কিছু আবশ্যক করে না। এই সকল কথা শুনিয়া আরও অধিক পরিমাণে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন—হৃদয়ের অতি গভীর স্থানের ভক্তিরস দ্বারা ভিখারিণীর পদ-রজ ধৌত করিয়া, সুগন্ধিযুক্ত সুচিক্কণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কেশে পদদ্বয় মুছাইয়া দিতে কেহই ত্রুটি করিলেন না। তাঁহার রূপ, গুণ, ব্যবহার, হৃদয়ের অভ্যন্তরের অতি গুপ্তকথা মুখ দেখিয়া প্রকাশের ক্ষমতা দেখিয়া, সকলে স্নান-আহার পরিত্যাগে মন-প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। জননী নন্দিনী দ্বাদশ ভগিনী এক সঙ্গে ভিখারিণী-প্রেমে মজিয়া আত্মহারা হইলেন। পরস্পর সকলের মনেই আশা চপলা অতি চঞ্চলভাবে খেলিতে লাগিল যে, আমি বেশী পরিমাণে সেবা করিয়া ভক্তিভাবে মজাইয়া বাধ্য করিয়া মন সাধ পূর্ণ করিব। অন্তরের যাবতীয় ক্ষত এই তেজস্বিনী, অন্তর্য্যামিনী, তপস্বিনী মহোদয়ার কৃপা-কটাক্ষ ঔষধে আরোগ্য করিয়া লইব।

মনিবিবির কন্যাদিগকে বলিলেন, "জননী সকল—বাছা সকল! তোমরা এখন স্নানাহার করতে যাও। কিছুক্ষণ আমি আলাপ করব।"

চাঁদ-বদনীগণ একটু দুঃখিত ভাবেই কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন কি প্রকারে? কন্যাগণ চলিয়া গেলেন, মনিবিবি ভিখারিণীকে বলিলেন, "এমন

শক্তি নাই যে, আপনার নিকটে গিয়ে বসি। দয়া করে এই শয্যায় পার্শ্বে বসলে মনের কথা বলতে পারি।

ভিখারিণী আপত্তি না করিয়া মনিবিবির মুখের দিকে উদাস ও স্নেহের ভাবে চাহিয়া সেই গুন্ গুন্ রবের অব্যক্ত গান গাইতে গাইতে উঠিয়া কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

একাদশ নথি

মধুক্রমের মক্ষিকাসকল কোন ক্রমে তাড়াইয়া ভয়শূন্য করিলে, মক্ষিকাদংশন-ভীতি বিদূরিত হইলে, চক্রখণ্ড হস্তগত হইবার আশা জন্মিলে, মধুলোভী প্রাণীদল দলে দলে ছুটিয়া ছুটিয়া জুটিতে থাকে। ভাগ্যক্রমে কেহ খাঁটি, কেহ মলিন মধু, কেহ মক্ষিকাদলের মল মিশ্রিত অতি কদর্য্য পদার্থ লাভ করে, কাহার ভাগ্যে দুই একটি অন্ধ মক্ষিকার দংশন লাভ ঘটে। কপাল-ক্রমে কাহাকে একেবারে রুক্ষহস্তে, শুষ্কমুখে ফিরিতে হয়।

সোনাবিবি কয়েদ হইতে উদ্ধার পাইয়া অরাজকপুরে আসিয়াছেন। দলে দলে মধুলোভী মহোদয়রা সোনাবিবির বাড়ীতে আসিতেছেন, আত্মীয়তা দেখাইতেছেন, ভক্তি প্রেম ভালবাসার প্রমাণ করিতেছেন, তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কাতর ভাব প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার মন-কষ্টের সহযোগী হইয়া হা-হুতাশে মন-বেদনা জানাইতেছেন। কেহ তাঁহার কাবাগৃহের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া নয়নদ্বয় জলে পরিপূর্ণ করিতেছেন। কেহ বস্ত্র হরণের পালা শ্রবণ করিয়া কর্ণে আঙ্গুলি প্রদান করিতেছেন। যাঁহার বেশী লাভের আশা, অর্থ-মধু অধিক পরিমাণ সংগ্রহের আশা, তিনি কান্দিয়া আকুল হইতেছেন, জয়ঢাকের বুদ্ধি-বিবেচনায় শত শত ধিক্কার দিতেছেন, নিমকহারাম বিদ্রোহী আমলাগণকে জীয়ন্তে নরকে ডুবাইতেছেন, ঘর-ভাঙ্গা, মাথা-পাগল বাবুর পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ করিতেছেন, মনিবিবিকে অভিসম্পাত করিয়া পীড়া বৃদ্ধির কামনায় দয়াময়ের নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিতেছেন। এক দল বিদায় হইতেছেন, অন্যদল জুটিতেছেন। কুসিদজীবী মহাজন-পিশাচেরা সময় ও অবসর মতে সেলাম পাঠাইতেছেন। সপ্তাহকাল এইরূপে আশা-যাওয়া-কথা-বার্ত্তার অতীত হইল। নূতন আমলা অনুরোধে, আবশ্যক অনাবশ্যকে, খাতিরে, ভয়ে অনেক নিযুক্ত হইল। মন্ত্রদাতা, পরামর্শদাতার এক প্রধান দল জুটিয়া গেল।

মুসলমান রমণী মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা ও শিখিবার সুপ্রশস্ত পথ নাই, জ্ঞান লাভের কোন উপায় নাই, ভাল-মন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি নাই, সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার বুদ্ধি নাই, বিঘোর দুনিয়ার মারপেঁচ চক্র বুঝিয়া হস্ত পরিমিত স্থান অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই, কপট কৃত্রিম বাছিয়া পরিত্যাগ করার ক্ষমতা নাই, শত্রু-মিত্র চিনিবার চক্ষু নাই, সাত-পাঁচ কত হয়—গণিয়া বলিবার বিদ্যা নাই, সৎ-অসৎ বিচার করিয়া কার্য্য করিবার মাথা নাই।

তবে হাজারের মধ্যে একজনের দুই একটি, বড় জোর তিনটি বিষয়ে জ্ঞানবুদ্ধি, যাহাই বলি, কিছু আছে, দেখা যায়। দশ হাজারের মধ্যে একজন ঈশ্বরে ভয় পরকাল জ্ঞান বিশিষ্টা, পাপে, বিরতা, সদ্‌জ্ঞান সদবুদ্ধির অনুগতা। আর হাজারের মধ্যে একজন যিনি বুদ্ধিমতী, সে বুদ্ধিতে তাঁহার অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট লাভের আশা নাই। যথা গাজী মিয়াঁর বেগম সাহেব। কি কৌশলে মানুষকে ঠকাইবেন, কেমন করিয়া স্বার্থ সিদ্ধি করিবেন, কি উপায়ে একজনের সর্ব্বনাশ করিবেন, ঠকাইয়া দশ টাকা হাতে করিবেন, এই সকল জ্ঞান দেখিয়া শুনিয়া, ধর্ম্ম কর্ম্ম খোয়াইয়া, নারীধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া শিক্ষা করিয়াছেন। তাহাতেই তিনি সাধারণ সমাজে জ্ঞানবতী, বুদ্ধিমতী। বাঁধি গদে প্রেমপত্রিকা লিখিতে শিখিয়াছেন, তাহাতেই অরাজকপুরের হাকিমান চক্ষে তিনি বিদ্যাবতী। সাধারণ স্ত্রীলোক বিষয়ে ভাবিলে, তাহাদের বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি লক্ষ্য করিলে, মুসলমান রমণীর ন্যায় অবোধ-সরল মূর্খ আর কোন জাতির মধ্যে নাই। জগতে মুখ দেখিবার পর, বয়োবৃদ্ধির সহিত জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটে। প্রথম বয়সে, ধূলাখেলার তাহার পর বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত এক প্রকার বন্দিনী। কিছু বেশী বয়স হইলে অবিবাহিতা অবস্থায় জন্মদাতা পিতার সহিত পর্য্যন্ত দেখা হয় না—এ প্রথা ভদ্রসমাজেই প্রচলিত।

সোনাবিবির সম্বন্ধে গাজী মিঁয়া বলিতেছেন—সোনাবিবির বয়স চল্লিশের উপর। স্বামী বাঁচিয়া থাকা পর্য্যন্ত শিখিয়াছেন, পাঁচ সন্ধ্যা উপাসনার নিয়ম, এবং সেই উপাসনার পবিত্র কোরানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কএকটি "সুরা" (পদ) ও যাহা যাহা আবশ্যক। আর দেখিবার মধ্যে দেখিয়াছেন, বাড়ীর দ্বিতল ত্রিতল দালান, চতুষ্পার্শ্বের প্রাচীর, হাঁস, মুরগী, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষী। উদ্ভিদের মধ্যে দেখিয়াছেন, প্যাজ, মরিচ, বেগুন ইত্যাদি। স্বামী পরলোকে গমন করিলে পর আমলাগণ সঙ্গে কথা কহা, দাস-দাসী চাকরের উপর হুকুমজারি, গালাগালি, চক্ষু রাঙ্গাইয়া শাসন,—এ সকল বিষয় এক প্রকার ভালই শিখিয়াছেন। লিখাপড়ার মধ্যে অতি কষ্টে আপন নামটি সহি করিতে পারেন; কিন্তু তাহাও কাগজ ভাজিয়া না দিলে "দোত" হইতে কলমে কালি উঠাইয়া না দিলে, হয় না। নিজের বুদ্ধি খরচ করিয়া জমিদারী কার্য্য করিতে তাহার ক্ষমতা নাই। বিনা আক্কেল বরদারে কোন প্রস্তাব মীমাংসা, বিনা আক্কেল দরবারে সম্পত্তি রক্ষা, বন্দবস্ত, আয়, ব্যয় দেখিয়া ন্যায়-অন্যায় অবধারণ সংশোধন, কর্ত্তব্য পালন করিবার কোন উপকরণ তাঁহাতে নাই। আক্কেল বরদার দরকার। বর্ত্তমান আক্কেল বরদার মধ্যে, প্রধান দাগাদারী। দ্বিতীয় বে-আক্কেল। তৃতীয় তেনা-চেরা। দাগাদারী অনুপস্থিতিতে বে-আক্কেল। বে-আক্কেল কাছে না থাকিলে তেনা-চেরা। এই তিন মূর্ত্তিই সোনাবিবির মন্ত্রদাতা, সর্ব্বকার্য্যে পরামর্শদাতা; সকল বিষয়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা। কয়েক দিন হইতে গত "কয়েদ" কাণ্ডের মধ্য হইতে ভেড়াকান্তের কথা শুনিয়া থাকেন, কিন্তু আক্কেল বরদার তিন মূর্ত্তির অনুমোদন না হইলে শুধু ভেড়াকান্তের আক্কেলে আক্কেল হয় না, বিষয় সম্পত্তির কার্য্যও সুচারুরূপে চলে না।

আজকাল অরাজকপুরের অনেক বে-আক্কেল, আক্কেল বরদারীতে, মন্ত্রণা পরামর্শ দিতে অগ্রসর হইয়াছে। মক্ষিকা দংশনের ভয় নাই, অর্থ-মধু আহরণ চেষ্টা ক্রমে পরিপূর্ণ। উকীল মক্তার মন্ত্রদাতার অভাব নাই। হাঁকাহাঁকি দৌড়াদৌড়ি ব্যস্তত্রস্ত—কতই যেন কাজ, কতই যেন হৃদয়ের টান, কতই যেন কার্য্যে তৎপরতা, কতই যেন অনবসর। ধরিতে গেলে, কোন কাজ উপস্থিত নাই, অথচ ঘরে বাহিরে লোকের ভিড়।

দাগাদারী সাহেব সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহার আদেশ উপদেশেই কার্য্য চলিতেছে। সামান্য কার্য্যেও উকীল মক্তার ডাকিয়া পরামর্শ। এত চক্ষের জল, হা-হুতাশ, কিন্তু বাবুরা আপন আপন "ফি" বারবরদারী কড়া-ক্রান্তি করিয়া গণিয়া লইতে লাগিলেন।

গাজী মিঁয়া বলেন, বঙ্গরাজ্যে কসাই তিন প্রকার। গরু বাছুরের গলায় ছুরি দিয়া বাজারে মাংস বিক্রয় করে, সে আসল কসাই। দুই দলে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া কোন এক পক্ষের পক্ষ সমর্থনকারী প্রিয় উকিল মক্তারবাবু, যাহাদের আদৌ পসার নাই, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর কসাই। কোন মতের চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা না করিয়া ঔষধ অস্ত্রে ব্যবস্থাকারী কবিরাজ ডাক্তার তৃতীয় শ্রেণীর কসাই। এই তিন শ্রেণীর মানবাকার পশুহৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র নাই। সর্ব্বঅস্ত্রের অগ্রভাব গলায় দাবাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করাই ইহাদের প্রধান ধর্ম্ম।

মনিবিবির পক্ষেও দুই চারিজন কসাই যোগ না দিয়াছেন তাহা নহে। মনিবিবি আক্রমণ করিবেন, সোনাবিবি রক্ষা করিবেন। মনিবিবির পক্ষ হইতে আক্রমণ না হইলে; সোনাবিবির আত্মরক্ষা? মকদ্দমার মধ্যে কেবল দাগাদারীর এক মকদ্দমা, যাহাতে তাঁহার পাঁচ শত টাকার শত টাকার জামিনী হইয়াছে। আর লোকে বলে যে, মনিবিবির বিরুদ্ধে লাল আলু যে মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তাহাতে সোনাবিবির যোগ আছে। প্রকাশ্যে সে কথার কোন কথা পাওয়া যায় না। কাজেই মকদ্দমার মধ্যে ধর্ত্তব্য নয়।

এই সকল কাজের জন্য দিবা-রাত্র পরামর্শ চলিতেছে। দৈনিক "ফি" দিয়া উকিল মক্তার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

উকিলে উকিলে মক্তারে মক্তারে পরের জন্য যেন কাটাকাটি, মারামারি, কত প্রকার হিংসার ভাব। কিন্তু কাচারি ঘরের বাহিরে আসিলে, সেই হরিহর আত্মা, সেই ভ্রাতৃভাব, সেই প্রণয়, পীরিতি ভাব। তাঁহারাও দেখিলেন যে, সোনাবিবি মনিবিবিতে লাগে লাগে না, বাধে বাধে না, মনের মত মধু পাওয়া যায় না, বাক্স চক্রে পরিপূর্ণ মধু থাকিতে হাতে আসে না। ভ্রাতৃদলে, শাটে ইঙ্গিতে, ঠারে বিঠারে কথা চলিয়া পরস্পর সতর্ক হইলেন।

দাগাদারী ভাই দিনরাত খাটিতেছেন, স্নান-আহারের সময় পান না। দিবসের আহার সন্ধ্যার পর, রাত্রের আহার প্রভাতে। কি কাজে তিনি ব্যস্ত, তিনিই জানেন। উকিল মক্তারের বাসায় যাওয়া-আসা, কিসে কি হইবে, কি করিবেন, সেই চিন্তাতেই সর্ব্বদা অস্থির। অনধিকার প্রবেশ মকদ্দমা, পাঁচ শত টাকা জামিন—কম ভাবনার কথা? কারণ সোনাবিবি তাঁহার সম্পর্কে একেবারে ছাঁকনিছাঁকা খাঁটী মনিব নহেন, দুধ-ভাই। মুসলমান মধ্যে দুধ-ভাই একটা সম্পর্ক আছে। একের মায়ের দুধ অপরে পান করিলেই দুধ-ভাই সম্পর্ক জন্মে।

সোনাবিবি দাগাদারীর মাতার দুগ্ধ পান করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে দুধ-ভাই। ছেলেবেলা হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সোনাবিবির বাটিতে আছেন, একভাবে একত্রে এক সাথে আহারাদি করেন। জয়ঢাক নাবালগ, সুতরাং অনধিকার প্রবেশ অনিবার্য্য। শক্ত মকদ্দমা—বারিষ্টার না আনিলে স্থানীয় উকিল মক্তারের সাধ্য নাই যে, এমন কঠিন মকদ্দমা ভালভাবে চালায়।

দাগাদারী ঐ সকল কথা শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। সোনাবিবির নিকটে বসিয়া, মোক্তার বাবুদের বিবেচনার কথা, শক্ত মোকদ্দমার কথা, কথায় কথায় বলিতেছেন, এমন সময় দারওয়ান "জয়দেব" বাঁধা কোমরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার একটি কথা।"

উত্তর হইল—অবশ্যি দাগাদারীই উত্তর করিলেন, "কি কথা? এত রাত্রে কেন? খবর কি?"

"হুজুর! লাল গরু দেউড়ি পর্য্যন্ত এসেছে। ঐখানেই রেখে দেব, কি হুজুরে হাজির করবো?"

"আচ্ছা আমি যাচ্ছি।" এই কথা বলিয়া দাগাদারী অতি ত্রস্তপদে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। সোনাবিবি লাল গরুর কথা শুনিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। ক্ষণকাল পরে দাগাদারী আসিয়া সোনাবিবির কানে কানে কি কথা বলিতেই সোনাবিবি বলিলেনঃ

'দারওয়ানকে বল, ভেড়াকান্তকে ডেকে আনুক। আর এই পর্দ্দাটা বড় পাতলা, এটা খুলে খেরুয়ার পর্দ্দাটা বেন্দে দেও। পর্দ্দার বাইরে বসবার আসন পেতে রাখ। ভেড়াকান্ত আসলেই যেন গেট চাবি দিয়ে বন্দ করা হয়। তুমি লাল গরুকে খুব সাবধানে, গরুর গায়ে কাপড় জড়িয়ে সঙ্গে নিয়ে এসো। দারওয়ানকে ভাল জোরের ঘোড়া দেখে একখানা গাড়ী নিয়ে যেতে বল।"

সোনাবিবির আদেশ মত কার্য্য তখনই সম্পন্ন হইল। পর্দ্দা পরিবর্ত্তন, নূতন পর্দ্দা পত্তন, পর্দ্দার বাহিরে আসন স্থাপন, দাগাদারীর গমন, ক্ষণকাল পরে নূতন এক মূর্ত্তিসহ দাগাদারীর আগমন, নবাগত নরমূর্ত্তি সহ উপবেশন।

মাথা মুখ কাল কমফার্টারে জড়ান চক্ষু দুটি লম্বিত, নাসাটি এবং উভয় গণ্ডের কতকাংশ অনাবৃত। চক্ষু দুটি খুব বড় বড়, নারী মজান ভাব। স্বভাবতঃই ঐ ভাব—না অভ্যাস? দারওয়ান বলিল, লাল গরু দেউড়ি পর্য্যন্ত এসেছে। মুখে মাথা কাপড় জড়িয়ে আনার হুকুম। কাপড় জড়ান কথাটার সঙ্গে বেশ মিল, আর সকলি গরমিল। দিব্বি হাত-পা, মাজা মুখ, সকলি আছে। নাক চোখ ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পুচ্ছের নাম গন্ধ নাই। আরও হাসির কথা পায়ের সংখ্যায়। এই কি সেই লাল গরু? কথাটা কি? এমন দিব্বি সুপুরুষকে গরু বল্লে কেন? না এর কথা বলে নাই। গাজী মিঁয়া বলিতেছেন—পাঠক! এই আগন্তুক নরমূর্ত্তি আপনাদের অচেনা। দেখি, দাগাদারী কি বলেন?

এখনও চুপি চুপি কথা। নরমূর্ত্তি নির্ব্বাকে সোনাবিবিকে সেলাম জানাইল। সোনাবিবি সেলাম লইলেন কিনা দেখা গেল না। কারণ সে সময় উভয়ের মধ্যে বৃহৎ পর্দ্দা ঝুলিতেছে।

দাগাদারী চুপি চুপি সোনাবিবিকে আগন্তুকের সেলাম করা জানাইলে, পর্দ্দার আড়াল হইতে সোনাবিবি বলিলেন, "দোরটা বন্দ করে বসলে ভাল হত।"

দাগাদারী বলিলেন, "ভেড়াকান্ত আসলে আবার খুলতে হবে। এখানে এখন কেউ আসবে না।"

সোনাবিবি বললেন, "মোল্লার বেটা ভাল আছ ত?"

আগন্তুক মাথার বাঁদন খুলিয়া কম্ফারটারটা হাতে করিয়া উত্তর করিলেন, "হুজুরের দয়া।"

সোনাবিবি—"ওরা লোকজন দিয়ে নাকি বড় উৎপাত আরম্ভ করেছে?"

"এত মগের মুল্লুক নয়। এখানে অত্যাচার কল্লে—হুজুর বেআদবী মাপ হয়—উৎপাত কল্লে চিৎপাত হতে হবে।"

সোনাবিবি পর্দ্দার আড়াল হইতে খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে দাগাদারীও হাসিলেন। দুই হাসি একত্রে মিশিয়া, হাসির মাত্রাটি বেশী করিল। এদিকে ভেড়াকান্ত দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেই আগন্তুক ত্রস্তভাবে মাথা হেঁট করিয়া গায়ের কাপড় মাথার উপর দিয়া সমুদায় অঙ্গ ঢাকায়, দাগাদারী বলিলেন, "সে কি? আপনি কাপড়ের মধ্যে লুকাচ্ছেন কেন? আমাদের ভেড়াকান্ত।"

ভেড়াকান্ত ত্রস্তপদে গৃহমধ্যে আসিতেই দাগাদারী দ্বার বন্ধ করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিলেন এবং হাসির অবশিষ্ট অংশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "উৎপাতে কল্লে চিৎপাত হবে।" ভেড়াকান্ত এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। সোনাবিবিকে সেলাম জানাইয়া বসিলেন। সোনাবিবি ভেড়াকান্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাবাজি, এই ত মোল্লার বেটাকে এনেছি। যা যা বল্‌তে হয় বলুন। যা শুনতে হয় শুনুন!"

দাগাদারী পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মোল্লাজি এসেই এক কথা বলেছেন।"

ভেড়াকান্ত বলিলেন, "মোল্লাজিকে মনিবিবির লোকে বড়ই উৎপাত আরম্ভ করেছিল, শুনেছিলাম। তাই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তারা নাকি বড় উৎপাত করছে?" মোল্লাজীর উত্তর—'উৎপাত কল্লে, চিৎপাত হবে'।"

ভেড়াকান্ত হাসিলেন না, বলিলেন, "মোল্লাজী খুব রসিক মানুষ দেখ্‌ছি। আপনারা যে অর্থ খাটিয়েছেন, ভালই। তা ছাড়া আরও অর্থ হয়।"

সোনাবিবি বলিলেন, "বাবা! তুমি আবার কি মনে কল্লে?"

ভেড়াকান্ত বলিলেন, "ওর দুই তিন রকম অর্থ হয়। এক অর্থে চিৎ হয়েই আছেন, এখন পাত হতে বাকী। অর্থাৎ ব্যাধি শয্যায় সর্ব্বদা চিৎ হয়েই থাকেন, শুনেছি।"

"না বাবা। তুমি বহু দূরে নজর করেছ। মনিবিবি আমার নূতন সম্বন্ধে চিৎই হন্, আর পাৎই হন, যা ইচ্ছা হয় হন, এখন মোল্লাজির কথা শুনুন।"

ভেড়াকান্ত কিছু গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, "মোল্লাজি! আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর করুন। লোকে যা বলে বলুক, আপনি কি বলেন শুনি?"

মোল্লাজি মাথার কাপড় ফেলিয়া দাড়ী মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, "হুজুর যা জিজ্ঞাসা করবেন, তার উত্তর দিব।"

ভেড়াকান্ত বলিলেন, "আপনি এই নালিশ করেছেন কি লাভের জন্য?"

মোল্লাজি নিরুত্তর।

ভেড়াকান্ত পুনরায় বলিলেন, "আমার কথা বুঝতে পারেন নাই? আপনি যে এই নালিশ করেছেন, এতে আপনি সত্য সত্যই কি মনিবিবিকে স্ত্রী বানাতে চান? আমি বলি, আমি সে কথা বিশ্বাস করতে পারি না। কারণ মনিবিবির যে দশা, তাতে অমন রোগ-গ্রস্ত পচা শরীর, আজ বাদে কাল মাংস খসে পড়বে, এখনি আরম্ভ হয়েছে। এমন পচা সড়া, দুর্গন্ধ ওটা, পুঁজ রক্তে মাখান, বুড় একটা স্ত্রীলোককে স্ত্রী বানাতে কার সাধ হয় বলুন ত? এমন পচা শরীরের কাছে কে যায় বলুন ত? তার পরেও ঈশ্বর ইচ্ছায় তাঁর দাঁত পড়েছে, নিচের ঠোঁটখানি খসে পড়েছে, হাতে পায়ে, পায়ের তলায়, নাকের আগায় বাঘের ঘায়ের মত থক্ থক্ কচ্ছে। এমন লোকের কাছে কে বসতে পারে বলুন দেখি? আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। তবে কি আপনি স্ত্রী লাভের জন্য, আপনার ঘর-সংসার সুবিধার জন্য এই মকর্দ্দমা উপস্থিত করেছেন? কে এ কথা বিশ্বাস কর্ত্তে পারে? পুঁজ রক্তের দুর্গন্ধে, গলিত মাংসের দুর্গন্ধে, পেটের নাড়ী পর্য্যন্ত উঠে পড়ে। দিনে দশ-বার বার বিছানা বদ্‌লাতে হয়, ধরে তুলতে হয়, ধরে বসাতে হয়। ছুকরি বাঁদী কেউ কাছে যেতে চায় না—দেউড়ি পর্য্যন্ত গন্ধে মাতিয়ে তুলেছে। বড় মানুষ—জমিদার। কম হলেও দেড় শত দাসী, এক ডজন মেয়ে,—তাইতে রক্ষা। তা না হলে এত দিন, যা দশ দিনই হউক আর দশ মাস পরেই হউক, হবেই হবে। পোকা না পড়ে যায় না। আপনারা দেখবেন, না দেখতে পান, শুনবেন। পোকা পড়বে পড়বে পড়বে। হাড় পর্যন্ত খসে পড়বে। এমন সাধের স্ত্রীরত্ন সহিত সংসার-ধর্ম্ম রক্ষা করতে কি আপনি নালিশ করেছেন?"

মোল্লাজি বলিলেন, "তবে কি জন্যে করেছি?"

ভেড়াকান্ত বলিলেন, "হক কথা বড়ই কড়ুয়া লাগে। কথাই আছে, হক কথায় মানুষ রুষ্ট, গরম ভাতে বিড়াল অসন্তুষ্ট। আমার মুখে আর শুনে কাজ নেই। আপনিই বলুন।"

মোল্লাজি একটু বিরক্তির সুরে বলিলেন, "হুজুর। আপনিই বলুন, আমি কি উদ্দেশ্যে এই নালিশ করেছি।"

ভেড়াকান্ত বলিলেন, "মোল্লাজি! আপনি যখন শুনতে চাচ্ছেন, শুনুন!—মাপ করবেন। আপনি মাসিক ৩ টাকা মাহিয়ানায় মনিবিবির স্টেটে চাকর ছিলেন। জবাব হয়েছে, অবশ্যই মনে একটু রাগ জন্মেছে। আবার সে রাগটা তিন বছর হতে আপনার পেটের মধ্যে আর মাথার মগজের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোন উপায়ে সেই সঞ্চিত রাগ বাহির কর্ত্তে সুবিধা হলো, সাহায্য পেলেন। দেখুন! এখনও বলি, আপনিই বলুন।"

পর্দ্দার আড়াল হইতে সোনাবিবি বলিলেন, "না না! বাবা তুমিই বল।"

ভেড়াকান্ত বলিতে লাগিলেন, "মনের কথাটা মনের ভিতরে চেপে রাখা হল। নালিশ

রুজু কর্ত্তে সাহায্য পেলেম। যদি হেরে যাই, নোকসান নেই। যিনি সাহায্য করেছেন, তিনিই খরচা দিবেন। কেঁদে কেটে বলব যে, আপনাদের কথায় নালিশ করে আমার এই দশা। অবশ্যই যিনি সাহায্য করেছেন, তিনি যদি দয়ালু হন—তার যদি বিচার থাকে, তবে অবশ্যই খরচার টাকাটাও দিবেন। আর যদি জয়ী হই, তবে ত পোয়াবারো। লাভের উপর লাভ। মনিবিবি আজ বাদে পচে গেলে—কীট পিপিলিকার খাদ্য হবেন। আপনি জওজিয়তের দাবী করে, তাঁর তাজ্য সম্পত্তির সিকি অংশ মেয়েদের মুখে ছাই দিয়ে, জামাইদের কানটি মলে আদায় করবেন। দেখুন দেখি কত লাভ? অতি কম হলেও সিকি সম্পত্তির মূল্য চার লাখ টাকা! আর যদি তারা মানুষ হয়, মনিবিবির পক্ষে যদি ভাল লোক থেকে থাকে, যাতে হয় আপনাকে কিছু টাকা দিবে মকদ্দমা আপসে মিটাবে। আপনিও ভাববেন, কি জানি যদি হেরেই যাই, তখন কি হবে? দূর হক, এখন যা পাই তাই লাভ। আমি নিশ্চয় করে বলছি, এক হাজার—না হয় দুই হাজার, নিতান্ত জোর তিন হাজার পেলে এখনি মকদ্দমা ছেড়ে দিবেন। আপনার আশাই টাকা। নিষ্পত্তিতেও টাকা, জিতলেও টাকা। টাকা ছাড়া আপনার কোন আশা নাই। এই ত আমার ধারণা—এখন আপনার মনের কথা বলুন। কি আশা আপনার?"

মোল্লাজি বলিলেন, "আমার আশা স্ত্রীলাভ। তা আপনি যাই বলুন। আমি মকদ্দমা কখনি আপস করবো না। জিতলেও ছেড়ে দিব না। ঔষধ কল্লেই রোগ আরাম হয়। ঔষধ যদি নাও সারে, তবে আল্লা আরাম দিলে কে ঠেকায়?"

ভেড়াকান্ত বলিলেন, "আপনি ছাড়লেন না। আমার মুখে আরও কিছু শুনতে চান? আল্লা আরাম দিতে পারেন, খুব সত্য কথা! তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটু কিন্তু আছে। মনিবিবির যে পাপ—যে পাপে তাঁর এই দশা, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কুষ্টরোগে হয় না। মাংস খসে হাড়ের মধ্যের শাঁস পচে গলে পোকা পড়ে বাহির হলেও সে পাপের একাংশ মাপ হবে না। কারণ, খোদা তালাই আপন পবিত্র কালামে, স্বামীর মর্য্যাদার কথা, স্ত্রী-স্বামীর সম্বন্ধের কথা, স্ত্রীর কর্ত্তব্যকার্য্যের কথা উল্লেখ করেছেন। খোদার কালাম কি কখনও রদ হয়? বহুকালের নিমকহালাল চাকর, আপনি সকলি জানেন। মনিবিবি তাঁর স্বামীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করেছেন, তাতে ঐ কুষ্টরোগে শরীর তিল তিল করিয়া খসে পড়লেও ত সে পাপের প্রায়শ্চিত হয় না। আমাকে মাফ কর্ব্বেন, আমি আর বলতে চাইনে।"

সোনাবিবি বলিলেন, "বাবাজি যা বলেছেন, তার একটিও মিথ্যা নয়। আমারই ত ভাই! স্বচক্ষে অনেক দেখেছি। ভাল মুখে একদিন একটি কথা বলে নাই। সম্মুখে এলেই, শেল-কুকুরের ন্যায় তাড়িয়েছে। বেগুন সিদ্ধ, বেগুন পোড়া, খেসারীর দাল, ছাড়া আর কিছুই খেতে দেয় নাই। নিজে পোলাও কোর্ম্মা খেয়েছে, স্বামীর ভাগ্যে...। স্বামী স্নান কর্ত্তে একটু তেল পান নাই, তিনি ফুলেল তেল, আতর, গোলাপে ডুবে রয়েছেন। স্বামীর পরনে পাঁচ হাত মোটা মারকিনের তবন। আড়াই হাত গামছা বগলে চাপা। বাজারের মুদির দোকান হতে—হাতে হাতে তেল চেয়ে নিয়ে স্নান করেছেন। বিবি পালঙ্গের উপর দেড় হাত-পুর

গাদী, তার উপরে ডবল তোষক, তার উপর ফুল দলের মত সাদা চাদর, আশেপাশে পায়ের তলে মাথায় অতি কম হলেও ১৮টা বালিস নিয়ে পড়ে আছেন, দাসী-বাঁদীরা কেউ পা দাবছে, গা টিপছে, বাতাস কচ্ছে, কেউ চুলে বিলি দিয়ে উপরি ঘুষ দিচ্ছে। ভাই আমার বাহির বাড়ীর দালানের বারান্দায় চাটাই পেড়ে খালী শিয়রে সারা রাত ছট্‌ফট্‌ কচ্ছেন। মশার যন্ত্রণায় উঠছেন, বসছেন—এই প্রকারে উঠা বসা করে, রাত কাবার কচ্ছেন। খানসামাও ছিল। বিবি সাহেবের দেড় শত বাঁদী থাকতে খানসামা দুটকে ছেড়ে দেন নাই। এ কাজ সে কাজ কর বলে বন্ধ করে রেখেছেন। ভাই আমার কষ্টের একশেষ সহ্য করেছেন। কত বলব, সে সকল কথা মনে কল্লে বুক ফেটে যায়। সে পুরন কথা তুলে আর কাজ নাই। বাবাজী যা বলেছেন, তা ঠিক। ওর একটিও সাজান নয়। এখন কি কর্ত্তে হবে, তাই তাঁর কাছে শুনে রাখুন।"

মোল্লাজি বলিলেন, "হুজুর! আমি ধর্ম্মতঃ বলছি, কসম খেয়ে বলছি, দোহাই আল্লার আমি সত্য বলছি, দশ হাজার টাকা পেলেও নিষ্পত্তি করবো না, তাদের কথা শুনবো না। হুজুর যা বলেন, তাই করবো।"

ভেড়াকান্ত বলিলেন, "সে বিশ্বাস আপনাদের মধ্যে। আমার যা বুদ্ধিতে এল বল্লেম। কাজের নিয়ম ধরন যা তাও দেখালেম, এখন, আপনারা বিশ্বাস করে যা কর্ত্তে হয় করুন। তবে আমি আবারও বলছি, মনিবিবির পাপের অন্ত নাই। নন্দিনীরাও কম নয়।"

সোনাবিবি বলিলেন, "বাবা! তুমি এ সকল খবর কোথায় পাও?"

ভেড়াকান্ত বলিলেন, "খোদার মরজিতে আমার কানে কথা সকল বাতাসের আগে আগে ধেয়ে ধেয়ে আসে। আমি কি না জানি? দুলামিয়ায় তাস খেলা জানি। জলবিহার জানি, পোষ্ট মাষ্টারের গলায় ছুরি হাত কাটার কথা জানি। পেস্কার বাবুর আতর গোলাপ মাখা জানি। মৌলবীর ওয়াজ নসিহাত জানি। কুল গাছে কুল পাড়া জানি। আরও কত জনার কত জানি।"

মোল্লাজি বলিলেন, "হুজুর! আমাকে বাড়ী পাঠানের যোগাড় করে দিন। দিনের বেলা আমার যাওয়ার সাধ্য নাই।"

সোনাবিবি বলিলেন, "তবে কথাটা ত এই ঠিক রৈল। আপনি খোদার কসম খেয়ে আজ বল্লেন, নালিশ রুজুর সময় কোরান শরীফ ছুঁয়ে কি বলেছেন, সে কথাটা যেন মনে থাকে।"

মোল্লাজি বলিলেন, "তওবা, তওবা, আমি কি একেবারে গরু যে, আমি কোরান ছুঁয়ে এক কথা কয়ে টাকার লোভে সেই কথা ভুলে মকদ্দমা ছেড়ে দেব? ও কথা মনেই আনবেন না, মুখেও করবেন না, ইনশাআল্লাহ।"

"আজ আর এক গুপ্তকথা সেই বাড়ীর লোকের মুখে শুনেছি। সে বড় তামাসার কথা হুজুর। কোথা হতে এক যোগিনী না তপসিন্নি এসেছে, সে মনের কথা মুখ দেখে বলে দেয়। সেই নাকি বলেছে যোগবলে আমার মনের গতি মনিবিবির দিকে ভিড়িয়ে

দেবে। মকদ্দমা বিনা টাকায় বিনা খরচায় উড়ে যাবে। আর আপনারও যেন কি করবে।"

সোনাবিবি বিশেষ ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "যোগিনী কি? তপসিন্নিই বা কি? কথাটা কি আমি ত কিছুই বুঝলেম না। ভাল করে বুঝিয়ে বল।"

মোল্লাজি বলিলেন, "হুজুর! সেই ফক্‌রের মাকে চিনেন? সে খোদ কর্ত্তার সম্মুখেই সর্ব্বদা কাজ করে। সে তাঁর জামাইয়ের বাড়ী যাচ্ছিল। পথে আমার সঙ্গে দেখা। খোঁজখবর জানবার জন্য আমি ঘোড়াটা থামিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা কল্লেম। তাইতে কথায় কথায় সে বল্লে যে এক পাগলিনী এসেছে। মেয়েরা, খোদ কর্ত্রী ভারি ভক্ত হয়ে পড়েছেন। মেয়েরা মাথার চুল দিয়ে তার পা মুছে দিয়েছে। সেই পাগলিনী মন্ত্রের বলে আমার মন ফিরিয়ে দিবে। মকদ্দমা উড়িয়ে দেবে। আর আপনারও কি যেন করবে। আমি শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে ঘোড়া থেকে নেবে, ভাল করে শুনলেম। যাদুমন্ত্রের প্রতি তাদের ভারি ভক্তি। মন্ত্রের সাধনে মন ফিরবে? মিল-মিশাও হয়ে মিটে যাবে? আশ্চর্য্য মেয়েলী কথা! পাগলিনীর বরাত ভাল ভাল। সময়ই ভাল জায়গায় গিয়ে জুটেছে।"

সোনাবিবি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মোল্লার বেটা! আমাকে ঐ রকম একজন পাগলিনী এনে দিতে পারেন? তা হলে আমিও ২/৩টি লোকের মন ফিরাতেম।"

মোল্লাজি বলিলেন, "হুজুর! ও সকল কথা কখনই মনে করবেন না। মুখে আনবেন না। 'যাদুবর হাক কারণে ওয়ালা কাফের' *এ কথা মানি। কিন্তু পাগলীর যে সেই ক্ষমতা আছে, তাত কখনই বিশ্বাস হয় না। কেবল জুয়াচুরী ফেরেববাজী। ঐ রকম সাত দুগুণে চৌদ্দ ফকিরনী এসে, মাথা আছড়ে মন্ত্র পড়েও লাল আলু মোল্লার মন ফিরাতে পারবে না। যে মন ফিরেছে, সে মন আর ফিরবে না, ফিরতে পারে না। হুজুর। অনেক রাত হলো আমাকে বিদায় দিন।"

মোল্লাজি সোনাবিবিকে সেলাম করিয়া দাগাদারী সহ বাহির হইলেন। ভেড়াকান্তও সোনাবিবিকে সেলামের কথা বলিলেন "অনেক রাত হয়েছে, আমিও বিদায় হই। আমার নামে কে কে দরখাস্ত দিয়েছে শুনেছি। আমার কোন আলাপী লোকে বলে গেল। কিন্তু আমি ত কোন ঘটনা কি কোন কিছুর মধ্যে যাই নাই। তাইতে সন্দেহ হচ্ছে। কাল প্রাতেই জান্তে পাব। আজ বিদায় হই।"

ভেড়াকান্ত বিদায় হইলেন। দাগাদারী ভাই মোল্লাজিকে বিদায় করিয়া ফিরিয়া আসিতেই দ্বারে ভেড়াকান্ত সহিত দেখা হইল। সেইখানেই বিদায়, হস্তমর্দ্দন বিদায়। ভেড়াকান্ত দেউড়ি পার হইয়া গাড়ীতে চাপিলেন। দাগাদারী পর্দ্দা উঠাইয়া সোনাবিবির শয্যার পার্শ্বে বসিলেন।

সোনাবিবি বলিলেন, "বোধ হয় আমাদের ভিখারিণীই গিয়ে থাকবে? কার কি মনের কথা বলল? মন্ত্র, তন্ত্র, জিন, পরী, হাজির কর্ত্তে পারে, তাই জানি। মনের কথা বলতে পারে, তাত শুনি নাই!"

---

*যাদুমন্ত্র ঠিক, যে করে সে মহাপাপী।

দাগাদারী বলিলেন, "মানুষ কি চিনা যায়? আমরা, মানুষের উপরি উপরি চেহারা ও দুই একটি কার্য্যের ভাব দেখেই যা মনে উদয় হয়, সেইরূপ ধারণা করে বসে থাকি। তার কি কি গুণ, কি কি দোষ, দোষের ভাগ অধিক, কি গুণের ভাগ অধিক, সেদিকে ত লক্ষ্য করি না। ধরতে গেলে, গুণের দিকে চক্ষু পড়েই না। কেবল দোষেরই অনুসন্ধান করি, তাই দেখি। আচ্ছা ফিরে এলে এবার ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে। ভিখারিণী সামান্য ভিখারিণী নহে। ওর মধ্যে অবশ্যই কিছু আছে।"

"সাহস দেখ! স্বচ্ছন্দে তাদের সঙ্গে মিলে গেছে!"

"ধর্ম্মের আবরণ বড় শক্ত আবরণ, হঠাৎ ভেদ করে আসল মূর্ত্তি, সকল মানুষের দেখবার সাধ্য নাই। সকল চক্ষুর ক্ষমতা নাই।"

"এখন ভালয় ভালয় কাজ উদ্ধার করে আসতে পাল্লে হয়।"

"সে কাজ না সেরে আসবে না।"

"যা যা চাই, সকল জিনিসের দরকার, তা সে হাতে করেই ফিরে আস্‌বে।"

"এবার আমি দেখবোই দেখবো যে, সে মনের কথা বলতে পারে কি না। তাদের মনের কথা বলেছে। আমার মনের কথা বল্‌তে পারে কি না পরীক্ষা করবো।"

"পরীক্ষা করে লাভ কি? আরও ভয়, সন্দেহ বৃদ্ধি করা।"

"ভেড়াকান্ত বল্‌ছিল যে, তার নামে নাকি দুই নম্বর মকদ্দমা আজ উপস্থিত হয়েছে?"

"আমিও শুনেছি। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ধিনতাধিনা মক্তার বাবু বল্‌ছিলেন, দুই নম্বর নালিশ হয়েছে। এক নম্বরে ভীমরূলের ছেলেকে ধরে এনে কয়েদ রাখা জরিমানা করা। ২য় নম্বরে আরশুলাকে মারপিট করা। তা করুক! শুনেছি, হাতপাতা থানার দারগার প্রতি তদন্তের ভার হয়েছে। হাকিম বলেছেন, এ মকদ্দমা তার বিশ্বাস হয় না, মিছে। তুড়ুক পাছাড় নাকি একবারে নাছোড় হয়ে ধরেছিল। হাকিম সাহেবের ইচ্ছা তখনি ডিস্‌মিস্‌ করেন, কেবল তুড়ুক পাছাড় বাবুর কান্নাকাটিতে, শেষে হাতপাতা থানায় দারগাকে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলেছেন। দারগার হাতে যখন এসেছে, তখন আর ভাবনা কি? তবে বেশী ভাবনার কথা হচ্ছে আমার মকদ্দমা। সকলেই পরামর্শ দিলেন, মকদ্দমা উঠিয়ে নিয়ে, এই হাকিমের হাত থেকে উঠিয়ে নিয়ে অন্য হাকিমের কাছে বিচার প্রার্থনা করা।"

"তা কি হয়? এ কি ঘরাও কথা? না নিজের হাতের কথা? উঠিয়ে দিতে বললে—হাকিম তা দেবে কেন?"

"হাকিম কি আর ইচ্ছে করে দেবেন? উপরে যেতে হবে। সেখানে দরখাস্ত করতে হবে। সেখানে তাঁরা দেখবেন। এই হাকিম কি কি কাজ করেছে, বড় হাকিমেরা তা দেখবেন, দেখে যদি বিবেচনা করেন তবে—"

"তবে কি করবেন?"

"উঠাবার হুকুম দেবেন।"

"তা যদি হয়। আর নিশ্চয় জান যে উঠাবার ক্ষমতা আছে, তবে আর দেরি কর না। যাতে শীঘ্রই উঠে যায়, তার চেষ্টা কর।"

"চেষ্টা ত কর্ত্তে হবে। কিন্তু টাকা কিছু বেশী পরিমাণ খরচ হবে।"

"তা হক্। যত টাকা লাগে খরচ করো। যাতে উঠে যায়, তার তদ্‌রির ভাল করে করো। লাল আলুর কথায় আমার সন্দেহ হয়েছে। ভেড়াকান্ত যা যা বল্লে, তার একটিও মিছে নয়।"

"মিছে না হক, অত আগার, পাগার ভেবে কাজ কল্লে আর এ জামানায় কোন কাজ করা যায় না। লাল আলু তেমন লোকই নয় যে, তাদের কথায় ভুলে যাবে।"

"ভুলাতে কতক্ষণের কাজ। স্ত্রীলোকে যদি ইচ্ছা করে যে, আমি ওকে ধোঁকা দিব, ভুলাব, তবে হাজার বুদ্ধিমান, পণ্ডিত লোক হক্, ভুলে যাবে, স্ত্রীলোকের কথায় অবশ্যই ভুলে যাবে।"

"সকলে নয়।"

"সকলে নয় ত বাদ্ কে কে, বল্‌তে পারো?"

"সে কথা যখন বলতে হয় বলবো। আর একটি কথা। বেগম সাহেবের সঙ্গে খুব ভালবাসা ভাব দেখাতে হবে। জানেন ত, তাঁর সঙ্গে হাকিমানের খুব আলাপ আছে, তাকে হাতে রাখতে হবে।"

"তুমি গিয়ে ভাব করো, আর তাকে হাতে রাখো। তোমার ত হাতের মাল, হাত দেখালেই আবার ভাব হবে, হাতে আসবে, নূতন ভাবে বশ হবে। আমি কারও সঙ্গে ভাব-লাভ কর্ত্তে পারবো না।"

"মনে যাই থাকুক, কাজ উদ্ধারের জন্য নিতান্ত ছোট লোক, তিন পয়সায় মজুর, তাকেও ভালবাসতে হয়, ভাব করতে হয়, ভালবাসা জানাতে হয়, ভালবাসা দেখাতে হয়।"

"তুমি ভালবাসা দেখাও। তোমার পুরাতন কুটুম্ব, কুপ নূতন করে ঝালিয়ে লেও। আমার কারো সঙ্গে পীরিত প্রণয় নাই। ভালবাসা নাই।"

"আপনি একেবারে কথা খেয়াল করেন না—না শুনে, না বুঝে চটে উঠেন। হিন্দুশাস্ত্রে আছে, রামচন্দ্র দায়ে পড়ে কাজ উদ্ধারের জন্য গুহক চণ্ডালের সঙ্গে মিতালী করেছিলেন।"

"তা করুন। আমি রাম-শ্যাম জানি না, চিনিও না। আমি কখনই বেগম ঠাকুরানীর সঙ্গে পীরিত প্রণয় কর্ত্তে পারবো না, করবো না। যাও বেশী বকো না। আমায় ঘুমাতে দেও। তুমি তোমার বিছানায় যাও।"

দাগাদারী অরাজকপুর আসিয়া, বেগম সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসী মিশামিশি আরম্ভ করিয়াছেন। বেগমের সাবেক শিক্ষাগুরু দাগাদারী। হাতে ধরিয়া "ক খ" শিখাইয়াছেন। পূর্ব্বে বেগমের নিকটই প্রায় থাকিতেন। ধর্ম্মের লড়াই বাধাইয়া, হটুলটুর কল্যাণে ছাড়া হন। অরাজকপুর যে দিন আসিয়াছেন, সেই দিন হইতেই খুব মাখামাখি, সেই পুরাতন আত্মীয়তা ভাব দেখাইতেন। সোনাবিবি বেগমের নাম শুনিতে পারেন না। নামেই আগুন, ঐ নামেই সোনাবিবির মনে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। দাগাদারী আর বেশী কথা না বলিয়া আস্তে

আস্তে উঠিয়া বাহির হইলেন। দাড়াম্ করিয়া কপাট বন্ধ হইল। হুড়পাড় করিয়া হুড়কা পড়িল।

দাগাদারী নিজ শয্যায় শুইয়া আপন মকদ্দমা, অদৃষ্টের ফলাফল, ভবিষ্যতের ভাবনা, বেগম সাহেবের বর্ত্তমান ব্যবহার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ নথি

এক সময়ে এক মুখে তিনটি গল্প করা মানুষের অসাধ্য। একের অন্ত, অপরের আদি। ক্রমে পর পর কথা প্রকাশ না করিলে, একের মধ্যে এক যায়, সেই "এক যায়" মধ্যে 'অপর' প্রবেশ করে। কথার কথা—টানা-পড়েন, ঠিক থাকে না। কেহ ঠিক রাখিতে পারে না। কাজেই এক সময়ের ঘটনা কার্য্য কথা পর পর না বলিলে উপন্যাসের রস থাকে না, শুনিতেও ইচ্ছা করে না। যাঁহারা শুধু কেচ্ছা শুনিয়া যান, সময় সময় তাঁহাদিগকেও বিশেষ ধৈর্য্য ধরিয়া "কেচ্ছা খাঁ" অর্থাৎ উপন্যাস প্রকাশকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে হয়। যেমন পীড়ার পর আরোগ্য, রাত্রের পর দিন, বালিকার পরেই যুবতী, পরিশ্রমের পরই বিশ্রাম, দুঃখের পরেই আরাম, গ্রীষ্মের পরেই শীত, অধিক গরমের পরেই শীতল, ভাটার পরেই জোয়ার, প্রতিপদ পরেই চন্দ্রের উদয়, সেই প্রকার উপন্যাসেও তিক্তর পর মিষ্ট, নীরস কর্কশ পরেই রসাল মধুর, মন্দের পরেই ভাল। সুতরাং ধৈর্য্যচ্যুতি হইলে উপন্যাস শুনা যায় না, ভালও লাগে না।

প্রিয় পাঠক! বাধ্য হইয়া মূলকথা ছাড়িয়া অন্য কথা পাড়িতে হইল। সময়ের তাৎপর্য্যে বেল্লিক বাজারে আসিতে হইল। জগতে বাস করিলে তিতো, মিঠো, টক, কষায়, ঝাল, কোন স্বাদ নাই যেমন চোঁয়ান জল, সর্ব্বপ্রকার স্বাদ না লইয়া কেবল মধু মিষ্টই যে খাইতে হইবে, এ-কথা কোন মতেই সিদ্ধ নহে। কেবলই যে সুখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাও নহে। দুঃখের স্বাদ গ্রহণ না করিলে, সুসময়ের সুখস্বাদের মজা মিলে না। সুখ-দুঃখ মনের বিকার। লবণ, ঝাল রসনার গুণ। সময় অল্প, কথা অনেক—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এখন কথা বেগম সাহেবকে লইয়া। কুঞ্জ-নিকেতনে তাঁহার আদি বাস, বোধ হয় অন্তর্বাসও সেইখানেই হইবে। কুঞ্জ নিকেতন কি? কুঞ্জ-নিকেতনের জলবায়ু কি প্রকার, নিকেতন কি প্রকার? কুঞ্জই-বা কি প্রকার, সে কথা এ পর্য্যন্ত কোন স্থানেই খুলিয়া বলা হয় নাই।

"কুঞ্জ-নিকেতন" একটি গড়ের নাম। সৈন্যসামন্ত, বারুদ, গোলা, যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি যে গড়ে রক্ষিত হয়, এ সে গড় নহে। শত্রুগণের হঠাৎ আক্রমণের দায় হইতে বাঁচিতে, ধরাতল-তলে গৃহ আদি নির্ম্মাণ ও খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিবার নিয়ম যে বহু প্রাচীন

কাল হইতে আসিতেছে, এ সেরূপ গড় নহে। চোর-ডাকাতের ভয়ে বসতি স্থানের চারিদিক দীর্ঘ পুষ্করিণী অর্থাৎ কোন প্রকারে জলের খেলা থাকিলেই, গাজী মিয়াঁ যে-দেশের কথা কহিতেছেন, সে-দেশের সাধারণ লোকে তাহাকে গড় কহে। কুঞ্জ-নিকেতনও সেই শ্রেণীর—পুরাতন, অর্দ্ধ-ভগ্ন, অর্দ্ধ শুষ্ক একটি জীর্ণ গড়। অনেক স্থানে পরিসর আছে, গভীরতা নাই, দশ হাত খাই আছে, জল কণামাত্র নাই। কোন্ সনে, কাহা কর্ত্তৃক এই খাদ্ কাটা হয়, তাহার কোন কথা, কোন দেশের হিষ্ট্রিতে নাই, পুরাণে নাই, মহাভারতে নাই, শ্রীমদ্‌ভাগবতে নাই, চৈতন্য চরিতামৃতে নাই। যৎকিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত যা কিছু আছে, গাজী মিয়াঁর বস্তানীতেই পাওয়া যায়। সে সকল কথার এ সময় নয়। যদি অবসর ঘটে, তবে অনেকের জন্মকথাই পাঠক গাজীর মিয়াঁর কৃপায় জানিতে পারিবেন। এক্ষণে কথা এই যে "কুঞ্জ নিকেতন" একটি গড়ের নাম। সেই গড়ের চারিদিকে খাদকাটা বটে, জল নাই—পরিশুষ্ক। গড়ের উত্তর দিকে ছোট-খাট একটি পাহাড়। পাঠক! এ কথাটাতেও আবার কথা বলিতে হইল। মহাবিপদ, ভারি ঝঞ্ঝাট দেখিতেছি, কুঞ্জ-নিকেতনের—যাতে হাত দেই, যে দিকে চক্ষু ফিরাই, সেই দিকেই ঝঞ্ঝাট। সে কথাটা বলি—তাহার টীকা-টিপ্পনি না করিলে, বুঝাইতে পারি না। লোকে পাহাড় বলে, কিন্তু পাহাড় নহে। কত কালের বল্মীক মৃত্তিকা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এখন পাহাড়ের মত হইয়াছে। স্রোতস্বতী যমুনা পূর্ব্ব-দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া বহিয়া গিয়াছে। হায়! এ কি হইল?—আবার ব্যাখার দরকার হইল। সিরাজ আলি চৌধুরী স্থাপিত, সাত শত বিরাশি ঘর বারাঙ্গনা পুরিত, সিরাজগঞ্জের পদমূল ধৌত করিয়া যে যমুনা বেগবতী পদ্মাবতী সহিত বাইশ কোদালিয়া স্থানে মিশিয়াছে, সে যমুনা নহে। ভাগিনা প্রেমে উন্মাদিনী, মধুসূদন 'মামানী' বনবিহারী রাখাল রাজের উপপত্নী, স্বামী অয়ন বর্ত্তমানে পর পুরুষসহ বনে বনে বন-বিহারকারিণী, রাধে গোয়ালিনী, শত ছিদ্রযুক্ত কলসী কাঁখে লইয়া যে যমুনার জল তুলিতে গিয়াছিলেন, এ সে যমুনা নহে। উপপতির বংশীবাদন রব শুনিয়া ছটফটকারিণী, ননদিনী জটিলার তাড়নায় নির্জ্জনে নয়ন জল নিপাতিনী, রাই উন্মাদিনী, যে যমুনা কুলে নাগর লইয়া সতীত্বকুলে, রমণীকুলে, কলঙ্ককালিমা মাখাইয়াছিল, সে যমুনা নহে। যমদ্বার নির্ঝরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ নির্ঝরিণী হইতে প্রবাহিত হইয়া, কুঞ্জ-নিকেতনের পাদ ধৌত করিয়া মহাকলঙ্ক হ্রদে ভাসাইয়া, বগুড়ার অতি নিকট ভীম জাঙ্গাল সদৃশ গঞ্জনা জাঙ্গালের উপর হইয়া, সুনামগঞ্জের বাজার ডুবাইয়া, পতিপর্ব্বতের অতি উচ্চ গৌরব গাছের মাথা ডাল ভাঙ্গিয়া, পাপনগরের মধ্যে বহিয়া "হাবিয়া" সাগরে পড়িয়াছে। উদ্যান ভূমি বড়ই চমৎকার, নানাবিধ রক্ষলতায় পরিপূর্ণ। যদি বাক্‌শক্তি থাকিত, তাহা হইলে পাতা নাড়িয়া, আগা হেলাইয়া, শাখা ঝাড়িয়া, এ বলিত আমায় দেখ ও বলিত আমায় দেখ। চাল্‌তা বলিত, তেঁতুল ভাল নয়। জামরুল কহিত, জামের আদর কোথা? ভুঁড়িপেটা কাঠাল, ভুড়ি নাড়িয়া প্রকাশ করিত, আমের নাম করে কে? এই প্রকার ফুল দলেও ঐরূপ গণ্ডগোল। কেয়াদল মাথার চুল এলাইয়া, গোলাপের কণ্টকের কথা তুলিত। কুমুদিনী কমলিনীর নিন্দা গাইত। স্থানে স্থানে

কুঞ্জ—কৃত্রিম কুঞ্জ নহে, এ স্বাভাবিক বন্যলতায় কুঞ্জ। ঢোল কলম্বী, আঁসলতা, মাকাল লতা, বানর লতা, পিপ্পল লতা, পটল পট্‌পটী লতা এবং আলক লতার জঙ্গলেই কুঞ্জের সৃষ্টি। নিকেতনের বৃহৎ আয়তন দ্বিতল পাকা ঘর, দিব্বি সাজান, সেই জন্যই "কুঞ্জ-নিকেতন।" দালান কোঠার কথা, সাজ-সজ্জার কথা বিরুক্তি মাত্র।

সূর্য্যদেব কেবল মাত্র নিজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। এখনও গাছের পাতার উপরের শিশির ঝরে নাই। ডালের জল নড়ে নাই। নিকেতনে সকলে জাগে নাই। শয়নকক্ষের দ্বার খোলে নাই। বেগম সাহেবের শয়ন পালঙ্গ পার্শ্বে পালঙ্গের পায়া ধরিয়া এক পুরুষ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। বেগম সাহেব পর্য্যাঙ্কে পরি, ম্লান-মুখে বাম গণ্ডে বাম হস্ত দিয়া, মস্তক অবনতে উপবেশন করিয়া আছেন। নরমূর্ত্তি বেগম সাহেবের পরিধেয় অঞ্চল কোণের জড়িত সূত্র অন্যমনস্কে খুলিতেছে, দুই-একটি কথাও মুখে ফুটিতেছে।

নরমূর্ত্তি বলিতেছে, "কথা যখন দিয়েছি, কিছু টাকাও যখন নিয়েছি, কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজও দেখেছি, এখন আমি ফিরে বসি কি করে! তাহলে আর আমার মুখ থাকে না, ব্যবসাও চলে না। জগতে যত ব্যবসাদার আছে, সকলেরই এক-একটা ধর্ম্ম আছে—"

এই কথা বলিয়া নরমূর্ত্তি কাপড়ের অঞ্চল ছাড়িলেন। এতক্ষণ যোগ ছিল, সমভাবে সমান প্রকারে উভয়ের মনের গতি, শক্তি, সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে ছিল। বিদ্যুতের তেজ যাবতীয় তেজ অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। কোন কোন নির্দ্দিষ্ট ধাতুর সূক্ষ্মতার সংযোগে বিদ্যুৎযোগ বহু দূর দেশ পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে। আফ্রিকার মরুভূমি, মহাসমুদ্রের অতল জলরাশি, হিমালয়ের অতি উচ্চ চিরহিমানী-আবৃত কাঞ্চনশৃঙ্গ ভেদ করিয়া গমন করিলেও বিদ্যুৎ যোগ বিচ্ছিন্ন হয় না। জগতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঐ অমূল্য যোগ কৌশলেই ধারণাতীত অল্প সময় মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত আঘাতপাত হয়। উভয় সীমায় বিদ্যুৎ প্রস্তুতকারী পদার্থ সকল অপর্যাপ্ত ও অপরিমিত মতে রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট ধাতু নির্ম্মিত সূক্ষ্ম তারের পরিবর্ত্তে পাট, নারিকেল ছাল প্রস্তুত মোটা দড়ি সংযোগ করিয়া মৃত্তিকা সংলগ্ন কর, শত বৎসর চেষ্টা করিলেও, সংযোগের চিহ্ন লক্ষিত হইবে না, যোগ থাকিবে না। উভয় সীমায় সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রকাশক ক্ষুদ্র দণ্ড নড়িবে না, শব্দ হইবে না, চলিবে না, শব্দ বহন করিয়া লইয়া সীমা পর্য্যন্ত পঁহুছাইবে না, যোগ বিচ্ছিন্ন হইবে।

বেগম সাহেবের সহিত উপস্থিত নরমূর্ত্তির অন্তরে অন্তরে এমন সংযোগ উভয়ের শরীরস্থ তড়িত প্রবাহের এমনি আশ্চর্য্য গুণ, এমনি চঞ্চল শক্তি যে, বস্ত্রাঞ্চলের সূক্ষ্ম-সূত্র স্পর্শ সংযোগেও উভয়ের মন মধ্যস্থ বিদ্যুৎ যোগ সমবেগে চলিতেছিল। সূক্ষ্ম-সূত্র নিবন্ধন মৃত্তিকা স্পর্শ থাকা সত্ত্বেও সমান তেজে উভয়ের হৃদয়ে শরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায় সমতেছে, তাড়িত বেগ অতি বেগে ছুটিতেছিল। সেই নরমূর্ত্তি বস্ত্রাঞ্চল ছাড়িয়া বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, যোগ ভাঙ্গিয়াছে, বিজলীর খেলা বন্ধ হইয়াছে—বেগমের মনে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

সজল নয়নে, ভারী মুখ আরও ভারী করিয়া বলিলেন "আমার কথার নিকটে তোমার স্বীকার; কথা দিয়েছ, কিছু টাকা লয়েছ এই কথার মূল্যই অধিক হয়।"

নরমূর্ত্তি একটু মুচকে হাসিয়া বেগমের চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "আচ্ছা! তুমি যা বলবে, তাই শুনব। তুমি যাতে খুসী যাক, তাই করব।"

বেগম সস্নেহে নরমূর্ত্তির গলা ধরিয়া দুই গণ্ডে তিন চুমা দিয়া বলিলেন—"তা হবে না, কথায় হবে না। আমার মাথা ছুঁয়ে শপথ কর যে, সোনাবিবির পক্ষে যাব না, দশ হাজার টাকা দিলেও যাব না, কখনই ভেড়াকান্তের মকর্দ্দমার উকিল হব না।"

"আচ্ছা আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, সোনাবিবির পক্ষ সমর্থন করব না, ভেড়াকান্তের সাহায্য করব না, বিপক্ষেও যাব না।"

বেগম দুই চক্ষু তখনি জলে পূরিয়া অভিমানে নরমূর্ত্তির গলা ছাড়িয়া, পালঙ্কের অন্য পার্শ্বে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন, এবং গুন গুন স্বরে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিলেন "ভেড়াকান্ত তোমার কে? তার সঙ্গে বন্ধুত্ব কি? তার বাড়ী গঙ্গা পার। তার উপরেও আরও পার, তার পরে যমুনা পার। তার পর সোন্ ব্রিজ পার হয়ে, কোন জঙ্গলা দেশে। আর তুমি হলে স্বর্গ সদৃশ অমরাপুর পরাজিত রাজধানীর নিকটের লোক। তার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব কি? রূঢ় অঞ্চলের মাটিতে রস নাই, মানুষের মনেও দয়া-ক্ষমতা নাই, যেন শুক্‌নো পাথর।"

—আচ্ছা তাও ছাড়লেম। সে কাথাও উল্টালেম। যাতে খুসী, অধীনও তাইতে রাজী। আজ্ঞা হয়, তবে এখন বিদায় হই।"

বেগম একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মন্দ নয়! যে সকল দলিল কাগজপত্র দেখাতে লোকের উপর লোক পাঠিয়ে আন্‌লেম, কে জানে, কোথায় চলে যাবে। টাকা পেলে ত রক্ষা নেই। টাকাই তোমাদের মা-বাপ, টাকাই তোমাদের স্বর্গ-পুণ্য, টাকাই তোমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, টাকাই তোমরা চেন। খাতির মরুয়ত ত নাই। (মুচকিয়া হাসিতে হাসিতে) লজ্জা যে কোথায় লজ্জা পেয়ে চলে গেছে, তার খোঁজ-খবর সন্ধান পর্য্যন্ত নাই। ভাবলেম, রাত থাক্‌তেই যদি কোথায় চলে যায়, তাইতে দুপোর রাত্রে লোক পাঠিয়ে এনেছি। যে জন্যে ডাকা হয়েছে, তাহার কিছুই হয় নাই। কাগজপত্র বাঁধা বহি যা যা আছে—খুব মনোযোগ করে দেখ, কি কি চাই, আর কোন কাগজ-চিঠিপত্র-দলিল চাই কিনা, দেখে আমাকে বলে দিয়ে যাও। কোন কাজ হলো না, কাজের কিছুই হল না, অমনি দৌড়। আর একটি কথা তোমাকে বলে দেই। আমি বন্ধু-বান্ধবের মুখে এই দুরন্ত 'যাই" কথাটা শুনতে ভালবাসি না। যাই কথায় আমার মনে বেজায় আঘাত লাগে। তাড়াতাড়ি কচ্ছো কেন? তুমি না এলে আমি এতক্ষণ ঘুম থেকেই উঠতেম না।"

"একটু বিশেষ দরকার ছিল, তাইতেই।"

"কেউ কি বায়না করেছে?"

"বায়নার কথায় আমরা চটি না। ব্যবসাদারের বায়নাই হচ্ছে আসল কাজের গোড়া-পত্তন। "সাএত" লাভের আশা। কথাটা যদিও শুন্‌লে একটু বেয়াড়াগোছের বোধ হয়, তা চটে কি করবি? ব্যবসাদার মাত্রই বায়না পেলে খুসী। কি কর্ত্তে হবে হুকুম হক্।"

বেগম সাহেব আর একটু আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, "দেখ প্রাণ! প্রাণ খুলে দেখাই কি করে? হুকুম! তোমার উপরে হুকুম, তুমি আমার যে কাজ করেছ, সাধ্য নাই দেখাই কি করে, বুক চিরে দেখাই কি করে। তোমার উপর হুকুম নাই। আমিই তোমার হুকুমের তাঁবেদার। তোমায় গুণ আমার শিরায় শিরায় জাগে। তোমার স্নেহ, তোমার দয়া, তোমার মমতা, আমার প্রতি রক্ত-বিন্দুতে সর্ব্বদা আঁকা রয়েছে; কথায় প্রকাশ ভিন্ন প্রত্যক্ষ দেখাবার উপায় নাই। অন্তরের চিত্র, তোমার সম্মুখে ধরি কি করে। তুমি আমাকে রক্ষা করেছ, জীবন দিয়েছ। মৃত ব্যক্তিকে যেমন সঞ্জীবনী মন্ত্রে জীবিত করে, সেইরূপে আমার প্রাণ দান করেছ। মনের আগুন শীতল করেছ। ধাঁ-ধাঁ করে শত জিহ্বা বিস্তারে যে অগ্নিশিখা অন্তর-ভাণ্ডারে জ্বলে উঠেছিল, তোমার সুকৌশল সুশীতল বারিতে মুহূর্ত মধ্যে নির্ব্বাণ করে দিয়েছ। এই কঠিন সময়ে, ভাল কথা, ভাল উপদেশ, সৎ পরামর্শ এবং অর্থের সাহায্য করে, আমার জাতি, মান, সম্ভ্রম কুল, অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষা করেছ। তোমাকে আজ্ঞা করবো আমি? তোমার ঋণ ইহজীবনে পরিশোধ করার সাধ্য আমার নাই। অনাথা নিরাশ্রয়ার আশ্রয়ই সেই বিপদের কাণ্ডারী অনাথনাথ ভগবান। তিনিই আমার উপস্থিত বিপদকালে তোমার মত অকৃত্রিম অমূল্য বন্ধুরত্ন লাভ করে দিলেন। যেমন হাতে ধরে তুলে দেয়, সেইরূপ সুঁপে দিলেন। তোমার কল্যাণ কামনাতেই রক্ষা পেলেম, উদ্ধার হলেম। তোমার গুণ শত মুখে শত বৎসর বলেও আমি শেষ কর্ত্তে পারি না। সেই বিপদকালে তুমি সাহস সূচক কথাগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট বলে যদি আমার হৃদয়ে বল সঞ্চার করে না দিতে তাহলে যে পড়েছিলাম, পড়েই ছিলাম, পড়েই থাকতাম, আর খাড়া হতে পার্ত্তেম না। সম্মুখে গুণ প্রকাশ কল্লে তোষামোদ করা হয়। যাক এখন কথা হচ্ছে, তুমি আজ কিছুতেই যেতে পার্ব্বে না, বৃহৎ একটি ব্যাপার আছে, দেখ, এই পত্র দেখ।"

বালিসের নীচে হইতে পত্র বাহির করিয়া নরমূর্ত্তির হস্তে দিলেন। পত্র খুলিয়া পাঠ। নরমূর্ত্তি এইরূপ পাঠ করিলেন, যথা—

প্রিয় ভগিনি!

আপনার আদেশ ও উপদেশ মতে আগামীকল্য আড়াইটার পর ভ্রাতাগণ সহ কুঞ্জ-নিকেতন উপস্থিত হইয়া, হরিগান কীর্ত্তনের অঙ্গ—

এই পর্য্যন্ত পাঠ হইলেই বেগম একটু চকিতভাবে "অরে! ওটা কি! ওখানা নয়, ওখানা" বলিয়া বালিসের নিয়ে হাত দিয়া আর একখানা পত্র বাহির করিয়া নিজে নিজে পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ

"এই দেখ! তোমার হাতে এক দলের আগমন সংবাদ, আর এই পত্রে অন্য দলের শুভাগমনের কথা। এখন কোন দিক যাই, কি করি।"

নরমূর্ত্তি পত্র দেখিয়া চক্ষের ভ্রূ দুটি ঈষৎ কুঞ্চিতভাবে বলিলেন ঃ

"একদিনে এত হাঙ্গামা গোলযোগ বরদাস্ত করবেন কি প্রকারে?"

"তাইত তোমাকে যেতে দিচ্ছি না। তুমি সাহায্য না কল্লে একা আমার দ্বারা আঞ্জাম হওয়া ভারি কঠিন।"

মুখ ভারী করিয়া—"আমি ভাই তোমার সকল কার্য্যের সহায়তা কর্ত্তে পারবো না। তা কিন্তু আগেই বলে রাখছি।"

বেগম সাহেব স্নেহভরা হাসিমুখে নরমূর্ত্তির বাম গণ্ডে অতি স্নেহের অতিরসের প্রেমপূর্ণ সেই এক প্রকার চপেটাঘাত করিলেন, যাহার বর্ণনা করিতে কবি পরাস্ত ও নিরস্ত। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, ওরূপ চপেটাঘাতের মূল্য নাই। কারণ দৈব আনকূল্য ভিন্ন মানব বুদ্ধি করিয়া ওরূপ আঘাত ঘটাইতে পারে না। আঘাত অথচ মধু হইতে মিষ্টি মুখে বলিলেন, চক্ষু ঘুরাইয়া তারা বাহির করিয়া বলিলেন ঃ

"চুপরাও।"

নরমূর্ত্তি মিষ্টির লোভে তখন পর্য্যন্ত জিহ্বা দ্বারা ঠোঁট চাটিতেছেন। চাটিতে চাটিতে বলিলেন ঃ "হাকিমের দল, ডাক্তার, ডাকের বড় বাবুও দেখছি। উকিলের দলটা বাকী রৈল কেন?"

"তাও আছে।

ত্রৈলক্ষ্য, ঈশান, কণ্ঠ, শশী, বনমালী।

সারদা, বরদা, রাম, যাদু, যদু। কালী।

শুনলে! এঁদের আসবার কথা আছে।"

নরমূর্ত্তি দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেনঃ "সর্ব্বনাশ! তা কি হতে পারে। ওরে বাপরে! তাহলে কি জাত থাকে। তাদের সঙ্গে দেখা হলে কি আর মান থাকে! না আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, বসতে হলো।"

এই বলিয়া নিকটস্থ একখানা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন এবং পুনরায় বলিলেন, "তাঁদের সম্মুখে কি আর এই বেল্লিকিপনা করতে পারি। তখন সেই এক ভাব।"

বেগম বলিলেন, "সে কি! তারাও ত ভদ্র-সন্তান।"

"ভদ্র-সন্তান হলে কি হয়? তাদের কাছে, এমন সৎ, এমন নম্র, এমন সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ের ভাব দেখাই, তারা মনে করে যে, আমি একজন দেবতুল্য মানুষ। আজকাল দেখবেন, জগতে প্রায় মানুষই দোমুখো ভাব, দোরঙ্গা বসনে ঢাকা। দুই নৌকায় পা। কাজ উদ্ধার নিয়েই কথা।"

"কাজ উদ্ধার ত বটে, দু নৌকায় পা রাখলে কি যে ফাটে।"

"তাত বটে। আজকাল আর তেমন বোকা নাই। যে জানে, সেই পা রাখতে জানে—খেলওয়াড় যে, তার ফাটে না। ঘোড়ার নাচ দেখ নাই। দুই পা, দুই ঘোড়া; দুই কেন, সাত ঘোড়া দুই পায়ে চালাচ্ছে, দাঁড়িয়ে—ঘোড়ার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে দুখানি পায় সাতটি ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। যিনি পেটের কথা মুখে আনলেন। কথা নাই ঠক্‌লেন।"

বেগম বলিলেন, "ওসকল পচা কথা রেখে দাও। হাকিমানের দল দিনের বেলা আসবেন না। সন্ধ্যার পরেই তাঁদের আগমন। তুমি তাঁদের দলে মিশবে কিনা বল? আমার চারিদিক ভেবে-চিন্তে সকল কার্য্যের বিলি-ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে।"

"দেখুন! আমি হাত জোড় করে নিবেদন কচ্ছি, আমাকে কোন দলে ফেলবেন না। আমি আপনার এই ঘরে শুয়ে-বসে সময় কাটাবো। আমি কোন দলে মিশবো না।"

"আচ্ছা, বেশ ভাল কথা, তুমি আমার এই শয়ন ঘরেই থাক্‌বে। যদি কিছু দরকার হয়, সঙ্কেতে কোন চাকর দিয়ে জানালেই আসবো। বেলা কম হয় নাই। সেই ঘুম থেকে উঠে বক্ বক্ কচ্ছি।" আর ঐ দেখ—"

"ঠিক। ঠিক। দশ মিনিট কম দশ।"

"আর বসবো না—তুমি এইখানে বসে এই বইখানা পড়। আমি স্নান করে আসি।"

"আচ্ছা তা আমি থাকি। কিন্তু—"

বেগম বলিলেন, "হাঁ হাঁ। বুঝেছি, বুঝেছি। সে কথা আমার মনে আছে। ঐ যে স্নানাগার দেখ্‌ছো, ঐখানে জল এনে দেবে। স্নান করে খানার ঘরে গিয়ে খাবে। এই ত তোমার কিন্তু গেল।"

"আমি দেখেছি। এখানে যে দিন আহার করেছি, কাচারিতে তার কানাকানি শুনেছি। আপনার এ কুঞ্জে নিশ্চয় ভূত আছে। ভূত না হলে, খাবার কথাটা কেমন করে পরের কানে যায়?"

"আচ্ছা আমি সাবধান হচ্ছি। সন্ধানও কচ্ছি, এ বাড়ী খবর কে কাচারিতে নেয়! শুনে আমার যে মাথা গরম হয়ে গেল।"

এই কথা বলিয়া বেগম আলমারী হইতে একখানি পুস্তক বাহির করিয়া নরমূর্ত্তির হাতে দিয়ে বলিলেন, "বইখানার যেখানে ইচ্ছে, সেইখানে পড়ো, দেখ্‌বে কত মজা আছে।"

"হাঁ হাঁ। নামটি তো বড় রগড়ের—'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' বাবা। কমলাকান্তের দপ্তরের উত্তর নাকি?"

"পড়েই দেখ, বড় মজার পুস্তক।" এই কথাটা বলিয়াই বেগম শয়ন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। নরমূর্ত্তি এ পাতা সে পাতা অন্য পাতা ক্রমে পাতা উলটিয়ে দেখিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে কোন পাতার এক ছত্র কোন পাতার অর্দ্ধ ছত্র কোন পাতার প্রথম ছত্রের প্রথম শব্দটির প্রতি দৃষ্টি করিয়া, পুস্তক পাঠে ক্ষান্ত হইলেন। আবার কি ভাবিয়া প্রকাশকের নাম পাঠ করিয়া—কতক্ষণ সুস্থির ভাবে সুস্থির নয়নে, পুস্তকের টাইটেল-পেজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। বোধ হয়, দৃষ্টির কার্য্য ইতি হইল। তাহা না হইলে, পুস্তকের বাইন্ডিং এপিঠ ওপিঠ উল্টাইয়া দেখিবেন কেন? তাহাও যেন শেষ হইল। ধীরে ধীরে পুস্তকখানি পালঙ্কের উপর রাখিয়া, চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

সে সময় তাঁহার বদনমণ্ডলের ভাব, ভ্রূযুগলের বঙ্কিম ভাব, বাঁকা নয়নের চাহনির প্রাকৃত ভাব কোন চিত্রকর তুলি-দ্বারা অঙ্কিত করিয়া কোন সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত লোকের সম্মুখে ধরিলে, তিনি নিশ্চয় বলিবেন, অন্তরাকাশে বিশেষ কোন কারণে আক্ষেপ বায়ু বেশ সবেগে বহিতেছে। আরও প্রমাণ ঐ শুনুনঃ

"আমি যথার্থই আহাম্মক। যত লোকে, যত মহাজনে বেগমের নিকট টাকা পাইবে,

সকলেরই এক একখানা দলিল আছে। আমি শুধু মুখের কথায় ভুলিয়া—বিনা দলিলে দেড়টি হাজার টাকা দিলাম। আমি নিতান্তই আহাম্মক, সত্য টাকা, রেজেষ্ট্রারী দলিল, বিশেষ বিশেষ উচ্চদরের মানী লোক সাক্ষী,—সে টাকার জন্যে নালিশ, তাহাতেও জবাব দাখিল,—কত লোককে এই বেগম পথের ফকির করে দিয়েছে। ফাঁকি দিতে পাল্লে ছেড়ে কথা নেই, এমন লোকের সঙ্গে কারবার। আমি নিতান্তই বোকার বোকা তস্য বোকা, তা না হলে বিনা দলিলে, এত টাকা দিয়ে ফেল্লেম। যদি সুযোগ পাই, যদি সুবিধা হয়, দলিলের কথা বলবো, কপালে থাক্‌লে অবশ্যই পাবো। হায়! হায়! আমি মাথায় করে এনে, বিনা দলিলে এক ছালা টাকা দিলাম। এখন আর ভেবে কি করব? আচ্ছা যাতে হয়, যে প্রকারে পারি, দলিল হাসিল কর্ত্তেই হবে।"

অনেক লোকেরই স্বভাব এই যে, স্বকৃত ভ্রম, কি সেই ভ্রমজনিত ক্ষতি, সম্মানের সংসারের কি অর্থের যে প্রকারের ক্ষতিই হউক, সে ক্ষতির কথা মনে উদয় হইলে, সেই মহা কষ্টপ্রদ ক্ষতির কথা মনে হইলে, দাবদগ্ধের ন্যায় নিরন্তন অন্তর দহিতে থাকে, দেহ জ্বলিতে থাকে, বাধ্য হইয়া, শীঘ্র শীঘ্র সে কথা মন হইতে সরাইয়া, অন্য কথা, অন্য চিন্তা, কি অপর কিছু মনে করিয়া, সে জ্বলন্ত দাহ হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করে। যাতে সে কথা ঢাকিয়া যায়, তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে থাকে। এ নরমূর্ত্তির সেই অনেক লোকের মধ্যে একজন স্বকৃত দোষ, অথবা বোকামিজনিত ক্ষতির বিগত ছায়া আর অন্তর চক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন না। ত্রস্তপদে উঠিয়া পুনরায় "গাজী মিয়াঁর বস্তানী" হস্তে করিলেন, এবং পালঙ্ক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, লঘু হস্তে, চঞ্চল চক্ষে পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

গাজী মিয়াঁর বস্তানী—সে কি কথা? আশ্চর্য্য কিছুই নহে। এই বিশ্ব ভাণ্ডারে কত গাজী মিয়াঁ আছেন। কত বস্তানী, কোন কোণে, কত ঘরের কোণে, কত বনে, কত আকারে পড়িয়া আছে। কত গাজী মিয়াঁ যাইতেছেন, আসিতেছেন, কে তাহার সংখ্যা করে? আরও কথা—কালী সিংহের মহাভারত, আফতাব চাঁদ রায় রাজাবাহাদুরের মহাভারত, প্রতাপ রায়ের মহাভারত, কাশীরাম দাসের মহাভারত, যৈমিনীর মহাভারত—এক মহাভারত নানা জনের নাম রটাইয়া উপন্যাস মহলে আধিপত্য করিতেছে। বিদ্যাসুন্দর! ভারতের বিদ্যাসুন্দর—রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর, আরও কাহারও বিদ্যাসুন্দর যে না আছে, কে বলিতে পারে? বঙ্গে না থাকিতে পারে—আর কোন দেশে, অন্য আকারে, অন্য ভাষায় যে না আছে, তার প্রমাণ কি? আর একটি কথা! ভালবাসার সকলি ভাল। মলেমূত্রে গন্ধ নাই। খাঁদা নাকী হইলেও কাকাতুয়া টিয়া হইতে শত গুণে ভাল। নেড়া মাথা হইলে সুকেশিনী। দাঁত না থাকিলেও মুক্তদশনী। ঝন্‌ঝনে কন্‌কনে হইলেও মধুর ভাষিণী। ভেক জাতি হইলেও মরালগামিনী। নিরেট কাষ্ঠের মত শক্ত শরীর হইলেও কোমলাঙ্গী। দশ বিশ মুষলাঘাতে খবরই নাই, ভালবাসার চক্ষে ফুলের ঘায় মুর্চ্ছা যান—ভালবাসার চক্ষুর তুলনা নাই। সে দৃষ্টি সে বিবেচনার কোন কথা নাই, সকলই সম্ভবে। তাহাতে আশ্চর্য্য নাই, অতিরিক্ত নাই, ভালবাসার উপমা নাই। যদি সেই ভালবাসার চক্ষে, কি ভাবে, কি খাতিরে, যদি

কেহ গাজী মিয়াঁর বস্তানীকেই মুল গাজী মিয়াঁর বস্তানী বলিয়া সাব্যস্ত করেন, ভ্রম, ভুল, ভ্রান্তিতে কোন মার নাই, আশঙ্কা নাই। ভালবাসার চক্ষে এক ভ্রম সহস্র গুণের সমান্। ইহাও যদি অতিরিক্ত বোধ হয়, তবে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে আজ্ঞা—হাঁ—না, না, হুঁ হুঁ আজ্ঞা—আজ্ঞা। কবিগুরু রত্নাকর যদি রাম-জন্মের ষষ্ঠি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, অপূর্ব্ব উপাখ্যান রামায়ণের সৃষ্টি করিয়া, জড়-জগৎ মোহিত করিয়া থাকেন, তবে গাজী মিয়াঁর জন্মের এক শত বৎসর পূর্ব্বে কি গাজী মিয়াঁ জন্মাইতে পারে না? যাক্, একটি কথার মীমাংসা করিতে কত বাজে কথা বলিতে হইল। পাঠক! মার্জ্জনা করিবেন। গতিশীল শকটের গতি-রোধ চেষ্টা করিতে করিতে দশ হাত সরিয়া পড়ে। স্বভাবের গতিই এই প্রকার। বাদ্যঘর বাদ্যযন্ত্র হইতে হস্ত টানিয়া লইলেও কতক্ষণ পর্য্যন্ত সুমধুর ধ্বনির প্রতিধ্বনি শ্রবণে রহিয়া যায়।

নরমূর্ত্তি "বস্তানী" উল্টাইতে উল্টাইতে একখানি পত্র বস্তানীর মধ্যে দেখিতে পাইলেন। পত্রখানি কোন সৌখিন লোকের লিখা। সুবর্ণ রসে লিখিত। রজত অভ্রে লতাপুষ্প কোকিল মৃগ-শিশু চিত্রে চিত্রিত। ডাকযোগে আগত, ডাক মোহরে অলঙ্কৃত। ডাক বিভাগের বিশ্রী কালি প্রভাবে জড়িত, অক্ষরে অক্ষরে মিশ্রিত, কোন কোন চিহ্ন একেবারে অদর্শিত। কোথা হইতে আসিয়াছে, কিছুই বোঝা যায় না। নামটিও এমন সঙ্কেতে লিখা, বহু চেষ্টাতেও অর্থ হয় না, বোঝা যায় না। কে লিখিল, কোথা হইতে আসিল, সে বিষয় স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া, সে পথ হইতে মন ফিরাইলেন, কাজেই চক্ষু ফিরিল। এখন মর্ম্ম কি? পত্রের ভাব কি? সেই সন্ধানেই আদি শব্দ হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। নরমূর্ত্তির মুখ হইতে অতি মৃদু মৃদু স্বরে উচ্চারণ হইতেছে। এক প্রকার মনে মনেই পাঠ, কিন্তু পাঠকের শুনিতে কষ্ট নাই।

যথা—

"প্রাণরে! প্রিয়ারে!"

পাঠক! একটি কথা—পত্রের ভাষা, অর্থ, ভাব, বিষয়ে যদি কেহ তর্ক উপস্থিত করেন, তবে গাজী মিয়াঁ নাচার। কৃপা-কটাক্ষে নিরপেক্ষ চক্ষে বিচার করিয়া দেখিবেন। বস্তানীর মধ্যে পত্র কার লিখা সাব্যস্ত হইল না। কোথা হইতে আসিল, তাহাও জানা গেল না। শিরোনামাতে অবশ্যই পরিচিত লোকের নাম। কাজেই পত্রের বিষয় ক্ষমা প্রার্থনা করি।

"প্রাণরে! প্রিয়ারে। মলেম্‌রে গেলেম্‌রে। বাবারে মারে। আর ত বাঁচি নারে! লোকের মুখে কি কথা শুনিরে! হায়! হায়! কলেজায় বাক্যবাণ শক্তিশেল বাণ আশী বিষ সম নিদারুণ বাণ, কে হানিল রে! ধর, ধর, আমায় ধর। আর সঙ্গ হয় না। ভগিনী। আমার প্রিয় ভগিনী। প্রেমের ভগিনী! প্রেমের প্রতিমা, সোনার মাণিক! উহু! বন পোড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে নারে। দোহাই তোমার। সাত দোহাই তোমার? ছাঁচে ঢালা, প্রেমের খেলা, দুধে আল্‌তা মিশান, যোলকলা পূর্ণ কমল চাঁদ-বদনের কি হলরে! কথা যে কলমে আসে না। প্রিয় প্রণয়িনী, জীবন মরণে সঙ্গিনী, মম সীমন্তিনীর এমন কথা,

আমার কানে কে শুনালেরে! কি কঠিন, কি কঠিন! অরে পাষাণী! ধান ছুঁয়ে! দুর্ব্বা ঘাস ছুঁয়ে, আমার মাথা আর মুণ্ডু, মাথা ছুয়ে কি বলেছিলি রে! একটি কলার অর্দ্ধেক তোর মুখে, আর অর্দ্ধেক আমার মুখে—মুখে করে দিয়ে কি কলা খাওয়াইয়া দিলি রে! খড়ম জোড়া কৈ, মাথায় বাড়ি দেও। হৃদয়ের রক্ত, ফেঁপসার বাতাস, নাড়ীর রস, পাকস্থলীর জল, কিছু নাই। ওরে কিছু নাই। আন ছুরি, দেখ চিরি। কিছু নাই। কিছু নাই! এই জন্যই বুঝি দাদা বলে ডেকেছিলি! রক্তে রক্তে পশমে পশমে মিশেছিলি! কে বলে অবোলা? তুই হরবোলা। তোর আঁতে পাতি ভাতে, দাঁতে, বম্বাই, কানাই বাসী। আগুন জ্বলিল, আর নেবে না। তামা তুলসী ছুঁয়ে, জনক জন্মদাতা বলে ডাকলেও আর নয়। তুমি তা পার।"

এই পর্য্যন্ত পাঠ হইলে, পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা এই পর্য্যন্ত পাঠ শেষ হইলে, অপর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহা আর বদনে উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, চক্ষুযোগে দেখিলেন—আর মনে মনে পড়িলেন। শেষে এইটুকু শোনা গেল।

"উকিল কীল-চোরা, আস্ত ডাকাত, প্রকাশ্যে মাথায় লাটি মারে না, কৌশলে ছোরা বসায়। যখন রুধিরের ধারা বইবে, তখন বুঝবে। দাদা চিরকাল সাদা। পরনারী দেখলে, হৃদকম্প, দেহকম্প উপস্থিত হয়, একথা তুমি তোমার প্রিয় দাদার কাছে শুনে থাকবে। লিখবার আর ছিল। হল না। কাগজে আর স্থান নাই, কুলাইল না। ইতি ১৭১০, ১৫ই জুলাই। তোমারই সেই টিয়ে কাটা শিকল।"

নরমূর্ত্তি বলিলেন, "শিকল কাটা টিয়ে লিখতে টিয়ে কাটা শিকল করেছ। বাবা এ কি! শিরোনামার পৃষ্ঠে কাটা কাটা অক্ষরে কাটা ছত্রে প্রতি উত্তরের মুসাবেদা খানিও যে দেখছি। তাইত এই পত্রেরই উত্তর। কারণ যিনি উত্তর লিখেছেন—এ অক্ষর ত আমার চেনা। বুঝেছি আসল পত্রের পৃষ্ঠায় প্রতি উত্তরের মুসাবেদা। ভাল ভাল। বড় ছোট অক্ষরে লিখা।"

পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া খুব মনসংযোগে পড়িলেন ঃ

"প্রিয় দাদা! বড়ই দুঃখিত হলাম। মাথায় শীতল জল সর্ব্বদা দিবে। পার যদি প্রতিদিন দুই এক সের বরফ দিও। তোমার পত্রের উত্তর নাই। ঈশ্বরের কৃপায় তুমি সুস্থ হইলে উত্তর পাঠাব। এক বোতল মধ্যম নারায়ণ চন্দ্রকিশোর সেনের আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয় হইতে আনাইয়া পার্শেলে পাঠাইলাম। এখন তুমি বুঝ—আর না বুঝ। লোকে যা বলুক যা লিখুক, সত্য হইলেও তাহার মধ্যে কারণ আছে। শেষে জানিবে। কার্য্য উদ্ধার, কার্য্য উদ্ধার তুমি আমারই। আমি তোমারই চির ভালবাসা ভগিনী।"

তারিখ নাই, শিরোনামা নাই, মাত্র মুসাবেদা।

নরমূর্ত্তি পত্রখানি আর বস্তানী মধ্যে রাখিলেন না। চারিদিকে চাহিয়া গায়ের কোটের পকেটে রাখিয়া অন্য মনে যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন—

"মায়াবিনী। সর্ব্বনাশ। কার্য্য উদ্ধার!"

এমন সময় পঞ্চকল্যাণী আসিয়া বলিল, "স্নান করে খাবার ঘরে চলুন। টেবিলে খানা গিয়াছে।"

নরমূর্ত্তি ঈষৎ বিরক্ত ভাবে—"টেবিলে খানা গিয়াছে—তিনি খান।"

"তা কি হয়। (পঞ্চকল্যাণী মাথা নাড়িয়া) তা কি যে। তিনি বসে আছেন, চলুন।"

নরমূর্ত্তি মনে মনে ভাবিলেন, "কোন কথা প্রকাশ করা নয়, মনের নিগূঢ় তত্ত্ব ত পাওয়া গেল,—সাবধানে চলাই ভাল।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "চল, আজ আর স্নান করবো না। টেবিলেই যাই।"

অগ্রে অগ্রে পঞ্চকল্যাণী খানার টেবিলে উপস্থিত। ইংরেজী নিয়মে আহার পরিষ্কার ঘর, কেবল খাদ্যসামগ্রী রাখিবার আসবাব। ছুরি, কাঁটা, চামুচ, প্লেট, হাফ্ কোয়াটার প্লেট, গ্লাস, ছাইড্ বোটের উপর বিস্তর। জলের ফিলটার। বরফ প্রস্তুতের কল। উপরে ঝাড়, দেওয়ালে দেওয়ালগীর। নীচে কারপেটের মেটিং। অনবরত টানা পাখা চলিতেছে! নূতন ধরনে, নূতন আসবাবে এই ঘরখানার ঘর নির্দ্দিষ্টে সাজান হইয়াছে। টেবিলের উপরে সোনা-রূপার আসবাবও সম্ভব মত আছে। সকলই সুরুচি সহিত সংস্থাপিত। কুরুচির নাম-গন্ধ এখানে নাই। খানসামার মাথায় পাগড়ী, গায়ে সাদা চাপকান, চুড়িদার পায়জামা, কমরে নীল জরদের ফিতায় জড়িত কমরবন্দ।

সারি সারি ফুলদান, মাঝে মাঝে রৌপ্য আধারে রঙ্গীন শিশিতে ভিনিগার, সস্, মাষ্টারড্ লবণ, মরিচ চূর্ণ পৃথক পৃথক পাত্রে রহিয়াছে।

নরমূর্ত্তি উপস্থিত হইতেই বেগম তাঁহাকে দক্ষিণ পার্শ্বে অতি নিকটের আসনে বসাইলেন। আহার আরম্ভ হইল। গল্পও চলিল।

বেগম বলিলেন, "স্নান হল না কেন?"

"মন ভাল নয়।"

"মনের সঙ্গে স্নানের বেশী সম্বন্ধ? না শরীরের সঙ্গে বেশী?"

"মন কি শরীর ছাড়া?"

"উপরে জল ঢালিলে কি সে জলের গুণ শরীরের ভিতরে যায় না?"

"যখন স্নান কর্ত্তে আসি, সে সময় ত মন ভালই ছিল।"

"মনের গতি আকাশের চঞ্চলা হতে বেশী চঞ্চল।"

"আকাশে মেঘ না জন্মালেও বুঝি চঞ্চলা খেলা করে?"

এ কথার উত্তর হইল না। নরমূর্ত্তি ইংরেজি-নবীস। মাষ্টারড্ অর্থ রাই বা শরিষা। তিনি ভাবিয়াছেন যে, আমাদের তেল কাসুন্দী কি তেঁতুল কাসুন্দীর মত হইবে। পরিপাক শক্তিও খুব। খাওয়াও হইতেছে মাংস আলু ইত্যাদি। বেগম ছুরি কাঁটায় খাইতেছেন। নরমূর্ত্তি হাতের পঞ্চ আঙ্গুল সহায়ে থাবায় থাবায় আধ পেষা করিয়া উদরে দিতেছেন। বিলাতী কাসুন্দী খাইতে বাবুর বড়ই সক্ হইয়াছে। নিজ হাতে কাসুন্দী পাত্র টানিয়া মনের মত

লইয়া, ভাতের সহিত যেই মুখে দিয়াছেন, আর যাবি কোথা। নিশ্বাস বদ্ধ, কথা বদ্ধ, চক্ষু, মুখে, লাল, নির্ঝর রূপে ঝরিতে লাগিল। হল কি, কেহ জানে না। সকলেই বলে এ হলো কি? প্রাণ যায়, আর রক্ষা নাই। কি হলো? হঠাৎ এইরূপ হলো কেন? "খানসামা" "বেহারা", "বয়" অস্থির। বেগম আহারে ক্ষান্ত দিয়া নরমূর্ত্তির এই উপস্থিত বিপদের, প্রাণ যায়, আরোগ্য তদ্‌বির সহজ জ্ঞানে যতদূর হইতে পারে করিতে লাগিলেন। পঞ্চকল্যাণী দৌড়িয়া আসিল, বেগম সহিত সেও যোগ দিল। জল হাওয়া ঠাণ্ডা করিতে করিতে বাবু ক্রমে নিশ্বাস ফেলিয়া একটু সুস্থ হইয়া, কিসে কি হইল, কিছুই বলিলেন না। বেগম আহারীয় খাদ্যসামগ্রী মধ্যে কেহ কিছু মিলাইয়া দিল, না, অন্য কিছু হইল, ইহার কারণ অনুসন্ধান বৃত হইলেন। নরমূর্ত্তির আহারের পাত্র তখনি সরান হইল। পঞ্চকল্যাণী মহা ভীতা। কেন এরূপ হইল? তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখে যে-নরমূর্ত্তির আহারের অবশিষ্ট যাহা আর তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হয় নাই, সেই ভাতের মধ্যে দলা দলা মাষ্টার্ড দেখিয়া হাসিতে হাসিতে, হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে বেগম নিকট লইয়া আসিল, এবং দেখাইল।

বেগম বলিলেন, "ভাল, ভাল্" নরমূর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সে কি চাঁদ? কাসুন্দী খেয়েছিলে নাকি?"

নরমূর্ত্তি বলিলেন, "তাতেই কি এই ঘটেছিল?"

"হাঁ! হাঁ! দিশী আর বিলাতীর ভাব দেখ।"

"বাপরে! এত তেজ, নিশ্বাস বন্ধ হয়েছিল। প্রাণ গিয়ে ছিল আর কি?"

"কাসুন্দী খেয়ে যাদের প্রাণ যায়, দম বন্ধ হয়, তারাই আবার স্ত্রীলোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করতে চায়। যাক্, সরে এসো, আমি চামুচে করে তোমায় খাওয়াচ্ছি। আবার এক থাবা গোল মরিচের গুড় খেয়ে কি চক্ উলটে মরবে?"

নরমূর্ত্তি বলিলেন, "আমি কি দুধের ছেলে, কচিখোকা, কোলের সন্তান, যে হাতে তোলা, মুখে তোলা খাব?"

এই বলিয়া ডাল আর ভাত আচ্ছা করে চটকিয়ে মাখিয়ে, থাবা থাবা গলাধঃ করিতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া ঐ আহারের প্লেটেই গ্লাসের জল ঢালিয়া হাত মুখ ধুইলেন। নিচে কারপেট পাতা, কোথায় কুলকুচ ফেলেন, হঠাৎ স্থির করিতে না পারিয়া হস্তস্থিত গ্ল্যাসের মধ্যেই ওকর্ম্ম করিলেন। এখন জল খান কিসে? কাচ বাটিতে হাত ধুইবার জন্য যে জল রাখা হইয়াছিল, বাবু বাটি উঠাইয়া ঢোকে ঢোকে ঐ হাত ধোবার জলে পিপাসা শান্তি করিলেন। পঞ্চকল্যাণী ও খানসামা কক্ষের বাহিরে গিয়া হাসিতে হাসিতে বাবুর অসভ্যতার বিষয়, গ্লাসে কুলকুচ করা, হাত ধোয়া জল পান করা লইয়া, হাসাহাসি করিতে লাগিল। বেগমের কর্ণে সেই হাসির উচ্চরব প্রবেশ করিতেই, আঁখি ঠারিয়া বিশেষ সাবধান সতর্ক করিয়া দিলেন।

এমন সময় বাহির প্রাঙ্গণে খোল-করতাল নেপুরের শব্দ হইল। খানার ঘরের ঘড়িতেও ঢং ঢং করিয়া দুট বাজিয়া গেল। বেগম একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন "কি আপদ!

এ বালাইদের কথায় স্বীকার হয়েও এক মুস্কিলে পড়েছি। পত্রে লিখলেন, আড়াইটে, এসে পড়লেন দুটর সময়। এমন বালাইত আমি কখনও দেখি নাই?"

নরমূর্ত্তি বলিলেন, "ভাল না লাগে, নিষেধ করে দেও। ফিরে যাক্। ব্রহ্মদিগের সংকীর্ত্তন, ওতে কি রস আছে?"

"তাড়িয়ে দিতে পারি না। ওর মাঝে অনেক কথা আছে?"

পঞ্চকল্যাণীকে বলিলেন, "বাহিরে যে আমলা বাবুই থাকুন, তাঁকে বলো,—কীর্ত্তনে বাবুদিগকে খুব যত্ন করে বসতে আসন দিন। আহারের পর তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে।"

পঞ্চকল্যাণী ত্রস্তপদে চলিয়া গেলে বেগম বলিলেন, "কি করি! সকলের মন না রাখলেও হয় না, সময়েও কুলায় না। শরীরেও আর বরদাস্ত হয় না। আচ্ছা, আসবি, আড়াইটার পরেই আয়। দুট খেয়ে একটু বিশ্রাম করবো, গড়াব। শেল কুকুর বানর পশুরাও আহারের পর বিশ্রাম করে। আমার কপালে সে সুখও নাই।"

আহার শেষ হইল।

পঞ্চকল্যাণী ফিরিয়া আসিয়া বলিল. "বাবুরা কেহই আসেন নাই। জন কয়েক স্কুলের ছোঁড়া, খোল-করতাল গুল নিয়ে আগে এসেছে। তাদেরও আদর অভ্যর্থনা করতে বলে এলেম।"

বেগম বলিলেন, "বাঁচালেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।"

নরমূর্ত্তিকে বলিলেন "চল বৈঠকখানা ঘরে বসা যাক। বাবুরা এলে সেইখানে আগে আদর অভ্যর্থনা করতে হবে। পান তামাক আতর গোলাপে আগে সম্মান রেখে তারপর অন্য কথা।"

উভয়ে অগ্র পশ্চাৎ হইয়া বৈঠকখানা গৃহে আসিলেন। এ কক্ষ পাঠকগণের পরিচিত। হাকিম সাহেবের সঙ্গে প্রথম দিন যে ঘরে কথাবার্তা হইয়াছিল, উভয়ে সেই বৈঠকখানা গৃহে যাইয়া বসিলেন। টানা পাখা, অপরের টানে ঝালর নাড়িয়া, স্থির বায়ু সরাইয়া, টানিয়া দেহ শীতল করিতে লাগিল।

নর—"বক্ষ ভাই দলের সঙ্গে মেলামেশা করায় সমাজে, জ্ঞাত কুটুম্ব আপনাকে কেহ কিছু বলে না? আমাদের মধ্যে হলে ত ধোপা, নাপিত, হুঁক, তামাক পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।"

"তুমি দেখেছ সমাজ। আমি সমাজের ধার ধারি না। কুটুম্ব-স্বজনেরও কোন এলাকা রাখি না। আমার মন? মন বাদশা—মন উজির—মন ফকির—মনই আমার সকল।"

কোটনা সিং আসিয়া জোড় হাতে কক্ষদ্বারে খাড়া হইয়া বলিল, "মহারাজ! বাবু লোক সবকুই আয়া।"

"জারা টাহারকে লে আও, পান তাম্বাকুসে খাতির কর।"

কোটনা সিং সেলাম বাজাইয়া চলিয়া গেল।

নরমূর্ত্তি বলিলেন, "হুকুম ত হলো তাঁদের আন্‌তে, এখন আমি কি করি? আমি তাঁদের

দলে মিশবো না, তাঁদের সঙ্গে দেখা করবো না। আজ যদি প্রকাশ্যে ব্রহ্ম দলে মিশি, কীর্ত্তনে যোগ দেই তাহলে আমার নাপিত ধোপা বন্ধ হবে, হুঁক কলকে বন্ধ হবে, একঘরে হয়ে থাক্‌তে হবে।"

"আহা। তুমি তাঁদের কাজে যেয়ো না—এই ঘরেই থাক। বাবুরা এলে তুমি আমি পর্দ্দার মধ্যেই থাক্‌বো। নিতান্ত পক্ষে তাঁরা নাছোড় হন, আমি পর্দ্দার বাহিরে তাঁদের সঙ্গেই বসে যাব। তুমি চুপটি করে আমার জায়গা জখল কার পর্দ্দা মধ্যে শুয়ে শুয়ে গড়াগড়ি দিও, পুস্তক, খবরের কাগজ আছে, যা ইচ্ছা হয় পড়ো। ঐ দেখ পর্দ্দা এখন উপরে উঠে প্রস্তুত রয়েছে, যেই বাবুরা আস্‌বেন, অমনি পর্দ্দা ফেলে আড়াল করে দেব। এখন কথাটি বলো না, একটু কম করেই নিশ্বাস ফেলো।"

"দেখতে পাচ্ছি, আমাকেও আজ বিবি সাজতে হলো। মেঘনাদ মেঘের আড়াল থেকে বাণ বরিষণ করত, আমরাও আজ পর্দ্দার আড়াল থেকে নয়ন অগ্নিবাণ, বাণ, কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করবো।"

"আমি ত আর পুরুষ নই যে মেঘনাদের সহিত তুলনা হয়? প্রমীলা দেবীও মেঘনাদের সঙ্গে মেঘের আড়ালে থাক্‌ত না।"

বেগম এই কথাটার সঙ্গে সঙ্গে একটু মিঠে-কড়া হাসি হাসিলেন। নয়নবাণ যে কি জিনিস, তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া আরও বলিলেন, "এই ব্রহ্ম-দত্তি বাবুর দলে আজ আমার মনটা বড়ই খারাপ করে দিয়েছে। এদের বিদায় কল্লে হাড়ে বাতাস লাগে।"

পঞ্চকল্যাণী আসিয়া বলিল, "বাবুরা এসেছেন।"

বেগম—"ব্যস্ত হচ্ছো কেন? তুমি কল্যাণী বেঁচে থাক্‌তে আমায় ভাবনা কি? বেয়ারা বেটাকে ঐখানে হাজির থাক্‌তে বলে, পর্দ্দাটা টেনে দিয়ে আমার কাছে এসে চুপটি করে বসে থাক। বাবুরা এলে বেয়ারা বেটাই আদর করে বসাবে এখন। তুমি আমার কাছে এই তক্তপোষের পার্শ্বেই বস। কোন কাজ পড়লে, পর্দ্দাটা না তুলে আর বাহিরে যাবার পথ নেই। পারতপক্ষে আজ আমি ওদের সম্মুখে যাব না। যখন যা দরকার হবে, তোমায় দিয়েই তা সার্‌ব।"

পঞ্চকল্যাণী বেহারাকে ডাকিয়া হুকুম শুনাইয়া দিল। পর্দ্দা টানিয়া পর্দ্দার নিকটই বসিল।

বেগম—"দিনেই যে রাত কল্লি।"

পঞ্চ—"কি করব? এদিকে ত আর দোর নাই যে খুলে দিয়ে আলো আনব।—জানালাও নাই যে, তারই কপাট সরিয়ে আঁধার ঘুচাব। থাক্‌তে থাক্‌তেই ফরসা হবে।"

বাবু দল কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বড় বাবু অর্থাৎ যিনি রাজধানী হইতে আগমন করিয়াছেন তিনিই বড় বাবু। নাগপুর হইতে যে বাবুটি আসিয়াছেন, তিনিই ছোট বাবু। আর যিনি সিলোন হইতে আসিয়াছেন,—তিনিই বড় ছোট, ইহারই মাঝামাঝি বাবু। এই তিনটি বাবুর সঙ্গেই বেশী কথাবার্ত্তা, আলাপ-পরিচয়; বেগমের সহিত ইঁহাদের তিন ভ্রাতারই সমান আলাপ। বহু কালের বন্ধুত্ব ও পরিচয়। একদিনের ব্যাপার নয়। নামের দরকার

নাই। তবে পরিচয় জন্য গাজী মিয়াঁ সাব্যস্ত করিলেন, পাঠকের বুঝিবার জন্য সুবিধা করিলেন, যথা—বড় বাবু ফাষ্ট ক্ল্যাশ ভাই, মাঝারি বেঁটে বাবুটি সেকেণ্ড ক্ল্যাশ ভাই, ছোট বাবু, যিনি নাগপুর হইতে আসিয়াছেন, তিনি লাষ্ট ক্ল্যাশ ভাই, আর যিনি লঙ্কা হইতে আসিয়াছেন, তিনি ইন্টার ভাই। ফাষ্ট ক্ল্যাশ ভাই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—

"ভগ্নী কোথায়? আমাদের প্রিয় ভগ্নী কোথায়?"

"আজ্ঞা আপনারা বসুন। আমি এখানেই আছি।"

ভাই সকল আপন আপন সুবিধা মত উপবেশন করিলেন। ভগ্নী কোন গোপনীয় কার্য্য অর্থাৎ বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন, চুল, মুখের পরিপাটি করিতেছেন, সেই জন্যই পর্দ্দা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে, প্রয়োজন সাধন হইলেই, বাহিরে আসিবেন, কি পর্দ্দা সরাইবেন, ভাইদের মনে ইহাই ধারণা। বিশেষ ফাষ্ট ক্ল্যাশ ভাই নিশ্চয়ই মনে করিলেন যে, সভ্য "লেডীর" মাথার উপরের হঠাৎ পতিত কুট গাছটা সরাইতে হইলেও, পর্দ্দা টানা দরকার। বডীর বোতামটা আঁটতে হলেও আবরণের আবশ্যক। কাজেই পর্দ্দার পতন। আসুন তাঁহার কার্য্য শেষ করে আসুন। ততক্ষণ সৎপ্রসঙ্গ করা যাক। ফাষ্ট ক্ল্যাশ ভাই সকলের নিকট এই ভাবে কথাটা পাড়িয়া শেষে সেকেণ্ড ক্ল্যাশ ভাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ

"দয়াময়ের প্রসাদে আজ আমরা উপাসনা করে, ভগবানের নাম-কীর্ত্তন করে, খুব সুখী হব আশা করি। আর ভগ্নীর যোগদানই হচ্ছে সেই সুখের মূল ভিত্তি। এমন সরল হৃদয়া, সর্ব্বজীবে সম-দয়া, ভক্তিপরায়ণা মহিলা জগতে অতি কমই দেখা যায়। মুসলমান ঘরে জন্ম বটে, কিন্তু মুসলমানের নাম-গন্ধ ভগ্নীতে নাই যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, মাছ মাংস স্পর্শ করেন না, অন্নাহারও প্রায় ঘটে না। ফল মূল দুগ্ধ প্রতিই নির্ভর। আপনার সঙ্গে সেই গত বৎসর বৃন্দাবনে ভগ্নীর সঙ্গে দেখা হয়। সময় ছিল না বলে বেশী আলাপ কর্ত্তে পারেন নাই। বিদ্যায় বিদ্যাবতী, হিন্দুমতে সরস্বতী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

সেকেণ্ড ক্ল্যাশ ভাই বলিলেন, "আহা! আহা! আপনার এই কথাগুলি কর্ণে যেন মধু ঢেলে দিল। আহা! দয়াময় কেন এই মানবাকার দেববালাকে মুসলমান কুলে সৃষ্টি করেছিলেন, বুঝি না।"

চক্ষু বুজিয়া একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন, "বুঝেছি"। এও এক লীলা। মহাপ্রভুর অন্তরের মায়াময় খেলা। তিনি গোবরে পদ্মফুল ফুটান্, পাথরে কয়লায় হীরক জন্মান্। সকলি দয়াময়ের ইচ্ছা। কিন্তু ভগ্নীর এ প্রকার দোটানা ভাবে না থেকে এক টানার মধ্যে আসাই ভাল। এঁর আর আছে কে? না আছে কে? অথচ কেহই নাই। আর দূর আত্মীয়ের কথা বলছি না, আপনা বলতে কেউ আছে কিনা?

"আপনা আপনি আপন, সকলি আছে, অথচ কেহই নাই। দুটি ছেলে ছিল যেন সোনার পুতুল, যেন কার্ত্তিক গণেশ। ভগবানের ইচ্ছা একটি ডুবে মরেছে, একটি দেশান্তরি হয়ে কোথায় চলে গেছে, তাঁর খোঁজ-খবর নেই। পিতা জন্মাবিচ্ছিন্ন পাগল। মাতা অন্ধ। ভাই চার-পাঁচটি। তিনটির কথা মুখে আন্‌তেও লজ্জা বোধ হয়। আর যে দুটি ভাই ভগ্নীর

ভাই বলে যাঁদের পরিচয় দেওয়া যায়, সেই ভাই দুটিও বেআড়ার হদ্দ। ভদ্রঘরের ছেলে আর কি বলব?"

ইণ্টার বাবু ঐ কথার মধ্যেই বলে উঠলেন, "পতি আছেন?"

ফাষ্ট বাবু সঙ্কেতে নিষেধে করিয়া একটু মৃদু মৃদু স্বরে বলিলেন "ওকথা তুলো না। ও কথা মুখে এন না। অনর্থ হবে। রক্ষা করা দায় হবে। এমন পতি-প্রেমে পাগলিনী, পতি ভক্তির আদর্শিনী, কুল-কামিনী আমি দেখি নাই, কোন পুস্তকে পড়ি নাই, কার মুখে শুনি নাই। পতির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। যদি বিধানে বারণ না থাকিত, সমাজে বাধা না দিত, তবে নিশ্চয়ই ভগ্নী সহমরণে যেতেন। তাও বলেছিলেন যে আমাকে এক গোরে পুঁতে ফেল। পতিশোকে একটি বছর আহার করেন নাই। একুশ দিন নির্জ্জলা ছিলেন। এমন পতিপ্রাণা ললনা তুমি দেখ নাই। পতির নাম, কি কোন কথা কানে আসলে, কি কাহার মুখে শুনলে, তখনি অজ্ঞান, তখনি হাত পা খেঁচুনি, তখনি কেশ বেশ ছিঁড়িয়ে ফাড়িয়ে একাকার। ও কথা মুখে এন না। সাবধান!"

"পতি আছেন," পাঠক! এ দিকে এই কথা। পর্দ্দার মধ্যে ঐ কথায় কি কথা হইল শুনিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু হাসি যে মুখে ধরে না, চাপিয়া চাপিয়া রাখা হইতেছে, দাবিয়া দাবিয়া মুখের মধ্যে বস্ত্রাঞ্চল পোরা হইতেছে, তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে।

ফাষ্ট ক্ল্যাশ ভাই বলিলেন, "ভগ্নি! সময় প্রায় হয়ে এল। ভগবানের নাম করে কীর্ত্তন আরম্ভ করে দেওয়া যাউক।"

পর্দ্দার আড়াল হইতে উত্তর হইল, "একটা কথা মুখে আস্‌ছে আস্‌ছে না, প্রকাশ্যভাবে আজ আমাকে যোগ না দিলে কি হয় না?"

"ভগ্নি! বলেন কি? আপনার স্বাধীন মনে এ পরাধীন লোক-লজ্জা ভাব উদয় হল কেন? ভাইগণ সকলেই আপনার পরিচিত। আর সে কি কথা? আপনি কীর্ত্তনের উপাসনায় যোগ না দিলে সে উপাসনাই নহে। সে কীর্ত্তন কীর্ত্তনই নহে। জমাট বাঁধবে না। মহানন্দের দ্বার খুলবে না। মন বসবে না, আমরাও সুখী হব না। কীর্ত্তন উপাসনায় অবশ্যই আপনাকে যোগ দিতে হবে। আসুন আসুন! আর বিলম্ব করে ভাই সকলের মনে কষ্ট দিবেন না।"

বেগম দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পর্দ্দার বাহিরে আসিলেন। ভাই সকল আদর অভ্যর্থনায় তাঁহাকে অতি সমাদরে উপযুক্ত স্থানে বসাইলেন।

সেকেণ্ড ক্ল্যাশ ভাই অতি নম্রভাবে বলিলেন, "দয়াময়! প্রভু! দিন দিন ভগ্নীর পরিশুদ্ধ হৃদয়ে পবিত্র ভাবের মাত্রা বৃদ্ধি করুন! ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা, ক্রমে দিন দিন বাড়িতে থাকুক। মনে মুখে প্রকাশ্য ভাব এক হউক। কাতরে দয়াময় নিকট প্রার্থনা করি, ভগ্নীর মনবেদনা সমূলে দূর হউক! সবই মঙ্গলময় ঈশ্বর সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদিকে ভগ্নীর মঙ্গল করুন!"

লঙ্কা হইতে আগত ইণ্টার ভাই দুই চক্ষু মুদিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগ্নীর যেরূপ নির্ম্মল ভাব, নির্ম্মল স্বভাব, ইহাতে আমি আশা করি যে কাহাকেও ঈশ্বরের দরবারে ভগ্নীর

জন্য সুপারিশ করিতে হইবে না। ভগ্নীর কীর্ত্তি অনুযায়ী ফল অবশ্যই পাইবেন। ঈশ্বর যার সদয়, তার জন্য অপর পাপী মানুষের উপাসনার দরকার কি? মুহূর্ত্ত কাল সেই প্রাণের প্রাণ প্রাণনাথ ছাড়া যার হৃদয়ে অন্য কথা নাই, অন্য ভাব নাই, অন্য কোন নাম নাই, তার জন্য অপরের কাঁদাকাটির প্রয়োজন দেখি না।"

বেগম চক্ষের চসমাটা বডীর পকেটস্থ শুভ্র রুমালে পুছিয়া, নাকে চড়াইয়া চক্ষু বুজিয়া বলিলেনঃ "ভাই সকল! বন্ধু সকল! আমি আপনাদের শ্রীচরণের দাসী। আপনাদের দশ জনার পদসেবা করলেই, ঈশ্বরের সেবায় সমান ফল দাঁড়ায়। চিরকাল সৎপথে মতি থাকে, পাপে ঘৃণা, পুণ্যে আগ্রহ, নরজীবে প্রেম ও ভালবাসা কঠিনভাবে যেন স্থায়ী থাকে। আমরা মানুষ, পদে পদে ভ্রম, পদে পদে পদস্খলন হওয়ারই কথা, সেই বিষয় যেন লক্ষ্য থাকে। প্রত্যেক নরভ্রাতঃ প্রত্যেক নারী ভগ্নী, এইটি যেন আজীবন মনে থাকে। ইহাই আমার প্রার্থনা, আরাধনা ও উপাসনা। ভাই সকল, ভগ্নি সকল, কায়মনে একাগ্রচিত্তে সেই প্রভু পদে মন সঁপে দেও। হে দয়াময় প্রভু! মনে বল দেও যে, আমি সমাজের কঠিন নিগড় হতে খালাস পাই। উদ্ধার হই।"

ভ্রাতাগণ সমস্বরে "ওঁমে দ্বিতীয়ম্" আশা পূর্ণ কর। (দ্বিতীয় বার) ওঁমে দ্বিতীয়ম্ ভগ্নীর মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর। ওঁ তৎসৎ, সত্যসনাতন, ভগ্নীর মনের আগুন নির্ব্বাণ কর।"

সকলেই থামিলেন। সকলের মুখে ভগ্নীর প্রশংসা। কেহ বলেন, "এ কি মানবী?" কেহ বলেন, "না না, মানবী নয়, দেবীবংশে জন্ম, সাক্ষাৎ গৌরী, দেবী, সতী, সাধ্বী, সাবিত্রী।"

এই প্রকার সৎপ্রসঙ্গে স্তোত্র হইয়া প্রথম শ্রেণীর ভাই মহাশয়ের উপদেশে সকলেই জোড় আসনে বসিলেন। কিঞ্চিৎকাল উপাসনা হইয়া রৌদ্রতেজ কমিলেই সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইবে। সকলেই উপাসনায় যোগ দিলেন, ফাষ্ট ক্লাশে বাবু আচার্য্যের স্থান অধিকার করিলেন। উপাসনা আরম্ভ হইল। জগৎ হইতে মন সরাইয়া অন্য জগতে লইলেন। সকলেরই চক্ষু বন্ধ। ইহার মধ্যে লস্কার ইন্টার ভাই দপ্ করিয়া চক্ষু খুলিতেই ভগ্নীর চক্ষু দিকে নজর পড়িল। ভগ্নী প্রথম দেখাদেখি এবং ভক্তি রসের প্রমাণ দিতে ভক্তের মন ভিজাইতে চক্ষু মুদিয়া আবার তখন খুলিয়াছেন। মুখের স্বাভাবিক প্রেমপূর্ণ স্বর্গীয় ভাব যেমন নিদ্রার আবেশে অপরের চক্ষে দেখায়, এরূপ জাগ্রত অবস্থায় দেখা যায় না, দেখিতে পারা যায় না। কারণ জাগ্রত অবস্থায় অনেক কৃত্রিম ভাব চক্ষের সহায়ে শরীর মনে মুখে আসিয়া অধিকার করে। জাগ্রতে চক্ষু বোজা নিদ্রার অর্দ্ধ লক্ষণ ভাব। এ উপাসনা অবস্থায় সকলেই তন্ময় চিত তদ্‌পদ ভাব। ভগ্নী পরকলার চসমার মধ্য হইতে লুক'চুরি খেলিয়া একে একে সকলের মুখ দেখিয়া চক্ষের গতি ফিরাইতেছেন। ইন্টার ভ্রাতার মনেও জাগ্রত প্রেম ভাব চক্ষু খুলিবেন না, দেখিবেন না, প্রথম মিটিমিটি, পরে যেই চক্ষের উপরের পাতা সরাইয়া ভগ্নীর মুখের দিকে তাকাইয়াছেন, ভগ্নীর চক্ষুদ্বয় ঘুরপাক খাইয়া ইন্টার ভ্রাতার মুখের দিকে যেই পড়িয়াছে, তিনি সেই সময় ভগ্নীর মুখের দিকে তাকাইয়াছেন।

ভাই দপ করিয়া চাহিতেই ভগ্নী খপ্ করিয়া দেখিয়াছেন। অমনি হাসি, নির্ব্বাকে ঈষৎ হাসি। চারি চক্ষু একত্রে হাসি। মনে ভয়, অন্য কোন ভাই যদি এই সময় মধ্যে হঠাৎ চক্ষের পাতা খোলেন তবে ত মহা আশঙ্কা ও লজ্জা। ভাই-ভগ্নীতে আর কখনও আলাপ নাই, তাহাতেই তার ভয়। হাসির কারণ—ভাইও চতুর—ভগ্নীও চতুরা। কেহই কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। পুনরায় আর একটু হাসিয়া উভয়েই চক্ষু বন্ধ করিলেন।

"শান্তি! শান্তি!!" ক্ষণকাল উপাসনা হইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ অন্তে নব উৎসাহ নূতন ভাবে ভাই সকল ঈশ্বর গুণ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। খোল করতাল বাজিতে লাগিল। ভ্রাতাগণের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ভ্রাতাগণ সহ ভগ্নী ঈশ্বর কীর্ত্তনে বাধ্য হইয়া যোগ দিলেন।

উহা কি ভয়ানক ব্যাপার। কলমে কালি সরে না। ধর্ম্মের অমর্য্যাদা, সমাজের অপমাননা, কালি-কলমে আঁকা যায় না। রমণী কথাটাই সুমধুর। নারী জাতির শরীর কোমল, মুখমণ্ডল প্রস্ফুটিত কমল। বুদ্ধি-বিবেচনা অতি ক্ষীণ। আত্মরক্ষার ক্ষমতা অতি দুর্ব্বল। বিপদ-আপদে ভালমন্দ বিচার রক্ষার পথ অবধারণে একপদ অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা মুসলমান রমণীর মস্তকে আছে কিনা সন্দেহ। কোমল-প্রাণা ললনাদিগকে সাবধানে, অতি যতনে, মৃত্যু পর্য্যন্ত কেন, মৃত্তিকায় প্রোথিত পর্য্যন্ত, পর্দ্দার আবরণে রাখিবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অনুমতি আছে। সাধারণ জ্ঞানেও বুঝিতে পারা যায়, অতি সহজ জ্ঞানেও বুঝিতে পারা যায়। নিতান্ত প্রিয় পদার্থ, যতনের রতন, আদরের সামগ্রী জীব-জন্তু মাত্রেই আদরে রাখে ও যতন করে। কেহ কেহ তালা ডবল তালা দ্বারা সিন্দুকে আলমারিতে বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। যিনি অবহেলা করেন, তাঁহার বিপদ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ও পদে পদে। উপস্থিত দৃশ্যে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, মুসলমান সমাজে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে, অমঙ্গল সয়তান সদলে প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দু খ্রীষ্টানের দেখাদেখি পবিত্র এসলাম সমাজ-ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা মহা বিষবৃক্ষের কণ্টকময় অঙ্কুর উৎপাদনের সূত্রপাত হইয়াছে।

কৈ! আজ তাহারা কোথায়? যাঁহারা আজিকার অভাবনীয় দৃশ্যের মূল, তাঁহারা কোথায়? বনিয়াদি, বড়-ঘর, মুসলমান শ্রেষ্ঠ, মান্য-গণ্য, আমাদের সমান ভদ্র ইণ্ডিয়াতে আর কেহ নাই, ইহাই যাঁহাদের বোল, তাঁহারা আজিকার এই দুর্দ্দিনে কোথায়? নানা ঢংএর সিঁথি কাটিয়া, টারকীস ক্যাপের ঝোব্বা দোলাইয়া, ছাতি ফুলাইয়া, দেশময় স্বগুণের দীপক রাগের গান গাহিয়া যাঁহারা আগ্রা, দিল্লী, জাহানবাদ, বেনারাস মাতাইয়া তোলপাড় করেন, তাঁহারা কোথায়? কোটধারী, পেণ্টালুনধারী, জলবিহারী, পর্ব্বতবিহারী, নগরবিহারী, বনবিহারী, হটু নটু আজ কোথায়? চারি চক্ষু বিস্তারে চাহিয়া দেখুন! তাঁহাদের কৃতকার্য্যের ফল প্রত্যক্ষে চাহিয়া দেখুন। তাঁহাদের শিক্ষার ফল, রক্ষার ফল, স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিবার ফলাফল, সেই ফলাফলের ফলোৎপন্ন বিষময় মহাফল, সর্ব্বশেষে নেত্রজলসহ পরিণাম-ফল চাহিয়া দেখুন, জীবন সার্থক হউক, চৌদ্দ পুরুষের নাম উজ্জ্বল হউক। ধন্য তাঁহাদের বিবেচনা, ধন্য তাঁহাদের বুদ্ধির দৌড়। অবলা বালাকে কে ঘরের বাহির করিল! কে তাহাকে

স্বাধীন ক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিল? কে এই ঘোর কলঙ্ক কালিমা রেখা পুরবাসিনী একজন মুসলমান মহিলার মুখে স্বহস্তে আঁকিয়া দিল? ভাই! আপন সহোদর ভাই! সহোদর সহোদরে এই ব্যবহার? ভাই হইয়া ভগিনীর হাত ধরিয়া পর্দ্দার বাহির করিল। কি ঘৃণার কথা। সহস্র প্রকার লজ্জার কথা! সমাজ অন্ধ! সমাজ দীন দুঃখী দুর্ব্বলের নিকট সবল। ঠিক্ স্বার্থে। ধিক চক্ষে! ধিক বিবেকে! শত ধিক সমাজের আত্মমর্য্যাদায়!

দেখুন! ঐ দেখুন, গাজী মিয়াঁ মনের দুঃখে ও আনন্দে এক প্রকার হর্ষবিষাদে তুলি হস্তে চিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন। সমাজের দুঃখ, সমাজের অবনতি দেখিয়া ঐ দেখুন, তাঁহার দক্ষিণ চক্ষে অজস্র জলধারা ঝরিতেছে, বাম চক্ষে হর্ষের আভা প্রকাশ পাইতেছে।

ধিক্ বেগম সাহেবের মুখে। সহস্র ধিক্! জগতে যদি তাহার কেহ থাকিয়া থাকে, তাহার মুখে। জগৎ হাসাইলি। মুসলমানকুলে কালি মাখাইলি! তুই না জমিদারের ঘরণী, জমিদারের ভগিনী! ধিক্! ধিক! সহস্র ধিক্ তোর বিবেচনায়! অন্তঃপুর মধ্যে একি? ছি ছি! অন্তঃপুরের মধ্যে পর-পুরুষের মেলা। বিধর্ম্মী পর-পুরুষের সহিত বাহু তুলিয়া নৃত্য! যদি ইহাই তোমার ভাল হয়, যদি এই ধর্ম্মেই তোমার মতিগতি হইয়া থাকে, তবে মুসলমান সমাজকে কেন ঠকাও? তুমি তোমার ধর্ম্ম প্রকাশ্যে অবলম্বন কর, তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না। তুমি সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, কোন মুসলমানের চক্ষে বিন্দুমাত্র জল ঝরিবে না, কাহারও অন্তরে আঘাত লাগিবে না। তুমি স্বচ্ছন্দে দূর হও—সত্য পবিত্র মুসলমান সমাজ হইতে একেবারে জীবনের মত দূর হও। যদি ঐ ধর্ম্মেই তোমার মন মজিয়া থাকে, তবে অন্তঃপুরে কেন? প্রকাশ হও, নাম লিখাও—সমাজে যাও। মুসলমান সমাজ তোমাকে চাহে না। মুসলমান সমাজ তোমার ও কলঙ্কপূর্ণ মুখ বিষনয়নে আর দেখিতে চাহে না! আবার বলি,—তুমি দূর হও! দূর হও! (গাজী মিয়াঁর এক চক্ষের আভাস গত—দ্বিতীয় চক্ষের আভাস আরম্ভ।)

কি মজা! মরে যাইরে বেগম। ধর্ম্ম গানে আঁখি ঠারো কেন রে বেগম? ইহারা তোমার কে? গায়ে গায়ে মিশামিশি, পাছা-পিঠে খেঁসাঘিসী কেনরে বেগম? ঐ সুন্দর বাবুটি, আর তোমার বাম পাশের কাল বাবুটি কে হয় বেগম? ছি ছি! আবার পিরীত প্রণয়মাখা আঁখি-ঠার। ওঃ। ছি ছি! এ না ধর্ম্মের গান? তওবা, তওবা, হাজার তওবা! এই তোমার ধর্ম্মের গান!—ঐ মাথা নাড়িয়া, মাজা দোলাইয়া, নূপুর বাজাইয়া, খোলে ঢোলে আঘাত করিয়া,—ও দুটি তোমার কে? ঐ দাড়ী-মুখো সুন্দর মুখখানি, যিনি তোমার অতি ক্ষুদ্র আঁখি দুটির প্রতি বার বার উল্‌টভাবে বাঁকা দৃষ্টি নির্ঘাতে নিক্ষেপ কচ্ছেন—তিনি হন কে? তোমার পিছনে দাঁড়াইয়া দুই হাতে করতালে ঘা মারিতেছেন—উটিই-বা কে? গান হচ্ছে তোমার ধর্ম্ম ভাবের,—চাউনি কেন অন্য ভাবের? তোমাদের দুজনকে মধ্যে করিয়া আর সকলে চারিদিকে চক্রাকারে ঘিরিয়া ঘুরিয়া "খুচুর! খুচুর!" পা ফেলিতেছেন, ওটি কে? তোমার ধর্ম্ম ভাবের গানের মধ্যে এ প্রকার তালে তালে, বাজনার তালে, সকলে

একমিলে হাত উঠাইয়া, কোমর হেলাইয়া, পায়ে পায়ে মিল রাখিয়া, অতি ত্রস্তভাবে ধরিত্রী পৃষ্ঠে পদাঘাত করিতেছে,—ইহাকে কেমন ধর্ম্মপ্রচার বলে?—এ ক্রিয়ার নাম কি? মাঝে মাঝে হরিবোল হরিবোল ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছে,—সে কোন্ হরি? হিন্দুর হরি? না তোমাদের হরি? হিন্দুর হরি তো সাকার। সে হরি ত নবযৌবনী মনমোহিনী কামিনী ছিল, সে হরি ত কদম্ব-ডালে বসিয়া বাঁশরী বাজাইত। সে হরি ত পশ্চিম অঞ্চলে নন্দঘোষের খড়ম অথবা নাগরা জুতা মাথায় করিয়া বহন করিত। সে হরি ত পেটের জ্বালায় মাখন চুরি করিয়া খাইত। চোর অপরাধে নন্দঘোষ দড়াদড়ি দিয়া খামের সঙ্গে বাঁধিয়া আচ্ছা করিয়া চাবুক সই করিত। সে হরি যে স্ত্রীলোকের কাপড় চুরি করিয়া গাছে উঠিয়া থাকিত—স্ত্রীলোকের ঘরের তোলা কাপড় নয়, পরনের কাপড় চুরি করিয়া গাছের এক আগডালে উঠিয়া থাকিত। তাদের কাপড় ছিল না, তাইতে নেংটা হইয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িত—তাহার পরেই কাপড় চুরি যায়। দেখত বেগম, স্ত্রীলোকের তখন কি দুর্দ্দশা হয়! একি সেই হিন্দুর হরি? যে হরি আপন মাতুল আয়ান ঘোষের স্ত্রীকে লইয়া জঙ্গলে জঙ্গলে লুকোচুরি খেলিয়া বেড়াইত, একি সেই হিন্দুর হরি, যে হরি সখা বিসখা বৃন্দেদিগের ঘরে ঢুকিয়া কত আবদার কর্ত্তো, যার জ্বালায় গোয়ালপাড়ায় স্ত্রীলোক রাত্রে ঘুমাইতে পার্ত্তো না, একি সেই হিন্দুর হরি? না তোমার ধর্ম্মের অন্য কোন হরি? বল, বল, তোমার কালামুখে শুনি, এ কোন্ হরি? অমন করিয়া হাত ঘুরিয়া মাথার উপর অঙ্গুলী তুলিয়া হরি বোল হরি বোল কর না; চক্ষু নাই! চক্ষে চসমা দিয়া কি একেবারে অন্ধ হইয়াছ! যে হাতই তোল, বডী-আঁটা শরীরে, মাথার উপর ঊর্দ্ধভাবে হাত তুলিয়া অঙ্গুলী ঘুরাইও না। ঐ দেখ! তোমার হাত তোলায়, হরিবোল বলায়—ঐ দেখ, তোমার ধর্ম্মমতে ধার্ম্মিক নরেরা, তোমার ভ্রাতারা কোন্ দিকে তাকায়? ছি ছি! এ ভাব কেন? সংকীর্ত্তনে হরিগুণ গানে ত কাহারও মন আঁটা-সাঁটা দেখি না। ওঃ! ছি ছি! সকলেই তোমার মুখের দিকেই চেয়ে আছে। সে চাউনির ভাব কি? তা ভ্রাতারাই জ্ঞাত আছেন। তোমার হাত তোলা, হরি বোলের ভাব, গায়ের বডী, পরনের সাড়ী, চক্ষের চাউনি, জোড়া ভ্রূর কাল ভঙ্গিমা, বেহদ্দ বাহার, যেন তন্ন তন্ন করে দেখ্ছেন, আর তালে তালে পা ফেল্ছেন। কিনা সংকীর্ত্তনের বোল গোলমালেই গোলে হরিবোল হচ্ছে।

তুমিও ত কম কচ্ছো না! তোমার ভ্রাতাগণের মধ্যে সকলে না জানুক কেহ কেহ তোমাকে খুব ভাল করিয়া চিনে। যারা চিনে, ঐ দেখ তারা নীরব। তাদের মুখে কীর্ত্তন নাই, হরিবোলের ধুম নাই। বিদেশী ভাই সকলকে খুব-কীর্ত্তন দেখাইলে! তোমার ধর্ম্মে তোমার ঘৃণা কেন? তুমি মুসলমানকে এত ঘৃণা কর কেন? মুসলমান-মুখ দুই চক্ষে দেখিতে পার না কেন? মুসলমান কি তোমার জন্মদাতা নহে? তুমি কি মুসলমান কুলে জন্মগ্রহণ কর নাই? ধিক্ ধিক। বেগম! তোমার মায় কে বুঝিবে? তোমার পর্দ্দার আড়ালে এক মূর্ত্তি, উপাসনার সময় দেখাইলে অন্য মূর্ত্তি, সংকীর্ত্তনে আর এক মূর্ত্তি। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গুপ্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী, খ্রীষ্টান, নাস্তিক—সকলের প্রতি তোমার বিশেষ অনুগ্রহ। মুসলমান তোমার

প্রাণের শত্রু, অন্তরের দুষমন কি জন্য? তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ নাই কেন? তাহাদের নাম শুনলে তোমার গা জ্বালা করে কেন? গোপনে একরূপ, প্রকাশ্যে অন্যরূপ কেন? ধর্ম্মের সঙ্গে তোমাদের এত চাতুরি খেলা কেন? তোমার ভ্রাতাদলেরই বা এত কপট ভাব কেন? ধর্ম্মের আবরণে এরূপ পিচাশ-স্বভাব কেন? তোমারই-বা এ দশা কেন?

অত পা নাড়া, গা নাড়া, হাত নাড়া, মাথা নাড়া কোমলপ্রাণা কামিনীর প্রাণে সহিবে কেন? মাথা ঘুরিয়া গা বমি বমি করিবে বেগম ঠাকরুণ!—গাজী মিয়াঁ এখন হতে বেগম সাহেবকে বেগম ঠাকরুণ বলিবেন! বেগম ঠাকরুণ, সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে দিতে ভাল রকম ভোজবাজীর ভেল্কীর সহিত এক কীর্ত্তি করিলেন,—ধুপুস করিয়া পড়িয়া গেলেন। হরিবোল ধ্বনি আরও বৃদ্ধি হইল। কেহ বুঝিল, হরিগুণগানে বিশেষ মাতোয়ারা হইয়া শেষে গলিয়া ঢলিয়া পড়িলেন। কাজেই হরিবোলের পরিবর্ত্তে হরি-হরি বোল শব্দ হইতে লাগিল। ইন্টার ভাই, মধ্যশ্রেণীর ভাই, ১ম শ্রেণীর ভাই—তিন ভায়ে ভগিনীর মাথায় ঠাণ্ডা জল, গোলাপ জল, যথেচ্ছ ঢালিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তন বন্ধ হইল। অনুমান ১৫ মিনিট পর বেগম ঠাকুরাণী একটু সুস্থ ভাব ধারণ করিলেন। শরীর মন যেন ভাঙ্গিয়া বসিয়া পড়িয়াছে, আহ্লাদ উৎসাহ কিছু নাই, বড়ই অস্থির। ভ্রাতারা কেহ পাখার বাতাস, কেহ কোঁচার হাওয়া, কেহ সুখের ফুৎকার ব্রহ্মচাঁদিতে দিতে লাগিলেন। ক্রমেই সুস্থ।

কার সংকীর্ত্তন কে গায়? ভ্রাতাগণ ভগিনীর অবস্থায় মাথা অস্থির। সাব্যস্ত হইল, সংকীর্ত্তনে আজ আর দরকার নাই। জমাট ভাঙ্গিয়া গেল, মাথা ভাঙ্গিলেও আর সে দিন জমাট বন্ধ। আজিকার মত ক্ষান্ত দেওয়াই কর্ত্তব্য। ভগিনীও তাহাই চান। ভ্রাতাগণ মুখখানি ম্লান করিয়া ভগিনীর নিকট বিদায় লইলেন। আর একদিন সাক্ষাৎ হইবে আশা দিলেন। এ দিকে সন্ধ্যাদেবী ক্রমে জগৎ অন্ধকার করিয়া, কুঞ্জ-নিকেতন ঘিরিয়া বসিলেন। বেগম ঠাকুরাণী বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া দেখিলেন,—এক নরমূর্ত্তি পর্দ্দার মধ্যে একা বসিয়া ছট্‌পট্ করিতেছেন। পর্দ্দার ফাঁক দিয়া তিনি সংকীর্ত্তনের সমুদয় অঙ্গই দেখিয়াছিলেন।

হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিনামের মাতোয়ারা ভাবটা কেবল তোমাকেই লাগিল, কৈ, আর কোন ভাই ত মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিলেন না?"

বেগম হাসির প্রতিশোধ দিয়া চাপন সহকারে বলিলেন, "ও সময় ভাব না লাগলে কি এতক্ষণ এখানে আসতে পারতাম? তা যাহ'ক তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি কাপড় বদলে আসি।"

বেগম ঠাকরুন কাপড় বদলাইতে অন্য কক্ষে গিয়া নূতন প্রকার সাজগোঁজ আরম্ভ করিলেন। আজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার অবসর নাই। প্রাতঃকাল হইতে দশটা পর্য্যন্ত এক ভাব। দশটা হইতে আড়াইটা পর্য্যন্ত এক ভাব। আড়াইটার পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অন্য ভাব। সন্ধ্যা হইতে বস্ত্র পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত ধর্ম্মভাবের সঙ্গে কপটতা ভাব। এইক্ষণ আবার অন্য ভাবের আয়োজন হইতে আরম্ভ হইল। পরিধেয় পরিবর্ত্তন করিয়া যেই বৈঠকখানার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, পঞ্চকল্যাণী আসিয়া বলিল, "কি আপদ, আজ

হলো কি? এক দল যেতে না যেতে অন্য দল আসিয়া দেউড়িতে খাড়া, —হাকিম সাহেব, ঋতুরাজ বাবু, কালাচাঁদ ওরফে বক্কেশ্বর বাবু এবং আরও একজন নূতন বাবু আসিয়াছেন। ফিরে যেতে বলবো, না আসতে বলবো?"

বেগম—"ছুঁড়ি বলে কি? শীঘ্র ডেকে আন।"

নরমূর্ত্তি বলিলেন, "ডেকে ত আনবে, আমি এখন কি করি?"

"তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?"

"তোমার এই পর্দ্দা, এই শয্যা—ভয় কি? আর আমি সাধ্যপক্ষে তোমাকে একা রাখবো না। দেখলে ত ভাই, বন্ধু-বান্ধবেরা মুখোমুখী হয়ে, চার চক্ মিশিয়ে না বস্‌লে কেউ বস্‌তে চায় না।" মুখের কথা শেষ না হইতে হাকিমান দল হুড়পাড় করিয়া বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন। পঞ্চকল্যাণী পর্দ্দার এক প্রান্তে অর্দ্ধ শরীর আর পর্দ্দার মধ্যে অপরার্দ্ধ শরীর—হাকিমানের দিক পর্দ্দার বাহিরে, এই প্রকার ভাবে দাঁড়াইল। পর্দ্দা মধ্যেও লক্ষ্য, পর্দ্দার বাহিরেও দৃষ্টি। কল্যাণীর দক্ষিণ চক্ষু যেন কর্ত্রীর পক্ষে, বাম চক্ষু যে হাকিমান দলের দিকে। পর্দ্দা অস্ত্রে সরল নাসার ঠিক মধ্যস্থান হইতে চিরিয়া মস্তক পর্য্যন্ত গিয়াছে, নাসা-নিম্নেও ঐ দশা। ওষ্ঠ অধর থুতি দ্বিভাগ করিয়া বক্ষস্থলের ত কথাই নাই, উদরের ভাগও আছে। সেই চিহ্নিত চিহ্নে পর্দ্দা অস্ত্র নিম্নে মিশিয়াছে। কাজেই কল্যাণীর দেহ সমভাগে অর্দ্ধ পর্দ্দার মধ্যে, অর্দ্ধ বাহিরে রহিয়াছে। পৃষ্ঠদেশ দেওয়ালে সংলগ্ন। হাকিমান দলে চার মূর্ত্তি; তিন মূর্ত্তি পাঠকগণের পরিচিত, এক নরাকার মূর্ত্তি অপরিচিত। তাঁহার কথা বলিবার কোন অধিকারই নাই। পরিচিত তিন মূর্ত্তি মধ্যে ঋতুরাজ বাবু বলেন, তুমি বল। ভোলানাথ বলেন, তুমি বল। বক্কেশ্বর বলেন, তুমিই আগে বল। ঋতুরাজ, ভোলানাথ, বক্কেশ্বর, সকলেই বন্ধু, সকলেরই মনে মনে ফাঁক। একজন মনে ভাবিতেছেন, আমার সঙ্গে বেশী পরিচয়, আমি আগে কথা কহিব না। অপর জনার মনেও সেই দাবী। তৃতীয় নটবরই বা কেন মান খোয়াইবেন। মনে মনে তর্ক, মনে মনেই মীমাংসা।

ঋতুরাজ বাবু কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকরুন কোথায়?"

কল্যাণী কোন উত্তর করিল না। একটু মুচকি হাসি হাসিয়া ইঙ্গিতে দেখাইল, "পর্দ্দার ভিতরে।"

ঋতুরাজ বাবুই বলিলেন, "কথাটা বলতেই বেধে গেল। ব্যাকরণের মুখের দিকে তাকালে রসের মাথা খেতে হয়? আবার রসমিষ্টির দিকে চাহিলে ব্যাকরণের অপমান করা হয়। কার মন রাখি? আপনারা হাস্‌বেন না। বাধ্য হয়ে রসমিষ্টির মাথায় বাড়ি দিতে হলো। 'অয়ি! চিত্রবিচিত্র সূত্র-শরীরী পটাপটী পর্দ্দে! তুমি কি কারণে আজ পড়িয়া আছ? অভিমান? ক্রোধ? না হাসি-তামাসা? তোমার এ লম্বিত ঢালা অঙ্গ দেখিয়া মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত। কি কারণে আজ তোমার এ ভাব, হেলিয়া দুলিয়া উত্তর দেও। তুমি চক্ষের সম্মুখে থাকিলে মনের দ্বার খোলে না; চার চক্ষু একত্র হয় না। তুমি উঠিয়া পড়। করজোড়ে বলি, তুমি চক্ষের উপর হইতে সরিয়া যাও। হে মানময়ী পর্দ্দে। আর লম্বিত

হইয়া মাটিতে লুটিপুটি করিও না। আর সহ্য হয় না। তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি ভালবাসার মধ্যে দাঁড়াইয়া পৃথক করিয়া দিলে। হে কার্পাস বিকারে। সদয় হও। তোমার দেহ সঙ্কুচিত কর, আমাদের নয়ন-মনের সার্থক হউক।"

পর্দ্দার আড়াল হইতে বেগম ঠাকুরাণী বলিলেন, "আমার সেলাম পৌঁছে। আর পর্দ্দার উপাসনায় কাজ নাই, ক্ষান্ত হউন।"

ঋতুরাজ বাবু বলিলেন, "চক্ষের অগোচর হইতে কথা। কার কথা কে বলে, কিসে বুঝি? মুখ না দেখলে শুধু শব্দে কি করে বুঝিবে, মনের সঙ্গে কথার মিল আছে। আজ একি ভাব?"

পর্দ্দার আড়াল হইতে কথা আসিল, "ভাবের কোন অভাব হয় নাই।"

ঋ—"তবে আড়াল কেন? তবে অভিমান মানের চিহ্ন কেন? ভিন্ন ভেদের লক্ষণ কেন? আমি ত আর থাক্‌তে পাল্লেম না। সহজে না যায় কথায় না সরে, এত মিনতিতেও যদি না উঠে, লাঠি দিয়ে সরিয়ে দেই।"

পর্দ্দার আড়াল হইতে কথা আসিল, "একটু অপেক্ষা করুন। বোতাম কটা লাগিয়ে নিই।"

"না না, আর বোতাম লাগান সহ্য হয় না। অদর্শনে কথা ভাল লাগে না।"

এই কথা বলিয়াই ঋতুরাজ বাবু পর্দ্দা উঠাইতে অগ্রসর হইলেন। কল্যাণী দক্ষিণ আঁখি ঠারিয়া ইঙ্গিত করিতেই পর্দ্দামধ্যস্থিত নরমূর্ত্তি বেগম ঠাকুরাণীর ইঙ্গিতে তক্তপোষের নীচে বাধ্য হইয়া মাথা দিলেন, বেগম ঠাকুরাণী দুহাতে ঠেলিয়া তক্তপোষের নীচে দিলেন। মোটা শরীর তক্তপোষের নিম্নে সহজেই কিছুতেই প্রবেশ করে না। অতি কষ্টে দু হাতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া খাড়া হইলেন। এদিকে ঋতুরাজ কর্ত্তৃক পটাপটি পর্দ্দা ত্রস্তভাবে সরিয়া গেল।

আগন্তুক দলে হাসির তুফান উঠিল, করতালির ধুম পড়িয়া গেল। পরিচিত বন্ধু তিনজনের সহিত হস্তমর্দ্দন হইল। সে করস্পর্শ মধ্যেও নানা ভাব। তিন হস্তই বুঝিল, আমার সহিত স্বতন্ত্র ভাব। নবাগত বাবুটির নিকটে যাইতেই বক্কেশ্বর বাবু বলিলেন, "এই ভদ্রলোকও আমাদের বিশেষ প্রিয় বন্ধু।"

ভোলানাথ বলিলেন, "আমার হৃদয়ের বন্ধু।"

ঋতুরাজ বলিলেন, "আমার প্রাণের বন্ধু।"

বেগম বলিলেন, "তবে আমারও চিরবন্ধু।"

হস্তমর্দ্দন হইল। বেগম ঠাকুরাণী পা দোলাইয়া তক্তপোষের উপরে বসিলেন। বাবুগণ সারি বাঁধিয়া তাঁর সম্মুখে বসিলেন। কথা চলিতে লাগিল। বেগম ঠাকুরাণীর ইচ্ছা শীঘ্রই বৈঠক ভঙ্গ করে খানার ঘরে কি অন্য ঘরে যান। কিন্তু হঠাৎ কি বলিয়া উঠাইবেন, কোন কথা ভাবিয়া পাইতেছেন না। পঞ্চকল্যাণীকে বলিলেন, 'কল্যাণী, দেখত খানার বিলম্ব কি?"

ঋতুরাজ—"একটু স্থির না হইতেই খানা? সারা দিনটা কলম ঠেলে মাথার ঘাম পায়ে

ফেলে একটু ঠাণ্ডা হব বলে এখানে এলেম, তাতে আপনি এখনই যদি খানা দিয়ে বিদায় করে দেন, তবে আর যাই কোথা? প্রাণ মন মাথা শীতল করি কোথা? আমি বড় মুখফোঁড়। আজিকার যাত্রাটা ভাল নয় বোধ হচ্ছে। আচ্ছা বলুন ত আপনার মনটা আজ?"

বক্কেশ্বর বলিলেন "ঠিক ধরেছ দাদা। মেজাজটাও যেন ঝনঝনে, কথার আওয়াজ যেন ক্ষণক্ষণে, মুখখানাও যেন ভারি ভারি। কারণ কি?"

বেগম বলিলেন, "ভারি কি মাথায় লেগেছে?"

ঋতু—"তবেই বোঝা গেছে।"

বেগম—"বুঝেছ তবে ঔষধ দেও।"

বক্কেশ্বর—"এই ডাক্তার এনেছি।"

ঋতু—"হাত দেখাও, জিহ্বা দেখাও। যদি মনের কোন বিকার ঘটে থাকে, তবে মন দেখাও। বেথা হয়ে থাকে, বেথার স্থান দেখাও। তারপর কালি কলম কাগজ। তার পরে ডি. এন পালের দোকানে লোক পাঠাও। না হয় "সা" কোম্পানীর হউসে থাক—অষুধ আসুক। এখনি আরাম হবে।"

বেগম—"আমার রোগ আরাম হবার নয়। জীবন থাকতে আরাম হবার নয়।"

ঋতু—"বলেন কি? এ যে জেল-ডাক্তার নূতন আমদানী। এ'র হাতেই জেল। ঘানিগাছ ঘুরণের কর্ত্তাই হচ্ছেন এই বাহাদুর।"

বক্কেশ্বর—"ঠিক! দাদা যা বলছেন তা ঠিক। হাকিমদের আর ক্ষমতা কি? হুকুম দিয়েই খালাস। ঘানি টানান, সুরকি ভাঙ্গান, মাটি কাটান, পায়খানা ছাপ করান—সকলি এই হাতে। কয়েদিকে বসিয়ে রাখাও ওঁরই ক্ষমতা। খাটিয়ে খাটিয়ে পিত্তি বের করাও ঐ প্রভুর এখতেয়ার।"

বেগম ঠাকুরাণীর মনে অন্য কথা উঠিল। মুখখানি তখনই হাসো হাসো ভাব করিয়া ডাক্তার বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার আজ সুপ্রভাত যে মহাশয়েব দর্শন পেলেম। আমার শরীরের অবস্থা ভাল নয়, সময় সময় অনুগ্রহ করে যদি এসে যান, তবে আর কি বলবো। ঋতুরাজ বাবু বলুন আমি কি হই—"

ঋতু—"আমি পারবো না, ভোলা দাদা বলুন।"

ভোলা—"তবে বেগম ঠাকরুণ বাঁচেন, এবারে আর জগৎ ছাড়েন না। আমাদেরও দু দণ্ড বসে ঠাণ্ডা হবার স্থান থাকে।"

ডাক্তার—"যখন ডাকবেন, আমি আসবো।"

এদিকে সেই তক্তপোষের নিম্নস্থ নরমূর্ত্তি যার পর নাই কষ্ট ভোগ করিতেছেন। স্থূল দেহ, নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছে, মৃত্তিকায় বুক ঠেকাইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন, পিপীলিকা মশকের দংশনে অস্থির হইয়াছেন, হস্তপদ নাড়িয়া যে মশা তাড়াইবেন, পিঁপড়ে মারিবেন, তাহাও পারিতেছেন না। অতি কষ্টে নিশ্বাস দাবিয়া বুকে ঘেসিয়া একটু অগ্রসর হইলেন, এবং বেগম ঠাকুরাণীর পায়ে ছোটখাট একটা চিমটি কাটিলেন। উদ্দেশ্য যে, আর

বাঁচি না, রক্ষা কর। বেগম চিমটার আঘাতে চেঁচিয়ে উঠবেন, সাপে কাটলো কি ইন্দুরে কামড়ালো বলে হাত পা গা ঝাড়া দিয়ে উঠতেই, মনে হলো, অমনি চাপিয়ে গেলেন। প্রকাশ্য বলিলেন, "বুঝেছি, সকলেই আপন আপন লাভ খুঁজছেন। যার জ্বালা সেই জানে। অনুগ্রহ করে আসবেন। মুখে অনেকে অনেক কথা বলেন—কিন্তু ডাক্তার বাবু! কাজে আর এক দণ্ড, এক মুহূর্ত্তও দেখা যায় না। আজ কাল এমনি কাল পড়েছে যে, তা আর বলব না।"

ভোলানাথ বাবু চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া টানিতে টানিতে বলিলেন, "বুঝেছি। বুঝেছি। যার মনে যা তা বুঝেছি। কেন ঠারের কথা তাও বুঝেছি।"

তক্তপোষের নিম্নস্থিত নরমূর্ত্তি ভোলানাথ বাবুর কথায় বুঝেছি পর্য্যন্ত শুনিয়া আরও অস্থির। সানপেটা মেজে, তারই উপর তক্তপোষ পাতা; বসিবার উপায় ত একেবারে নাই। কখন চিত কখনও অচিত অর্থাৎ কাত, কখনও উবুর হইয়া মান মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন। যার মনে যাহা জাগে, অন্য কথা হইলেও স্বতঃসিদ্ধ কথা যে তার কানে তার মনগত কথারই সংস্রব বলিয়া বোধ হয়।

"বুঝিতে আর বাকী নাই। আমাদের ব্যবসাই ঐ কথা, মনের কথা মুখ দেখে টেনে বের কর। বুঝেছি। এ কথাটা আমার উপর লক্ষ্য করেই বলা হচ্ছে।"

"আপনি বড়ই ব্যস্ত হচ্ছেন। রয়ে-সয়ে কাজ না কল্লে সে কাজ ঠিক হয় না।"

বেগম—"রয়ে-সয়ে! এ দিক আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি, ওদিকে রয়ে-সয়ে! কিছুই দেখি না। কিছুই শুনি না। কতকাল রহিব। কতকাল সহিব!"

ভোলানাথ আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন—

"বেগম ঠাকরুণকে একটা কথা বলবো কিন্তু কানে কানে।"

বেগম (জোড়হাতে কাতর কণ্ঠে) "আপনি হাকিম। ঐ কথাটা আপনি মাপ করবেন। বন্ধু-বান্ধবের মজলিসে কান কথা আমি শুনতে চাই না। যা বলতে হয়, প্রকাশ্যে বলুন, এখানে শত্রু কে আছে দেখি না।"

ঋতুরাজ টেবিলে আঘাত করিয়া—"ধন্য! ধন্য! শত ধন্য!—ভোলাদাদা কান কথা কও? কেমন! ফাজিল চালাকি কর্ত্তে গিয়ে নিজে কান মলা।"

বক্কেশ্বর বলিলেন—"ভোলাদাদার ভুল হয়েছিল। যাক বা বলবার খুলেই বলুন। কর্ত্রী শুনেন—আমরা আপনার তাঁবেদার আছি, আমরাও শুনি।"

ভোলানাথ বলিলেন, "কথাটা আর কিছু নয়। সেই কথা।

ঋতু—"বুঝেছি বুঝেছি—(সুরের সহিত) "তোমার যত ছলনা।"

বেগম ঠাকুরাণীর মনে একটু ছুইয়া গেল—ঘা দিয়া গেল। কিন্তু আসল কথা তা নয়। সামান্য একটু প্রতিবন্ধক ডাক্তার। ডাক্তার বাবু বাবুদের বন্ধু, কিন্তু ভেড়াকান্ত সম্বন্ধে হাকিম দল যে প্রকার কৌশল খাটাতে আরম্ভ করেছেন, তারপর স্ত্রীলোকের অনুরোধে এমন একটি কুকাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কি মনে করবে, কি ভাববে, এই সকল ভেবেই

ভোলানাথ কানে কানে কথাটা বলতে চেয়েছিলেন। তা হল না। ডাক্তার বাবুকে যে সঙ্গে করে এনে বেগম ঠাকরুণ সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন, তার কারণ এই যে, ভেড়াকান্তকে ত জেলে পাঠাবেন। নিশ্চয়! ডাক্তারের হাতেই তার খাটুনী, ডাক্তারের হাতেই তার জীবন। কয়েদী মাত্রেরই এক কথা,—ডাক্তার বাবুই জেলখানার মালিক। বেগম ঠাকরুণ সঙ্গে আলাপ থাকলে তার সুবিধে। বেগম ঠাকরুণ মনে অন্য কথা। "বুঝেছি তোমার যত ছলনা।" আর কেহ বুঝুন আর না বুঝুন। পাঠক অবশ্যই বুঝিতেছেন, বেগম ঠাকরুণের মনে আঘাতে লাগিতেছে? ঋতুরাজ বাবু বলিলেন?

"কথায় কথায় মন ভারী। দেখি পারি কি না পারি। সকলেই কান পেতে শুনুন, যার যেটুকু দরকার তিনি সেইটুকু গ্রহণ করুন।

হয়েছে হয়েছে আজ, তাহার যোগাড়।
যা'তে ভাঙ্গে, ঘাড় মাজা, পাঁজরার·হাড়॥
আরসুলা ভিমরুল লাগিয়াছে গায়।
ভাঙ্গা ঘরে জয়ঢাক, পাগলে বাজায়॥
বলে যায় ঋতুরাজ হেঁয়ালির ছাঁদে।
বল বল বন্ধুগণ কে হাসে কে কাঁদে?"

বেগম ঠাকুরাণীর মুখে আনন্দ রেখা পড়া দূরে থাকুক, বিষাদ-কালিমা-রেখা দেখা দিল। বাক রোধ হইল। তিনি ভাবিলেন যে—সর্ব্বনাশ! যত চাতুরি চালাকী আজ প্রকাশ পাইল। হৃদয়ের কাঁপানী উঠিল, গায়ের রক্ত শুকাইল। মনে মনে বলিতেছেন, হায়! আজ একি হইল? ঋতুরাজবাবু পুনরায় বলিলেন—

"চতুরের চূড়ামণি পড়িয়াছে ধরা।
ঘুসী মেরে ঘানি জুড়ে করে আধমরা,
এই আসিতেছি দাও বকসিস ইনাম,
হবে কথা এইখানে গানে বলিলাম॥
তবে কেন বিষাদিনী বুঝিতে না পারি।
বল বল মাথা খাও আমরা তোমারি।"

বেগম ঠাকরুণ শেষের দুইটি পদ শুনিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু মনের ধাঁধা গেল না। ভাবিলেন, অবশ্য অন্য কোন কথা আছে। আর বিলম্ব না করে ভোলানাথ বাবুর নিকটে যাইয়া একটু মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি কথা? আমি এ সকল আকার-ইঙ্গিত ঠারের ভাবের কথা বুঝতেই পাল্লেম না?

ভোলানাথ বাবু বলিলেন—

"দেখুন ত! এখন বলুন ত! কানে কানে কথা লাগে কিনা?"

বেগম বলিলেন—

"আমি বুঝলেম এক, হয়ে পড়লো আর। আমি কি জানি, এর মাঝে এত আছে?"

ভোলা—"তাই ত কথার প্রকার আকার না বুঝে, খোঁজ-খবর না জেনে, কোন মতামত অভিপ্রায় প্রকাশ কর্ত্তে নেই।"

ঋতুরাজ বলিলেন, "যাক, আর সময় নষ্ট করে কাজ নেই। আমরা অনুমতি কচ্ছি, মানময়ী মানিনীর মনবেদনা, কান-কথা কয়ে আপনিই দূর করুন।"

ভোলানাথ বাবু বেগম ঠাকুরাণীর কানে কানে সংক্ষেপে যাহা বলিবার তাহা বলিলেন। বেগম আহ্লাদে গলিয়া পড়িতেন—গলিয়াও না যাইতেন ঢলিয়া পড়িতেন,—যদি তক্তপোষের নীচের কথা মনে না থাকিত। তত্রাচ খুসী, কিন্তু বেলাগ-নিরস। ইতিমধ্যে তক্তপোষখানা নড়িয়া উঠিল। কারণ নরমূর্ত্তি মশক পিপীলিকা দংশনে অস্থির হইয়া ছটফট করিতেছেন, কিছুতেই আর টিকিতে পারিতেছেন না। হাত পা নাড়াচাড়া করিতে তক্তপোষ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। ঋতুরাজ বাবু "হরিবোল হরিবোল" করিয়া উঠিয়া খাড়া হইলেন এবং আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বলিলেন—

"কি মশাই আমার চক্ষের ধাঁদা? না কি ঘটনা? কোথায় কিছু নয়, তক্তপোষটা হঠাৎ নড়ে উঠলো কেন? কারণ কি? শেল কুকুর ত ঘরে ঢোকে নেই!"

বেগম ব্যস্ত হইয়া তক্তপোষ নড়ার নিকটে আসিলেন। মাথা হেঁট করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "না না কিছু নয়, কোথা কুকুর, কৈ কিছু নয়।"

ঋতুরাজ বাবু বলিলেন—

"ঐ যে ফোঁস ফোঁস করে যেন হাঁপ ছাড়ছে, হাঁপাচ্ছে। (বক্কেশ্বর বাবুকে ডাকিয়া) দাদা! এদিকে এস ত? দেখি, তোমার লাঠি গাছটা দেখি। হয় কুকুর ঠাকুর, নয় শৃগাল দেব, না সর্প বাহাদুর।"

কথা হইতেছে এমন সময় পঞ্চকল্যাণী আসিয়া বলিল, "খানা প্রস্তুত।"

বেগম ঠাকরুণ সুযোগ পাইয়া বলিলেন—

"আমাদের এ ঘরে থেকেই কাজ নেই। খেপা কুকুর হলেও ভয়। শৃগাল সাপ হলে ত আরও ভয়। ওদিকে গিয়েই কাজ নেই। চাকরেরা এসে তক্তপোষ উঠিয়ে দেখুক। ওদিকে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। চল খাবার ঘরে যাওয়া যাক।"

সকলেই একবাক্যে বলিলেন—

"সেই ভাল। কি জানি কি হউক, না হয় আচ্ছা করে দাঁত বসিয়ে দিলে। চল যাই। এখন পেট ঠাণ্ডা করি গিয়ে।"

কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। বেগম ঠাকরুণ সকলের পিছনে। বড়ই ঢিমে কদম। মনের ভাব যে একটু বিলম্ব করিয়া যান। কিন্তু ঋতুরাজ ভারি চতুর, তাঁর মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছে তিনিই জানেন। বলিয়া উঠিলেন—

"পা উঠে চলে না কেন? পশ্চাৎ আকর্ষণের কারণ কি? কৈ? আকর্ষণী কোন দিকে? সম্মুখে না দক্ষিণে বামে? না পশ্চাতে? ওহো। তাইতে, (বেগমকে সকলের পিছনে দেখিয়া) তাইতে পা চলে না। আমরা বি. এ. পাশ এম. এ. পাশ করি, তার উপরে যে পাশ

আছে, তাও যদি করি;—এক্স ওয়াই জেড পর্য্যন্ত পাশ করে, অক্ষরের সীমা ছাড়িয়ে যাই, তত্রাচ মুসলমানের নিকট সৌজন্য বিদ্যায় সিদ্ধি বস্তু পর্য্যন্ত যাইতে পারে কিনা সন্দেহ। যার বাড়ী এসেছি, যাঁর অন্নে উদর পূর্ণ করিব আশায় আহারের স্থলে হাঁ হাঁ খাঁ খাঁ করে ছুটে যাচ্ছি, কি খাব ফয় হাতে তুলে মুখে দিব, চিবিয়ে গিলবো, কি মুখে ফেলেই দাবিয়ে উদরে ফেলবো—"এই চিন্তাই এখন মাথায় ঘুরে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেই গৃহকর্ত্রী যে পিছনে পড়ে আছেন, সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। (বেগম ঠাকুরাণীর প্রতি) আসুন আসুন, আপনি আগে আসুন। আমরা আপনার পিছনে পিছনে ননীচোরার মত যশোদার অঞ্চল ধরে নৃত্য করতে করতে যাচ্ছি।"

কি করেন, একটু গিলটি হাসি হাসিয়া সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। নরমূর্ত্তি তক্তপোষের নিচে হইতে বুকে হাঁটিয়া মাথাটি বাহির করিয়া দেখিলেন—কক্ষ মধ্যে কেহ নাই। বেহারা পঞ্চকল্যাণী, যাহারা তাহাকে জানে, যাহাদের নিকট গোপন নাই, তাহাদেরও মধ্যেও কেহ নাই। মস্তক বাহির করিয়া দেখেন, আবার ভাবেন, কি জানি কেহ যদি পর্দ্দার অপর পৃষ্ঠে থাকিয়া থাকে। ভাবিয়া, অতি সাবধানে তক্তপোষের নিম্ন হইতে গড়াইয়া বাহির হইলেন। সুরকীর লালী, চুনের সফেদি, মাকড়সার জাল, ময়লার ঝুল, আবর্জ্জনা আদি গড়াইয়া বুকে হাঁটিতে কাপড়ে মাথায় চুলে চেরা সিঁথিতে লাগিয়াছিল, তাড়াতাড়ি ঝাড়িয়া বেগম ঠাকুরাণীর রাঙ্গা চরণের উদ্দেশ্যে শত শত নমস্কার করিয়া, কান নাক মলা খাইয়া গৃহ কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। প্রবেশ দ্বার পার হইয়া মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে বলিতে চলিলেনঃ

"ইহার প্রতিশোধ না নিয়ে যদি কুঞ্জ-নিকেতনে আসি, তবে সে তৃজাতক, এবং আমার নামও আকালের বধূ নয়।"

ত্রয়োদশ নথি

মায়াময় জগতের মায়া অতি চমৎকার। প্রফেসার "ভেনিকের" কুহক রঙ্গ, ভেল্কিবাজীর তামাসা, তাসের কৌশল, রুমালের খেলা, কাটা মুণ্ডর কথা কওয়া, জীবন্ত দেহ হইতে শিরচ্ছেদ দেখিয়া কত আশ্চর্য্যান্বিত হই, কত প্রশংসা করি। কিন্তু প্রতিদিন প্রতি ঘরে যে সকল ভেল্কী কুহক মুণ্ডপাত হইয়া কত ভেনিকের গৌরব মাটি হইতেছে, কত রাজা ভোজ, আত্মারাম সরকার পরাস্ত হইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখি না, সন্ধানও করি না। নিজের দোষ নিজ চক্ষে দেখা যায় না, নিজ মস্তকে নিজ কার্য্যের সমালোচনাও হয় না। আমরাই বাজি দেখাই। আমরাই ভেনিকের মাথায় কুঠারাঘাত করি। আমরাই দর্শক, আমরাই খেলওয়াড়, আমরাই বাজীকর। আমরাই গুরু, আমরাই শিষ্য।

মনিবিবি ভিখারিণী সহিত অনেক আলাপ করিয়াছেন। মনের কথা অনেক ভাঙচুর

করিয়াছেন। পীড়ার ঔষধ চাহিয়াছেন। ভিখারিণী বলিয়াছে, "আপনার পীড়া কি ভাবে কি প্রকারে কোন কার্য্যের পর পীড়ার সূচনা হইল, সকল বিষয় সত্য সত্যরূপে আমার নিকট যদি বলিতে পারেন, ঘুণ পরিমাণ কথাও গোপন না করেন, তবে আমি ঔষধ দিতে পারি। ভাল হওয়া না হওয়া আপনার কৃতকার্য্যের ফল ও কপাল। স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম। স্বামী সেবাও কম নহে। এ দুই কার্য্যে আপনি কি পরিমাণ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছেন, স্বামীকে কখনও কোন প্রকার কটুবাক্যে অন্তরে আঘাত দিয়াছেন কিনা? স্বামীর সহিত মিথ্যা প্রবঞ্চনা ছল চাতুরী করিয়া তাঁহার সরল মনে ধোকা দিয়া স্বেচ্ছাচার ভাব রক্ষা করা হইয়াছে কিনা? মনের সহিত তাঁহাকে যত্ন করিয়া ভালবাসিয়া অকপটে জীবন যৌবনের অধিকারী করা হইয়াছিল কিনা? এই সকল বিষয় সত্য সত্য বলিতে হইবে।"

মনিবিবি ভাবিতেছেন, মনের কথা প্রকাশ করিবেন কিনা! যথা যথা বলিলে সত্য সত্যই যদি সারিয়া যায়, ভিখারিণীর কথা সত্য হয়, তবে সত্য বলিতে দোষ কি? আবার ভাবিতেছেন, সত্য ঘটনা, সত্য কার্য্য, সত্য কথা, সকলি বলিলাম। যাহা আজ পর্য্যন্ত কোন প্রাণী জানে না, তাহা একজন ভিখারিণীর নিকট অকপটে প্রকাশ করিলাম। সে যে গোপন রাখিবে তার বিশ্বাস কি? সে যে আমার হয়ে হৃদয়ের অতি গোপনীয় স্থানে, আমি যে ভাবে রাখিয়াছি, সেইরূপ রাখিবে, তাহাই-বা বিশ্বাস করি কোন সাহসে? কার বিশ্বাসে?

মনিবিবি এইরূপ চিন্তা-দোলায় দুলিতেছেন, ভাবনায় অস্থির হইয়াছেন, কি করেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। লাল আলুর মোকদ্দমার কথাও ভিখারিণীর নিকট বলিয়াছেন, মিথ্যা এক মোকদ্দমা চাপাইয়া চিরশত্রু সোনাবিবি আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। যাহাতে মকদ্দমা উড়িয়া যায়, আর না চলে, উপায় যাহাতে হইতে পারে, তাহার পথ সন্ধান ঔষধ ব্যবস্থা চাহিয়াছেন। সোনাবিবি আর দাগাদারীতে যাহাতে মনে মনে ফাঁক হয়, মনান্তর ঘটে, দাগাদারীর কথা কর্ণে না করেন, তাহার যে কোন উপায় হয়, তাহাও করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন। ভিখারিণীও কত আশ্বাস কত কথার হাত ঘাত রাখিয়া ইঙ্গিতে ভাল করিবে বলিয়াই আশ্বাস দিয়াছে। তুকতাক খাটাইতে, তন্ত্রে-মন্ত্রে মানুষের মন ফিরাইতে, অঘটন ঘটাইতে, অনেক দ্রব্য-সামগ্রী, গাছ-গাছড়া, জড়ি-বুটী, যাহা লাগিবে, তাহার এক ফর্দ্দ লিখাইয়া দিয়াছে। জিনিসপত্রের সংগ্রহ হইতেছে। সর্ব্বশেষে ভিখারিণী বলিয়া দিয়াছে, এ সকল দৈববল ত থাকিবেই, তারপর, যেখানে যে বলের দরকার তাহার চেষ্টা করিতে কখনই ত্রুটি করিবে না। সংসারী লোকের মন্ত্রণায় যাহা ঠিক হয়, সেই পথে চলিবে। সঙ্গে সঙ্গে দৈব অনুকূল বল সংযোগ থাকিলে, সোনায় সোহাগা হইবে, শক্তি বৃদ্ধি করিবে, কার্য্যও উদ্ধার হইবে।

চাঁদ-বদনীরাও আপন আপন মনের কথা ভিখারিণীর নিকট বলিয়াছেন। যাঁহারা পতি সোহাগে গলিয়া পড়েন, তাঁহাদের আশা যে, স্বামীটি সর্ব্বদা তাঁবেদারের ন্যায় হাজীর থাকেন,

যখন যাহা বলি মাথাটি হেঁট করিয়া হুকুম তামিল করেন, কোন স্ত্রীলোক প্রতি চক্ষু তুলিয়া চাহিতে না পারেন, কোন স্ত্রীলোকের কথা মুখে না আনিতে পারেন, চক্ষু থাকিতেও আমি না দেখাইলে কিছু না দেখিতে পারেন, পা থাকিতেও আমি যতক্ষণ না বলি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত হাঁটিতে না পারেন, আমাকে বাদ দিয়া দুনিয়া জাহাঁনের স্ত্রীলোককে মায়ের মত দৃষ্টি করেন, সর্ব্বদা আমার রূপ লাবণ্য মনে মনে চিন্তা করেন, ধ্যান করেন, আমাতেই মাতিয়া যান, আমাতেই মজিয়া থাকেন।

ছিঁড়িয়া খাতুন বলিয়াছেন, ওসকল কথা আমারও আছে। ওসকল কথা ছাড়া আমার জন্যে কিছু বেশী চেষ্টা কর্ত্তে হবে। আপনি টাকা পয়সা যখন একেবারে হাতে করেন না, চক্ষে দেখতে চান না, তখন আমি আর কি করি, কি দিয়ে আপনার মন খুসী করি। আপনিই বলে দিন; তাই করি। আমার সাধ্য নাই যে আপনাকে খুসী করি।

আমার মনের কথা ত অনেক বলেছি। আর এই কথা কটা পেলেই আমার আশা এক প্রকার পূর্ণ হয়। যাতে হয়, যে কৌশলে ঘটে, মন্ত্র তাবিজে, গাছের শিকড়ে, যে কোন প্রকারে হয়, এই কয়েকটা কথা রাখতেই হবে। আপনার এই সর্ব্বকনিষ্ঠা দাসীর আবদারটা যাতে রক্ষা হয়, রক্ষা করতেই হবে।

আমার ইচ্ছা যে, স্বামীর মনের মধ্যে হেঁটে চলে যাই। হাত বাড়িয়ে দিয়ে দেখি সে মনে কি কি আছে। যাতে স্বামীর মনের মধ্যে যেতে পারি, মনের উপর হুকুম জারি কর্ত্তে পারি, তিনি মনে করেন যেন আমি তাঁর মাথার উপরে এক পাহাড়ে রয়েছি। উঠতে বল্লে উঠেন, বসতে বল্লে কথাটি না কয়ে শুয়ে পড়েন। চক্ষু রাঙ্গাইলে, মাথা ঘুরে চারদিক আঁধার দেখেন। "কি! এত বড় কথা!" এই বলে হুঙ্কার ছাড়লে, দশ কলসী জল আর কাপড় বদলায়ের দরকার যেন নিশ্চয়ই ঘটে উঠে। দশ মিনিট আমার মুখখানি না দেখতে পেলে বন বন করে তাঁর মাথাটা ঘুরে। কিছু বেশী সময় অদর্শন ঘটলে হাউ-মাউ করে কেন্দে, থেকে থেকে যেন চমকে উঠেন। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়ে—জবো করা গরুর মত হাত-পা আছড়াতে থাকেন। আমার হাত তোলা, কি দাঁতে কাটা, কি জিহ্বায় জড়ান, আধ চিবান, কিছু না খেলে, বার ব্যঞ্জন সাথে থালা থালা ভাত গো-গ্রাসে পেটে দিলেও যেন ক্ষুধার জ্বালায় গড়াগড়ি পাড়তে থাকেন। সাদা ধবধবে, ফুল বিছানায় নরম বালিস নরম গদীর উপর, সহজে সুখে ঘুমাবার সুযোগ থাকলে, বিছানায় গা ঢেলে দিবামাত্র, ঘুমে চক্ষু চেপে ধরার কারণ থাকলেও শুয়ে শুয়ে আমার মাথার রুসী জল গেরো চুলকিয়া উঠিয়ে না দিলে, পিঠ পাঁজরের মলা মোলায়েম ভাবে না তুললে, পা দুখানি অতি আরাম সহিত অন্তর টিপুনিতে না টিপলে, কখনই যেন চক্ষে ঘুমের অধিকার না হয়। আমার ইচ্ছামত নিশ্বাস ফেলেন, হাই তোলেন, আমি যা বলি তাই যেন কানে শুনেন।

ছিঁড়িয়া খাতুন আরও অনেক কথাই বলিয়াছেন। ভিখারিণী শুনিয়া কোন উত্তর করে নাই, হাসিয়া হাসিয়া ছিঁড়িয়ার সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপ বিনিন্দিত দুই গণ্ডে বার বার চুমা দিয়াছে, চেরা সিঁথির উপরের এলমেলো চুলগুলি পরিপাটি করিয়া সোজা করিয়াছে।

যাঁহাদের বিবাহ হয় নাই, তাঁহাদের এক একজনের মনের আশা এক এক প্রকার। কেউ বেনারসের বর চান, কেউ ব্যারিষ্টার স্বামীর আশা করেন, কেউ জজের পত্নী হইতে ইচ্ছা করেন, কেউ কালা বাঙ্গালী প্রেমেই মজিতে চান, কেউ ওপথেই যাইতে চান না, বর লাভের আশা রাখেন না। পিতা নাই, মাতারও ঐ দশা। অদৃষ্টকে দোষী করে নিজের জীবনকে নিজে শত শত ধিক্কার দেন, অদৃষ্টে খেঙ্গরা মারেন। দাসী বান্দীরাও সুযোগ মতে আপন আপন মনের কথা ভিখারিণী নিকট প্রকাশ করিয়াছে। মনের সারকথা, স্বামী বশ, সতীনের বিনাশ, ভালবাসা লাভ। বেশী বয়স যাদের, তাদের এ ছাড়া অতিরিক্ত কয়েকটা কথা আছে। যৌবন আবার কিসে ফিরে, কিসে যুবতী হওয়া যায়, দাঁত পড়া কিসে বন্ধ থাকে, মুখের চামড়া কিসে টনটনে হয়, সাদা চুল কিসে কাল রূপ ধারণ করে, মাজার ব্যথা কিসে কমে, শরীরের চাকচিক্য লাবণ্য ছটা কিসে বৃদ্ধি পায়। দেহরাজ্যের গড়া পড়া, দাগিধরা, খসখসে রুক্ষ শুষ্ক—বেঁকা তেড়া মাল আসবাবগুলি কিসে কি করিলে যেমন ছিল তেমন হয়, আরও না হয়, মেরামত করে কিছুদিনের জন্য ভাল অবস্থায় ব্যবহারের উপযোগী হয়ে দাঁড়ায়, ইহার চিন্তায় চেষ্টায় ভিখারিণীর পাছু লাগিয়াই আছে।

ভিখারিণী সকলকেই আশ্বাস দিয়াছে। ভিখারিণীর ক্ষমতা অসীম বলিতে পারি না, কারণ সে মানুষ। তবে তাহাকে শত শত ধন্যবাদ যে, দুই দিনের মধ্যে একটি বৃহৎ পরিবারের পরিবারস্থ যাবতীয় লোকের মনের কথা শুনিয়াছে। কেবল শুনিতে পারে নাই মনিবিবির। যদি তার সাধ্য থাকে, গুণ থাকে, সে কথাও শুনিবে, না থাকে মনিবিবির মনেই থাকিবে।

ভিখারিণী হিন্দু কি মুসলমান, আজ পর্য্যন্ত সে কথা প্রকাশ হয় নাই। কেহ জানিতে পারে নাই। ফল মূল, কাঁচা দুধ ভিন্ন আহার হয় না। সে আহারও দিনে নাই, রাত্রে। যাক, সে বিষয় জন্য আর মাথা কচকচি করিয়া কাজ নাই। এখন কাজের কথার কাছে যাওয়া যাক।

মনিবিবির বাড়ীর উত্তরে বৃহৎ একটি আম বাগান। সাধারণে আম বাগান বলে, কিন্তু সে বাগানে নানাবিধ ফলবান বৃহৎ সতেজে খাড়া হইয়া মস্তক উঠাইয়া যমদ্বারের জমিদারদিগের আচার-ব্যবহার দেখিতেছে। বাগানের তিনদিকে সুদীর্ঘ উচ্চ প্রাচীর, পূর্ব্বদিক মনিবিবির বৃহৎ দ্বিতল বাসগৃহ। বাগান মধ্যে ছোট-বড় চারিটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে প্রশস্ত পথ। পথের দুধারে নানাবিধ সুগন্ধি ফুলের গাছ। দুইটি পুষ্করিণীর চারিদিকে বান্ধা ঘাট। দুইটির ঘাট বাঁধা নহে। তবে মাটি কাটিয়া থাকে থাকে সিঁড়ির গঠনে জলে নামিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সময় সায়াহ্ন, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ব, রৌদ্রের তেজ নেই। বাগানের আম গাছের উচ্চ ডালে, কোন কোন গাছের মাঝের পাতায় কিঞ্চিৎ রবিতেজ দেখা যাইতেছে। কিন্তু বাগানের মধ্যে শীতল।

বৃক্ষে বৃক্ষে, ডালে ডালে, পাতায় পাতায় মিশিয়া আকাশ ঢাকিয়া ছায়া করিয়াছে। নিকটেই পুষ্করিণী। সে পুষ্করিণীর ঘাট বাঁধা নাই। মাটি কাটিয়া জলে নামিবার পথ করা

হইয়াছে। সেই পুষ্করিণীর ঘাটের দক্ষিণ পার্শ্বে ঢালু স্থানে ঘাসের উপর দুইটি নারীমূর্ত্তি পা ছড়াইয়া বসিয়া কথা কহিতেছে। অনর্থক বাগাড়ম্বরে আবশ্যক নাই! নারীমূর্ত্তি পাঠকগণের চেনা। সবুজ বসনে যাঁহার অঙ্গ ঢাকা, তিনি ছিঁড়িয়া খাতুন—আর গোলাপী বসন যাঁহার অঙ্গে তিনি তাঁহার অবিবাহিত এক ভগ্নী। উভয়ে কথা কহিতেছেন।

ছিঁড়িয়া খাতুন বলিতেছেন ঃ

"বোন! তুমি আমার বয়সে বড়, কিন্তু দুনিয়াদারী কাণ্ডে আমি তোমার অনেক বড়। বিয়ে, হায়রে বিয়ে। আগে নেহাত ছেলেবেলায় জানতেম, বিয়ে যেন কি একটা খাবার জিনিস। খাবার জিনিস নাহলে 'বিয়ে' নাম শুন্‌তেই ছেলে, যুবা, শেষে বুড়া-বুড়ীরা পর্য্যন্ত মহা খুসী কেন? ছেলেবেলা খাবার জিনিসের উপর—বেশীর ভাগ সন্দেশ রসগোল্লার উপর—ভারি টান ছিল। ভাবতেম বিয়ে বুঝি খুব বড় বড় সন্দেশ। কি খুব বড় রসগোল্লা, খুব মিষ্টি। কিঞ্চিৎ বড় হলে সে জ্ঞান যে উলটে গেল, তা নয়। কি একটা কাজ, বড় খুসীর কাজ, বাড়ী সমেত লোক মহা খুসী। পাড়া-প্রতিবাসীরা খুসী, আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত খুসী। তারপর বাজী বাজনা। বাড়ীর লোকে গান গায়, পান খায়। ভাবতেম, এর চাইতে খুসীর কাজ দুনিয়া-জাহানে আর নাই। তারপর যতই বড় হতে লাগলেম, বয়স যতই বেশী হতে আরম্ভ হলো, বিয়ের বিবেচনাটা যেন এ বছরে এইরূপ, অন্য বছরে আর একরূপ বোধ হতে লাগলো। শেষে সাত আট বছরের আগেকার মত ভাব সমুদায় উল্‌টে গেল। এখন ভাবলেম, বিয়ে পুরুষে আর মেয়েতেই হয়। পুরুষ হলে বিয়ে করে বাড়ী আনে, মেয়ে হলে পরের বাড়ী নিয়ে যায়। একটা যাওয়া-আসার কাজ, নূতন কুটুম্ব। এরা একবার নিয়ে যায়, তারা একবার নিয়ে আসে, তার পরের বছরে আবার সে ভাব উল্টে গেল। বাড়ী বসে থেকেও বিয়ে হয়। আগে ভাবতেম, বিয়ে করে নিয়ে যায়, না নিয়ে গেলে বিয়ে হয় না। শেষে দেখি, তাও নহে। চিরকাল বাপ-মায়ের বাড়ী থাকলেও বিয়ে হয়। বিয়ে হলেও অনেকে মা-বাপের বাড়ীতেই থাকে। তারপর বৎসর তাও উল্‌টে গেল। ও কথাটিও কিছু নয়। যাওয়া-আসা ওটা কিছু নয়। পুরুষ আর মেয়ে মানুষে যে কুটুম্ব পাতে, তারাই হচ্ছে আসল। তাদের সঙ্গেই কাজ। মা বাপ ভাই ভগ্নী প্রতিবাসীর সঙ্গে বিয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। স্ত্রীলোককে পুরুষে বিয়ে করে। পুরুষে তাকে কাপড় কিনে দেয়, পয়সা দেয়, যখন যা চায় তাই দেয়। আবার স্ত্রীলোকেও পুরুষটাকে পান তৈরী করে দেয়, খাবার প্রস্তুত করে দেয়—এক ঘরে এক বিছানায় দুইজনে শুয়ে থাকে। তারপরের বছরে কতক উল্‌টালো, কতক থাকলো। মাঝে একটা কথা নূতন বস্‌লো—ঐ যে পুরুষটা স্বামী হবে, সে ভালবাসবে, আমিও ভালবাসবো। খুব যত্ন করবো, সেও আদর করবে, তারপর কয়েকটা কথা ক্রমে বাদ পলো, বেশী কথা নূতন যোগাল। বেশী কথার মধ্যে বলিবার কথা এই যে, স্বামী আর আমি একত্র এক বিছানায় শুতে শুতে ঘুমতে ঘুমতে আমাদের একটা ছেলে হবে। দিন কএক ভেবেছিলেম কার হবে? তারই হবে কি আমারই হবে। শেষে যত ছেলে কোলে করা মেয়ে মানুষ দেখি, তারা বলে, তাদেরই

ছেলে। আমিও ভাবলেম, আমারি হবে, ভালই আমাদের দুই জনার মধ্যে আর একজন হবে। তারা যেমন ছেলে কোলে করে সোহাগ করে নাচায়, তা দেখে আমারও মনে সক হলো, আমিও নাচাব। আমার "বাবা"! আমার "সোনা" "যাদু" বলে নাচাব, ভালবাসবো। খাওয়াব কি? আমার ত আর কিছুই নাই। এই ভাবনা যে দিন হলো, তার পরে ঐ দিকেই বেশী লক্ষ্য পড়লো। খাওয়াব কি? আমার ত দুধ নেই। শেষে মনে মনে বুঝলেম, আমার হবে। যদি আমার হবে, তবে আজ রাত্রেই হয় না কেন? দুই তিনজন সমবয়সী ছুঁড়িদের কাছে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা কল্লেম, ওলো! তোর দুধ হয় নাই কেন? বড়দের কাছে, তোর এত বড় কেমন করে হলো? তারা ত উত্তর কল্লে না, হেসে এ উহার গায়ে পড়ে খিলখিল করে হাসতে লাগলো। আমিও চেপে গেলেম। ভাবলেম, কি যেন অন্যায় কথা বলেছি, বোকা আহাম্মুকের মত কোন কথা বলেছি। আর তাদের কাছে কোন দিন সে কথা পাড়লেম না। তার পরেই দেখি, প্রমাণ আপন শরীরেই উঠে পড়েছে। ফোড়ার মত ফুলতে আরম্ভ হল। সর্ব্বদাই মন আনচান করে। হাসি তামাসা গল্প নিয়েই দিন কাটাতে ইচ্ছা করে। কিসে ভাল দেখায়, কিসে গায়ের রংটা আরও সাদা হয়, হাত পা মোলাএম নরম হয়, পাছাখানা বড় দেখায়, এইরূপ নানা ভাব মনে উদয় হল। এর মধ্যে আমাদের বাড়ীর পাঁচির ছেলে হচ্ছে, শুনে ছেলে-হওয়া দেখতে যাব। মা বারণ কল্লেন, যেও না। তা কি আর আমি শুনি। খুব গোপনে বুড় বুড় দাসীগুলার খোসামোদ করে ছেলে-হওয়া দেখতে গেলাম। বোন্। ধর্ম্ম জানে! তোমায় বলব কি? আল্লার কাছে তখনি বল্লেম যে আল্লা! আমার যেন ছেলে না হয়। ওরে আল্লা! সে যে কি কষ্ট তা আমি মুখে বলতে পারবো না। শেষে শুনলেম, নিজের জ্ঞানেও বুঝে নিলেম যে, স্বামীর বিছানায় না শুলে ছেলে হয় না। মনে মনে স্থির কল্লেম, প্রাণ থাকতে বিয়ে করবো না।

"ছ মাস সেই কথার উপরই গেল। ছ মাস পর ফাল্গুন মাস এলো। বাতাস কেমন সাঁ সাঁ করে বয়। চারদিকে যেন হাঁ হাঁ করে। প্রাণের মধ্যে যেন খাঁ খাঁ করে, আবার মাঝে মাঝে ঐ যে বড় আম গাছটা দেখতে পাচ্ছো, ওর মাঝে কাল রঙ্গের একটা পাখি, কি গলার আওয়াজ। যখন কুহু বলে ডাকে, তখন মনটা যেন ঐ পাখির ডাকের দিকেই ধায়। প্রাণ উড়ু উড়ু করে। যতই দিন মাস গত হতে লাগলো, শরীরের জ্বালা যন্ত্রণা আরও বেড়ে উঠলো। গলার সাবেক আওয়াজ ভেঙ্গে সেই এক প্রকার নূতন আওয়াজ বেরলো। শরীরটা ভাল দেখাবার জন্য মনে মনে যা যা বলেছিলাম, সকলই যেন আমার মন মতেই হয়ে উঠলো। কিন্তু আগুন আগুন, মহা আগুন! বাহিরে আগুন, মধ্যে আগুন, আগুন যেন নাকে মুখে কানে যেখানে সেখানে গিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলো। ভাবলেম হলো কি?"

এই পর্য্যন্ত কথা হইতেই শ্রবণকারিণী ভগ্নী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠিক কথা বোন্! তুমি যা বল্লে, সে সমুদায় ঠিক। এ দিকের কথা একটিও মিছে নয়। আমি ওদিকে তত বুঝি নাই, ভেবে দেখি নাই। লেখাপড়া, মৌলবীর নিকট কোরান শরীফ পাঠ, রোজা

নামাজের মসলা জানা, এই সকল কাজ নিয়েই থাকতেম। তুমি ত সেদিকে যেতে না। পড়তে বল্লে ছুটে কোথায় পালাতে, তার খোঁজ পাওয়া যেত না। শেষে মারধরেও যখন ঠিক হলে না, পড়তে এলে না, মা যখন বারণ করে দিলেন যে আর ওকে ডেকো না। ও যা ইচ্ছা তাই করুক। আমরা কয়েক জনে পড়তেম। তার মধ্যে মেজো বুবু সেজো বুবু ওঁরা বাঙ্গালা শিখে বাঙ্গালা বই পড়তেন, বাঙ্গালাই লিখতেন। আমি কোরান কেতাব নিয়ে থাকতেম। পাঁচ সন্ধ্যা নামাজ পড়তেম, তোমার ও সকল ভাবনা আমি ভাবতেই পারি নাই।"

ছি—"ভাবনার কথা বলছি না, তাঁদের বাঙ্গালা শিখাত কে? আমার ত মনে হচ্ছে না!"

ভগ্নী—"সেদিনের কথা ভুলে গেলি বোন। এই তোমাদের উপস্থিত নড়াই ভেড়াইয়ের মূল যে দাগাদারী।"

ছি—"হাঁ হাঁ, মনে হয়েছে। কত নূতন নূতন কেতাব কিনে এনে দিত। মনে হয়েছে, "বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ," "কি মজার শনিবার" "হদ্দ মজা রবিবার," "বেটি মাটি কোটা, তিন লয়ে কলিকাতা।" যাক, এখন আসল কথা শুন। সে সকল কথা বললে দশ বছরেও শেষ হবে না।"

"আর ছাই মাথা আর মুণ্ডু শুন্‌বো কি? এ দিকের কথা ত আমি নিজেই জানি।"

"সকল কথা তুমি জান না। তুমি আমার এক বছর তিন মাসের বড়। দেখতে আমাকেই তোমার পাঁচ বছরের বড়র মত দেখায়। তা যাক, শুন। তারপর তোমার জানা কথা হয়, একটু শুনে আর শুনতে চেয় না। আগুন যেন জ্বলে জ্বলে উঠে। শরীরের মধ্যেই বেশী জ্বলনী। মনের মধ্যেই যেন বেশী পোড়ানী। কাকেও কিছু বলি না, এ হলো কি? তারপর বোন, নাম বলবো না, একজন লোক একখানা কেতাব পড়ে এক জনকে শুনাচ্ছিল।"

"বেশ, এখানে আর কে আছে যে অত আকারে প্রকারে বলছো?"

"ঠিক কথাই ত। (চতুর্দ্দিক চাহিয়া) ঠিক কথাই ত। তবে শুন—ঐ যে লাল আলু মোল্লা সন্ধ্যার পরেই মার কাছে এসে রোজ রোজ কেতাব পড়ে শুনাত, দুই একদিন আমরাও কাছে বসে শুনতাম। একদিন শুনতে গিয়েছি, লাল আলু আমায় দেখে পড়তে পড়তে থেমে গেল, মাকে ইসারায় কি যেন বল্লে। মা একটু পরেই আমাকে বল্লেন, 'এ কেতাবে অনেক ঔষধের কথা আছে, ব্যামপীড়া চিকিৎসার কথা আছে, নানা প্রকারের কুকুরে মন্ত্র আছে, তোমরা সে সকল কথা শুন না, তোমাদের শুনতে নেই।' কি করি, মায়ের কথার উপর ত আর কথা বলতে পারিনে, ঠিক সেই সময় বাবাও সেইখানে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা কল্লেন, "কি কেতাব শুনছেন বিবি?"

"মা উত্তর কল্লেন—বোন্! সে ত উত্তর নয়, একেবারে যেন ঠাটা গর্জ্জে উঠলেন—'তোমাকে এখানে ডাক্‌লে কে? তোমাকে কেতাব পড়ার খবর দিল কে? আমি রোজ রোজ কেতাব শুনি। তোমাকে কেন বলবো? তুমি বিরক্ত করো না। এখন চলে যাও। খাওয়ার সময়

হয় নাই। শোয়ার সময়ও হয় নাই যে এসেছো। যাও, শীঘ্র বের হও, আমি কেতাব শুন্‌বো। তুমি দূর হও।"

বাবা বললেন, "আমি যাচ্ছি। কেতাবটা কি, তাই শুনতে চাই।"

"মা কল্লেন কি—বাতাসের মত এসে লাল আলুর হাত থেকে কেতাব খানা কেড়ে নিয়ে বালিসের নীচে রেখে, এই বাপের উপর তাড়না জুড়লেন। শেষে বাবা বাবারে বাবারে কর্ত্তে কর্ত্তে ঘর থেকে বেরিয়ে দেউড়ি পার হলেন। মা রেগে বলে দিলেন যে, 'আজকে যদি বাড়ীর ভেতরে আসবি ত মজা দেখবি।"

"যাক, ও রকমের কেচ্ছা অনেক আছে। তুমি কি কল্লে?"

"আমি কি করি—বসেই রইলেম। তারপর মা বালিসের নিকট গিয়ে কেতাব এনে লাল আলুর হাতে দিয়ে পড়তে বল্লেন, আমাকেও খুব ঝাঁকনী সঙ্গে কসে এক উড় তাড়া দিতেই আমি উঠি কি পড়ি ঘর থেকে বেরুলেম। কিন্তু পিছনের দিকের বারান্দায় জানালার নিকটে গিয়ে শুন্‌তে লাগলেম।

"মা বললেন,, 'পড়। এতক্ষণ আরও কত শুনতেম, মাঝখানে এক সয়তান ভূত এসে গোলে বাধিয়ে চলে গেল। আজ ওর কপালে ছেঁড়া চট, আর বাহিরের বারান্দা। খাওয়ার মধ্যে মোটা চাল সিদ্ধ, আর খেসারীর ডালের পানি আছে। তুমি কাল সকালেই শুনবে। পড়, তারপর আর কি হলো?'

"শেষে লাল আলু মাথা দুলিয়ে চেরা সিথাটার উপর ঢাকাই জামদানীর টুপিটা সরিয়ে সুর করে পড়তে লাগলেন। সে দুটি কথা এখন আমার মনে আছে। আমি কান পাতে জানালার আড়াল হতে শুন্‌ছি—লাল আলু পড়তেছেন ঃ

"শুন্‌লো মেলেনি কি তোর রীতি।
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি।
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে
কালি শিখাইব মায়ের আগে॥

"তারপর বোন বলবো কি—কেতাবের সমুদায় কথা ভাল করে বুঝলেম না। যেখানে খুব রঙ্গরসের কথা, সেইখানে লাল আলু মাকে খুব ভেঙ্গে চুরে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। তারপর বিদ্যার বিয়ে হল। তারপর যা যা পড়লো তা তোমার কাছে বলতে পারি না। তুমি বাঙ্গালা জান না। তা হলে সেই কেতাবখানা তোমায় দিয়ে পড়িয়ে শুন্‌তেম। সে লজ্জার কথা মুখে আনা যায় না। কেতাবের লেখা কথা শুনেত মনের ভাব যেন আস্তে আস্তে টলতে লাগলো। যে বাঙ্গালা কেতাব দেখি, সেইখানাই বুবুজানকে পড়তে বলি। তিনি কোন সময় কথা রাখেন, কোন কোন সময় নাও রাখেন।

"মনের মধ্যে দিন রাত আগুন বর্ষাচ্ছে, আগুন বয়ে যাচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জ্বালাচ্ছে, পোড়াচ্ছে, দগ্ধাচ্ছে। এর মধ্যে শুনতে পেলেম আমাদের বাড়ীর আমলা বাবুরা বাহির বাড়ীর আঙ্গিনায় যাত্রা গান গাওয়াবেন। সামিয়ানা উঠ্‌ছে। আমাদের শুন্‌বার জন্যে আলাহিদা

জায়গা হয়েছে। তিন দিক ঘেরা আঁটা, সম্মুখে চিক, আমরা সকলকেই দেখতে পাব। আমাদিগকে কেউ দেখবে না। আহার করলেম—সে আহার নাম মাত্র। সকলেই বলে, যাত্রা গানে বড় সুখ, বড় মজা। আমার মন খারাপ, সকল সময়ই হু হু করে। সর্ব্বশরীর যেন বিছে হেনার মত জ্বালা করে। বিশেষ কয়েক স্থানে যেন কিছু বেশী বোধ হয়। ভাবলেম, সকলেরই সুখ হয়, আমারও হবে। খাওয়া ত খাওয়া—নাম মাত্র খাওয়া। যাক্, সময়ে যাত্রা শুনতে বসলেম। এখন হাসি পাচ্ছে। তখন কত সাধ হয়েছিল। তোমার মনে নেই? আমরা কত ডাকলাম। শেষে মা পর্য্যন্ত তোমাকে নিয়ে যেতে চেষ্টা কল্লেন, তুমি গেলে না। মনে হয়? সেই দিন যাত্রা শুন্তে বস্লেম। প্রথম দুই বেটা এলো, এক জনার হাতে ঝাঁটা, একজনার হাতে বগলে দুটা বোতল—কতক্ষণ কি কি বল্লে—বোতল হাতে বেটা ঢলে পড়ছে, বমির মত ওয়াক ওয়াক করে যেন বমি কচ্ছে দেখালো। তারপর রাধিকা এলো! বোন্। তুমি না প্রত্যয় যাবে, সেই রাধিকার কথা শুনে, আর তার সখি,—সঙ্গে সঙ্গে দাসী-বাঁদীর সঙ্গে যে যে কথা বল্লে—তা শুনে, মনে হলো যে, পর্দ্দা ছেড়ে ফেড়ে গিয়ে রাধিকার গলা ধরে বসে থাকি। তার মুখের কথা, তার হাত মুখ নাড়া, আর মনের দোর খুলে সঙ্গীদিগকে দেখান ভাব দেখে, আমার মনে হলো, যেন তার গলাটি ধরে দুজনে নীরবে বসে কাঁদি। তার মনের অনেক কথার সঙ্গে আমার মনের অনেক কথা একেবারে ঠিকঠাকে মিল হয়ে গেল। তার বেশী কথা, কেবল "কালা" "কালা"। কালা কি আমি বুঝলেম না। সেই কালা কথাটার প্রতিই যেন পাগল। যা হক, যাত্রা শুনে সকলেই খুসী হলেন, আমার মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে উঠ্লো। সে দিন গেল, তারপর আর দুই দিন গেল, একদিন এই পুষ্করিণীর ঐ ঘাটে একা একা বসে ভাবছি—লাল আলু মোল্লাজী মায়ের কাছে যে কিতাবখানি পড়েছিলেন, তাতে বিদ্যার যে ভাব হয়ে ছিল, তারপর মালা দেখে সেই পূর্ব্বভাবের এক অঙ্গ বেড়ে উঠে, তারপর রথের ধারে সুন্দর নামক রাজপুত্রকে দেখে আর একভাব ভাবে যোগ দিল, নিতান্তই অস্থির হয়ে পড়লেন। আমার মন তেমন হলো না। তবে সুন্দরের রূপ না দেখার পূর্ব্বে বিদ্যার মনে যে যে ভাব হয়েছিল, আমার মনেও ঠিক সেই ভাবই এসে দাঁড়াল। তারপর যাত্রা গানের রাধিকার সঙ্গেও আমার ঐ পরিমাণে মিল। তখন মনে কল্লেম, এই সকল জ্বালা-যন্ত্রণা পুরুষের সহিত একত্র বসা-উঠা দেখাশুনা কথা-বার্ত্তা কইতে পাল্লেই বুঝি ভাল হয়। আমাদের ত সেরূপ কপাল ছিল না। পুরুষের মধ্যে কে আছে? ভাই নাই যে তার সঙ্গে বসা-উঠা করবো। সমবয়সী আর আত্মীয়-স্বজন কেউ নাই যে, তাদের সঙ্গে খেলা করবো। তুমি আমাদের কাছে ভিড় নাই, ভিড়তেও না। তোমার যে কাজ, সেই কাজে দিনরাত যেন ডুবে থাকতে। যত কষ্ট, যত খেজালত আমরা কয়জনে ভোগ করেছি। এর মধ্যে শুন্লেম, আমার বিয়ে হবে। তোমাদের সকলকে রেখে আগে আমারই যে হবে। বে'র কথাটা শুনে আর মনে ভয় হলো না। ছেলে হওয়ার কথাটা তখনি মনে উদয় হলো, সেই সময় পাঁচির প্রসব সময় যা যা চক্ষে দেখেছিলাম, সেইগুলি যেন চক্ষের উপর ঘুরতে লাগলো। কিন্তু সে

ঘোরা বেশীক্ষণ রইল না, মনের সেই জ্বলন্ত তেজে কোথায় ভস্ম হয়ে উড়ে গেল। বিবাহ করতে আবার নূতন প্রকারের নূতন ভাবে, মনের ইচ্ছা জন্মাল। পূর্ব্ব ভাব পরিবর্ত্তন হলো। বিবাহ হলেই ভাল হয়। ক্রমে এতদূর পর্য্যন্ত হলো যে বিয়ের নাম কল্লেই সুখ বোধ হত। বোধ হয়—এখন তোমার যেরূপ হয়ে থাকে।"

"আমার কথা যদি বলতে হয় পরে বল্‌বো। তোমার কি হলো তাই বলো।"

"আর কি হবে। বিয়ে হলো। বিয়ে হলো—সকলেই বলে বিয়ে হলো। আমিও দেখি, বিয়ে হলো। কানেও শুনি, বিয়ে হলো। কিন্তু কি যে হলো, কিছুই বুঝতে পাল্লেম না। শরীর যেমন আগে ছিল। তেমনি রয়ে গেল। কিছুই পরিবর্ত্তন হল না। জ্বালা-যন্ত্রণা যা যেমন যেখানে ছিল, তার হ্রাস-বৃদ্ধি কিছু দেখলেম না,—বরং কি যেন বেড়ে উঠলো—আমি তার অনেক বড়। তার বুদ্ধি, জ্ঞান আমা হতে বড় হতে পারে না। তার আলাপে ব্যবহারে আমার মন আরও খারাপ হয়ে উঠ্‌লো। শুনেছিলাম, স্ত্রীকে স্বামী খুব ভালবাসে, তার একটি কথার প্রমাণও আমি পেলাম না। কত প্রকারে সুখী করে, আমার ভাগ্যে তাও ঘট্‌লো না। কেবল নূতন ভাবের মধ্যে দেখি, কোন কোন রাত্রে আমার বিছানায় এসে চুপটি করে শুয়ে থাকে। কেন শুয়ে থাকে, জানি না। তবে যা হুকুম করি, তা শুনে, তৎক্ষণাৎ তামিল করে। যা বল্‌বো, তা যে গতিকে পারে সে হুকুম মত কাজ করবেই করবে। তোমরা সকলে পরামর্শ দিলে যে, ওকে সমেত তুমি বেরিয়ে এসো। কিছু না—হাতখান ধরে কেবল বল্লেম, চলো, আমাদের বাড়ী যাই, এ বাড়ীতে থাক্‌বো না, দাগাদারীর অত্যাচার আর সহ্য হয় না, আর চক্ষে দেখা যায় না। কেবল বলতে দেরী অমনি গয়নার বাক্সটা বগলদাবা করে পাছে পাছে চলে এলো। যদি বিয়ে করে আমার মত সুখী হতে চাও, ভাল একজন ফরমাবরদার চাকর লাভ কর্ত্তে চাও, তবে মন্দ নয়—কিন্তু সকল কার্য্যে হুকুমের তাবেদার নহে। দুই তিনটা কাজের কথা বল্‌লে মুখ ভারী করে বসে থাকে, কিছুতেই হাত পা নেড়ে সরে বস্‌তে চায় না। আমি কি বুঝি তা নয়। বোন্! বিয়ে করে সকলে সুখী হয় না। সুখ সকলের ভাগ্যে জোটে না। বিশেষ জমিদার, কি টাকা পয়সা আলা ঘরের মেয়েদের কপালে স্বামী-সুখ প্রায় ঘটে না। আমরা সুখের জানিই বা কি বুঝিই বা কি?"

"দেখ বোন্! তোমার বুদ্ধির দোষ আছে, বুঝবারও দোষ আছে। আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে অন্য সময় এই ঘাটে এসে বলবো। এ স্থানটি বড় নিরিবিলি। এখন আর বস্‌তে পারিনে। মগরেবের নামাজের সময় আর নেই বললেই হয়। কথায় কথায় নামাজের সময় নষ্ট করেছি। আমি উঠি।"

ছিঁড়িয়া খাতুন বলিলেন, "বোন? যেদিন এসো,—একটু পূর্ব্বে জানিয়ে এসো। ভিখারিণীর সঙ্গে যে যে কথা হয়েছে, সে সকল কথা বলতে আজ সময় পেলুম না; শুন্‌লে বুঝবে, বিবাহ করাটা কত বড় শক্ত কাজ, শক্ত কথা।"

উভয়ে একত্র উঠিয়া আসিতেছেন। বাগানের মধ্যে আসিয়া দেখিলেন, ভিখারিণী গুনগুন

স্বরে গান করিতে করিতে সেই পুষ্করিণীর দিকে আসিতেছে।

ভিখারিণী তাহাদিগকে দেখিয়া দাঁড়াইল। তাঁহারাও দাঁড়াইলেন। ভিখারিণী ছিঁড়িয়াকে বলিল, "ও সোহাগিনী! তুই কোথা যাস্? ওকে ছেড়ে আমার সঙ্গে আয়। ওর কাজ আছে। তোরও কাজ আছে।"

ছিঁড়িয়া ভগ্নীর বাম হাত ছাড়িয়া ভিখারিণীর বাম দিকে গিয়া খাড়া হইলেন। ভগ্নী "নামাজের সময় যায়" বলিয়া অন্তঃপুর মধ্যে ত্রস্তপদে চলিয়া গেলেন।

ভিখারিণী ছিঁড়িয়ার হাত ধরিয়া একটু সরিয়া যাইয়া বলিল, "দেখ! তোর মনের কথা যা শুনেছি, তার পরে আমি যা বলেছি, তা বুঝেছিস? আর তোকে যা যা যোগাড় কর্ত্তে বলেছিলাম, তা যোগাড় কর্ত্তে পেরেছিস?"

বিনীত ভাবে ছিঁড়িয়া বলিলেন, "ঠাকুরানি! সকল যোগাড় করেছি। আপনি একে একে চান আমি দেই।"

ভিখারিণী বলিল, "আর একটু সরে আয়। এটা চলাচলের পথ। কোন কাজ পথের উপরে, কোন কাজ পথের দূরে, কোন কাজ ঘরে, কোন কাজ বাহিরে করতে হয়—চল্ একটু দূরে যাই।"

উভয়ে সেই পুষ্করিণীর নিকটে যাইয়া খাড়া হইলেন। অন্ধকার আকাশে অনেকগুলি তারা ফুটিয়াছে। দুইটি তারা উজ্জ্বল ভিন্ন আর সকলই মলিন। ভিখারিণী বলিল,

"কৈ পরনের কাপড়ের কোণ কাটা?"

ছিড়িয়া অঞ্চল হইতে এক পুঁটলী বাহির করিলেন, পুঁটলি খুলিয়া বলিলেন, "এই নিন কাপড়ের কোণ কাটা?"

"পিঠের মলা?"

"তাও নিন।"

ভিখারিণী বলিল, "বুকের মলা, মাথার চুল, কানের খৈল, এ সকল কৈ?"

"এই নিন—এই পুঁটুলিতে সকলি আছে।"

ভিখারিণীর হস্তে দিতেই ভিখারিণী পুঁটুলি লইয়া বস্ত্র মধ্যে সাবধানে রাখিল। বলিল, "দেখ! তোর স্বামীর মন যদি এতে ভাল না হয়, তোর দিকে ফিরে না শোয়, তবে জানিস্ তার মনে অন্য কিছু নাই। কোন পীড়ায় ভুগছে। লজ্জায় তোর সঙ্গে কথা কয় না!"

"আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করতে পারিনে—তবে এখানে আমোদ, ওখানে প্রমোদ, দিন-রাত আমোদে ভোর। বোটে বজরায় নদীর মধ্যে আমাদের ঢেউ খেলে, ব্যবসাদার বদ্ স্ত্রী খান্‌কি দিন-রাত পড়ে থাকে, তার কি?"

"খেপি! পাগলি! ও সকল বড় মানুষী। তুই ছেলেমানুষ বুঝিস্‌নে, ওর মাঝে অনেক লুকোচুরি আছে। পয়সার অসাধ্যি কিছু নাই। আমি যা দিব, যা কর্ত্তে বলবো, যে অষুধ দিব,—ঠিক আমার কথা মত কাজ কর্‌বি। যদি এতে কিছু না হয়, তবে নিশ্চয় জানিস্ আসল কল বেগড়া। তার ঔষুধও আমার কাছে আছে। আমি সে বেগ্‌ড়া কলও ভাল

করে দেব। তুই ভাবিসনে। এইটে হচ্ছে প্রথম পরীক্ষা। যদি এতেই হয়ে গেল, তা হলে জানিস্ পীড়া নয়। আর এতে যদি না হয়, যদি তোর সঙ্গে আলাপ, কথাবার্ত্তা শোয়া-বসা, তোর মনোমত না করে, তবে জানিস্ তার দোষ নয়। পীড়ার দোষে লজ্জার খাতিরে তোর কাছে ঘেঁসে না—কথা বলে না। আচ্ছা তুই এখন যা—আমি একটু পরে যাচ্ছি।"

"ঠাকুরানি! আমিও তাই দেখবো যে আসল কথাটা কি? আমাকে ভালবাসে না, আমাকে চায় না বলেই,—আমার দিকে ফিরে চায় না, ফিরে শোয় না। সে ইচ্ছা করে না কি ইচ্ছা হয় না, কি না পেয়ে বাধ্য হয়ে ঐ রূপ করে, মিশতে পারে না, শুতে চায় না, —আমি এইটিই জান্‌তে চাই, দেখতে চাই, পরীক্ষা করে বুঝতেও চাই।"

"তাই হবে। কোন চিন্তা নাই, এতেই সব ধরা পড়বে। কি জানি যদি এ-রকম নির্জ্জন স্থান আর না পাই—না ঘটে, এখনি বলে রাখি। গুঁড় ঔষধটা নারিকেল তেল কি ফুলল তেলে গুলে মাখবি, মুখে দিবি—আর তোর স্বামীর মাথায় তুই নিজে হাতে মেখে দিবি। আর লাল অষুধটা তোর স্বামী ঘুমালে তুই নিজে তার নাকের কাছে ধরবি। আসল কথা কি নিশ্বাসে অষুধের গুণ নাকে টেনে নেয়। কার কাছে এ গুপ্ত কথা ভাঙ্গিস্ না। তারপর কি হয়, কি করে—সমুদয় আমাকে জানাবি, মিছে বল্‌বি না।"

ছিঁড়িয়া ভিখারিণীর নিকট হইতে বিদায় হইলো। ভিখারিণী পুষ্করিণীর ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

লাল আলুর মন সোজা করিতে ভিখারিণী স্পষ্ট স্বীকার হয় নাই। মনিবিবির অন্য অন্য কথায় যেরূপ আপত্তি করেছে,—"যদি সত্য বলিতে পার—তবে তোমার মঙ্গল পক্ষে চেষ্টা করবো।" মনিবিবি অবসর লইয়াছেন—সত্য কথা বলিবেন কিনা, সত্য বলিয়া পীড়ার দায় হইতে মুক্তি লাভ করিবেন কিনা? সত্য কথা পেটে যাহা আছে, তাহা বলা হইল, অথচ পীড়াও আরাম হইল না। যে সকল কথা মাত্র তিন চারিটি লোক ভিন্ন আর কেহ জানে না, সেই সকল গুপ্ত কথা ভিখারিণীর কানে গেল। সেও এক ভয়ের কথা। এই সকল চিন্তা ও ভাবনার মধ্যে পড়িয়া মনিবিবি বলিয়াছেন—বিবেচনা করিয়া দেখি। লাল আলুর মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইবে। ডাকিলে অবশ্যই আসিবে। মনিবিবি ডাকিলে আসিবে, তাঁহার কথা শুনিবে। ভিখারিণী স্পষ্ট না বলুক, আভাসে জানাইয়াছে।

পূর্ব্বেই ঘর-ভাঙ্গা মাথা-পাগলা বাবুরা লোক পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের কথায় লাল আলু বিশ্বাস করে নাই। সে কথা পাঠক ইতিপূর্ব্বে ঘর-ভাঙ্গার মুখে শুনিয়াছেন। মনিবিবির ইচ্ছা, যত টাকাই লাগুক্, আপোষে নিষ্পত্তি হইলেই ভাল। যাহাতে আপোষ হয়—তাই করিতে আদেশ করিয়াছেন। সে কথাও পাঠকগণের বেশ মনে আছে। ঘর-ভাঙ্গা মাথা-পাগলা, উভয়ে লাল আলু মোল্লার বাড়ীতে গিয়া তামা তুলসী ব্রাহ্মণের পা ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, তোমাকে ফাঁকি দিয়া নিয়া বে-ইজ্জত করিব না। বিশেষ মনিবিবির নাম করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছে। সন্ধ্যার পরেই মনিবিবির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইয়া তাঁহার সম্মুখেই আপোষ নিষ্পত্তির কথা উঠিবে—মীমাংসা হইবে।

কোন্ কার্য্য কাহার দ্বারা কোন্ উপায়ে কোন্ পথে কি কৌশলে ঈশ্বর ঘটনা করেন, ঘটাইয়া দেন, তাহা মানুষের বোঝা দুঃসাধ্য। ভিখারিণী মিল করিয়া দিবে। আজিকার রাত্রের এই মিলন যদি যথার্থই মিল হয়—তবে ভিখারিণীর গৌরব আরও বৃদ্ধি হইবে, মনিবিবির বিশেষ ভক্তি জন্মিবে। লাল আলু মোল্লা আসিয়াছে, এ কথা মনিবিবির কানে গিয়াছে, সন্ধ্যার পর দেখা সাক্ষাৎ কথোপকথন হইয়া যাহা হয় আজ রাত্রেই হইবে, এ কথাও শুনিয়াছেন।

সন্ধ্যা—ঘোর অন্ধকার। দেখিতে দেখিতে রজনীর অধিকার। যমদ্বারে নিশার অধিকার। আরও অন্ধকার। মনিবিবি বাতি জ্বালিয়াছেন। নাস্তা (জলখাবার), নানাবিধ ফল, আঙ্গুর, পেস্তা, আখরোট, কিস্‌মিস্, নানাবিধ মিষ্টান্ন, নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া থরে থরে রাখাইয়াছেন। রৌপ্যবিড়িদান-ভরা পান, মসলা সংযুক্ত-খিলি প্রস্তুত করাইয়া যথারীতি সাজাইয়াছেন। বিছানা বালিস পরিষ্কার। পীড়িত শয্যার দক্ষিণ পার্শ্বের কামরাতেই লাল আলুর আদর অভ্যর্থনার স্থান।

আজ প্রকাশ্য আদর। দায়ে পড়িয়া যতনের সহিত আদর করিতে—মনিবিবি স্বয়ং, কন্যাগণ, আমলাগণ, জামাতাগণ, দাসী বান্দী চাকরগণ, এক প্রাণে লাল আলুর আদর অভ্যর্থনার মনোযোগী হইয়াছেন—যোগ দিয়াছেন। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সংবাদ লইতেছেন, আসিতেছেন কিনা। আমলাগণ যার পর নাই পরিশ্রম করিতেছেন, যাহাতে এ দুর্নামযুক্ত কলঙ্কপূর্ণ মকদ্দমা মিটিয়া যায়।

লাল আলু আসিয়াছেন—অতি গোপনে। কারণ সোনাবিবির কোন লোকে দেখিলে নিতান্তই লজ্জার কথা। বেশী নহে, সেদিন রাত্রে সোনাবিবির সম্মুখে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, পবিত্র কোরান শরীফ ছুঁইয়া কছম খাইয়াছেন, কখনই মিল করিবেন না, মনিবিবির সহিত দেখা করিবেন না, তাঁহার বাটীতে আসিবেন না। আজ আবার একি? এই সকল ভাবিয়াই গোপনে আসিয়াছেন। সম্মুখের সদর-দেউড়ী হইয়া মনিবিবির নিকট আসিবেন না। বাহিরের পথে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবেন না। ইহা উভয় পক্ষেরই ইচ্ছা। লাল আলুরও ইচ্ছা যে, বাড়ীর পিছন—আম বাগান হইয়া পুষ্করিণীর কিনারের গুপ্তপথে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করেন। আমলাদিগের ইচ্ছাও তাহাই।—মনিবিবিরও সেই কথা।

যে বাগানে ছিঁড়িয়া খাতুন ভগ্নীর সহিত একত্রে বসিয়া আছেন, যে বাগানের মধ্যে ভিখারিণী এখনও কোন গাছ তলায়, কি কোন পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে—কি সবুজ বর্ণ দুর্ব্বাদল ক্ষেত্রের উপরে, কি পুষ্পক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে—সেই জানে।

এদিকে লাল আলু আর দুইজন সারি বাঁধিয়া অতি সাবধানে পা ফেলিয়া আসিতেছেন। একটি বকুল বৃক্ষ, যাহার শাখা-প্রশাখা বহু স্থান ব্যাপিয়া আছে, বাগানের সমুদায় অন্ধকার যেন ঐ বকুল মূল ঘিরিয়া রহিয়াছে। বাড়ীতে লণ্ঠনের অভাব নাই। মনে করিলেই লণ্ঠনের আলো লইয়া আসিতে পারিতেন। কিন্তু লাল আলু লণ্ঠনে বড়ই নারাজ। তিনি বলিয়াছেন, আমি কি ঐ বাগানে নূতন যাইতেছি। কত বছর এই বাড়ীতে চাক্‌রী করিয়া গিয়াছি।

কত কার্য্য উপলক্ষে একা কত দিন ঘোর নিশীথ সময়, বাগানের মধ্যে কত যাওয়া-আসা করিয়াছি, আর সন্ধ্যার সময় লোক সঙ্গে বিনা আলোতে যাইতে পারিব না? আলোর কোন আবশ্যক করে না। আলো দেখিলেই মানুষের চক্ষে পড়ে, নানা প্রকারে সন্দেহ করে। লাল আলুর সাহসে অন্ধকার মধ্যেই তিনজন একত্রে আগে পাছে হইয়া আসিতেছেন। লাল আলুর মধ্যে, পশ্চাতে লাল আলুর পিতা, সকলের অগ্রে ঘর-ভাঙ্গা। বকুল গাছতলা পর্য্যন্ত আসিয়া ঘর-ভাঙ্গা খাড়া হইলেন। লাল আলুর পিতা বৃদ্ধ—দন্তগুলি একেবারেই পড়িয়া গিয়াছে—কানে শুনিতে পান না। মনিবিবির সরকারে খুব বিশ্বাসী চাকর ছিলেন। বৃদ্ধ দশায় কার্য্য কাম করিতে অক্ষম হইয়াছেন। লাল আলু তাঁহার পিতার সময় হইতেই মনিবিবির চাকর ছিলেন। এইক্ষণে কেহই চাকর নাই। কিন্তু কার্য্যকারকগণ বৃদ্ধের কথা বিশেষ মান্য করে। মনিবিবিও মান্য করেন। বৃদ্ধ এই ঘরের পরম হিতৈষী। লাল আলু যদিও বৃদ্ধের অবাধ্য, পিতার সঙ্গে ঐক্য নাই, বাড়ী-ঘর পর্য্যন্ত পৃথক—তত্রাচ এই উপস্থিত বিবাদ যাহাতে আপস নিষ্পত্তি হয়—এটি বৃদ্ধের নিতান্ত ইচ্ছা, আন্তরিক কামনা। বৃদ্ধ দুই পক্ষেরই মুরব্বি—মনিবিবির ঘরের বহু কালের পুরাতন চাকর—এইক্ষণে পেন্‌সনভোগী। এদিকে লাল আলুও সন্তান। ঘর-ভাঙ্গা ভাবিয়াছেন, বৃদ্ধ উপস্থিত থাকিতে কোন পক্ষেরই মাথা নাড়িবার ক্ষমতা হইবে না। এত বড়, গুরুতর কাজ—দুই একজন মাতব্বর লোক মধ্যে থাকা ভাল। তার মুকাবেলা কথা স্থির হওয়াই সর্ব্বাংশে মঙ্গল। তাই ভাবিয়া সঙ্গে আনিয়াছেন। মনিবিবিও বৃদ্ধের আগমন কথা শুনিয়াছেন। শুনিয়া খুব খুশী হইয়াছেন। বৃদ্ধেরও আসিবার বিশেষ টান আছে। বৃদ্ধের মনে বিশ্বাস যে, তাহার সম্মুখে কেহ লাল আলুকে হত্যা বা কোন প্রকারে অপমান করিতে পারিবে না। বৃদ্ধ সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে তার গায়ে কেহ কাঁটার আঁচড়টি দিতে পারিবে না। হাজার হউক পুত্র। পৃথক হইয়া ভিন্ন ভাত খাইয়া—ভিন্ন বাড়ীতে বাস করিলেই কি পুত্রের মায়া হৃদয় হইতে উড়িয়া যায়? কখনই নহে। লাল আলু বৃদ্ধ পিতাকে সঙ্গে আনিতে কোন আপত্তি করেন নাই। তিনি এ কথাটা নিশ্চয় জানেন যে, বুড়ো সঙ্গে থাকিতে তাঁহার কোন ভয় নাই। আরও ভাবিয়া ছিলেন যে তাঁহাকে ফাকি দিয়া ডাকিয়া আনিয়া আক্রমণ করা দূরে থাক্, বৃদ্ধ পিতা সঙ্গে থাকিতে তাঁহার শরীরের একটি লোমও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। পক্ষ, বিপক্ষ, মধ্যস্থ আমলা পক্ষ, তিন পক্ষই বৃদ্ধের ভক্ত। বৃদ্ধ সঙ্গে আছেন বলিয়া তিন পক্ষেরই আনন্দ, তিন পক্ষেরই সাহস। তিনজনে অগ্র-পশ্চাৎ হইয়া যাইতে বকুল তলে ঘোর অন্ধকার দেখিয়া ঘর-ভাঙ্গা দাঁড়াইলেন। লাল আলুও গমনে ক্ষান্ত দিলেন, কাজেই বৃদ্ধও, "কি কথা? কেন দাঁড়াইলেন?" বলিয়া খাড়া হইলেন।

ঘর-ভাঙ্গা বলিলেন, "একটি কথা। আমি এ পর্য্যন্ত বলিবার অবসর পাই নাই। কথাটা কি! দাদাজি! (বৃদ্ধকে আমলাগণ দাদাজি বলিয়া ডাকিয়া থাকেন।) দাদাজি! দেখুন, আমরা সকলেই চাকুরী করি। আজকাল আপনারা এ সংসার ছেড়ে গেছেন, আমরা ধরেই আছি। জমিদারের চাকুরীর ধরন আপনাদের অজানা নাই। চক্ষের উপর পাই পয়সা খরচ হলে

গায়ের এক ফোঁটা রক্তপাতের ন্যায় বোধ হয়। পিছন দিক হতে দশ হাজার গেলেও কোন কথা নাই। দায়ে ঠেকে দশ টাকার জায়গায় বিশ টাকা দিতেও কষ্ট হয় না। বোকামির দরুন শও-পঞ্চাশ গেলেও প্রাণে ব্যথা লাগে না। উচিত কাজে পুরস্কার নাই। উচিত খরচে কাটাকাটি মারামারি। এ কথাটা আপনাদের অজানা কিছুই নাই। বাবাজি যে ফাঁদ পেতেছেন, এতে বেশী হাতে কিছু লাভ করা চাই। এমন সুযোগ আর হবে যা, হবে না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "সে ঠিক কথা।"

ঘর-ভাঙ্গা বাবু বলিলেন,, "হাজার হোক, পাকা লোক, পাকা কথাই বলেছেন। এমন নির্জ্জন স্থান আর পাওয়া যাবে না। এখনই এ কথার একটা মীমাংসা হয়ে আমাদের মধ্যে কথাটা ভাঙ্গচুর হক। কার কিরূপ আশা?"

লাল আলু বলিলেন, "ভাল কথা উপস্থিত করেছেন। আমাদের মধ্যে কথাটা পাকা করে,—শেষ—দরবার উপস্থিত হওয়াই ভাল।"

ঘর-ভাঙ্গা একটু অগ্রসর হইয়া চুপি চুপি বলিলেন, "দাদাজি এত কষ্ট করে এসেছেন, ওঁরও কিছু হওয়া চাই। কিছু হাতে আসা চাই।"

লাল আলু, "আপনি যখন এর মধ্যে আছেন, এত পরিশ্রম কচ্ছেন, কেন ফাঁক পড়বেন? আচ্ছা বলুন ত, আপনাদের মনে মনে কি পরিমাণ আঁচ আছে?"

ঘর ভাঙ্গা—"আমাদের আঁচ কিছু নাই। যাতে হয়, মোকদ্দমা আপোষে মিটমাট করবো—তা যাতে যা হক আপোষ করবই, এই হচ্ছে গোড়ার খবর। এখন আপনার কি পরিমাণ আশা, তা বল্লে ত বুঝ্তে পারি?"

লাল আলু—"আপনার সঙ্গে যদি গড়াপেটা থাকল, তা হলে কেউ কিছু কর্ত্তে পারবে না। যে সকল চিঠি আমি দাখিল কর্‌বো, তাও শুনেছেন। খোদ কর্ত্রীর হাতের লেখা অতি কম হলেও দুশ চিঠি আমার হাতে আছে। তাই বুঝে হিসাব করে আপনিই বলুন—তারপর উপরি অঙ্ক যোগ করে আমরাই তিনজনে কথাটা পাকা করে গোড়া এঁটে যাই। আমার মকদ্দমা খরচ হয়েছে হাজার টাকা, তার উপরে লাভ কি দিবেন?"

ঘর ভাঙ্গা—"আচ্ছা তা হলে আপনি আর দুই হাজার নিন।"

লাল আলু—"তা হবে না। ভেড়াকান্ত সেদিন আমাকে বলেছিলেন যে, মনিবিবির পক্ষে যদি লোক থাকে, তবে কখনি মোকদ্দমা চালাতে দেবে না। চার হাজার দিয়েও তারা আপোষ করবে।"

ঘর ভাঙ্গা—"ভেড়াকান্ত একটা মানুষ। ওর সঙ্গে আমরা খুব লড়ে ভিড়ে দেখেছি, বাজিয়ে দেখেছি, ওর সমান লোক আমাদের দেশে নাই। তবে মনিবের মন যোগাতে নানা কথা বলে থাকি, সে যা বলেছে তাই ঠিক হলো--আমাদের দুজনার কি?"

বৃদ্ধ—"আমার কথা আমি বলি—যাতে আপোষ হয়ে এ মোকদ্দমা আর না চলে, তা কর্ত্তেই হবে। মনিবিবির টাকা বার ভূতে লুটে খাচ্ছে। ধুম্বলোচন এ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ হাজার পার করেছেন। আমরা নাহয় কিছু খেলেম—আর দুই হাজার ধরুন।"

লাল আলু—"তা হলে ঘর-ভাঙ্গা বাবুর জন্যেও দুই হাজার ধর্ত্তে হয়।"

বৃদ্ধ—"তাতে লোকসান কার! বার হাতে বার ভুতে লুটে নিচ্ছে। যে কষ্টে টাকা মজুদ করেছিলাম, তা আমি জানি। তা যখন রৈল না, তখন আর কথা কি? আমাদের বরাত্ যে উঠেছে, সে উঠেছে। আর ডাক্‌বে না। তবে ঘর-ভাঙ্গা বাবুর অনুগ্রহে যদি কিছু পাই, তবে তা ছাড়বো কেন? জমিদারের কাজে, যে দশ টাকার জায়গায় দশ টাকা খরচ করেও যে আসন পায়—আর যে দশ টাকার জায়গায় দশ টাকা খরচ করে আর পঞ্চাশ টাকা নিজ বাক্সে পুরে ষাট টাকার খরচ দেখায়, সেও সেই আসনেই বসতে পায়। সময় সময় আবার সেই ষাট টাকা ওআলাই বেশী বিশ্বাসী, হিতৈষী বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়ে চক্ষে ধূলা দিয়ে বাক্স বোঝাই কর্ত্তে থাকে। ওর জন্যে আবার আগার-মাগার কি?"

ঘর-ভাঙ্গা—"হাজার হক পাকা লোকের পাকা কথা। তা হলে আট হাজারের কথাই থাক।"

বৃদ্ধ আর একটু নিকটে আসিয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন, "না না! তা হবে না, তা বলো না। বলতে হবে বার হাজারের কথা। তার বুঝ্ আছে। ধর, যদি মোকদ্দমা লাল আলু ডিক্রি পায়—তা হলে কত টাকার সম্পত্তি যায়, কি পরিমাণ লোকসান হয়। তারপরে মোকদ্দমা চালালে খরচা আছে—ঘুষ আছে। কত কি আছে। সে কথাটা ভাল করে আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। তারপর তার কথাটার মর্য্যাদাও রাখতে হবে। বার হাজারই কথা, শেষে কর্ত্রীর উপরোধ খাতিরে আট হাজার হবে। তিনিও খুসী হবেন। ঘর-ভাঙ্গা বাবুও খুব সুখ্যাতি লাভ করবেন। আমরাও কিছু পেয়ে যাব। আসল কথা শুন, বার হাজার না দিলে মোকদ্দমা আপোষ হয় না। এই হলো ঘর-ভাঙ্গা বাবুর কথা। তারপর তিনি আলুর সঙ্গে অবশ্যই কথা কইবেন। বরং আপনিও (ঘর-ভাঙ্গা বাবুকে সম্বোধন করিয়া) আকারে প্রকারে ইঙ্গিতে বল্‌বেন—হুজুর গোপনে ডেকে দুকথা বল্লে তাহলে কিছু কমতেও পারে। তিনি অবশ্যই রাজী হবেন। কথাটা একেবারে ছেলের মুখের কথা মনে কর না। তিনি আলুকে নির্জ্জনে ডেকে বললেন, আমাকেও অনুরোধ কর্ত্তে অনুরোধ করবেন। আমার অনুরোধ, তাঁর কথা—এই সকল কারণে অবশ্যই লাল আলু কিছু ছেড়ে দেবে। দুই, তিন, শেষে হদ্দ সীমা চার হাজার ছাড়লে, আর কথাটি বলতে পারবেন না। আমাদেরও যা আঁচ তাও ঠিক থাক্‌বে, কর্ত্রীর অনুরোধও রক্ষা হবে।"

ঘর ভাঙ্গা—"দাদাজি! অন্ধকার না হলে তোমার পায়ের ধূলা মাথায় নিতেম। ঠিক বলেছেন। জমিদার শ্রেণীর লোকের উপকার কল্লেও যে কথা, দশ হাত নীচে নামালেও ঐ একই কথা। বার হাজার টাকার কথাই বলা যাবে। বাদসাদ গিয়ে আট হাজার। অর্দ্ধেক বাবাজি, আর যা বাঁচবে, তার অর্দ্ধেক দাদাজী, দুই হাজার বান্দা রামের। একথার আর মার নাই। যা চাওয়া যাবে, তাই পাওয়া যাবে। কথাটা ত আর কম নয়। বাবাজী যেন বড়শী ফেলেছেন, তাতে না আটকে যাওয়ার উপায় নাই। বুড় বয়সে দাদাজিও কিছু হাতে করবেন। আমিও আমার ছোট মেয়ের বিয়ের যোগাড়টা ভাল মতে কর্ত্তে পারবো। আর

বাবাজীর ত কথাই নাই। এত ভাল চাকুরী করে শেষে চার হাজার টাকা বক্‌সিস নিয়ে বাড়ী চল্লেন। অদৃষ্টের কথা কিছু বলা যায় না। যেরূপ ভাব দেখা যাচ্ছে, যদি আট হাজারের উপর কিছু বেশী লাভ হয়, তবে তার কি হবে? সে বেশী টাকা কে পাবে? কি প্রকারে ভাগ হবে?"

বৃদ্ধ—"সে বেশী টাকা আমরা চাই না। যত বেশী কর্ত্তে পারেন সকলি আপনার।"

ঘর-ভাঙ্গা বৃদ্ধের গায়ে গায়ে মিশিয়া বলিলেন, "তা হলে আমার একটি কথা। বাবাজি! যেন মুখে খুব শক্ত হয়ে বসে থাকেন। কিছুতেই যেন মনের গতি অন্যত্র না যায়। মনের ভাব যেন পরিবর্তন না হয়। কিছুতেই যেন ভুলে না যান। কোন কৌশলেই যেন গলে মোমের বাতি না হন। চক্ষের জলে যেন ভেসে না যান। তাহলেই আমার এক হাত। পোয়াবার। দাদাজি! তোমারই অনুগ্রহ। বাবাজী তোমাবই দয়া। আবার বলি সাবধান। বাবা! কোন কথায় মজে যেয়ো না।"

লাল আলু—"আমি ঠকে, দেখে, ভুগে খুব শিক্ষা পেয়েছি। ভুগে ভুগে এখন পাথর হতেও শক্ত হয়েছি। জমদ্বারের কর্ত্রীঠাকুরাণীদের আমি খুব ভাল করেই চিনি। আমার চিন্‌তে কেহই বাকী নাই। বার্ষিক চার হাজার টাকা লাভ রেখে, কয়েকখানি গ্রাম বিনা পণে, বিনা সেলামিতে পত্তনি লিখে দিতে চেয়েছিলেন। কাগজ এলো, মুশবেদা পর্য্যন্ত হলো। শেষে সকলি ভূয়—সকলি ফাঁকি। কি করি! আমার বুদ্ধির দোষে আমি ঠক্‌লেম। কপালে নেই, কি করবো।"

ঘর-ভাঙ্গা—"মুসলমানের কপালই ঐরূপ। মুখখানা ভারি দেখলে অমনি কাত্‌ আর কথা নেই। পায়ে ধরে গুনা মাপ। চক্ষের জলে বুকে পলেত চারদিক অন্ধকার। মুসলমান জাতিই হচ্ছে নরম দেল্‌। শক্তি নাই। ধারণা করবার বল নাই। সামান্য আঘাতেই নওয়াইয়া পড়ে। হাজার অপরাধ করে, মারি হাতী লুটি ভাণ্ডার, খুব ভারি অপরাধ করে মিছে মিছে চক্ষের জল বাহির করে দেখাতে পাল্লেই মুসলমান নিকট কার্য্যসিদ্ধি। এ বিষয় চতুর বলি হিন্দু। কার্য্য উদ্ধারে ভারি মজবুত। ভারি পাকা। সত্য-মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি, তোষামোদ বয়ামদ, জোড় হাত, পায় ধরা, বিনামা সোজা, গাড়ী টানা, ময়লা ফেলা, যেন-তেন প্রকারেণ কার্য্য উদ্ধার করে কিছু লাভ করবেই করবে। চলুন, আর বিলম্ব করবেন না।"

সকলেই দুই-এক পায়ে অগ্রসর হইতেছেন। হঠাৎ ঘর-ভাঙ্গা বাবুর মনে ভিখারিণীর চিত্র জাগিয়া উঠিল। অন্ধকার মধ্যে চক্ষের উপরেও যেন সেই রূপের আভা পড়িল। শরীর শিহরিয়া রোমাঞ্চিত হইল। হৃদয় মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। একটু থামিলেন, বসিয়া পড়িলেন। চক্ষু বুজিয়া বসিয়া পড়িলেন। লাল আলু থমকিয়া দাঁড়াইল, বৃদ্ধও দাঁড়াইল। উভয়ের মুখেই কি কি? কি হলো?"

ঘর-ভাঙ্গা উত্তর করিলেন, "কিছু নয় একটি লোকের কথা মনে পড়িতেই যেন আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। অন্ধকার মধ্যে যেটুকু দেখিতেছিলাম, তাহাও যেন অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল। শরীর শিহরিয়া উঠিল। তাতেই একটু বসে স্থির হয়ে নিচ্ছি।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে লোকটি কে? এমন লোক কে আছে, যে তার চেহারা মনে পড়তেই ভয় হলো?"

ঘর-ভাঙ্গা—"আছে, একটি ভিখারিণী। দাদাজী, সে ভিখারিণী সামান্য ভিখারিণী নয়।"

লাল আলু—"হাঁ হাঁ, আমিও শুনেছি। একটি ভিখারিণী মনিবিবির বাড়ীতে আজ কয়েক দিন এসেছে। সে মুখ দেখে মানুষের মনের কথা বলে দেয়।"

বৃদ্ধ—"ছি ছি! তুমিও ঐ কথা বিশ্বাস কর। মুখ দেখে মনের কথা কেউ বলতে পারে? এ কি একটা কথা?"

ঘর-ভাঙ্গা বাবু খাড়া হইয়া চলিতে লাগিলেন। বকুল মূল পার হইয়াছেন, কিন্তু বিস্তারিত ডালের নিম্নের অন্ধকার হইতে যাইতে পারেন নাই।

আবার যেন শুষ্ক পাতার উপরে চলে যাওয়ার পদ নিক্ষেপের শব্দ, তিনজনই শুনিলেন। সড় সড় শব্দে তাঁহাদের দক্ষিণ হইতে সম্মুখে চলিয়া গেল। এখনও বকুল ডালের ঘোর অন্ধকার ছাড়াইতে পারেন নাই। বাতি না আনিয়া বড়ই ভুল করিয়াছেন, তিনজনই তখন নিজ বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

ঘর-ভাঙ্গা বাবুর গা-টা গরমই আছে। মাথার মধ্যেও যে তোলপাড় না হচ্ছে, তাহা নহে। বুকের মধ্যের ধরফড়িটা একটু কমিয়াছে মাত্র। বেশী দূর যাইতে পারেন নাই। তিন-চার পা পথ অগ্রসর হইতেই ঐ শব্দ। শুষ্ক পাতার উপর হইয়া কোন জীবজন্তু—যেন চট্ চট্ শব্দে সড় সড় করিয়া—দক্ষিণ হইতে সম্মুখে চলে গেল। সেবারে আর দাঁড়াইলেন না। কিছু দূর গিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে ঢিল পড়ার ন্যায় একটি শব্দ হইল। ঢিলটা পড়ে যেন বৃক্ষ শ্রেণীর গলিত পত্র মধ্যে জোরে প্রবেশ করিল। ঘর-ভাঙ্গা "রাম! রাম! কৃষ্ণ! বিষ্ণু! দুর্গা! দুর্গা!" বলিয়া দাঁড়াইলেন। সেবারে আর মাটিতে বসিলেন না। অন্ধকারও এমনি যে নিকটের মানুষ দেখা যায় না। ইহাদের তিন জনার পরনের খুব পরিষ্কার কাপড়, তাহাতেই কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। রাম! রাম! বলিয়া দাঁড়াইতেই, বৃদ্ধ দাদাজী বুঝিলেন, শৃগালই হউক, কুকুরই হক্, সাবধানে পা ফেলে আসছে! যেন খুব নিকটে।

অনুভবে বুঝিতেছেন খুব নিকটে কিন্তু ভয়ে পিছনে ফিরিয়া চাহেন নাই, দেখেন নাই। আবার মনে করিয়াছেন, "কিসের ভয়? যদি খুব নিকটে আসার শব্দ শুনি, তবে নিশ্চয়ই তাকিয়ে দেখবো।" মনে মনে এই সকল চিন্তা কল্পনা এক মুহূর্ত্ত অতীত হয় নাই। ঘর-ভাঙ্গা দুর্গা দুর্গা বলিয়া কেবল দম ছাড়িয়াছেন, বৃদ্ধ পূর্ব্ব সংকল্প মত যেই পিছনে চাহিয়াছেন, এক ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া, "বাবা গো—মরেছি গো" বলিয়া লাল আলুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

লাল আলু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনজনই আবার বসিলেন। বৃদ্ধের কেবলই কম্প, শীতে যেন থরথর কাঁপনি। লাল আলু এত জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃদ্ধ কোন উত্তর দিলেন না।

ঘর-ভাঙ্গা বলিতে লাগিলেন, "এ-বাগানে যে একটা ব্রহ্মদত্তি আছে, তা আমি অনেক দিন হতে জানি। আরও কয়েকদিন অনেক অনেক রকমে—আপনারা মনে মনে আপনাদের

দেবতার নাম করে উঠুন। আমি ত মনে মনে দুর্গা নাম জপ কচ্ছি।"

ভয়ে ভয়ে বকুল মূলের অন্ধকার ছায়া পার হইয়া তাঁহারা একটু খোলা জায়গায় গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘর-ভাঙ্গা বাবু পরিধেয় কাপড় ঝাড়িয়া পরিলেন। গায়ের জামা খুলিয়া উলটাইয়া গায়ে দিলেন। বালাপোষখানা ঝাড়িয়া তল উপর করিয়া গায়ে দিলেন। "দুর্গা! দুর্গা।" বলিয়া যাত্রা করিলেন। মুখে খুব সাহস। "আসুন আপনারা, আমার সঙ্গে আসুন। দেখি ব্রহ্মদত্তি বেটা আর কি কর্ত্তে পারে।" এই সাহসের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনজন যেন একত্র মিশিয়া চলিলেন।

ক্রমে খিড়কির দ্বারে উপস্থিত হইতেই দেখিলেন, দ্বার খোলা। একজন দাসী দ্বারের নিকটে তাঁহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। দাসীর কর পরিচালন সঙ্কেতে তিনজন অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দাসী সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া যে ঘরে তাঁহাদের বসিবার স্থান নির্ণয় হইয়াছিল, সেই ঘরে লইয়া বসাইল। আদর-অভ্যর্থনা যত দূর মানুষের দ্বারা সম্ভব তাহা আরম্ভ হইল।

মনিবিবির আদেশে ঘর-ভাঙ্গা তাঁহার কামরায় আসিয়া সমুদায় অবস্থা বলিলেনঃ

"আপোষে নারাজ নহে। তবে খাঁই অনেক। অনেক বলে-কয়ে সঙ্গে করে এনেছি। তাঁহারা বাপ-বেটায় এসেছেন। তাঁদের আশা বার হাজার। এর কমে কিছুতেই নয়। তবে কথা হয়েছে, হুজুর যদি ডেকে কিছু ছাড়তে বলেন, তা হলে বিবেচনা করে দেখবেন।"

মনিবিবির পর্দ্দার আড়াল হইতে অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "তোমরা কি পর্য্যন্ত দিতে ইচ্ছা কর? বার হাজার কম টাকা নয়! সেই মরণ আমার হবে, কিন্তু এখন হলে হাড়ে বাতাস লাগতো। কি ঝকমারি!! এখন বার হাজার দাও, তবে রক্ষা।"

"হুজুর! বিপদে পড়লে করা কি? শক্রতা সাধন জন্য কত করে, দিকবিদিগ জ্ঞান থাকে না। হাজার প্রকারে ঈশ্বরে ধন্যবাদ! যে সেরূপ কোন ঘটনা শক্রলোকে ঘটায় নাই। আমার বিবেচনায়, হুজুর প্রথমে আমাদের সম্মুখে পিতা-পুত্রকে ডেকে দুই চার কথা বলে দেখুন, তাতে যদি কিছু লাভ হয়, ভালই, নিতান্তই একরোখা হয়ে থাকেন, হুজুর লাল আলুকে গোপনে ডেকে বিশেষ করে বল্‌বেন, লাল আলু খুব সরল। ঐ বুড় বেটা ভারি পেঁচাও।"

"ওকে সঙ্গে করে কেন আন্‌লে? ও বালাই না আসাই ভাল ছিল।"

"সাহস করে আসা বড় কঠিন! যে রকম ব্যাপার, এতে কার প্রাণের ভয় নাই, হুজুর? সেই ভয়েতে বুড়কে সঙ্গে করে এসেছে।"

"এখন আর উপায় কি? অত টাকা আমি কোথা হতে দেব! যা হয় হক্‌, আমার কপালে যা থাকে হক্‌, অত টাকা আমি দিতে পারবো না। আমাকে লাল আলু তার বাড়ীতে নিয়ে যাক্‌। তোমরাও বাঁচো, জামাইগণও রক্ষা পান, মেয়েরাও সুখে নিদ্রা যান্‌। আমিই হয়েছি তাঁদের সুখের কাঁটা। আমার জন্যেই সংসার ছারে-খারে গেল। আর বরদাস্ত হয় না।"

"হুজুর! সংসারে থাকতে হলে সুখ-দুঃখ মিশানে থাকতে হয়। কখনও সুখ, কখনও দুঃখ। দুঃখের সময় ধৈর্য্য না ধরে, ছট্‌ফটিয়ে প্রাণ ফাটিয়ে মলে কি আর রক্ষা হয়, না কার্য্য উদ্ধার হয়? হুজুর। আপনি যদি হাত-পা গুটিয়ে নেন, তাহলে এ সংসার এখন টেকা মুস্কিল। ভাববে না, ওদের খাওয়া হক্। এই ঘরে ডেকে এনে যা বলবার বল্‌বেন। হুজুর! আমাদের এই বাগানে কিছু আছে। অন্ধকার রাত্রে বড় ভয় হয়। আরও অনেকে ভয় পেয়েছে। হুজুর! সেই ভিখারিণী কোথায়?"

"তাঁর মন। তিনি কার বাধ্য নন্। কারও কথার মধ্যে নন্। যখন যা মনে হয়, তাই করেন। লোকের ভাল ভিন্ন মন্দ করেন না। কোথায় আছেন, ঠিক জানি না। যখন ইচ্ছা হয়, আমার এখানে এসে দুদণ্ড বসেন, ইচ্ছা হলো, তার শোবার ঘরে গিয়ে রইলেন। তিনি ত অনেক আশা-ভরসা দিয়েছেন, দেখি কি ঘটে কি হয়।"

ঘর-ভাঙ্গা—"হুজুর! ওঁদের আহার এখনও শেষ নয় নাই। আমার বড়ই শীত বোধ হচ্ছে। বাসায় গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে গায়ের কাপড় নিয়ে আসি।"

মনিবিবি—"যদি সুবিধা মনে করেন—আসবার সময় মাথা-পাগলা বাবুকে সঙ্গে আন্‌বেন। টাকা-কড়ির কথা! সঙ্গে সঙ্গে মামলা মকদ্দমা, তার সঙ্গে আবার অন্য সম্পর্ক, ভিন্ন সম্বন্ধ। বুঝে-সুজে [illegible]রাই ভাল।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া ঘর-ভাঙ্গা ক্ষণকাল জন্য বিদায় হইলেন।

মনিবিবি দরজার ফাঁক দিয়া লাল আলুর মুখ চক ভ্রূ, শুভ্র কপালের উর্দ্ধ রেখা, ঘন বাবড়ি চুল, মুখের শ্রী দেখিতে লাগিলেন। সময় সময় বৃদ্ধের দাঁত পড়া লম্বা সাদা দাড়ী সংযুক্ত মুখ নাড়া চিবন ভাবও নজরে পড়িতে লাগিল।

এই অবসরে একটি কথা বলিয়া রাখি। ভিখারিণী যে সেই আম বাগানে রহিয়া গেল, তাহার কোন খোঁজ-খবর লওয়া হয় নাই। মাত্র বলা হইয়াছে যে, হয় শ্যামল দুর্ব্বাদলোপরি, কি কোন বৃক্ষের তলে, কি পুষ্করিণীর বান্ধা ঘাটে বসিয়া আছে, কি গাছের তলায় তলায় হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। যাহা অনুমান তাহাই যথার্থ। ভিখারিণী বিনা কারণে, বিনা মতলবে ছিঁড়িয়াকে বিদায় দিয়া অন্ধকার মধ্যে বাগানে থাকে নাই। লাল আলুর মোকদ্দমা আপোষের ভার সমুদায় তাঁহার বুদ্ধি-কৌশলের উপর নির্ভর। সে বলিয়াছে, আপোষ হইবে। সে আপোষ যাহাতে হয়, তাহা তাহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। গোপনে খিড়কির পথে আসিয়া মনিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা—এ পরামর্শের মধ্যে ভিখারিণী আছে। মনিবিবিকে সে ঐ পথে ঐ প্রকার গোপন ভাবে আনিতে পরামর্শ দেয়। সে বলে যে, লাল আলু ভয়ানক লোভী। যাহাদের হাতে আছে, তাহারা যদি দেখে যে, লাল আলু মনিবিবির বাড়ীতে যাওয়া-আসা করে—আর নিষ্পত্তিও না হয়, তাহা হইলে সে দুই দিক হইতে মারা যাইবে। তাহাতেই ঐ পথে গোপনে রাত্রে আসার কথা। ভিখারিণী ঐ সকল সন্ধান, এবং ছিঁড়িয়ার নিকট হইতে যাহা যাহা তাহার সংগ্রহের দরকার, সেগুলি হস্তগত উদ্দেশ্যেই সন্ধ্যার সময় আম বাগানে গমন করিয়াছিল। ছিঁড়িয়া বিদায় হইলে, ভিখারিণী তিনটি লোককে বাগানে

আসিতে দেখিল। বলা বাহুল্য—তাহারাই ঘর-ভাঙ্গা, লাল আলু ও তস্য বৃদ্ধ পিতা। তাহারা চলিতে চলিতে যে সময় বকুল বৃক্ষের ঘোর অন্ধকারে আসিয়া খাড়া হয়, ভিখারিণীও সেই সময় সেই অন্ধকার মধ্যে গাছের অন্য পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাদের গুপ্ত পরামর্শ সমুদায় শুনিয়াছে। ঘর-ভাঙ্গার সম্মুখ হইতে চট্ পট্ শব্দে সরিয়া যাওয়া, তাহার পর বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে থাকা ও বৃদ্ধ পাছে মানুষ আছে ভাবিয়া মুখ ফিরিয়া তাকাইয়া দেখে ও ভয়ে লাল আলুকে জড়িয়া ধরে, এ সমুদায় ঘটনার মধ্যে ভিখারিণীর সংশ্রব আছে। ভিখারিণী তাহাদের গুপ্ত পরামর্শ সকলি শুনিয়াছে। ভিখারিণী আম বাগান হইতে আসিয়া, দ্বিতীয় নন্দিনী, মনি বিবির দ্বিতীয় চাঁদ-বদনী, যিনি বিদ্যায়-বিদ্যাবতী, রূপে-গুণে সরস্বতী, তাঁহারই গৃহে তাঁহার মন-বেদনার কথা শুনিতেছে। বিদ্যাবতী এখনও কুমারী। সুদীর্ঘ কেশের অধিকাংশ সুকান্তি দেহের রঙ্গের সঙ্গে বর্ণে বর্ণে মিশিয়াছে। শরীরে যেন রক্ত নাই। সুখ সাদা ধব্‌ধবে। দেহ-যষ্টির লাবণ্য যেন চির নয়ন জলে ধুইয়া গিয়াছে। ভিখারিণী তাঁহার দুঃখেও দুঃখিনী। এখন উপস্থিত তিন কথা। বিবাহের কথা, আর এক কথা, আর একটা মনের কথা, এই তিন কথা নিয়াই ভিখারিণীর সঙ্গে চাঁদ-বদনীর কথা হইতেছে। বিবাহের কথা—একাল পর্য্যন্ত কত স্থানে হইতে কত কথা আসিল, কোনখানেই হয় নাই। বর জোটে না। যদিও জোটে ত হয় না, শেষে কুঞ্জ-নিকেতনের বেগম ঠাকুরাণীর প্রিয় ভ্রাতা, দুরন্ত দুষ্ট সাগর মিট্‌মিটে শিরোমণি, অন্তরে বিষ, মুখে মধুপ্রবর, শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু "হট্টু" ফাঁদ মহোদয় সহিত কথা চলিতেছে, সে বিষয়ও ভিখারিণীর সহিত কথা হইয়াছে। আরও কথা—আরও কথা। সে সকল কথা এখন চাপা, গোপনে গোপনে, খুব গোপনে চলিতেছে। ভিখারিণী বলিলেন, "থাক্ আজ আর নয়, ক্রমে শুনব। ক্রমে বলব। ভেব না, চিন্তা করো না।"

এই কথা বলিয়া ভিখারিণী দ্বিতীয় চাঁদ-বদনীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া একেবারে মনিবিবির পর্দ্দার মধ্যে প্রবেশ করিল।

এ দিকে পিতা-পুত্রের আহার সমাধা হইয়াছে। পানের সহিত আলাপ চলিয়াছে। পিতার সম্মুখে সন্তানের তামাক খাওয়া ভদ্রনীতির বহির্ভূত। সুতরাং বৃদ্ধ পান-তামাকের সহিত আলাপ করিতেছেন। লাল আলুর পানের সঙ্গেই আলাপ। ঠোঁট দুখানি পানের রসে লাল টুকটুকে হইয়াছে। মনিবিবি ভিখারিণীকে দেখাইলেন,—"ঐ লাল টুক টুকে ঠোঁট দুখানি।" উপস্থিত কার্য্যক্ষেত্রে জামাইদ্বয় অনুপস্থিত। কন্যাগণ গরহাজির। কেহই দেখিবেন না, আসিবেন না। বড়ই ঘৃণার কথা, মাথাকাটা লজ্জার কথা। মাথা-পাগলা বাবু আসিলেন না। মাত্র ঘর-ভাঙ্গা, মনিবিবি, লাল আলু, আর বৃদ্ধ। মনিবিবির বুদ্ধির গোড়ার জল প্রদায়িনী, মন্ত্রবলে আপোষকারিণী ভিখারিণী মনিবিবির নিকটে। ক্রমে সকলেই মনিবিবির পর্দ্দার পার্শ্বে তক্তপোষের উপর বসিলেন। ভিখারিণী মনিবিবির নিকটেই রহিল। সে যে পর্দ্দার মধ্যে আছেন এ খবর বাহিরের কেহই রাখেন না। ঘর-ভাঙ্গা বাবু শুনিয়া গিয়াছেন যে ভিখারিণী কোথা আছে, মনিবিবি ঠিক বলিতে পারেন না।

কাজের কথা যোগাইয়া আনিতে বড়ই বুদ্ধি খরচ করিতে হয়। এত যোগাড়-যন্ত্রে

তিন মুখ একত্র হইল। দুই মুখ পর্দ্দার মধ্যে রহিল। কথা কহা শুনা, হাঁ না ইত্যাদির কোন বাধা জন্মিল না।

ঘর-ভাঙ্গা বলিলেন, "কথা ত অনেক বলা হয়েছে। এখন সংক্ষেপে বলুন, কি হলে মকদ্দমাটা তুলে নেন। আর বেশী কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। মনে এক মুখে আর, এভাবও দেখাবেন না। যা মনে আছে, মন খুলে বলে দিন। আমরা ভেবে-চিন্তে দেখি, পারি কি না পারি?"

লাল আলু মুখে কথা আসে আসে না "যাহার সঙ্গে এত কথা, এত ভালবাসা—এত মিষ্টি কথা, এত ভাব, এত যে, তারই বিরুদ্ধে নালিশ। তারই সঙ্গে আবার মিল, আবার আপন। কিন্তু মাঝে টাকার খেলা। টাকাই সকল। টাকাই পিরীত, টাকাই প্রণয়, হায়রে টাকা! সেই টাকার জন্যে আজ দর-দস্তুর! আমি কি চাই? তিনি কি দিবেন? না বনে, কথায় মিল না পড়ে, উঠে যেতে হবে। আবার যে শত্রুতা সেই শত্রুতা। দুনিয়ার খেলাই টাকা। দুনিয়ার মায়াই টাকা। দুনিয়ার প্রণয় পিরীত ভালবাসা, যা বলো সকলি টাকা। হায়রে টাকা! এখন কি বলি। যাক্, আর মনের ধাঁদা খেয়ে কাজ নাই। মনে মনে কথা রেখেও কোন দরকার নাই। মুখ মন এক করে, সাদা ধবধবে বিলাতী ধোয়া লংক্লথের মত বলিতেছি, বারর কম কিছুতেই হয় না, হবে না।"

ঘর-ভাঙ্গা চক্ষু টিপিয়া বলিলেন, "কিছু কম করুন। কিছু ছেড়ে দিন্। মন একটু নরম করুন। চক্ষু তুলে এক নজর আমাদের দিকে চান্। জগৎ সেই ভাবেই আছে। সেই চাঁদ—সেই তারা—সেই বাতাস—সেই রাত্রি—সেই আকাশ—সেই দুনিয়া—সেই এক ভাবেই আছে। পরিবর্ত্তন আমাদের। একটু নজর করে বলে দিন্। সকল দিকেই রক্ষা হক।"

লাল আলু—"আর হবে না। যা হবার হয়েছে। যা বলবার বলেছি। আমার যে কত ক্ষতি, তা কি আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না?"

ঘর-ভাঙ্গা—"ক্ষতি লাভ জানি না। হুজুর! এতই শুন্‌লেম, দাদাজি যে কিছুই বলেন না।"

বৃদ্ধ—"হুজুর! ফোঁটায় ফোঁটায় মজুদ করেছিলাম। এখন ঘড়ায় ঘড়ায় যাচ্ছে। যার হাতে পড়েছে, সেই বাক্‌স বোঝাই করে বাড়ী পাঠাচ্ছে। আমরা গরীব। হুজুর নজর কল্লেই বেঁচে যাই। চিরকাল খেয়ে বাঁচি।"

মনিবিবি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার হিতৈষিণী, ভিখারিণীর সঙ্কেতে বলিলেন, "লাল আলু এখানে একটু বসুন। আপনারা বাহিরে যান্। কি অন্য ঘরে গিয়ে বসুন। আমি একটা কথা বলে দেখি। তিনি বার হাজার না হলে আমাকে ছাড়বেন না। আপনারা যান্। দেখি, আমি যদি কিছু কমাতে পারি।"

ঘর-ভাঙ্গা সঙ্কেতে লাল আলুকে সতর্ক করিলেন। বৃদ্ধও লাল আলুর হাত ধরিয়া সতর্ক। শেষে মাথা ছুঁওয়াইয়া সতর্ক যে, "খবরদার যে কথা তার অন্যথা যেন না হয়।" এই বলিয়া উভয়ে বাহিরে আসিলেন। লাল আলু ঘরের মধ্যে রহিলেন।

পাঠক, এই স্থানে গাজী মিয়াঁ কি করিবেন? বড়ই কঠিন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্ম কর্ম্ম, পবিত্র কোরান, মাথা ছুঁইয়া কিরে, কত প্রতিজ্ঞা—এই সে দিনের কথা। দ্বিতীয় পর্ব্বে প্রেম ভালবাসা, হৃদয়ের ধন, কলিজার টুকরা, সে আমার, আমি তার। মধ্যে বিরহ, তারপর বিচ্ছেদ, তারপর মিলন। কেবল চক্ষের দেখা। নায়ক-নায়িকার খেলা, রঙ্গরসের মেলা,—কেহ বাদী, কেহ বিবাদী, কেহ মধ্যস্থ। সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থ। আবার কাহারও অর্থই সার, অর্থই সংসার, অর্থই জীবন—অর্থই সর্ব্বস্ব। বড়ই কঠিন—বড়ই কঠিন। দেখিব, আজ দেখিব, কবির কল্পনা, দেব ঋষি মুনি গোঁসাইদিগের বর্ণনা। প্রেম পিরীতির মর্য্যাদা টান্, বিষম ব্যাপার! স্বার্থ কম নয়। বারটি হাজার টাকা! দেখিব কোন্ পক্ষের পাল্লা কি পরিমাণ ভারী। কার জয়, কার পরাজয়! দেখিব, দেখিব। কোন্ আননে, কোন কথায় কি প্রকারে, কার মান কে ভঙ্গ করে? ভাঙ্গা মন কি প্রকারে কোন শক্তির বলে কোন্ যন্ত্রের কৌশলে জোড়া লাগে! দেয়ালে ল্যাম্প জ্বলিতেছে। নোলোক নাড়া টাইমপীসের নির্জ্জীব কমলিনী, পলকে পলকে চক্ষু ঠারিতেছে, টক্ টক্ শব্দে নোলোক দুলিতেছে। লাল আলু নির্ব্বাকে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছে। পর্দ্দার অপর পার্শ্বে মনিবিবি। মনিবিবি আজ ক্ষত স্থান সকল.পরিষ্কার সুচিকন খণ্ড খণ্ড বস্ত্রে জড়াইয়া রক্তধার, পচা পুঁজ সার বন্ধ করিয়া পুরু ফেলালেনের কোরতা পরিয়াছেন। কোরতার উপর কাল রঙ্গের সাটীনের জ্যাকেট। চারিধারে মিহিন সুবর্ণ সূত্রের পাতা লতা ফুল কাটা, সুচের কাজ— দেখিতে খুব বাহার। পরিধান বিখ্যাত ভিটীর ধুতি। আতর গোলাবে চর্চ্চিত। মস্তকে ফুলল তেলের অতিরিক্ত ব্যয়। বিছানা বালিস পরিষ্কার।

কি বলিলেন, কাহাকে বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া নিজে নিজেই বলিতেছেন, "ঘরের দোরটা খোলা রইল, কি করি আমিও উঠতে পারি না!"

লাল আলু তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, অপূর্ব্ব দৃশ্য, পর্দ্দা অদৃশ্য পরস্পর দেখা। উভয়েই চক্ষু নিম্নে, মস্তক অবনত। আবার কেন? মধ্যে পর্দ্দা ছিল, তাহা নাই। রাত্র অধিক হইয়া আসিল। মনিবিবি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভিখারিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনিই অনুমতি করুন। এখন কোন্ পথে যাই। বাঁকাপথে ঘুরে যাব, না সোজাসুজি পাড়ি দিব।"

ভিখারিণী লাল আলুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। লাল আলুর চক্ষু যে নীচে নামিয়াছে আর উঠে নাই। ভিখারিণী অঙ্গুলী দ্বারা মনিবিবিকে দেখাইল।

মনিবিবি বলিলেন, "লজ্জা না অভিমান, না অর্থচিন্তা?"

লাল আলু আর মাথা নীচে রাখিতে পারিলেন না। মাথা তুলিয়া চাহিতেই পরিচিত চারি চক্ষু একত্র হইল। উভয়ের মুখে রক্তের আভা খেলিল! উভয়ের মনেই টান পড়িল। হৃদয়ে আঘাত লাগিল। বিদ্যুৎবেগে চালিত হইল।

লাল আলু চির অভ্যাস মতে হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "আমি গরীব, আমার উপর এত অত্যাচার কেন?"

মনিবিবি—"তোমার উপরে অত্যাচার! না আমার উপরে তোমার অত্যাচার!!"

"আমার কি সাধ্য, আমি হুজুরের উপরে অত্যাচার করি!"

"নালিশ করল কে? স্ত্রী-স্বত্ব কে সাব্যস্তের মোকদ্দমায় ফরিয়াদী কে?"

"যেই হউক, হুকুম কল্লেই উঠে যায়।"

"তবে আর এত গোলযোগ কেন? এত কথাই বা কেন? এত কেলেঙ্কারী, মারামারি, লাঠালাঠিই বা কেন?"

লাল আলু ছলছল চক্ষে বলিলেন, "কেন তা হুজুরই জানেন। আমি কি জানি!!"

মনি—"তোমার যে খাঁই। বার হাজার। সময় দেখ্‌তে হয়, অবস্থার প্রতিও নজর কর্ত্তে হয়। তুমি কি টাকা দেখনি, টাকা হাতে করনি, টাকা টোকা দিয়ে বাজাওনি? সে সকল কথা কি ভুলেছ?"

লাল—"হুজুর ভুলি নাই। এখন দেখি যে চায় সেই পায়, যেই ইচ্ছা করে সেই নেয়। তবে আর আমার অপরাধ কি?"

মনি—"তোমার অপরাধ পায় পায়। তুমি চাইলেই পেতে, তোমাকে দিই নাই কি? আছে কি? রেখেছি কি?—জানো—বোঝ, তবে আদালতে গেলে কেন? দেশময় কলঙ্ক রটালে কেন?"

লাল—(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) "মানুষই ভ্রমে পড়ে। মানুষেরই ভুল হয়। এখন হুজুরে হাজির হয়েছি, যা ইচ্ছা সাজা দিন, পিঠ পেতে সইব। ঘাড় নওয়ায়ে হুকুম তামিল করবো। (হাত জোড় করিয়া) এ গোলাম চিরকালের হুকুম বরদার—তাঁবেদার।"

মনি—"আর মানি না। ও কথা আর শুনি না। দেখ ত, ভেবে দেখ ত, যে সোনাবিবি তোমার চক্ষের শূল ছিল, যে সোনাবিবির নামে সাত শত ঝাঁটা মেরেছ, এখন তুমি সেই সোনাবিবির তাঁবেদার, কথার ভিখারী। তোমার ঘৃণা হয় না। আমি দুনিয়া থেকে উঠে গেলে সোনাবিবির পায়ে ধরতে, তার হুকুমে খাট্‌তে সেও এক প্রকার শোভা পেত। আমি এখন বেঁচে আছি, যমদ্বারে পড়ে আছি, এর মধ্যে এই কথা! ছি ছি! তোমার ঘৃণা নাই? লজ্জা নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, বুদ্ধি নাই, মোটা চক্ষু থাক্‌তেও দেখবার শক্তি নাই? যাক্, আমি আর এ সময় কি বলবো? কি দিব? তুমি মনের কথাটা খুলে বল। সত্যই আমার নিকট হতে বার হাজার নেবে? না নিয়ে আমায় ছাড়বে না? তুমি আমায় নিয়ে সুখী হও, আমায় নিয়ে ঘর-কান্না করতে ইচ্ছা কর, চল। ধর্ম্মত বল্‌ছি চলো তোমার বাড়ীতে যাই। আর চাই কি? আমার পেটের সন্তান যারা, তারাই ঘৃণা করে আসে না, তারাই এখন আমাকে চায় না, তুমি যে এ অবস্থায় আমাকে নিয়ে জরু বানাবে, একথা মানুষ ত মানুষ, চার পায়া গরুতেও বিশ্বাস করবে না। এখন তোমার চাই টাকা, টাকা পেলেই তুমি খুসী হও। মনের কথাটা খুলে বলো, আমার কাছে বল্‌তে তোমার লজ্জা কি? তুমি মন খুলে—যা চাও আমি তাই দিব। সে দেওয়া কি নূতন? ভেবে দেখ ত কত টাকা নিয়েছ? বার হাজার অতি তুচ্ছ কথা। তবে আমার সে দিন

নাই। আমার হাতে কিছুই নাই। যেখানে যা ছিল, সকলি তোমার হাতেই ছিল, তুমিই খুলেচ, তুমিই রেখেচ। দেখ এই চাবি নেও, দেখ খালি সিন্দুক। আমার মাথা ঘুরচে, বেশী বক্‌তে পারি না। তুমি কি চাও তাই বলো। আমার কাছে গোপন কর না, আজ এক কথা, কাল এক কথা বলে আমার সর্ব্বনাশ কর না।"

লাল আলু ভিখারিণীর দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনিই কি তিনি, যিনি মনের কথা মুখ দেখে গণে বলেন?"

মনিবিবি কপটভাবে অনিচ্ছার ভাবে বলিলেন, "আমি জানি না। তোমার মনে কোন কথা, তুমি ওঁকে আপন বাড়ী নিয়ে জিজ্ঞাসা করো। এখানে ওঁর সম্বন্ধে কিছু বলো না। আমাকেও জিজ্ঞাসা করো না। ভিখারিণী সংসারের ধার কি ধারে?"

"ওঁর কথা অনেক শুনেছি, জিজ্ঞাসা কল্লেম।"

ভিখারিণী হাসিয়া কুটি কুটি।

মনিবিবি ও প্রকারের হাসি ভিখারিণীর মুখে কখনও দেখেন নাই। হাসিতে হাসিতে যেন গলিয়া পড়িল—হাসির মধ্যে দুই একটি অপ্রাসঙ্গিক কথাও বলিল—মনিবিবি তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

ভিখারিণী হাসিতেছে, বলিতেছে, "লোভী—পেটুক, আহাম্মক। মনের কথা,—অন্ধকার, —বকুলতলা। হো! হো!"

লাল আলুর অন্তরে অন্তঃস্থান নড়িয়া উঠিল, একদৃষ্টে ভিখারিণীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। একটু স্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভিখারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্‌ছিলেন? হাসতে হাসতে কি বল্‌ছিলেন, বুঝতে পাল্লেম না।"

ভিখারিণী তখন হাসির পালা ছাড়িয়া—গানের পালা ধরিয়াছে। তার সেই অব্যক্ত অনর্থযুক্ত গুন্ গুন্ বদনমণ্ডল হইতে বাহির হইতেছে।

মনিবিবি লাল আলুকে বলিলেন, "ভিখারিণীর হাসি, গানে তোমার কি? তুমি তোমার কথা বল। রাত্র অধিক হয়ে এলো।"

লাল আলু ভাবিতেছিলেন যে, ভিখারিণী—বকুলতলা, অন্ধকার, একথা বলিল কেন? কথার মধ্যে ঐ দুট কথা হঠাৎ মুখে বেরোল—কি কি ভাবিয়া বলিল? সন্দেহ ত মিটে না।

মনিবিবির কথায় উত্তরে বলিলেন, "বার হাজার চেয়েছি। আপনার ইচ্ছা না হয় কিছু কম করেন।"

হায় হায়! ভিখারিণী একটু সরিয়া বসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—মাথা নাড়িয়া 'তোমার মনের কথা বুঝেছি' এইভাবে মাথাটা নাড়িয়া, মনিবিবির দিকে চাহিয়া বলিল, "কার জন্য?"

লাল আলু মনে মনে বলিলেন, কথার উত্তর দিয়াই বুঝি না কেন। চালাকি—না বদমাইসী? মুখখানি ভারী করিয়া বলিলেন, "আমার জন্য"।

ভিখারিণী—"মেলে কৈ?"

লাল—"কেন মিল্‌বে না?"

ভিখা—"তুমি চার, তারা চার। বারর মিল কৈ?"

লাল আলু মনে মনে গলিয়া গিয়াছেন। উঠিয়া গিয়া, ভিখারিণীর পা জড়াইয়া ধরিয়া অপরাধ ক্ষমা চান। আবার সাম্‌লে গিয়া বলিলেন, "আপনিই মিল করে দিন।"

ভিখা—"চার বাদ গেলে বাঁচে আট। তুমি আপন নাক কেটে পরের যাত্রা কর কেন? ভালবাসার ঘাড়ে পরের ভার চাপাও কেন?"

লাল আলু আর থাকিতে পারিলেন না। একেবারে ভিখারিণীর দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমি কিছুই চাইনে, যা আপনার ইচ্ছা হয় করুন। আমি কিছু চাইনে, যা আপনি বলবেন আমি তাই করবো।"

ভিখারিণী পা ছাড়াইয়া দূরে সরিয়া বসিলেন।

মনিবিবি নির্ব্বাক। এ সকল কথার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মাত্র এইটুকু তাঁহার বুদ্ধিতে আসিল যে, ভিখারিণীর মন্ত্রের বলে ও যোগের কৌশলে আলু একেবারে গলিয়া গিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! ভক্তির উপরে দ্বিগুণ ভক্তি, আরও ভক্তি। ভিখারিণীর দুখানি পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বলিলেন, "মা! তুমি রক্ষা কর, আমায় বাঁচাও।"

ভিখা—(আবার মাথা উঠাইয়া) "ভয় নাই, হয়েছে। ওর বুদ্ধি নাই, ও পাগল।"

"আমি পাগল। মানুষে আমাকে পাগল করে তুলেছে।"

ভিখা—"মানুষের কথা শুন কেন?"

লাল—"আর শুন্‌বো না। আমি এই প্রতিজ্ঞা কল্লেম, আর কার কথা শুন্‌বো না। কার কাছে যাব না। কোন কথা কানে করবো না। রাত্র প্রভাত হতেই অরাজকপুর গিয়ে যা কর্ত্তে হয় করবো।"

ভিখারিণী—"সত্য কর—তিন সত্য কর। তারপর যেখানের কথা বল্লে যাও। যা কল্লে ভাল হয় তাই করে এসো। তোমার কোন ক্ষতি হবে না। চিরকাল সুখে থাক্‌বে।"

লাল আলু ভিখারিণীর পা ছুঁইয়া তিন সত্য করিলেন; এবং মনিবিবিকে বলিলেন, "আমার বুদ্ধির গোড়ায় জল এসেছে। টাকা কড়ি আমি কিছু চাইনে। আপনার যা ইচ্ছে হয় করবেন। আমি চল্লেম। এই রাত্রেই অরাজকপুর যাব। আমার যা কর্ত্তব্য করে এসে ভিখারিণীর পা দুখানি মাথায় করে পড়ে থাকবো। যা অদৃষ্টে আছে—হবে। আমি চল্লেম।"

মনিবিবি কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার বৃদ্ধ বাপ বাইরে আছে। ঘর-ভাঙ্গা বাবু রয়েছে। তারা কেউ কিছু জানলে না। তুমি না বলে না কয়ে কোথা যাবে?"

লাল আলু বলিলেন, "আপনার দুখানি পায়ে ধরি। আমাকে আর তাঁদের কথা বলবেন না। আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করবো না। কোন কথাও বল্‌বো না। আমার কৃতকার্য্যের ফল আমিই ভোগ করবো। আপনি মন থেকে এ গোলামকে দূর করবেন না, আমি চল্লেম।"

এই কথা বলিয়া লাল আলু ত্রস্তপদে মনিবিবির ঘর হইতে বাহির হইলেন। পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সংবাদ আসিল যে, লাল আলু মকদ্দমা তুলিয়া লইয়াছেন। বৃদ্ধ মাথায়

হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী মুখে রওয়ানা হইলেন। ঘর-ভাঙ্গা বাবুর মনের আশা মনেই রহিয়া গেল। কন্যার বিবাহের জন্যে মহাজনের নিকট দলিল লিখিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন কিনা, সে কথা নথিতে নাই।

চতুর্দশ নথি

ইহারা কে? প্রকাশ্য রাজপথে বাঁধা কমরে, গাল পাট্টা বাঁধা, লাঠি সুড়কি হস্তে ইহারা কে? কাহার হস্তে তরবারি, পৃষ্ঠে গণ্ডার চর্ম্ম নির্ম্মিত, কাহার পিত্তলে গঠিত চন্দ্র তারা শোভিত ঢাল—ইহারা কে? কোঁচ জুতি স্কন্ধে স্থাপিত, কাহার স্কন্ধে লম্বিত থলিয়া পূর্ণ মৃত্তিকা নির্ম্মিত গুলি, দক্ষিণ হস্তে গুলি চালক গুলল বাঁশ। ইহারা কে? সারি বান্ধিয়া নির্ভয়ে বীরদর্পে "মার মার" শব্দে প্রকাশ্য পথে চলিয়া যাইতেছে, ইহারা কে? কোথাকার কে? কোথায় যায়? কি করিতে এই ভয়ঙ্কর বেশে দিনে দুপুরে কোথায় যায়? ইহারা কারা? ডাকাত? না, তাই-বা কি করে? দিনে দুপুরে ডাকাতি! ব্রিটিশ রাজ্যে ডাকাতি! অসম্ভব! অসম্ভব! তবে কি রাজকীয় পদাতিক সৈন্য? না তাতেও সন্দেহ? রাজ-সৈন্যের এ বেশ নহে। রাজঅস্ত্র-সুড়কি লাঠি নহে। গুলি গুলল বাঁশ তীব ধনুও নহে। তবে এরা কারা? পাড়াগাঁয়ের জমিদারের সৈন্য দল, নাম লাঠিয়াল, সর্দ্দার।

জমিদারের জেদ বজায় রাখিতে, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে, সহযোগী সহিত প্রতিযোগিতা দেখাইতে, সমকক্ষ সহিত বাহুবল যুঝিতে, অন্যায়কে ন্যায়ে পরিণত করিতে, নিরীহ প্রজার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে, জমিদার স্বীয় মন আশা স্বচ্ছন্দে সম্পূর্ণ সাধিতে, এই দুরন্ত দস্যু গুপ্ত ডাকাত দল ছদ্মবেশে বঙ্গের প্রায় জমিদার সরকারেই দুই চারিজন বৃত্তিভোগী, বেতনভোগী হইয়া পুরুষ পুরুষানুক্রমে তাঁবেদারী স্বীকার করিয়া রহিয়াছে।

দুই-চারিজন নহে। গণনায় প্রায় পঞ্চাশ। ইহারা যায় কোথা? কাহার সর্ব্বনাশ করিতে কে পাঠাইয়াছে? ভাল ভাল!! পিছনে দেখি আর এক দল। ইহারাও সংখ্যায় ঐ পরিমাণ। ইহাদের বেশ অন্য প্রকার। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, স্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বিত। বক্ষ হইতে উরু পর্য্যন্ত বস্ত্রে আচ্ছাদিত, বেত্র নির্ম্মিত ঢাল পৃষ্ঠে দোলিত। মুখে গাল পাট্টা বাঁধা নাই। হস্তে অতি দীর্ঘ রায় বাঁশ এবং কাহার কাহার হস্তে দুই চারি গাছা বর্যা ও সুড়কি। ইহাদের পরিচালকদ্বয় অশ্বারোহী। পরিচালকদ্বয়ের গড়ন গঠন পরিধান গ্রাম্য ভদ্রলোকের ন্যায়, কিন্তু যে কার্য্যে নিযুক্ত তাহাতে ডাকাতের সর্দ্দার না বলিয়া আর কি বলিব? ইহারাও যথাসাধ্য দ্রুত পদ-বিক্ষেপে আসিতেছে। মাঝে মাঝে সমস্বরে হো হো শব্দ করিয়া, দর্শক ও ত্রিপক্ষদিগকে ভয় দেখাইতেছে।

মুখে বলিতেছে, "ঐ যায়। ঐ দেখা যায়। শীঘ্র শীঘ্র চলো।"

অশ্বারোহীদ্বয় অগ্রে অগ্রে ঘোড়া ছুটাইয়া দ্রুতপদে আসিতেছে। রাজপথের অন্য অন্য পথিক পথ ছাড়িয়া দক্ষিণে বামে সরিতেছে।

রাজপথ—গ্রাম্য রাজপথ, অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের গতিবিধির জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অথবা লোকাল বোর্ড অথবা মিউনিসিপ্যালিটি হইতে যে কাঁচা রাস্তা সকল প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকেই সাধারণের সরকারী রাস্তা বলে। সুতরাং গাজী মিয়াঁ রাজপথ বলিয়াছেন। রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ অধিবাসীরা ভীতচিত্তে গাছের আড়ালে, গোশালার কোণে, গোপনভাবে থাকিয়া লাঠিয়াল দলকে দেখিতেছে। স্ত্রীলোকেরা লাঠিয়াল সর্দ্দারের নাম শুনিয়া, কেহ ঘরে কপাট দিয়াছে, যাহার ঘরে কপাট নাই, সে জঙ্গলে মাথা দিয়াছে। গ্রামের মধ্যে মণ্ডল, সরকার, প্রধান প্রধান লোকেরা যাহারা আইন-আদালত বোঝে, সর্ব্বদা জেলা-মহকুমায় যাওয়া-আসা করে, তাহারা আপন ভাই ব্রাদার সহ একত্র এক জোটে, বাড়ীর প্রকাশ্য আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া লাঠিয়ালদিগের হাবভাব, গতিবিধি একদৃষ্টে দেখিতেছে এবং বলিতেছে ঃ

"জমিদারে জমিদারে লড়াই, খুন-জখম না হইয়া যায় না। উচ্ছন্ন যাইবার লক্ষণই এই। মনিবিবিরও দুর্গতি, সোনাবিবিরও বুঝিবার ভ্রম। ঘরের পয়সা পরকে দিয়া যথেচ্ছভাবে লুটাইতেছেন। লাঠিয়াল সর্দ্দার আমলাগণের পেট ভরিতেছে। মরণ প্রজার। ডাঙ্গায় থাকিলেও বাঘে খায়, জলে গেলেও কুমীরে নেয়। এই টানাটানি জোর জবরানের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য, পুলিসের আশ্রয় লইবে, তাহাতেও শত বিঘ্ন। পুলিসের জলপানি সেলামীর বন্দবস্ত হইলেই একপক্ষে গড়াইলেন। কাজেই অন্যায় অত্যাচার বৃদ্ধি। প্রজা অবাধ্য হইলে আর পক্ষ-বিপক্ষ নাই। যে পক্ষের অবাধ্য হইবে, সেই পক্ষই প্রজার ভিটায় ঘুঘু চরাইবে। বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গারদে পুরিবে। যাতে সোজা হয়, যাতে আপন বাধ্য বশে থাকে, তাহার উপায় অতি উত্তমরূপে করিবে, বেশী রাগের কারণ হইলে পরিবার পরিজনের জাতি-ধর্ম্ম, ধন ধান্য এক মুহূর্ত্তে লাঠির চোটে, সুড়কির খোঁচায় দেখিতে দেখিতে কোথায় উড়িয়া যাইবে। তাহার কুল-কিনারা থাকিবে না।"

কেহ বলিতেছে, "এখনি দেখা যাইবে। দারগা বাবু সম্মুখের গ্রামেই আছেন। রাস্তার ধারেই আড্ডা করিয়া চুরি মকদ্দমার তদন্ত করিতেছেন। চার জনার অতিরিক্ত হইলেই যখন বে-আইন জনতা হয়, তখন প্রাণ-নাশক অস্ত্র লইয়া ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে "পায়তারা" খেলিতে খেলিতে ঝাঁক্ড়া চুল নাচাইতে নাচাইতে দুই দলে—অতি কম হইলেও একশত লোক প্রকাশ্য পথে যাইতেছে, উদ্দেশ্য কি, অবশ্যই কোন মন্দ অভিপ্রায়ে যাইতেছে—স্বচক্ষে দেখিয়াও কি কিছুই বলিবেন না, ডাকিয়া একটি কথাও কি জিজ্ঞাসা করিবেন না? তোমরা কার লোক? কোথায় কি কাজে যাও? এ কথাটাও কি একবার মুখে আনিবেন না?"

দর্শকমণ্ডলী মধ্য হইতেই উত্তর হইল। জিজ্ঞাসাও করিলেন, আসর জমকাইতে, জলপানি আদায় করিতে, "ইয়া করেঙ্গা", "উয়া করেঙ্গা" "চালান দেঙ্গা' বলিয়া লম্প, ঝম্প, কম্প সকলি করিবেন। যেই হুঁ আর কথাটি নাই। মিহি সুরে বলিলেন, যাও দাদা

হাঙ্গামা কর না, মারা যাইবে। জমিদারের কি? তোরাই মারা যাইবি! বেটারা। তোরাই জেলে পচবি। আমার কর্ত্তব্য কাজ আমি কল্লেম, শুনা না শুনা, তোমাদের এক্তেয়ার, তোমাদের মনিবের খুশি।

এদিকে শেষের দল প্রথম দলকে ডাকিয়া বলিল—

"ওরে! আর যেতে হবে না। ফিরে যা। সেদিন চালাকি করে, "গোবরডাঙ্গা" "নিমতলার" খাজনা আদায় করেছিস্। আজ আর যেতে হয় না। খাজনা আদায়ের নামও কর্ত্তে হয় না?"

অগ্রগামী দল হইতে উত্তর হইল। "হলধর মামাকে নিয়ে যমদ্বারে ফিরে যা। গাঁয়ের সীমানায় যদি যাবি, নেঙ্গটিচোরা গায়ের সীমানায় যদি পাড়া দিবি ত মাথা নিয়ে বাড়ী যেতে হবে না।"

হলধর জলধর, ইহারা মনিবিবির পক্ষের লোক। ইহাদের কার্য্যই লাঠিয়ালের "বকসী" গিরি করা, লাঠিয়ালের সর্দ্দার। ইহাদিগকে হুকুম দেহেন্দা বক্সী বলে।

আগে আগে গমনকারী গাল পাট্টা বাঁধা দল, সোনাবিবির পক্ষের সর্দ্দার। নেঙ্গটিচোরা গ্রামে খাজনা আদায় করিতে যাইতেছে। সোনাবিবি তাঁহার নিজ জমিদারী ও জয়ঢাকের জমিদারী, যে জমিদারীতেই খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন, সেই গ্রামেই মনিবিবির সর্দ্দার লাঠিয়াল যাইয়া খাজনা আদায়কারীকে উত্তম মধ্যম দিয়া তাড়াইয়া দিতেছে। তাই সোনাবিবির লাঠিয়াল সর্দ্দার সংগ্রহ করিয়া আপন স্বত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সোনাবিবির পক্ষেও বকসী চাকর আছে। কিন্তু সে বকসী পদব্রজে লাঠিয়াল সর্দ্দার সহিত একত্রে যাইতেছে। নাম রোশুম। রোশুম বকসীগিরিও করে, লাঠিবাজীও করে। দুই দিক হইতেই তাহার বেতন নির্দ্ধারিত আছে।

জলধর হলধরের ইচ্ছা যে সোনাবিবির পক্ষের লাঠিয়ালদিগকে পরাস্ত করিয়া, ইহারাই অগ্রে নেঙ্গটিচোরা গ্রামে গিয়া আড্ডা করে। এই বিবেচনা করিয়া অধীনস্থ লাঠিয়ালদিগকে বলিল, "শীঘ্র শীঘ্র চল, উহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া যাইতে হবে।"

লাঠিয়ালেরা "হো হো" শব্দ করিয়া যথাসাধ্য ত্রস্তপদে যাইতে লাগিল।

রোশুম দেখিল যে, উহারা এমন জোরে আসিতেছে যে, দলবল সহ ফিরিয়া লাঠি বাগাইয়া আনি বাঁধিয়া দাঁড়াইতে হয়। অথবা পথ ছাড়িয়া পথের দক্ষিণ-বামে হটিতে হয়। কি করিবেন? ফিরিয়া দাঁড়াইলে দুই দলে খুব মারামারি হওয়াই সম্ভব। কারণ এক পক্ষ গমনে বাধা দিবে, অন্য পক্ষ পথ পরিষ্কার করিয়া নেঙ্গটিচোরার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

যে গ্রামের খাজনা আদায় করিতে এই অভিযান, সে গ্রাম এখনও বহুদূর। যে স্থানে উভয় দলের সম্মিলনে সংঘর্ষণ হওয়ার উপক্রম, সে এলাকা যমদ্বারের কোন জমিদারের নহে। লালা বাবুর জমিদারী, ও মহারাজা প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের এলাকা, আর নবাব নাজিম বাহাদুরের জায়গীর। কোন পক্ষে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা নাই। বিশেষ রাজা বাহাদুর ও লালা

বাবুর এলাকার প্রজারা নিতান্তই ভদ্র। কোন প্রকারে মারামারি কাটাকাটি করার অভ্যাস তাহাদের নাই। কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামাতেই নাই। মামলা মকদ্দমাতেও নাই। সকলেই নিরীহ, সকলেই সত্যপ্রিয়। নবাব বাহাদুরের প্রজারা ভারি দেমাগি, তাহারা কাহারও নহে। এখানে লাঠালাঠি করিয়া কোন ফল নাই। কোন পক্ষেরই সামান্য সাহায্য পাইবার আশা নাই। রোশুম সর্দ্দার ভাবিতেছে, রাস্তা হইতে সরিয়া দক্ষিণ বামে হটিয়া যাওয়াও নিতান্ত লজ্জার কথা, যে কার্য্য জন্য এই যাত্রা, তাহার কিছুই হইল না। সে গ্রামে যাওয়া গেল না, খাজনার কথা প্রজাদিগকে বলা হইল না। খাজনা আদায়ের কোন চেষ্টা করা হইল না। পথের মধ্যে হঠাৎ মারামারি। আসল কার্য্যে ক্ষতি। ভাল দেখায় না। রোশুম মনে মনে এই তর্ক উপস্থিত করিয়া এ পর্য্যন্ত মীমাংসা করিতে পারে নাই। এদিকে মনিবিবির লাঠিয়ালগণ একেবারে তাহাদের পিঠের উপর আসিয়া পড়িল। এখনও সময় আছে, এ সময় ফিরিয়া দাঁড়াইলে, রোশুম দলবল সহ পরাস্ত হয় না। পৃষ্ঠ দেখাইয়া পথের দক্ষিণ বামে সরিয়া হটিতে হয় না।

মনিবিবির পক্ষের হলধর কর্কশ স্বরে বলিল, "এ গিধাড় কি বাচ্চা, হট যা। রাস্তা ছোড়্।"

রোশুমের কিছুতেই সহ্য হইল না। উহাদের সাঙ্কেতিক "আলী আলী" শব্দ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গের পঞ্চাশ জনও চক্ষের পলকে ফিরিয়া লাঠিবাজী আরম্ভ করিল। জলধর দূরে থাকিয়া হুকুম দিতেছে, "কাট্ রোশুমের মাথা। ভাঙ্গ ওর প্রধান সর্দ্দার গোরাচাঁদের মাথার খুলী। মার লাঠি। ঝাড় লাঠি। দে খোঁচা।"

দুই দলে খুব লাগিয়া গেল। দারগা বাবু নিকটেই চুরি তদন্তে ছিলেন। ভয়ানক চীৎকার, আর মার মার শব্দের হট্টগোল, হো হো শব্দের বায়ুভেদী প্রতিধ্বনি সহ ভীষণ রোলে, "আলী আলী" "কালী কালী" রবের তুমুল কোলাহল গোপনে সন্ধানে লইয়া, বারজন চৌকীদার, দুইজন কনষ্টেবলসহ দারগা বাবু যাইয়া বলিলেন, "দোহাই মহারানীর, দোহাই ভারতেশ্বরীর, তোমরা মারামারি লাঠালাঠি করিও না।"

দারগা বাবু ও কনষ্টেবলদ্বয়, তাড়াতাড়ি হাতের কার্য্য ফেলিয়া যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই আসিয়াছেন। পুলিসের পোষাক লইয়া আসিতে সময় পান নাই। চুরি তদন্ত স্থানের অতি নিকটেই, উপস্থিত সোরগোল নূতন হাঙ্গামা পোষাকের তত প্রয়োজনও মনে করেন নাই। যেভাবে ছিলেন সেইভাবেই আসিয়াছেন।

রোশুম দারগাকে পূর্ব্ব হইতেই চিনিত। হলধরও বিশেষরূপে জানিত। বিশেষ আলাপ পরিচয়ও আছে। দারগা বাবুর কথায় সকলেই নিরস্ত হইল। আর কেহই কোনরূপ গোলযোগ করিল না। লাঠি সুড়কি সকল শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল।

দারগা বাবু উভয় দলকে অনেক বুঝাইয়া অনেক বলিয়া চুরি তদন্ত মাজেরার স্থানে আনিলেন। সকলকেই আদর অভ্যর্থনা করিয়া চৌকীদারদিকের দ্বারা বসিবার আসন মাদুর চট যোগাড় করিয়া দিলেন। উভয় দলই দারগা বাবুর ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বসিল।

বিশ্রামদায়িনী তামাক নারিকেল ডাবায় দশ বার কলকিতে চলিতে লাগিল।

দারগা বাবু বলিলেন, "তোমরা দুই দলে এ বেশে কোথা যাচ্ছ?"

রোশুম—"হুজুর আমরা নেঙ্গটিচোরা গ্রামে খাজনার জন্য যাচ্ছি?"

দারগা—"বাঁধা কোমরে, ঢাল সুড়কি লাঠি ঠেঙ্গা নিয়ে, পঞ্চাশ জনে একত্রে খাজনা আদায় করিতে যাওয়া কেন?"

রোশুম—"হুজুর হাকিম! মিছে কথা বলিব না। সোনাবিবির বিষয় এলাকার কথা হুজুরের জানা আছে কিনা তাই আগে বলুন। সোনাবিবির নিজের জমিদারী ও ছেলের জমিদারী দুই জমিদারী তাহার হাতে আছে কিনা তাই বলুন। আপনি বলুন। সোনাবিবির সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে গিয়াছেন, কত সিদে ঘৃত খাসী মেঠাই পেয়েছেন। তাঁর কাজ কর্ম্মের কত প্রশংসা করেছেন। আপনি ত নূতন নহেন, যে খবর রাখেন না? আপনার অজানা কিছু নাই।"

দারগা—"হঁ। জানি, সোনাবিবির নিজের জমিদারীও আছে, ছেলের জমিদারীও এইক্ষণে তার হাতে। ছেলে যতদিন সাবালক না হবে, ততদিন সোনাবিবির হাতেই থাকবে। তাঁরই দখলে থাকবে।"

রোশুম—"এই ত হুজুর। ঘরের খবর জানেন। কোন কথা হুজুরের নিকট ছাপা নাই। সেই জমিদারীর খাজনা সোনাবিবি প্রজার নিকট চান। মনিবিবির পক্ষের লোকেরা তাতে সম্পূর্ণ বাধা দেয়। মনিবিবি বল করে সোনাবিবিকে বেদখল কর্ত্তে চান। আমরা নেঙ্গটিচোরা গ্রামে খাজনার জন্য যাচ্ছি। এই দেখুন! হঠাৎ আমাদিগকে ফাঁদে ফেলে আটকাতে চায়। গ্রামে যেতে দেবে না। আমাদিগকে মেরে ধরে পঞ্চায়েত চৌকীদারের হাওলা করে চালান দেবে। এই হচ্ছে আসল মতলব। আমরা আটকা পেলেম, ওদিকে ওরা গিয়ে খাজনা আদায় কর্ত্তে বসে গেলেন। যে না দেবে কি কোনরূপ আপত্তি জানাবে, তার ভিটেয় আর চাল থাকবে না।"

মনিবিবির পক্ষের হলধর জলধর বলিল, "ধর্ম্মাবতার! কথা ঠিক। রোশুম দাদা যা বল্লে, সে কথা মিছে নয়। তবে একটি কথা চাপা রয়ে গেল।"

দারগা—"বল কি কথা। দুই পক্ষের কথা না শুনলে আমি রিপোর্ট করবো কি প্রকারে? বল তোমাদের কথা কি?"

হলধর—"রোশুম দাদার কথা সকলি ঠিক। একটি কথা এই যে, নাবালকের জমিদারীর মালিক সোনাবিবি নন। তিনি নাবালক পুত্রের পক্ষে ম্যানেজার। তাঁর প্রতি অবিশ্বাস জন্মেছে। তিনি অনেক সম্পত্তি নষ্ট করেছেন। ঋণ করে সম্পত্তি রসাতলে দিবার যোগাড় করেছেন। নাবালক আইনমতে নাবালক, কিন্তু শাস্ত্রমতে সাবালক। সে আপন লাভ লোকসান বেশ বুঝতে পারে। যে চাকর এতদূর পর্য্যন্ত লোকসান করল, তার হাতে কি বলে সম্পত্তি রাক্‌বেন? যা আছে, তাও নষ্ট করবার জন্যে তার হাতে রাখবেন? আরও দেনা হবার জন্যেই কি তার হাতে রাখবেন? কেহ এ কথায় সায় দেবে না। তাইতে চাকরের

হাত থেকে সম্পত্তি কেড়ে নেওয়াই আমাদের ইচ্ছা। আর তাঁকে জমিদারী মধ্যে হাত না দিতে দেওয়াই আমাদের সকলের ইচ্ছা। আমি মালিক, প্রজা আমার। তুমি চাকর, তুমি বিশ্বাসঘাতক। তুমি আমার ক্ষতিকারক, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করে সর্ব্বস্বান্ত করার যোগাড় করেছ, তবু তোমাকে আমার সম্পত্তিতে ম্যানেজারী কর্ত্তে দিব? কখনই দিব না। হাঁ, তাঁর নিজের যা আছে—সোনাবিবির নিজের যা আছে, তাতে কোন কথা নাই। আমাদের কোন আপত্তি নাই। তোমার প্রজা, তুমি মার কাট সকলি এক্তেয়ার তোমার। তাতে আমরা একটি কথাও বলব না। তোমার নিজের পাঁঠা, হয় তুমি লেজে কাট, না হয় ঘাড়ে কোপ দেও। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। আজ ওরা নেঙ্গটিচোরা গ্রামে যাচ্ছেন, হুজুর জিজ্ঞাসা করুন, সে গ্রামখানা কার? সোনাবিবির নিজের না নাবালকের?"

দারগা—"দেখ, আমি তোমাদের ও সকল কথা শুন্‌তে চাই না। কার জমিদারী কে দখল করে, কার ম্যানেজারী কে খসায়, ও সকল কথার মধ্যে আমি নাই। আমি তোমাদিগকে এই প্রাণনাশক অস্ত্র নিয়ে, কোথাও যেতে দিব না। জেলায় চালান দিব। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ছেড়ে দেন দেবেন। আমি কখনই ছেড়ে দিতে পারি না। দুই শতাধিক লোক শতাধিক অস্ত্র, বাঁশের লাঠি এ কি কথা? এ কি কুকীর মুলুক, পাহাড়ী দেশ, না জুলু রাজ্য, যে নিজ ক্ষমতাতেই অস্ত্রচালনা করে—নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে পারে! এ ব্রিটিশ অধিকার! চুল চেরা বিচার। তোমার উপর কেউ অত্যাচার করে থাকে, আদালতের দ্বার খোলা আছে। কোন প্রজা খাজনা দিতে নারাজ হয়, মুন্‌সেফী আছে, নালিশ কর। কোন ম্যানেজার চাকর নালিশ করে থাকে, তার বিচার যে আদালতে বিধিমত হতে পারে, সে আদালতে যাও। রাজা বর্ত্তমান থাকতে নিজের হাতে বিচার লওয়ার কোন এক্তেয়ার কারও নাই। আমি দুই দলকে চালান দিব। এই অস্ত্রসমেত চালান দিব। তোমরা আমার কথা শুন। আমি পুলিস, আমার হুকুম, হুকুম কি, আইন আদেশ অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে। আমার হুকুম, দুই দলের অস্ত্র আমার সম্মুখে রেখে দেও।"

দারগার এই হুকুমে দুই দলেই কানাকানি, ফাসফুস, চুপি চুপি কথা চলিতে লাগিল। অস্ত্র সকল ছাড়িবে কিনা? হাতের অস্ত্র হাতছাড়া করিতে সকলেই নারাজ হইল।

রোশুম বলিল, "হুজুর! এইভাবেই জিলায় চালান দেন, অস্ত্র ছাড়িব না। কারণ আমরা আপনার কথায় অস্ত্র ছেড়ে খাড়ালেম, মনিবিবির লোকের হাতের অস্ত্র রয়ে গেল, তবে ত আমরা মারা গেলেম। যদি ছাড়তে হয় তবে দুই দল এক সঙ্গে একযোগে অস্ত্র আপনার সম্মুখে রাখুক।"

দারগা—"এ অতি উত্তম কথা। ভাল কথা বলেছে। তোমরা প্রধান প্রধান যারা আছ, দুই দলের প্রধান পক্ষ যে যে আছ, তারাই অগ্রে অস্ত্র রাখুক, এক সঙ্গে দুই দলের প্রধান পক্ষ অস্ত্র রাখুক। তারপর ক্রমে ক্রমে আর আর সকলে রাখুক।"

রোশুম—"হুজুর! এতে আমার দলের কোন আপত্তি নাই। আমি এই খাড়া হলেম,

আমরা দশজনে আপনার সম্মুখে রাখছি। ও দলেরও প্রধান দশজন খাড়া হক, তারাও রাখুক।"

হলধর পক্ষের কোন লোক খাড়া হইল না, অস্ত্র রাখিতেও সম্মত হইল না। কোন কথারও উত্তর দিল না। হলধর একজন কনষ্টেবল সঙ্গে বলিতে বলিতে একটু দূরে গিয়া খাড়া হইল। হলধর হাত নাড়িতেছে, মাথা নাড়িতেছে, মুচকি মুচকি হাসিতেও ত্রুটি করিতেছে না। কনষ্টেবল বাবুও হলধরের হাত ধরিতেছে, বুকে মিষ্টি মিষ্টি ও ক্ষুদ্রভাবে চাপড়াইয়া যেন সাহস বেশী করিতেছে, কখনও পূর্ব্ব, কখনও পশ্চিমে, ফিরিয়া ঘুরিয়া কত কি কহিতেছে।

রোশুম বুঝিল যে এর মধ্যে অন্যরূপ যোগাড় চলিল। হলধর গুপ্তমন্ত্র ঝাড়িয়া পুলিসের চক্ষে ধাঁদা দিতে হাত পা মুখ নাড়িয়া মন্ত্র ঝাড়িতেছে। বোধ হয় শীঘ্রই কাজ উদ্ধার হইবে। সেও অন্য আর একজন কনষ্টেবলকে ইসারায় ডাকিয়া একটু দূরে গিয়া উভয়ে খাড়া হইল।

কনষ্টেবল—"অহে! তুমি আসলেই বোকা। বুঝতে পাচ্ছ না। দারোগা কি কম চালাক।"

রোশুম—"ভেঙ্গে বল্লে ত বুঝতে পারি।"

কনষ্টেবল—"আর কি শুনতে চাও। ওরা বলছে যে"—

রোশুমের হাত টানিয়া লইয়া হাতের তালুতে কোন অঙ্কপাত করিয়া "এই হচ্ছে কথা, এই হলে ওর এখনি যে যেমন যেভাবে এসেছে, সে সেইভাবে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাবে।"

রোশুম—"আমরা?"

কনষ্টেবল—"তোমরা চালান হবে।"

রোশুম—"কেন আমরা চালান হব?"

কনষ্টেবল—"আর ভাই! ঐ তো পুলিসের মার-পেঁচের কথা। মাদ্দা মতলব দুই হলো। তারপর খোসনাম নেওয়ার জন্যে তোমরা থাকলে।"

রোশুম—"আমরা ত বলবো যে মনিবিবির পক্ষের লাঠিয়াল সর্দ্দারকে ছেড়ে দিয়ে আমাদিগকে চালান দিয়াছে।"

কন—"আর পাগল! তোদের কথা শুনবে কে? আমরা রিপোর্টে সে কাজ সেরে দেব। জান, এ সকল পুলিসের ভোজের খেলা। তাদের নাম গন্ধ কিছু করবো না। তোমরাই প্রাণনাশক অস্ত্র নিয়ে প্রজার প্রতি অত্যাচার, নেঙ্গটিচোরা গ্রাম লুট-পাট কর্ত্তে যাচ্ছিলে, আমরা জমাইত বস্তু ধরে চালান দিচ্ছি। কেমন খোসনাম পায় দেখ দেখি।"

রোশুম—"আচ্ছা, এই যদি তোমাদের বিচার হয়, তবে আমরাই তাই করছি, ওরা যা কর্ত্তে চাচ্ছে। ওরাই চালান হক। আমরা সরে পড়ি, যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাই।"

কন—"বেশ, এ কথা যে না হতে পারে তা নয়। তবে কি জান ভাই। ওদের সঙ্গে একটা কথা চলেছে, তোমরা বেশী না হাঁকলে উলটান যায় না।"

রোশুম—"আচ্ছা তাই হলো ওদের উপরে আমাদের এই বেশী রৈল।"

রোশুম কনষ্টেবলের দক্ষিণ হস্ত টানিয়া লইয়া, হস্ততালুতে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখাইলে, কনষ্টেবল বলিল, "ছি ছি! সে কি কথা? এই কাজ কি ঐ আঁকে হয়? শুন আমার কথা।"

কনষ্টেবল রোশুমের হাত টানিয়া লইয়া পূর্ব্ব প্রকার মনের কথা প্রকাশ করিলে রোশুমের মুখখানি ভারী হইয়া সেই এক প্রকার ভাবনার ভাব ধারণ করিল। পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি একথার উত্তর আধ ঘণ্টার মধ্যে দিচ্ছি। কিন্তু ভাই! আমার কথার শেষ না করে কিছু করো না। যখন আমি পাছে হট্‌বো, তখন তোমরা আমাদের হাতে দড়ি লাগাবে। শেষ না দেখে কিছু কর না।"

কন—"না না, তা কি হয়? সে কথা তুমি মনেই কর না। তোমার কথার শেষ না জেনে শেষ খবর না নিয়ে কিছু করা যাবে না।"

হলধর জলধরের কানে একথা তখনি গেল যে উহারা এই পথে চলিতে চায়, এই পথে গিয়া তাহাদিগকেই জেলায় চালান দেওয়ার যোগাড়ে আছে। হলধর জলধর তখনি তিন গুণ স্বীকার হইয়া, দারোগা বাবুর বিশ্বাস জন্মাইল। ঐ স্থলের মানিক মহাজন জামিন হইল, আর অবিশ্বাসের কথা নাই। সোনাবিবির পক্ষের সেপাইদিগের নাম-ধাম লেখা আরম্ভ হইল। মানিক মহাজন দারোগা বাবুর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করা মাত্র মনিবিবির বক্সীদ্বয় মাথায় চাদর জড়াইয়া অশ্বে আরোহণ করিল। এক দুই করিয়া সর্দ্দারগণ বক্সী মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নেঙ্গটিচোরা গ্রামের দিকে চলিল। দারোগা কনষ্টেবল চৌকীদার কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। তাহারও কাহাকে কিছু বলিল না। আপন আপন মতলবে চক্ষের ইসারায় হলধরের সঙ্গী হইল। রোশুম দলবলসহ নজরবন্দী কয়েদ রহিল, বাধ্য হইয়া হাতের অস্ত্র-শস্ত্র দারোগার সম্মুখে রাখিতে হইল। দারোগা এক-একজনকে ডাকিতেছেন, আর নাম-ধাম পিতার নাম জিলা মহকুমার লিখিয়া লইতেছেন।

রোশুমের দলে বিদেশী লোকই অধিক। মানভূম, কাটীয়ার, গোরক্ষপুর, সাঁওতালী। দারোগা নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহারাও বাপ-দাদার নাম সহ নিজ নাম লিখাইতেছে, গ্রাম থানা জিলা পর্য্যন্ত ছাড়া হইতেছে না। মানভূমের লোক বলিতেছে, আমার নিবাস মুরশিদাবাদ; গোরক্ষপুরের লোক বলিতেছে, আমার বাড়ী নেপাল। ইহার উপর, নিজ নাম পিতার নামও ঐরূপ লিখাইতেছে। গোবিন্দ বলিতেছে, আমার নাম শুকিয়া; লছমন বলিতেছে, আমার নাম নেকমর্দ্দন। এই প্রকার সত্য সত্য পরিচয় অকাতরে দিতেছে, দারোগা বাবুও খুব চোট-পাটে লিখিতেছেন। ভাবে বোধ হইতেছে যে রোশুমের দল তাহার প্রাণের শত্রু, পারেন ত ফাঁসি দেন।

নাম লেখা হইল। প্রত্যেকের নাম-ধাম পিতা প্রপিতার নাম পর্য্যন্ত দারোগা বাবু লিখিয়া একখানি রিপোর্ট খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিলেন। তাহার পর কনষ্টেবলদ্বয়কে বলিলেন, "তোমায় প্রত্যুষে ও এখনই এই সকল আসামী লয়ে জেলায় যেতে হবে। আমার পাল্কীতে

বিছানা পত্র করতে বল। এত আসামী—হাতকড়া সঙ্গে আছে মাত্র দুই গাছ, তাতে কি হবে। খুব মজবুত করে দড়ি পাকাও; দুইজন আসামীর দুই হাতে একের বাম হাতে আপনার ডান হাতে একত্রে খুব কসে বাঁধ। আর লাঠি, সড়কি, অস্ত্রাদিও দুই বোঝা কর। আসামীদের মধ্যে যে খুব মোটা গায়ে বেশী শক্তি, তাহাদের মাথায় চাপাও। চৌকীদার যে কয়েকজন আছে, তারাও সঙ্গে চলুক।"

দারোগা বাবু আসামী চালানের এইরূপ এই সুব্যবস্থা করিয়া ঘোড়ার উপর বসিলেন। পাল্‌কিতে বিছানা হইতেছে। কনষ্টেবলদ্বয় চৌকীদার দিয়া দড়ি পাকাইতেছে।

রোশুম বলিল, "হুজুর! আমাদের হাতে হাতকড়া দিবেন না, দড়ি দিয়াও বাঁধবেন না। আমরা আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি। যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাব। কখনই আপনার হুকুম লংঘন করব না।"

রোশুমের উপরেই দারোগা বাবুর বেশী রাগ, রাগের কারণ যাহা তাহা আর কি বলিব। অতিরিক্ত হস্তগত হওয়াতেই রাগের কারণ অতিরিক্ত মাত্রায় জন্মিয়াছে। রোশুমের মুখের কথা মুখেই আছে, সকার বকার গালাগালি পুলিসের সোনামুখে লাগাই আছে, তার কোন গালাগালিই বাকী রাখিলেন না। রোশুমের দলে পল্টন আর মেঘাই নামে দুইজন গড় গোয়ালা ছিল, তারা রোশুমকে সম্বোধন করিয়া বলিল ঃ

"ওস্তাদজি! এত বয়স হয়েছে, কেউ কখন এ প্রকার মা বুন তুলে গালাগালি দেয় নাই। আর এবার তোমার সঙ্গে এসে, মা বুনের আর জাত থাক্‌লো না। এই প্রকার কাপুরুষের মত গাল খাব? আর হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে গরুর মত টেনে নিয়ে যাবে? ছি! ছি! বড় ঘৃণার কথা!"

দারোগাবাবু শুনিয়া বলিলেন, "নবাব পুত্রদের জন্য পাল্কী বেহারা এনে খাতির তোয়াজ করে নিয়ে যাই আর কি?"

কনষ্টেবলদ্বয়কে বলিলেন, "তোমরা কচ্ছো কি? সব বেটাদের হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধো। আর ঐ দুই শালার হাতে হাতকড়া লাগাও।"

এদিকে রোশুমের চক্ষুর সহিত পল্টন মেঘাইয়ের চক্ষু মিশিয়াছে। অবশিষ্ট লাঠিয়ালদের চক্ষুও রোশুমের চক্ষুর দিক সম্মতির অপেক্ষায় ঘুরিতেছে, যেই চক্ষে চক্ষে মিল ঘটিয়াছে, পরস্পর মনের ভাব মনে মনেই জানাজানি হইয়াছে, "আলী আলী" শব্দ করিয়া পলক্ মধ্যে যাহার যাহার অস্ত্র লাঠি সড়কী ইত্যাদি হাতে করিয়া আপন আপন সাব্যস্ত মত খাড়া হইল। খাড়া হইয়া পুনরায় "আলী আলী" শব্দে ডাক ভাঙ্গিয়া দুই-এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। দারোগা দেখিলেন বড়ই বেচক্র। কনষ্টেবলদ্বয়কে হুকুম দিলেন, "ধর বেটাদের। ধর ওদের। জোর করে চলে যাবে, হুকুম অমান্য করে চলে যাবে, এত বড় ক্ষমতা!"

রোশুম বলিতে লাগিল, "দারোগা বাবু! আমাদের কাছে আসবেন না। আমাদের একজনার গায়ে হাত দিবেন না। এ পর্য্যন্ত আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করে অনেক গালাগালি সয়েছি।"

দারোগা—"বেটার বক্তৃতা দেখ। চার পয়সার মজুরের নবাবির কথা শুন।"

চৌকীদারগণ ও কনষ্টেবলদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া, দারোগা বাবু লাঠিয়ালদিগের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। হাত্‌কড়া দড়ি, এই সকল সাজ-সরঞ্জাম লইয়া লাঠিয়ালদিগের সম্মুখে ত্রস্তপদে যাইয়া গালাগালি দিতে দিতে মেঘাইয়ের হাতে দড়ি দিতে যেই দুই হাত বিস্তার করিয়াছেন, আর যায় কোথা? তাহারা পুনঃ ডাক ভাঙ্গিয়া দারোগা, কনষ্টেবল, চৌকীদারগণ পৃষ্ঠে দোহাতা লাঠি ঝাড়িতে লাগিল। চৌকীদার সমেত দারোগার দল লাঠিয়ালদের অর্দ্ধেক; সাধ্য কি আর তাহাদের নিকটে ঘেঁষিতে পারে? লাঠি পড়িতেছে, দারোগা বাবু দোহাই পাড়িতেছেন। কনষ্টেবলদ্বয়ের মাথা ফাটিল, হাত ভাঙ্গিল, চৌকীদার দল কোথায় কোন ঝাড়ে-জঙ্গলে, গৃহস্থদিগের ঘরের কোণে "ত্রাহি মধুসূদন" নাম করিতে করিতে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল। দারোগার পাল্কী চুরমার হইল। বেহারাগণ জোর করিয়া গ্রাম্য লোকদিগকে ডাকিতে লাগিল, কেহই অগ্রসর হইল না। দূরে কেহ আপন বসত বাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ভয়-বিহ্বলে লাঠির আঘাত দেখিতে লাগিল। সাধ্য কি, গ্রামের লোকে আসিয়া সাহায্য করে। তাহাদের মনে ভয় এই যে, লাঠিয়ালের গোঁ, কি জানি, আমাদের বাড়ী চড়াও করে।

রোশুম উচ্চ আওয়াজে বলিতে লাগিল, "তুই দারোগা নহিস্‌। তোরা মনিবিবির গোলাম, টাকা খেয়ে তাদের ছেড়ে দিলি। আর আমাদিগকে চালান দিবি। তোর দফা শেষ করে আমরা চলে যাব।"

দারোগা বাবু মাটিতে পড়িয়া গেঙ্গাইয়া গেঙ্গাইয়া বলিলেন, "বাবা সকল, আমাকে প্রাণে মারিস্‌নে। তোরা চলে যা।"

রোশুম বলিল, "তোমার কথায় যাব? বেটা মনিবিবির গোলাম।"

এই বলিয়া তিন-চারজনে গণিয়া লাথি মারিয়া দারোগাকে অচৈতন্য করতঃ ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সদর রাস্তার উপরে আসিল, আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। রাত্র তিনটার সময় সোনাবিবির জমিদারী কাচারিতে যাইয়া, প্রধান কার্য্যকারক নটবর বাবুকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া সমস্ত অবস্থা বলিল। ঢাল, সড়কী, অস্ত্রশস্ত্র দমাদম ফেলিয়া বলিল, "আমরা বিদায় হলেম, তোমরা থানায় মোকদ্দমার যোগাড় দেখ, আমরা চল্লেম।"

নটবর বাবু চক্ষু মুছিতে মুছিতে দুই চার কথা জিজ্ঞাসা করিবারও সময় পাইল না। কে কোথায় কোন পথে চলিয়া গেল, চক্ষু ফিরাইয়া আর দেখিতে পাইল না।

পঞ্চদশ নথি

আজকাল বিজ্ঞান গুরু, বিজ্ঞান কল্পতরু; বিজ্ঞানই কামধেনু, বিজ্ঞানই জ্ঞানের সীমা; বিজ্ঞান সম্মত, বিজ্ঞান প্রমাণিত, বিজ্ঞান অন্তর্গত না হইলে কিছুই কিছু নহে। বিজ্ঞান যদি বলে তুমি আছ, তবে তুমি আছ। বিজ্ঞান যদি বলে তুমি নাই, তবে তুমি থাকিয়াও নাই। বিজ্ঞান যদি বলে তুমি আহার করিয়াছ, তবে তুমি দুই সন্ধ্যা ত্রিসন্ধ্যা উদরে অন্ন জল না দিয়াও তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্ষুধা নাই। তোমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের ধন স্ত্রীরত্ন ঘর-সংসার আলো করিয়া আছেন। শ্রমজনিত ক্লান্ত হইলে অদ্বিতীয় সুখদায়িনী মনোমোহিনীর কমলদল-পরাজিত, সুকোমল গোলালু হস্তের সুস্নিগ্ধ বায়ু ব্যজনে, শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করিতেছ, কিন্তু বিজ্ঞান মতে এ সকল সপ্রমাণ না হইলে তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে,—বাধ্য হইয়া তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে, তুমি বিবাহ কর নাই, তোমার হৃদয়ধন সম্মুখে নাই, পাখা হাতে বাতাস করে নাই, তুমি সুস্নিগ্ধ হও নাই, শ্রান্তি ক্লান্তি দূরে যায় নাই। আহারে বিজ্ঞান, ব্যবহারে বিজ্ঞান, ধর্ম্মেও বিজ্ঞানের অধিকার।

ঋতুরাজ বাবু বড়ই বিজ্ঞানপ্রিয়। মুসলমান ধর্ম্ম বিজ্ঞান অনুমোদিত নহে, পূর্ব্বে যাহাই থাকুক, বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞ সুপণ্ডিত সমাজে কখনই স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে, এ কথার আন্দোলন বৈঠকখানাতে হয়, এজলাসে বসিয়া হয়, পেস্কার মহিউদ্দীন বাসায় কোন কাগজ দস্তখৎ করাইতে গেলে, সে দস্তখত সময় হয়। ছমির জমির প্যায়দা যখন গোপনে মুরগী মারিয়া খাল ছড়াইয়া কলাপাতায় বাঁধিয়া, হাঁসের মাংস, পাঠার মাংস উল্লেখে গিন্নীর হাতে দিয়া চলিয়া যায় সে সময়ও হয়। ঋতুরাজ বাবুর প্রশ্ন—"তোরা যে নামাজ পড়িস একবার উঠিস্ একবার বসিস্ কেন? আবার ডানি বাঁয় তাকাইয়া দেখিস কি?" প্যায়াদা প্যায়দাগিরি করে, সমন জারির দুই এক প্রশ্ন করিলে তার উত্তর বোধ হয় দিলেও দিতে পারে, নামাজের উত্তর কি প্রকারে দিবে? সে মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া যায়। ঋতুরাজ বাবু হাসিয়া কুটি কুটি, আহ্লাদে আটখানা। গিন্নিকে বলা হয়, "দেখলে? আমার এ সওয়ালের জবাব নেই।"

ঋতুরাজ বাবুর বাসার নিকট একটি বহুকালের পাকা মসজিদ আছে। সৌখিন মেজাজ, এয়ারের প্রাণ, খোলা দেল, রসিক রাজ, মাতালের হদ, সর্ব্বদাই আমোদ—সর্ব্বদাই রগড়। প্রাতঃকাল হইতে দশটা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হইতে রাত্র দুটো, কোন কোন দিন প্রভাত পর্য্যন্ত রগড় লাগাই থাকে। রবিবারে ত কোন কথাই নাই। ঋতুরাজের আমোদ, রস রসিকতা

বন্ধ কেবল কুঞ্জ-নিকেতনে নিমন্ত্রণের দিন। প্রায় নামাজের সময় নামাজিদিগের নামাজ আদায় করা মহা দায়। তবলার চাটি, পুরবি, মালকোসের আলাপ, সেতার বেহালায় ইমন কল্যাণের গদ ও গান, বেহাগের তান শেষে কীর্ত্তন। অবশেষে রামায়ণের চোটে কান পাতা ভার হয়। কতদিন মুসলমান উকিল মোক্তারগণ বলিয়াছেন ঃ

"ধর্ম্মাবতার! গান-বাজনা করিতে বারণ করি না। হুজুর! আমাদের নামাজের সময় একটু ক্ষান্ত দিলে আমরা নির্ব্বিঘ্নে নামাজ পড়িতে পারি।"

হুজুর হাসিয়া উত্তর করেন, "তা হলে আর আমোদ-আহ্লাদের নাম করতে হয় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নামাজ, আমোদের সময়ে নামাজ, এ নামাজের জন্য আমোদ-প্রমোদ বন্ধ করা ত মহাদায়। তোমাদেরও যে সময় নামাজ, আমাদেরও সেই সময় পুরা আমোদ। লক্ষ টাকা জরিমানা হলেও ত জমান মজলিস ভাঙ্গা যায় না। একবার গান জমে গেলে কি ভাঙ্গা যায়? আর সেই সময় এক মিনিট কাল ক্ষান্ত দিলে কি আর সে বাতাস থাকে। উপাসনা করা নিয়েই ত কথা। আমার কাচারির সময় একেবারে সমুদায় নামাজ সেরে নিলেই ত হয়। তবে বাকী রইল এক রবিবার, আচ্ছা সে দিনের জন্য না হয় একরূপ বন্দোবস্ত কর্ত্তে পারি। যেই দেখলে আমরা স্নান-আহার কর্ত্তে যাচ্ছি, সেই সময় নামাজ আরম্ভ করে শীঘ্র শীঘ্র সেরে নিও।"

উকিল মোক্তার দল—"হুজুর! তা কি হয়? নামাজের সময় বদল করা জগতে কাহারও ক্ষমতা নাই। খোদাতালার হুকুম তামিল কর্ত্তেই হবে।"

ঋতুরাজ বাবু হাসিয়া উত্তর করেন, "জরুরি কাজ পলে, মোকদ্দমায় আসামী থাকলে, সাক্ষী দিতে ডকে খাড়া হলে, জেলখানায় কয়েদ পলে, হাজতে গেলে কি হয় বাবা? তখন সময় ঠিক থাকে কোথা বাবা? আমার চক্ষে ত আর ধূলা বর্ষাতে পারবে না বাবা। প্রতিদিনই ত দেখছি বাবা। সে সময় কি হয়রে বাবা?"

উত্তর—"বেঁধে মাল্লে বড় সয়—হাকিমের হুকুম। নাচার। উপায় কি? শুনেছি, অনেক হিন্দু হাকিমে এর একটা উপায় করে দিয়ে থাকেন। তা এ নচ্ছার জেলায় সে কথার যখন কোন কথা নেই, ত অরাজকপুর থাক্‌বে কি?"

"খুব কথাই বলেছ। খুসী হলেম। নচ্ছার জেলা আর অরাজকপুরে নেই। 'বেঁধে মাল্লে বড় সয়, হাকিমের হুকুম।' বেশ বেশ, খুব ভাল কথা। যেখানে বেঁধে মারে, সেখানে সময় উলট পালট হয়, হাকিমের হুকুমেও রদবদল ঘটে। আচ্ছা বাবা! এটা বুঝি ক্ষেপা পাগলার হুকুম। যাও যাও, আর জ্বালাতন কর না; আর আর সময় যেমন বদলে থাকে, আমাদের আমোদের সময়ও সেই অজুহাতে বদলে দেও। জান, এও হাকিমেরই হুকুম।"

উকিল মোক্তার দল মুখখানি ভারী করিয়া চলিয়া যান। শেষে কাজী সাহেব। অতি বৃদ্ধ, অন্ত দন্তহীন। পশমের মধ্যে একটি কাল বলিতে নাই। চক্ষের পাতার রোঁয়া, ভ্রূ পর্য্যন্ত সাদা। ঠোঁট দুখানি অর্দ্ধেক পরিমাণ মুখের মধ্যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। লাঠি ভর দিয়া কত কষ্টে বৃদ্ধ কদিন এসে কাঁদাকাটি করেছে, ঋতুরাজ বাবু কাজী সাহেবকে দেখিলেই

·ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমনি এক কুতর্ক তুলে বসেন যে, বৃদ্ধের কাঁপা মাথা আরও কাঁপিয়া যায়। নামাজের সময় গান-বাজনা বন্ধ করার কথা মুখে আনিতেই ভয় হয়।

ভেড়াকান্ত নিকটে এই কথার আলোচনা হয়। ভেড়াকান্ত কয়েকটি কথা বলেন মাত্র। মোক্তার দল আমলা দল সে কথায় যোগ দেন নাই। দোকানদার দল স্কুলের ছেলে দল যোগ দিয়াছে। ঋতুরাজ বাবুর কানেও সে কথা না গিয়াছে, তাহা নহে। আরও শীঘ্র শীঘ্র কথাটা ঋতুরাজ বাবুর কানে যাওয়ার কারণই ভেড়াকান্তের পরামর্শ বলিয়া। সকলেই জানে, ভেড়াকান্তর উপর হাকিমান মাত্রই চটা। সরফরাজী লাভের জন্য, কথাটা যত শীঘ্র হইতে পারে, ঋতুরাজ বাবুর কানে গিয়াছে। ঘটনাক্রমে সেই সময় পদব্রজে দেশড়ী করিতে করিতে এক বাইজী উপস্থিত। বাইজীর ভারি মান। বাই খেমটা দল হইলে আর রক্ষা নাই। যে হউক, যেমন করিয়া হউক, ঋতুরাজ বাবুর বাড়ীর বৈঠকখানায় তাঁহাদের পায়ের ধূলি পড়িবেই পড়িবে। ঋতুরাজ বাবু যদিও ফাঁক বুঝিয়া বন্ধের দিন দেখে! বায়না কর্ত্তেন তা ভেড়াকান্তর পরামর্শের কল্যাণে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সেদিন পর্য্যন্ত সহ্য হইল না। যে দিন শুনা, সেই দিনই বায়না। হাকিমদল সমুদায় নিমন্ত্রণ। সবডেপুটি মৌলবীরও নিমন্ত্রণ। চারটার পর হইতেই নাচ, গান আরম্ভ হইবে। এইরূপ ঘোষণা। যদিও বৃহস্পতিবার কাচারির কাজ, আপন হাতের কাজ, সকালে সকালে উঠিয়া আসিলেই হইল, হইয়াছেও তাহাই। সাড়ে তিনটার সময় ঋতুরাজ বাবু বাড়ীতে আসিয়া বৈঠকখানা ঘরের টেবিল চেয়ার সরাইয়া ফারাস বিছানা করিয়াছেন। বাজার হইতে ঝাড় লণ্ঠন দেয়ালগীর ওয়ার ল্যাম্প ভাড়া করিয়া আনিয়াছেন। যাহা যাহা নাজাই পড়িয়াছে, কুঞ্জ-নিকেতন হইতে আনিয়াছেন, বেগম ঠাকুরাণীরও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র আসন পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে চায়না চিক্ ঝুলিতেছে। গিন্নি ঠাকুরাণী, আর বেগম ঠাকুরাণী, উভয়ে এক চিকের আড়ালে বসিয়া বাইনাচ দেখিবেন। দুই ঠাকুরাণীর বসিবার স্থানের পার্শ্বেই প্রাইভেট্ রুম খোলা হইয়াছে। "বিনা অনুমতি প্রবেশ নিষেধ।" এক-একটা কথা কাগজের বড় বড় অক্ষর কাটিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাইভেট রুমে বসিবার কোন আসন নাই। একখানি টেবিলের উপর দশ বারটা গ্লাস, আর চার পাঁচটা বোতল, তিন চারখানি পরিষ্কার তৌলিয়া, দুই তিন ডিস্ শুষ্ক খাদ্য। মাংসও আছে, ময়দাও আছে।

হাজার হক বাঙ্গালীর কারবার। ঠিক সময় মত কোন কার্য্যই হয় না। আমোদের অঙ্গ বলিয়া একটু নিকটে সাড়ে তিনটার স্থানে পাঁচটার সময় গান আরম্ভ হইল। বাছা উকিল বাবুরা জামা জোড়া ফেলিয়া দিব্বি ধুতি চাদরে কামিজে বাহার দিয়া উপস্থিত হইলেন। আতর গোলাপে ল্যাভেণ্ডারে খুসবুদারে হাকিমান দল কেউ আসেন নাই। বেগম ঠাকুরাণীও সে পর্য্যন্ত আসিতে পারেন নাই।

দোকানদার দল মধ্যে দেশীয় মুসলমান দল, প্রথমে "আচ্ছা দেখেঙ্গা জান দেঙ্গা" "প্রাণ দেঙ্গা" বলিয়া মুসলমানদিগের সঙ্গী হইয়াছিলেন। শেষে উপস্থিত সময়ে কে কোথায় লুকাইয়া গা ঢাকা দিয়াছেন তার খোঁজ-খবর পর্য্যন্ত নাই। সাহসী বলিত চাটগেঁয়ে ভায়াদের।

ধর্ম্মগত প্রাণ, ধর্ম্মের জন্য তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তারাই স্কুলের মুসলমান ছাত্রদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া খুব সাজ-গোঁজে কোমর বাঁধিয়া খাড়া হইয়াছে।

যে ছেলেরা কোন দিন মসজিদে নামাজ পড়িতে যায় নাই, সেদিন তারাও টুপি চাপকান নিয়া মগরেবের নামাজ পড়িতে মসজিদে গিয়াছে।

আগে বলিতে ভুলিয়াছি।

সকল মাষ্টার নহে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ মাষ্টারের নিমন্ত্রণও হইয়াছে। হেড মাষ্টার ও দলে নন। তিনি ভারি শান্ত সুধীর, যেখানে স্ত্রীলোক মদ্ মাতালের কারবার; সেখানে তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই। দ্বিতীয় অপেক্ষা চতুর্থ মাষ্টার ভারি রসিক। তিনি কোন হাকিমের ঘরণীকে ধর্ম্ম-মা বলিয়া সম্বন্ধ পাতিয়া কন্যা দুটিকে বাঙ্গালা পড়াইতেন। সর্ব্বদা চক্ষু মুদিয়া বেহ্ম উপাসনা করিতেন। জীবের কষ্ট দেখিলে কান্দিয়া আকুল হইতেন, কাহার মনে কোন দিন ঘুণাক্ষরেও কোন কথা বসে নাই। তাঁহার সুন্দর চরিত্র প্রতি কোন দিন কোন প্রকারে সন্দেহ জন্মে নাই। কিন্তু হঠাৎ হাকিম সাহেবের গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলেন। শেষে বাজে কথা অনেক মুখে শুনা গেল। হাকিমের জামাই দু বৎসরের মধ্যে শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করেন নাই। অথচ নানা কথা, নানা মুখে। কেহ বলিত—

লক্ষণ, এ আর কেমন,
কিছুই বুঝিতে নারি।

ডাক্তার দেখান হইল, কি জানি কি হইল। জামাই বেনারস কলেজে বি,এ ক্লাসে পড়িতেন, পরীক্ষা দিয়া শ্বশুরের কার্য্যস্থলে আগমন করিলেন। ডাক্তারবাবুর অনুগ্রহে রোগের শান্তি পূর্ব্বেই হইয়াছিল। আর কোন গোলযোগ হইল না। কিছুদিন পরে গেজেটে দেখা গেল ডাক্তারবাবু অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছেন। কিন্তু মাষ্টার বাবুর প্রাইভেট টিচারি আর হইল না। মাষ্টারী পর্যন্ত যায় যায় কথা উঠিল। শেষে তিন মাসের ছুটি লইয়া রক্ষা পাইলেন। সে হাকিম চলিয়া গেলে আবার কাজে হাজির হইয়াছিলেন। সে রসিক নাগর মাষ্টার বাবুও নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন। প্রাইভেট রুমে তাঁহার যাইবার অধিকার আছে। তিনি যাইতেছেন, বাহির হইবার সময় রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে এলাচির দানা চিবাইতে চিবাইতে আসরে বার দিতেছেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ঋতুরাজ বাবুর দলস্থ বন্ধু-বান্ধবগণের কানে সারিঙ্গের বোল জাঁকাল জমকাল বোধ হইতে লাগিল। তালে তালে বাহবা পড়িতে লাগিল। বাইজি ঘাড় নওয়াইয়া সেলাম বাজাইতে বাজাইতে মহা অস্থির। অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আগে আগে ডবল আরদালি ধাবিত হুঁ হুঁ শব্দে বেগম ঠাকুরাণীর পাল্কী আসিয়া অন্দরমহলে প্রবেশ করিল। ঋতুরাজ বাবু উলঙ্গ দেহে উলঙ্গ পদে অন্তঃপুরে যাইয়া, আদর অভ্যর্থনার সহিত বেগম ঠাকুরাণীকে পাল্কী হইতে নামাইয়া নির্দ্দিষ্ট চিকের অভ্যন্তরে অন্য অন্য মহিলাদিগের মধ্যে বসাইয়া আসিলেন। দুই মিনিট অতীত না হইতেই ভোলানাথ বাবু নাজির পেস্কার কোর্ট বাবু সহ

উপস্থিত হইলেন। বাকী রহিলেন এক বক্কেশ্বর, আর নবাগত সেই ডাক্তার। আরও বাকী রৈলেন, বিচারক দলের নেজুড়ি,—সব ডিপুটি এবং রেজিষ্টার বাবুই বলি—কি হাকিম বলি, তিনি।

বাইজী ফার্সী উর্দ্দু মিশাল গান ধরিয়াছেন। কম হইলেও কুড়িবার ছাঁইয়া সাঁইয়া করিয়া অস্থির হইয়াছেন। দক্ষিণ বামের সারিঙ্গীর মস্তকে হাত রাখিয়া, মহা অস্থিরের ভাব প্রকাশ করিতেছেন। গানের অর্থ দুই হাতে, দুই আখিতে ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া শ্রোতাদিগকে বুঝাইয়া মোহিত করিতেছেন। শ্রোতাগণ মধ্যে আলেফ, রে, তে কেহ পড়েন নাই, অথচ গানের অর্থ বুঝিয়া, ঢলিয়া গলিয়া পড়িতেছেন। "বাহবা বহুত আচ্ছা" বোলে সমুজদার বুঝদারের পরিচয় দিতেছেন। কেহ সমে কেহ ফাঁকে ঘাড় কাত করিয়া মান রাখিতেছেন, কেহ অপমান হইতেছেন। ঘাতে অঘাতে মিলে গরমিলে, মাথা কাত করিয়া সুখী হইতেছেন। ক্রমে সকলেই আসিলেন। সর্ব্বশেষে সব ডিপুটি সাহেব নবাবী চালচলনে এক পা সাতবার উঠাইয়া নাচের মজলিসে দেখা দিলেন—যেন বিয়ের বর। নূতন বিয়ের সময়ে যে সাহানা পোষাক প্রস্তুত করিয়া বর সাজিয়া মজলিসে বসিয়াছিলেন, বাছিয়া বাছিয়া আজ সেই রঙ্গিন আচকান জরির আমামায় দিব্বি সাজ দিয়া মজলিসে যোগ দিলেন। কিন্তু বাবুদের বিছানায় স্থান পাইলেন না। সেদিন তাঁহার ভাগ্যে একখানি বেঞ্চ জুটিল। হুঁকর সেই দুর্গন্ধময় জল নষ্ট হইবে বলিয়া সামান্য একখানি টুল, বহু দূরে বাইজীদিগের পিছনে তাঁহার জন্য পড়িল। তাঁহার উপরের হাকিম ভোলানাথবাবু যখন আদর করিয়া হাত ধরিয়া বসাইলেন, মনটা ছোট হইল বটে। কিন্তু মুখে মৃদু মৃদু হাসির অভাব হইল না।

সন্ধ্যাও নিকটে। বাতি-জ্বালার আদেশ হইল। দুই একটি বাতিতেও আগুন ধরিল। ওদিকে মস্‌জিদে মগরেবের নামাজ জন্য "আজান" আহ্বান ধ্বনি আরম্ভ হইল। মস্‌জিদটি অতি প্রাচীন। প্রবেশ-দ্বারের চৌকাঠের উপরে যে সব তারিখ খোদিত আছে, তাহাতে গণনায় শাজাহান বাদশার সমকালীন মস্‌জিদের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। আট গম্বুজের মস্‌জিদ মেরামত নাই। স্থানে স্থানে বট অশ্বত্তম বৃক্ষের কল্যাণে ছাদের অনেক অংশ ফাটিয়া গিয়াছে। মস্‌জিদের মেরামত ইত্যাদি কার্য জন্য নির্দ্ধারিত সম্পত্তি আছে, সে সম্পত্তির আয় মস্‌জিদের কার্য্যে ব্যয় হয় না। মালিকগণের নিজ ব্যয় ভূষণেই উড়িয়া যায়। আজান হইল। একটি বৃদ্ধ লোক আসিয়া সকাতরে অতি অল্পক্ষণ জন্য গান বাজনা বন্ধ করিতে প্রার্থনা জানাইল। হাকিম দল, সঙ্গে সঙ্গে আমলা দল...হিন্দু উকিল দল হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিলেন। ঋতুরাজ বাবু ভোলানাথ বাবুর কানে কানে চুপি চুপি কি কথা বলিলেন, প্রস্তাবকারী বৃদ্ধকে হাতে তালি দিয়া এক প্রকার পাগল সাব্যস্ত তাড়াইয়া দেওয়া হইল। ডবল উল্লাসে বাহবা বহুত আচ্ছা বোলে আসর খুব আঁটাআঁটিভাবে জমাইয়া দিলেন। হঠাৎ পূর্ব্বদিকে একটা গোলযোগ হইল। গোলযোগ কি মহা গোলযোগ হইল। যাহারা বৈঠকখানার বাহিরে দাঁড়াইয়া বাইজীর গান শুনিতেছিল,

তাহারা কে কাহার গায়ের উপরে পড়ে, কে দৌড়িয়া বৈঠকখানায় ঢোকে, এক মহা হুলস্থূল ব্যাপার বাধিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ঝাড় লণ্ঠন দমাদম ভাঙ্গিয়া চুরমার হইতে লাগিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে বেশী অন্ধকার....সেই বেশী অন্ধকার মধ্যেই আরও বেশী ধুমধাম। কে কাহার গায়ে পড়ে, কে কাহাকে ধাক্কা মারে, কে কাহাকে চাপিয়া ধরে, কে চিক্ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। ঘরের মধ্যে অন্ধকারে এক ভূতের কাণ্ড হইতে লাগিল। "মার শালাদের" "মার শালাদের" রব ভিন্ন আর কেহ কাহাকে দেখিল না, কেহ ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া অন্তঃপুর মধ্যে অর্দ্ধ উলঙ্গভাবে হাঁপাইতে হাঁপাইতে পড়িল। সারিঙ্গি তবলা ভাঙ্গিয়া চুরমার লইল। ঝাড় লণ্ঠন ঝন্ ঝন্ শব্দে পড়িতেছে। কাহার পা কাটিতেছে, হাত কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে। অতি অল্প সময় মধ্যে এই আকস্মিক ভৌতিক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। এক সেকেণ্ড মধ্যে এই ভূতন্ত ঘূর্ণিবায়ু অন্ধকারে বহিয়া ধাঁধা লাগাইয়া দিল। প্রাইভেট রুমের বোতল গ্লাস রুলের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইল। লিমলেড সোডার বোতল, তারে বান্ধা গালা আঁটা বোতল সকল ভাঙ্গিয়া কত মহিলার পরিধেয় বসনের অঞ্চল, কাহার কটি নিম্নের বসন পর্য্যন্ত ভিজিয়া গেল। মানুষের চাপনে পেষণে বেগম ঠাকুরাণীর জেকেট ছিঁড়িল, ব্রেচ হারাইল, গলা শরীর আরও গলিয়া পিষিয়া পশম উঠিয়া লাল লাল হইল। গৃহিণী ঠাকুরাণীর মাথার কবরী খসিল, উভয়ে আলুথালু কেশে অন্ধকারে ধাক্কাধাক্কি চাপাচাপিতে একের গায়ে অপরে পড়িল। কাহার বুকের উপর পড়িয়া, নেশার ঝোঁকে গড়াইতে কোন বাবু মহিলাদ্বয়ের উপরে পা পিচ্ছলে পড়িয়া গেল। হায়! হায়। সে কঠিন সময়েও মাতালের মহানন্দ। চুম্বন চুচ কৃতি লাভের বেগারে গঙ্গাস্নান করিয়া লইল। সব ডেপুটির বিবাহের জরির পোষাক লোকের চাপনে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইল। মাথার পাগড়ি কোথায় পড়িয়া পদতলে পেষণে কিরূপ হইল কে খুঁজিয়া দেখে? কাহারা এই গোলযোগ বাঁধাইয়া ভূত নন্দী কাণ্ডে গড়াইয়া, যেমন কর্ম্ম তেমন ফল ফলাইয়া, চক্ষের পলকে কোথায় চলিয়া গেল, কেহ তাহার সন্ধান পাইল না। তাহারা কোন সময় ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে, কেহই সন্ধান পাইল না। কিন্তু অন্ধকারে বাবুরা আপনা আপনি জড়াজড়ি করিয়া মহিলাকুল লইয়া কামড়া-কামড়ি পড়াপড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। একজন বুদ্ধি খরচ করিয়া ঋতুরাজ বাবুর শয়ন ঘর হইতে প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠন আনিয়া আলো ধরিতেই সকলে সুস্থির হইলেন। বিশ্বাস উকিল মহাশয় বাইজীকে ক্রোড়ে করিয়া বড় টেবিলের নীচে প্রাণভয়ে পালাইয়াছিলেন, বাহির হইলেন, এবং বাইজীকে সঙ্গে করিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। কাহার মুখে কথাটি নাই। মস্‌জিদে তখনও নামাজ শেষ হয় নাই। নামাজিরা নির্ব্বিঘ্নে নামাজ শেষ করিয়া আপন আপন স্থানে চলিয়া গেল। কেহই বাবুদের কোন খোঁজ-খবর লইল না। কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না।

এদিকে কাহার কোথায় আঘাত লাগিয়াছে, কাহার কোথায় বোতলের খাপরায় ঝাড় ভাঙ্গা কাঁচের টুকরায় কাটিয়াছে, বাতির আলোকে দেখিতে লাগিলেন। উকিল বাবুরা প্রায়ই চম্পট দিয়াছিলেন, দুই তিনজন মাত্র আশার পথ চাহিয়া ঘরের কোণে চিকের মধ্যে

আত্মগোপন করিয়া কোন প্রকারে প্রাণটি রক্ষা করিয়াছিলেন। কেহ কোন কথা কহিতেছেন না। বেগম ঠাকুরাণী বাতির আলোকে দেখিলেন, তাঁহার শরীরের অনেক স্থানে...বিশেষ গণ্ডে ও বক্ষে রক্ত জমিয়া লাল হইয়া গিয়াছে। পাল্‌কী বেহারা আনাইয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া নির্ব্বাকে বিদায় হইলেন। প্রায় সকলেই ঐ প্রকার বিদায় হইয়া আপন আপন বাটিতে আসিলেন। থাকিবার মধ্যে থাকিলেন ভোলানাথ, বক্কেশ্বর, আর ডাক্তার। ঋতুরাজের ত আপন বাড়ী। ঋতুরাজ বাবু স্ত্রীর দুরবস্থা দেখিয়া মনে মনে এক প্রকার কাঁদিলেন। দুই তিন স্থান হইতে রক্ত পড়িতেছে, দক্ষিণ গণ্ডে দন্তের আঘাতে মাংস খণ্ড উঠিয়া গিয়াছে। শরীরের কোন স্থান আর পূর্ব্বভাবে নাই। লোকের চাপনে পেষণে বক্ষঃস্থলের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। বুকে হাত দিবার শক্তি নাই—যেন বিষের টুকরা। বডী সেমীজ সমুদায় খণ্ড খণ্ড। ফরাসডাঙ্গার ধূতির গায়ে আর সুতা নাই। টানা-হেঁচড়ায় কেবল দুটি পাইড় বর্তমান আছে। মাঝের কাপড় তিনচার অঙ্গুলি, কোন স্থানে এক হাত আধ হাত ফাড়িয়া ছিঁড়িয়া কে যেন কাড়িয়া লইয়াছে। গণ্ডে যেমন দন্তের চিহ্ন স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে, শরীরের আর দুই তিন স্থানে নখাঘাতের চিহ্ন বহিয়া শোণিত জমিয়া রহিয়াছে। সকলেই দুঃখিত। ডাক্তারবাবুও দেখিলেন। ঔষধের ব্যবস্থাও হইল।

ক্ষণকাল এইরূপ কাটিলে ভোলানাথ বাবু চুরুটে আগুন ধরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আজ একি কাণ্ড হল! কিছুই ত বুঝি না। এ গোলটা বাধালে কারা? প্রথমে কে গোল করে ঘরের মধ্যে এসে তানপুরাটা আছড়ে ভাঙ্গলে। ছোট লাটির মত কি যেন একটা হাতে—সেইটে দিয়ে তবলা জোড়া ভাঙ্গলে। লাফিয়ে উঠে বাড়ি দিয়ে ঝাড়গুল ভেঙ্গে ফেল্লে। অপর লোক ত কেউ ঘরে আসে নাই। গান শুনতে যারা এসেছিল, তারা ভিন্ন বাহিরের অপর কোন লোক ঘরের মধ্যে আসে নাই। ঘরের লোকেই বাহিরের সোর-হাঙ্গামার শব্দে অনর্থক অস্থির হয়ে আপনা আপনি কাটা-কাটি করে এই দুর্দ্দশা হল।"

ঋতুরাজ বাবু বলিলেন, "আমি স্বচক্ষে দেখেছি, গোলটা যেন পশ্চিমদিক হতে উড়ে এলো। ঘরের তিন দিকে বহুতর লোক অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, সকলেরই মুখ বৈঠকখানার মধ্যে বাইজির দিকে। হঠাৎ ঐ দাঁড়ান লোকগুলোর মধ্যে পশ্চিমের দিকে যাহারা ছিল, তাহারা হঠাৎ গোল করে উঠলো, মাল্লোরে! মাল্লোরে! তখন কে কার গায় পড়ে! প্রাণের ভয়ে বাতি ভাঙ্গা ঠেলে যেন সরিয়ে নিয়ে এলো, আর অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। ঘরের মধ্যেও ঐরূপ সোরগোল হয়ে সকলেই খাড়া হল, তারপর ঝাড়বাতি ভাঙ্গা। বাতি নিবে গিয়েই আরও মুস্কিল হলো। যা বলেছি—তারাই এ গোলযোগটা বাধিয়েছে।"

ভোলানাথ—"হাঁ, আমার বিশ্বাস তাই। কিন্তু চক্ষে কাকেও দেখি নাই। অন্ধকারে দেখবোই বা কি করে?"

ঋতু—"আপনি সন্দেহ করবেন না। এ তাদেরই কার্য্য। অন্ধকারে এসে প্রথমে ঐরূপ

একের গায়ে অন্যে পড়ে গোল বাধায়। তারপর গোলেই গোলযোগ বেশী হলো। বাহিরের লোক ভয়ে ঘরে ঢুকলো; ঘরের লোক ভাবলে, ঐ বুঝি সেই মার খুনেরা, তারাই হাউ মাউ করে উঠে বাতি নিবিয়ে অন্ধকার করে ঝাড় লণ্ঠন ভেঙ্গে, মানুষের হাত পা কেটে, গা পা হাঁছড়িয়ে যুদ্ধ ফতে কল্লে। যাই হউক, তারা ঘরের মধ্যে না আসুক, প্রথম বাহিরের গোলযোগ যে—সেই যা বলেছি তাদেরই দ্বারা গোল, তাতে সন্দেহ মাত্র নাই।"

ভোলা—"এ কথা মানি। এ কথা হতে পারে। ওদেরই চক্র—তাতে আর ভুল নেই। যা হউক, খুব ছাফাই হাত খেলেছে। আচ্ছা পাব কোন দিন! এই হাতে পাব। আজ আর কিছুই বল্‌বো না। যাক্ গান ত একরকম ভালই শোনা হলো। বেগম ঠাকুরাণী ভারি বেজার হয়ে গেছেন। লোকের পেষণে তাঁর গায়ের এক পুরু চামড়া উঠে গেছে। একে সুন্দর মোলায়েম শরীর, যেখানে ঘেঁস লেগেছে, সেখানে যেন কাম সিন্দুর ঘন করে গুলিয়ে মাখিয়ে দিয়েছে। বেচারির মুখে কথাটি নাই। কি অন্যায়, কি অন্যায় হয়েছে।"

ঋতু—"দৈবাৎ হয়ে পড়লো তার কি করবো। আমি ত আর ইচ্ছা করে করিনি। তাঁর যেমন লেগেছে, আমার তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশী লেগেছে, দশ গুণ জখম হয়েছে, পঞ্চাশ গুণ সিন্দুর গুলে দিয়েছে। কথায় বলে, যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। আমার যে কলিজায় ঘা দিয়ে গেছে—তা কেউ দেখে না। ভদ্রলোকের মধ্যে এমন পাজি তা কেউ দেখে না। এই গোলযোগের মধ্যে দণ্ডাঘাত কেন? চাপন দাবন কেন? কামিজ বডী সামীজ ফাড়া কেন? পরনের সাড়ী টানাটানি কেন? যাক্, আমারই ঝক্‌মারি। যেমন আক্কেল—তেমনি শিক্ষা। ও সকল কথা আর তুলে কাজ নেই। এখানে আর মন টিক্‌ছে না—ভাল বোধ হচ্ছে না। চলুন, আপনার ওখানে যাই, না হয় বক্কেশ্বর দাদার ওখানে গিয়ে বসি।"

বক্কেশ্বরবাবু এ পর্য্যন্ত কোন কথা বলেন নাই। বলিলেন, "আমার ওখানে যেয়ে কাজ নেই। ভোলানাথ বাবুর ওখানে গিয়েও কাজ নেই। এইখানেই বসো, আমরাও যাচ্ছি না, এর প্রতিকার কি? এরূপ পীড়ার ঔষধ কি? এ ঘায়ের মলম কি? এ নিদারুণ মনোবেদন নিবারণের পন্থা কি? উপায় কি? তাই ভেবে-চিন্তে বাহির করো।—তা নাহলে এখানে চাকুরী করা দায় হয়ে উঠবে। তোমরা ভাবছো কি? একি সহজ জ্ঞানে হয়েছে? যে সে মাথা হতে এই বুদ্ধি বেরিয়েছে? যার তার কৌশলজালে নওলা ঢাঙ্গ মৃগাল পড়েছে? চিথল্ পেটি দেখিয়ে চিৎ হয়েছে? তা নহে। তা মনে করো না। আমি ভাবছি তাই। আজ দশ জনার মধ্যে এই হলো, চক্ষে ধাঁধা লাগিয়ে কি কাণ্ড করে গেল! দিনে দুপুরে মাথায় বাড়ী দিতে আটক কি? যে হাত দেখতে পাচ্ছি, ভেনিকের বাজী কোথায় লাগে! আমার ভয় হয়েছে। যেই হক্ এরা ইচ্ছা কল্লে সকলি কর্ত্তে পারে। সন্ধান কর্ত্তে হবে, বিশেষ সন্ধান করে জান্তে হবে এরা কারা?"

ঋতুরাজ বাবু যেন বিশেষ রূপে জানেন. এমনি ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আর কারা? এমন সাহস কাদের? যা শুনেছি তাদের। তবে সে একা নাই। সে ইহার মধ্যে

স্বয়ং আসে নাই। অবশ্যই তার পরামর্শ আছে। সে নাহলে এমন সাহস কারও হবে না।"

ভোলা—"সে কথা ঠিক। ভেড়াকান্ত এর মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। তবে সে যে চতুর, নিজে কখনই আসে নাই। অন্য যোগাড় করেছে। তা আমি তাকে কিছু দিনের জন্য এদেশছাড়া কচ্ছি। (ঋতুরাজ বাবুকে সম্বোধন করিয়া) তোমার হাতে যা ছিল, তার কি হয়েছে?"

ঋতু—"আমার হাতে তা হবে না। বোধ হয় আমার হাতে থাক্‌ছে না। উঠিয়ে নেবে। যা করেন আপনি।"

কথা হইতেছে—এমন সময় সেই দারোগা বাবু সঙ্গে কোর্ট বাবু আসিয়া উপস্থিত। দারোগা বাবু হাউ মাউ করিয়া পৃষ্ঠের দাগ, মাথায় জখম, ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন। রোশুমের আচরণ দ্বিগুণ রং চড়িয়ে দশ গুণ অতিরিক্ত করে বলিলেন। হলধর কথা একেবারে গোপন করিলেন। হাকিমান দশ শুনিয়া রাগে কাঁপিতে লাগিলেন। দারোগা বাবু আরও বলিলেনঃ

"ধর্ম্মাবতার। সমুদায় পরামর্শ ভেড়াকান্তের! তার পরামর্শ না হলে এত সাহস কারও হতে পারে না। আমার প্রাণ যে বেঁচেছে, সে কেবল আমার কপালের জোরে আর অন্নজলের জোর আছে বলে। পুলিসে প্রতি এরূপ অত্যাচার কোন দেশে হয় নাই, কেউ কখনই করতে পারে নাই।"

কোর্ট বাবু বলিলেন, "হুজুর! আজিকার ঘটনাও তারই পরামর্শের ফল। মুসলমান দোকানদারেরা তারই প্রশংসা কচ্ছে, কত কি বল্‌ছে।"

ভোলানাথবাবু বলিলেন। "আর বলতে হবে না! আমরা তা আগেই জানতে পেরেছি। আচ্ছা দারোগা বাবুকে রিপোর্ট কর্ত্তে বল। এতে আরও ভাল হয়েছে। সময় মত কাজ হয়েছে! আর পুলিসকে গোপনে সতর্ক করে দেও, যে সাবধান! ভীমরুলের মোকদ্দমা যেন নষ্ট না করে। রাগে আমার বুদ্ধি স্থির নাই। বেশী বলা কওয়ার দরকার নাই। যত চাপা থাকে ততই ভাল। কনষ্টেবল দুজনার যে হাত ভেঙ্গেছে তারা কোথায়?"

দারগা বাবু—"ধর্ম্মাবতার! তারা ডাক্তারখানায় আছে।"

ডাক্তার বাবুর প্রতি ভোলানাথ বাবু ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা কর্ত্তেই তিনি বলিলেন, "আমি যে সময় আসি, তার কিছু পূর্ব্বে দুইজন কনষ্টেবল হাত ভাঙ্গা ডাক্তারখানায় এসেছে। লাঠির বাড়িতে হাত ভাঙ্গা বলে, কিন্তু সে হাড় জোড়া লাগ্‌বে—একেবারে ভাঙ্গে নাই।"

ভোলা—"একেবারে না ভাঙ্গুক! কিন্তু রিপোর্টটা যেন গুরুতর বলেই হয়।"

ডাক্তার বাবু হাঁ—হু—না কিছু বলিলেন না। পকেট হইতে একখানা খবরের কাগজ বাহির করিয়া একটি চিহ্নিত স্থান দেখিয়া পড়িতে দিলেন। হাকিমান দল ক্রমে তিনজনই একে একে পড়িলেন। যিনিই পড়েন, তিনিই মুখখানি ভারী করিয়া পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করেন, মনে মনে কতক্ষণ চিন্তার পর ঋতুরাজ বলিলেন ঃ

"এ হলো কি? আমাদিগকে চারদিক হতে অস্থির করে তুল্লে। দেখ ত! কোথায় নিমন্ত্রণ

খেতে গিয়েছি কি করেছি। তাও ছাড়ে নাই। আর ত সহ্য হয় না। ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়েছি, একটু আমোদ-আহ্লাদ করেছি, সেকথাও দেশময় করে দিয়েছে। কি বলবো? মনের আগুন মনেই রয়ে গেল। আর একটি কথা। সে এত গুপ্তসংবাদ পায় কি করে? সে ত আর সকল জাগায় যায় না। অবশ্য সন্ধানী লোক আছে। আরও দেখুন! নীচের কয়েক ছত্র পড়ে দেখেছেন? এগুলি ত সত্য নয়। আমরা মদ খেয়েছিলাম, ঠিক্ কথা। খেম্‌টাআলিদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নেচেছি, তারা নাচ করেছে, আমরা বাজিয়েছি। এ সকল সত্যি নয়।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "তা মাতাল হলে কি জ্ঞান থাকে, না সে সময়ের কোন কথা মনে থাকে। যারা করে, তারা কি আর বুঝতে পারে,—সে সময় কি তারা বুঝতে পারে যে, আমরা কি কচ্ছি। আর এক পেরেগ্রাফ নীচে যান, আরও দেখ্‌বেন। দেখুন! কোন্ জমাদার বাবুর জন্য কাকে কি বলেছেন।"

ঋতুরাজ বাবু ডাক্তার বাবুর নির্দ্দিষ্ট মত পাঠ করিয়া—"তাইত! এ যে আর বাদ দেয় নাই।"

ভোলানাথ—"কোন্ জমাদার বাবু?"

ঋতু—"আর কে? ঐ সেই তবিলদার বাবুর পুত্র অলঙ্কার।"

দারোগা বাবু ও কোর্ট বাবুকে ভোলানাথ বাবু বলিলেন, "আপনারা এখন যান্। রিপোর্ট আসবামাত্র আমি ওর আণ্ডা বাচ্ছা মেয়ে ছেলে পর্য্যন্ত ওয়ারেন্ট দিব। ধরবে, আর হাজতে পুরবে।"

দারোগা বাবু আর কোর্ট বাবু চলিয়া গেলেন, ভোলানাথ বাবু বলিলেন, "দেখুন! আমি ওটাকে কিছুতেই ছাড়বো না। আমি ভোলানাথ—আমার মদ খায়, তাও চুরি করে! তার উপরে আমি ওকেই বিশ্বাস করে ওর হাতে রেখে দিয়েছিলাম। বেটা এমনি পাজি যে, আমারই মাথায় হাত বুলুলে! ওকে এবারে ঘানিগাছের গোরু করবো, তবে ছাড়বো। তোমার মনে নাই? তোমারই জন্যেই ত কথাটা ধরা পড়ে, তুমিই ত একটু ঠাণ্ডা হতে গিয়েছিলে? তুমিই ত একটু খেতে চেয়েছিলে? মনে নাই কি? তিন বোতল হুইস্কির মধ্যে এক ফোঁটা পাওয়া গেল না! দেখত দাদা? সে কষ্ট কি আর প্রাণে সয়? তিনটি বোতল, পুরা, তিন্ বোতল থাক্‌তে, সে সময় একটি চক্ষে পলে না। সে দুঃখ আমার কখনই অন্তর হতে দূর হবে না। অন্তঃজলের খাদে পা ডুবন পর্য্যন্ত আমার মন হতে ও কথাটা যাবে না। ওর চাকুরীর দফা, জমাদারীর দফা একেবারে সারা কর্বো। শরীরের দফা মদ খাওয়ার দফাটা ঘানি গাছে জুড়ে হাড় গুড়র সঙ্গে হয়ত ইতিই হবে। তোমার জন্যেই আমার এত।"

ঋতুরাজ—"আমার জন্যেই যদি এত, তবে আমার অনুরোধেই মাপ করা হক্। এবার ওকে ছেড়ে দিন্। বুড়োর কান্নায় আমার চক্ষে জল পড়েছিল। বুড়ো মানুষ পা ধরে পায়ে মাথা দিয়ে পড়ে থাকলো। কি করি—বাধ্য হয়ে স্বীকার করেছি, যে এবারে যাতে রক্ষা

হয়, তা করবো। তা এবারে আমার খাতিরে ওকে মাফ কর্ত্তে হবে।"

ভোলা—"তোমার জন্যই এত, তুমিই যদি তার পক্ষে ওকালতী আরম্ভ কল্লে, তার আর আমার আপত্তি কি?"

বক্কেশ্বর বাবু বলিলেন, "শাস্তিদান অপেক্ষা মাপ করাটাই প্রশংসার কথা। গোলযোগ মিট্‌মাট্ হওয়াই ভাল কথা। অহে! এক মিট্‌মাটে আর এক মিট্‌মাট করার কথা মনে পলো। লাল আলু মকদ্দমা তুলে নিয়েছে। দরখাস্তে বলেছে যে, আমার এইক্ষণে স্ত্রী প্রয়োজন নাই। বয়স দোষে ইন্দ্রিয় আদি শিথিল হয়েছে, আর স্ত্রীর আবশ্যক নাই।"

ঋতু—"বাবা! দরখাস্ত দাখিল সময় ইন্দ্রিয় আদি সটান ছিল, ছয় মাস না যেতে যেতে শিথিল হলো? দশ বার হাজারের কমে আর শিথিল হয় নাই।"

বক্কেশ্বর..."তাও শুনেছি...ওদের উকিল বাবুর মুখেই শুনেছি। বেশী হাতিয়ে নিয়েছে। মন ফিরিয়েছে নাকি এক ভিখারিণী। ভিখারিণী ত নহে, তপস্বিনী। সেই কি কৌশল কি মন্ত্রে-তন্ত্রে মন ফিরিয়েছে। টাকা দিয়েছেন মনিবিবি, নিজ তবিল হতে আট হাজার। আট হাজারেই পঞ্চাশ হাজার বাঁচিয়ে দিয়েছে।"

ঋতু..."যাক...ওসকল প্রেমের খেলায় আমাদের কাজ নাই। দেখুন। এখানে আমরাই সকলে আছি...আজ যে গোলটা হয়ে গেল, থেকে থেকে আমার মনে ঐ কথাই উঠছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমোদ হতো দিব্বি গান শুনতেম। যারা এই কাজ করেছে, তাদের সন্ধান নিয়ে বিশেষ শাস্তি না দিলে, বক্কেশ্বর দাদা যে বলেছেন, এখানে ট্যাকা দায় হবে, তা ঠিক। আমি মুখে অন্য অন্য কথায় সায় দিচ্ছি কিন্তু অন্তরে ঐ কথা! ঐ গোলযোগের কথা আমার রয়ে রয়ে জেগে জ্বলে উঠছে।"

ভোলা..."ঠিক না জেনে সন্ধান না নিয়ে কাকে কি বলি। অন্ধকারে কাণ্ড। আমরাই যেন অন্যভাবে ছিলাম। যাঁরা ভালভাবে ছিলেন তাঁরাও ত কাউকে চিন্তে পারেন নাই...ধরতে পারেন নাই। তবে ভেড়াকান্তর কথা, যা শুনা যাচ্ছে, সত্য মিথ্যা যাই হক, নিশ্চয় কথা, সে এর পরামর্শ মধ্যে আছেই আছে। কিন্তু সে ত আর নিজে আসে নাই, কি নিজে কিছুতেও নাই। এখন কি করি—কাকে ধরি।"

ঋতু..."দেখুন! ওদের জোটপাট বড় ভয়ানক! ধর্ম্মে কিছু থাক বা না থাক, জোটপাটের বড়ই চোটপাট! কৌশল কল না খাটালে হবে না। এই মসজিদটা এখান হতে ভেঙ্গে দেওয়া যায় না কি? তা হলে সকল গোল চুকে যায়। মাথাই যদি না থাকে তবে আর মাথা-ব্যথা কি?"

ভোলা—"কি করে ভেঙ্গে দেওয়া যায়? ভাঙ্গাচুর ঘর ত নয় যে এক কাঠি দেশলাই হাতে কল্লেই কর্ম্ম সাবাড় করা যায়! তা ত নয় ভায়া। এ যে পাকা ইট?"

ঋতু—"তার যোগাড় আছে। জরাজীর্ণ তাতে আর ত কথা নাই? মিউনিসিপ্যালিটির সহায়তা নিতে হবে। তাকেই মুরব্বী পাকড়াতে হবে। আর আমাকে খাটতে হবে। কোন সময় পড়ে কার সর্ব্বনাশ করে কত প্রাণী মারা যেতে পারে। হয় মেরামত হক, না

হয় ভেঙ্গে দেওয়া হক। নীচে উপর ঠিকঠাক করে রিপটা-রিপটি কল্লে অবশ্যই কিছু না কিছু কর্ত্তেই পারব। মেরামত হবে না। তার কারণ বলি। চারদিক দেখতে পাচ্ছি। মসজিদের জন্য সম্পত্তি রয়েছে, টাকা রয়েছে করনেআলা লোক মজুদ আছে। তাতেও যখন হচ্ছে না, সে সকল মসজিদ যখন ভেঙ্গে চুরমার হচ্ছে, তখন এ মসজিদকে মেরামত করবে? জমিদারগুলিও এমনি বেআক্কেল, ধর্ম্মের জন্য দান করে না। কেবল নাম কিনবার দান। কেমন মজার দান। টাকা অভাবে কত মুসলমান বালক গোরুর দলে মিশছে, টাকা অভাবে কত ভদ্র বংশের ছেলে কত প্রকার নীচ ব্যবসা অবলম্বন করেছে। কত পরিবার হা অন্ন, হা অন্ন করে, ঘরে পড়ে মরছে। লজ্জার খাতিরে মুখ ফুটে বলতেও পারে না, কারও কাছে কিছু চাইতে পারে না। কত দুধের ছেলে এক ফোঁটা দুধের জন্য—এক মুটো ভাতের জন্য ছট্‌ফট্‌ করছে, সে দিকে লক্ষ্য নাই। আপন ধর্ম্ম কর্ম্মের দিকে দৃষ্টি নাই। কেবল নাম ফুটাবার জন্য দান। জাতীয় উপকার, ধর্ম্মের সাহায্য এর জন্য মার কাট্‌ প্রাণ ফাট্‌ ফাট্‌! এমন বোকা চণ্ডীর দল হরিসভার জন্য মুক্তহস্ত, কালীপূজার জন্য উকিল বাবু ধরলেন, অকাতরে পঞ্চাশ বাহির। আমি সরস্বতী পূজার জন্য ধল্লেম, কথাটি নাই, মনে মনে যা আঁচ, তার উপরেও পাঁচ। ব্রহ্মমন্দির জন্য চন্দ্রবাবু ধল্লেন, ঝাঁ-করে পাঁচ শত ঝাড়লেন। আমলাপাড়ার খড়ো মসিদের (মসজিদের) জন্য দশটি টাকা পেলো না। কেউ দিল না। মোলুদ শরিফের জন্য দশ টাকা বেরুল না, কিন্তু ধোপা-পাড়ার গোপীনাথের মন্দির পাকা হয়ে গেল। সেই জাত্‌ আবার এই মসিদ মেরামত কর্ব্বে? কখনই নয়। মেরামত করবে না নিশ্চয়। কাজেই ভয়, কাজেই পড়ে যাওয়ার সম্ভব। তা হলেই ত আমাদের কার্য্যসিদ্ধি।

খান্‌সামা আসিয়া বলিল, "বাবু খাবার তৈয়ারী হয়েছে।"

"তা হলেই ত। আচ্ছা চলুন—এইখানেই হক। উপস্থিত ক্ষেত্রে যা জোটে মন্দ কি? চলুন। এখানেই চারটে আহার হক।"

ভোলা—"আমিও বলছি আচ্ছা, যে কথাটা তুলেছ সেও আচ্ছা বলেও ভেবে-চিন্তে দেখি।"

সকলেই আহার করিতে গাত্রোত্থান।

ষোড়শ নথি

এই কি ধর্ম্মাসন? এই কি রাজাধিকরণ? এই কি বিচারালয়?—ধর্ম্মের অবতার বিচারকের বসিবার স্থান? এই কি রাজদরবার? হাঁ! এই অরাজকপুরের বিচারগৃহ। বিচারাসনে বিচারকর্ত্তা হাকিম বাহাদুর—যথাস্থানে পেস্কার সম্মুখে নথিপত্র কাগজ। কিঞ্চিৎ নিম্নে অল্প-পরিসর দীর্ঘাকার টেবিলের পার্শ্বে উকিল মোক্তারগণের বসিবার আসন।

তৎপশ্চাতে দর্শক শ্রেণীর বসিবার বেঞ্চ। আজ কাচারিতে এত ভিড় যে গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষী না হইয়া এক পদও অগ্রসর হওয়ার সাধ্য নাই। পশ্চাৎপদ হইবার ত ক্ষমতাই নাই। দর্শক শ্রেণীর বসিবার স্থান পূর্ণ হইয়া চতুর্গুণ লোক দণ্ডায়মান। দ্বারে সেপাহী-পাহারা, বাদী, বিবাদী, উকিল মোক্তার ভিন্ন কাহারও মুখে কোন কথা নাই। সময় সময় হাকিম বাহাদুরের মুখে দুই একটি কথা, চুরুটের ধূম সংযুক্ত চাপা চাপা কথা। বিচারকার্য্যও চলিতেছে,—তামাক খাওয়ার কাজটা চুরূটেই উঠিতেছে। সময় সময় ধূমপুঞ্জে হাকিম বাহাদুরের কালাচাঁদ বদন ঢাকিয়া পড়িতেছে। ফরিয়াদী সাক্ষীর একই কাঠ্‌রা, আসামীর পৃথক। আসামীর কাঠরার দ্বারে সান্ত্রীর পাহারা। পাঠক! বিচারালয়ে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সমানাধিকার। কত পরিচিত অপরিচিত লোকের সমাগম—চিনিতে পারেন কি? বিচার আসনে যিনি বসিয়াছেন, মিটিমিটিভাবে চাহিতেছেন, সমগ্র মুখে সয়তানীর ডাবল খেলা খেলিতেছে—চিনিতে পারিয়াছেন কি? এ দুশমন চেহারার কটা চক্ষের কট্‌মটে চাউনি দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছেন কি?

আমোদের আড্ডায়, গল্পের চক্রে, কুঞ্জ-নিকেতনের দ্বিতল বৈঠকখানায় ঋতুরাজ বাবুর নাচের মজলিসে দেখিয়াছেন,—বিচার আসনে কখনও দেখেন নাই। তাহাতেই একটু আড়ম্বর—দুই চার কথা—নাম হাকিম বাহাদুর। আর ঐ আসামীর কাঠরায় দিব্বি চেরা সিঁথি, পরিধেয় সূক্ষ্মপেড়ে ধুতি, রঙ্গিন শার্ট রেশমী উড়নী গায়। গোপ স্থানে একজোড়া উপর চাঁড়া দেওয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গোপ। দাড়ি কামান, এমনই ভাবে কামান, যেন কখনও উঠে নাই—দিব্বি চেহারা, সাদা ফটফটে। ভ্রূ দুটি জোড়া অথচ নীলাভ। চক্ষু গোলও নহে, একেবারে আকর্ণ বিস্তারিত নহে বিস্তার—মানানসই। নাম দাগাদারী।

দাগাদারী পক্ষে ধিন্‌তাধিনা, ধামাধরা বাবু, আরও দুই তিনজন মোক্তার এবং উকিল উপস্থিত। বিপক্ষে তুড়কপাছাড় বাবুই সর্ব্বপ্রধান, সঙ্গে সঙ্গে আর সাত আটজন মোক্তার উপস্থিত। ধিন্‌তাধিনা বাবু একখানা দরখাস্ত হাতে করিয়া পেস্কার বাবুর পার্শ্বে রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

"ধর্ম্মাবতার! আমার মক্কেল দাগাদারী তাঁর জ্ঞান বিশ্বাস মতে জানিয়াছেন যে, এই আদালতে তাঁহার সুবিচার পক্ষে নানা প্রকার সন্দেহ। তিনি আরও বিশ্বাস করেন যে, উপস্থিত মোকদ্দমায় তিনি নির্দ্দোষ সত্ত্বেও তাহাকে বিচার বিভ্রাটে পড়িয়া দোষী সাব্যস্ত হইতে হইবে।

"আইনের বিধান হইতে মুক্তি পাইবার আশা মাত্র নাই। তাহাতে এই দরখাস্ত দ্বারা এক মাসের সময় প্রার্থনা করেন যে, উপযুক্ত আদালতে এই বিষয় জানাইয়া মোকদ্দমা অন্য কোন বিচারালয়ে উঠাইয়া লইয়া বিচারবিভ্রাট মহা বিপদ ও মহা আশঙ্কাজনক অস্ত্র হইতে রক্ষা পাইয়া সুবিচারে মুক্তিলাভ করেন। হুজুর! আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া প্রার্থীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া অদ্য হইতে ৩০ দিনের সময় দিতে আজ্ঞা হয়।"

বিচারক বাহাদুর কানে কথা কয়েকটি যেন সুতীক্ষ্ণ সূচিকাবৎ বিদ্ধ হইল। রোষে মাথা

গরম হইয়া উঠিল। হস্ত কাঁপিতে লাগিল। কি বলিবেন, কি করিবেন—মাথার গরমিতে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল বিকৃত উচ্চারণে বলিলেন, "দেখি, দরখাস্ত দেখি?"

পেস্কার বাবুর মুখ শুষ্ক! মোক্তার দল—কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ কেহ বসিয়া, কেহ দণ্ডায়মান। বিচারক দরখাস্ত হাতে করিয়া মনে মনে পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু দরখাস্তের লিখিত বিবরণ তাঁহার মাথায় প্রবেশ করিল না। পরিষ্কার লেখা, কিন্তু চক্ষে যেন সমুদায় কালি মাখান, কালি পড়া, কালিতে জড়ান দেখিতে লাগিলেন। দশ মিনিট কাল স্থির-নেত্রে দাগাদারীর আপাদমস্তক প্রতি দৃষ্টি করিয়া একটু সাম্‌লিয়া, দরখাস্তখানা দূরে ফেলিয়া দিলেন, এবং ঘন ঘন মোক্তার বাবুর প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

সাক্ষী জবানবন্দীর কুড়ি পঁচিশখানা কাগজ জোরে টানিয়া লইয়া দোত হইতে বার বার কলমে কালি উঠাইতে লাগিলেন। কি লিখিবেন, কি জিজ্ঞাসা করিবেন, মুখে কলমে সে সময় কিছুই সরিল না। এজলাসস্থ যাবতীয় লোক যেন স্পন্দনহীন কাঠের পুতুল। বিচারকের মুখের উপরেই স্থির-নেত্রে সকলের দৃষ্টি। বিচারপতি একবার মোক্তার বাবুর প্রতি চক্ষু ঘুরাইতেছেন, আবার তখনি বঙ্কিম নয়নে দাগাদারীর আপাদমস্তক প্রতি রোষকষায় লোচনে চাহিতেছেন, এইরূপ চক্ষু চালনার পর মুখে বলিলেন ঃ

"বিচার-বিভ্রাট! সুবিচারের আশা অতি অল্প!"

পুনরায় দোত হইতে কলমে কালি লইয়া বলিলেন ঃ

"দরখাস্ত অগ্রাহ্য। এখনি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিব। এখনি সাক্ষী জবানবন্দী করিব, ডাক সাক্ষী।"

চেয়ার সরাইয়া নিম্নস্থ চৌকিতে বার বার সজোরে পদাঘাত করিয়া সম্মুখস্থ দণ্ডবিধি খণ্ড অকারণ বাম হস্তে উঠাইয়া টেবিলের উপর আঘাত করিলেন। ধিন্‌তাধিনা বাবুর ইঙ্গিতে ধামাধরা বাবু দরখাস্ত খণ্ড মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া ধিন্‌তাধিনা বাবুর হাতে দিলেন। ধিন্‌তাধিনা পুনরায় বিনীতভাবে মিষ্ট মিষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন ঃ

"ধর্ম্মাবতার! আইনকর্ত্তাগণ আসামীকে অনেক স্বাধীনতা দিয়াছেন। বিধানে যদি থাকে তবে সে স্বাধীনতাটুকু লাভ করিতে তাহাকে বঞ্চিত করা, সুবিজ্ঞ বিচারকের সুবিচার বলা যায় না। আসামীর মনের সন্দেহ মিটাইয়া হুজুরের যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা। এরূপ অবস্থায় যদি আইনে সময় দিতে বলিয়া থাকে, তবে আমার মক্কেল কেন সে প্রার্থনা হইতে বঞ্চিত হইবে, আমি তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

বিচারক মেঘ-গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "কোথায় কোন্ আইনে আছে দেখাও দেখি?"

আইন নজীর ধারা পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। মোক্তারবাবু আইনের পাতা ধরিয়া পেস্কার বাবুর হস্তে দিলেন। পেস্কারবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে বিচারকের সম্মুখে ধরিয়া দিতেই বিচারপতি সজোরে আইনখানা টানিয়া লইতে উপরের পাতার অর্দ্ধ পরিমাণ ছিঁড়িয়া গেল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ছেঁড়া পাতার আদি-অন্ত মনে মনে পাঠ করিয়া আইন

খণ্ড পেস্কার বাবুর দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সাক্ষীর নাম ধরিয়া আরদালীকে সাক্ষী হাজিরের আদেশ করিলেন। আরদালী বিচারগৃহের বারান্দায় গিয়া আদালতী সুরে উচ্চৈঃস্বরে তিন বার নাম ধরিয়া ফুকরাইল, সাক্ষী উপস্থিত নাই, বিচারক আরও চটিলেন। তখন ক্রোধ নাকে মুখে বাহির হইতে লাগিল।

বাদীর পক্ষের মোক্তার বাবু জোড়হাতে বলিতে লাগিলেন, "ধর্ম্মাবতার! পাঁচ মিনিট মধ্যে সাক্ষী হাজির করিতেছি। মোকদ্দমা স্থগিত থাকিবে বুঝিয়া সাক্ষীরা বাসায় গিয়াছে।"

মনিবিবির আম্‌লা তদ্‌বিরকারক, এক বলিতে দশজন সাক্ষী আনিতে ছুটিল। এই অবসরে ধিন্‌তাধিনা বাবু আবার বলিতে লাগিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আমার আর একটা প্রার্থনা। আমার মক্কেলের প্রার্থনা যদি হুজুরের বিচারে অগ্রাহ্য হয়, তবে দরখাস্তের পৃষ্ঠে অগ্রাহ্য হুকুম লেখা হউক।"

হাকিম বলিলেন, "তোমার হুকুমে হুকুম লিখতে হবে নাকি?"

ধিনতাধিনা বাবু আর কোন কথা বলিলেন না। এজলাস হইতে উঠিয়া লাইব্রেরী ঘরে আসিলেন। বিচারক একটু চিন্তা করিয়া হুকুম দিলেন যে, "মোকদ্দমা ১৫ দিনের জন্য মুলতুবী থাকে। আসামী হাজত।"

কাচারীসমেত লোক অবাক। একি কাণ্ড। দাগাদারীর মুখ শুকাইয়া কালি হইল। গায়ের রেশমী চাদর সরিয়া পদতলে গড়িয়া পড়িল। মনিবিবির পক্ষের লোক তখনি অশ্বারোহণে মনিবিবিকে সংবাদ দিতে ছুটিল। দাগাদারী দুই এক কথা নিজে বলিবার ইচ্ছা করিয়া জোড়হাতে "হুজুর!" শব্দ মুখে উচ্চারণ করিতেই বিচারপতি ঠাটা গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া "চুপ রাও। লে যাও, আভি লে যাও।"

বলিতে বলিতেই দুই সিপাই তড়াক করিয়া কাঠরার দোর খুলিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করিল, এবং "চলো" "চলো" শব্দ কর্কশ স্বরে বলিতে বলিতে কোটবাবুর কামরায় লইয়া পুরিল। এজলাস প্রায় লোকশূন্য হইল। বিচারপতি দিয়া বাতি টানিয়া চুরুট ধরাইলেন এবং অন্য অন্য কাগজে বহিতে দস্তখত করিতে লাগিলেন।

কোটবাবুর কামরায় বেশী ভিড় হওয়ায় কোটবাবু বাজেলোক বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সোনাবিবি আহার করিতে বসিয়াছিলেন, বে-আক্কেল সাহেব হাঁপাইতে হাঁপাইতে দাগাদারী ভাই সাহেবের হাজতের হুকুমের কথা কাঁদো কাঁদো মুখে প্রকাশ করিলেন। সোনাবিবির মুখে আর অন্ন উঠিল না। হাত উঠাইয়া কথাটা ভাল মতে শুনিয়া "হায়! কি হল" বলিয়া এক প্রকার অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। সকলে ধরাধরি করিয়া তুলিল। মাথা মুখে জল দিয়া ঠাণ্ডা করিতে লাগিল। আমলা উকিল মোক্তার ক্রমে আসিয়া বাড়ী পুরিয়া গেল।

সোনাবিবি একটু স্থির হইয়া বলিলেন, "হায়! একি হল? আজ হঠাৎ একি শুনলাম! কখনই ভাবি নাই, দাগাদারী এইরূপে হাজতে থাকে। আহা! সে আজ খেয়ে যায় নাই।

বলে গিয়েছিল যে, কাচারি হতে এসে খাবে! খুব খেল! আমার কপাল মন্দ, তা না হলে এমন কাজ হবে কেন! বিনামেঘে বজ্রাঘাত!! এখন উপায় কি?"

(বেআক্কেলকে ডাকিয়া) "বাবা বেআক্কেল! এখন উপায় কি? এখন তাকে হাজত হতে খালাস করবার উপায় কি?"

বেআক্কেল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "হুজুর! আপনি ভাববেন না।"

সোনা—"মুখে বলে ফেল্লে, ভাববেন না। না ভেবে পারা যায়? হায়! হায়! তাকে হাতে পেয়ে, তারা কিনা কর্ত্তে পারে? হাজতের আসামী, তাকে কি না করতে পারে। না ভাববার কথা কি? এতক্ষণ কি হাজত ঘরে নিয়ে গেছে, না কোর্টের ঘরেই আটক আছে?"

বেআক্কেল—"হুজুর! তাঁরা সকলেই, আমাদের পক্ষের বাবুরা প্রায় সকলি বাহির বাড়ীতে এসেছেন, তাঁদের ডেকে জিজ্ঞাসা কল্লেই বুঝতে পারবেন।"

সোনাবিবির আদেশে মোক্তার, পরামর্শদাতা, হিতাকাঙ্ক্ষী, মন্ত্রদাতা বাবুগণ অন্তঃপুর মধ্যে আসিয়া সকলেই আসনে উপবেশন করিলেন। দাগাদারীর জন্য আক্ষেপ দুঃখ কিছুই বাকী থাকিল না। বিচারপতি বে-আইনী করিয়া হাজতে দিয়াছেন, কোন আইন মানিলেন না, নজীর দেখিলেন না, কাহারও কথা শুনিলেন না। বিচারপতি হইয়া এরূপ অন্যায় বিচার করিবেন, তাহা কেহই ভাবেন নাই। কেহ মনেও করেন নাই। এইরূপ নানা কথা একথা সেকথা, মধ্যে মধ্যে বাজে কথা কহিয়া সর্ব্বশেষে এই উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষার উপায় কি, তাহারই অবতারণা হইল। অনেক তর্কবিতর্ক, অনেক বাদানুবাদ পর সাব্যস্ত হইল যে, জেলার আপীল, মহামান্য রাজধানীতেও আন্দোলন। তাহাই সাব্যস্ত হইল। টাকারই শ্রাদ্ধ, টাকারই কথা।

আজ রাত্রেই দুই দিকে লোক ছুটিবে। এখন টাকার যোগাড় কোথায় হয়? ধনকুবের ধনভাণ্ডার খুলিয়া আছেন। দুলক্ষ পর্য্যন্ত দিবেন। সে কথাও বাবুরা বলিয়া ক্রমে ক্রমে বিদায় হইতে আরম্ভ করিলেন। কথা ঠিক হইল—আজ রাত্রেই মোক্তার বাবুদিগের মধ্যে কেহ একদিকে, কেহ অন্যদিকে ছুটিবেন। কাগজ-পত্র যাহা যেখানে দরকার হইবে এই সময় মধ্যে তাহারই যোগাড় করিতে হইবে। সেও টাকা! বিশেষ টাকা। হাকিম যখন সম্পূর্ণ চটা, তখন গোপন ভিন্ন প্রকাশ্য কোন কাগজ পাইবার আশা সময় মত নাই। বিলম্বে পাইলে এদিকে প্রাণ যায়। কাজেই যেখানে যাহা লাগে তাহাই দিয়া কাজ উদ্ধার করিতে হইবে। বাবুগণ এই পরামর্শ দিয়া সকলেই বিদায় হইলেন।

ধনকুবের পর্য্যন্ত এই সংবাদ পাঠান হইল। টাকায় টাকা যত আবশ্যক নিয়া যাও আর কোন কথা নাই। ধনকুবের যথার্থই ধনকুবের। বিষয়-সম্পত্তিও বিস্তর—ধার্ম্মিক, আয় অতি কম হইলেও দশ বার লাখ। নগদ টাকা কত মজুদ, তা গণনা করিয়া কেহ বলিতে পারে না। কেহ বলে, চার শত সিন্দুক ভরা টাকা; কেহ বলে, একটি বড় হল মেজে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত টাকার তোড়ায় ঠাসা বোঝাই করা। কত জনে কত পথে দুহাতে লুটিতেছে।

সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। এক যাইতেছে, আর আসিতেছে। বিস্তর আয়। দশ পথে পঞ্চাশ প্রকারে গেলেও মার নাই। কিন্তু চক্ষের উপর হইতে একটি পয়সা অপব্যয় যেন এক ফোঁটা গায়ের রক্ত। চুরি করিয়া দশ হাজার দাবিয়া বসো, ঠিকে ভুল করিয়া পঞ্চাশ হাজার গাপ কর, কথাটি নাই। তহবিল ভাঙ্গিয়া যাহা ইচ্ছা বাড়ী পাঠাও, খোঁজ-খবর হইলে বড় জোর এই কথা একখানি দলিল তমসুক অথবা কিস্তিবন্দী লিখিয়া দেও। চাকর মাত্রেই মাহিয়ানা এত লইয়াছে যে, দুই পুরুষ না খাটিলে মাহিয়ানার হারে কখনই পরিশোধ হইবে না। হইল নায়েব মহাশয়ের হাত হইতে দুই ছালা জলেই পড়িয়া গেল। বর্ষাকাল, এ-নৌকা হইতে ও-নৌকায় টাকার থলে তোলা হইতেছে, দৈবাৎ হাত হইতে দশ বার ছালা জলে পড়িয়া গেল। বর্দ্ধমান হইতে আগ্রা যাইতেছেন, পথে নায়েব মহাশয়ের ব্যাগ হইতে তিরিশ টাকার নোট চুরি হইল। কথাটি নাই। কাশীর গুণ্ডা কি পকেট মারার পকেট কাটিয়া পনের হাজার টাকার নোট লইয়া গেল। কিছু বলা নাই। চোরে ডাকাতে লইবে, কি করা যায়?

ধনকুবের একবার শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছিলেন, ষ্টিমার উপর মনিহারী ঘাট পার হইতে তিন চারটা বাক্স চুরি গেল। সঙ্গের লোকজন সে কথা প্রকাশ করিল। চুপ চুপ বিদেশ! থানাওয়ালা শুনিবে। দেখ কোন্ কোন্ বাক্স চুরি গেল! সঙ্গের লোক রিপোর্ট দিল, জহরাতের বাক্স চুরি গিয়াছে। মুখে কথাটি নাই! চুপ চুপ! পুলিস শুনিলে আবার ওর পাছে আর দশ হাজার যাইবে। ধনকুবেরের টাকার এইরূপ সদ্ব্যয়। কিন্তু কিছুতেই মার নাই। ব্যয় অপেক্ষা বার্ষিক আয় পঞ্চাশ গুণ অধিক। এ অবস্থায় সোনাবিবি টাকা পাইবেন, তাহার আর কি? ইহার মূলে সম্পূর্ণ স্বার্থ আছে। টাকার অভাব রইল না। যেখানে যেখানে আমলা মোক্তার উকিল পাঠান দরকার, সমুদায় পাঠান হইল।

জেলের প্যায়দা বরকন্দাজ সহিত বন্দোবস্ত হইল। দাগাদারীকে কেবল পরাধীনভাবে থাকা ভিন্ন আর কোন বিষয়ে কষ্টভোগ করিতে হইবে না। সোনাবিবি অকাতরে টাকা ব্যয় করিতেছেন। দিন দিন মোকদ্দমার সংখ্যা বেশী হইতেছে। হক-নাহক সামান্য কথায় দরখাস্ত পড়িতেছে। মনিবিবির পক্ষেও তাহার উত্তর যাইতেছে। আশ্চর্য্যের মধ্যে ভেড়াকান্ত আর দাগাদারী ছাড়া, সোনাবিবির পক্ষের আর কোন আমলা কি লোক কেহ আসামী হইতেছে না। অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চলের লোক কেহই কোন পক্ষ হইতে আসামী হইতেছে না। যত মরণ বিদেশী লোকের।

জেলাতেও মোকদ্দমা উপস্থিত। নাবালকের সম্পত্তি ও তাহার শরীর রক্ষণাবেক্ষণ করার ভার হইতে সোনাবিবি যাহাতে উচ্ছেদ হন, সে সকল মোকদ্দমাও মনিবিবি কর্ত্তৃক উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিকে মোকদ্দমা। উকিল মোক্তারের আনন্দের সীমা নাই। তদবিরকারকদলেরও খুসীর অন্ত নাই। লাঠিয়াল সর্দ্দারগণের ত কথাই নাই। প্রাতে এক ছালার মুখ খোলা হয়, সন্ধ্যা না হইতে হইতেই কাবার। যতক্ষণ শেষ না হয়, ততক্ষণ গা হাত পার মধ্যে জ্বালা করিতে থাকে। যেই এক তোড়া শেষ হইল, সেদিনকার মত

জ্বালা-যন্ত্রণা কামড়ানীও শেষ হইল। দাগাদারী হাজতে, প্রধান কার্য্যকারক তেনাচেরা আর বেআক্কেল।

পাঠক! হাকিম সাহেবকে এজলাসে দস্তখতের কার্য্যে রাখিয়া আসিয়াছি। দস্তখত শেষ হইল। পেস্কার বাবু মৃদু মৃদু স্বরে এত্তেলা দিলেন যে, "ধিন্‌তাধিনা মোক্তারবাবুর দরখাস্তের পৃষ্ঠে একটা হুকুম না লেখা একটু দোষের মধ্যে গণ্য হয়। ওরা উপর পর্য্যন্ত নিশ্চয় যাইবে। উপর হইতে নথি তলব হইলে উপরের হাকিম নথিতে কোনরূপ বে-আইনী বেজাবেতা দেখিলে সেটা দোষের মধ্যে আনিতে পারেন। দুই এক কথা জিজ্ঞাসাও কর্ত্তে পারেন। এ নথিটা দুরস্ত রাখা চাই। হুজুর! আরও কথা, যখন দরখাস্তখানা আমার হাতে দেয়, আমি নম্বর দিয়া জমা করিয়াছি, ছেনি দিয়া কোর্ট ফি কাটিয়াছি, অথচ কোন হুকুম লেখা হয় নাই। ওদের হাতে ঐ দরখাস্ত উপরে দাখিল হইলে নিতান্তই সন্দেহের কথা। জমা করা, নম্বর দেওয়া, কোর্ট ফি ছেনি দ্বারা কাটা, এ দরখাস্ত ফেরত না দিলে কি প্রকারে ইহাদের হাতে আসিল?"

পেস্কারের কথায় হাকিম বাহাদুর একটু নরম হইলেন। এবং সুবদন হইতে চুরুট সরাইয়া চুপি চুপি বলিলেন, "সে দরখাস্তখানা কৈ?" এই বলিয়া যে দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই দিকে ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

"সে দরখাস্ত কি আর সেখানে আছে? তখনি ধামাধরা বাবু কুড়াইয়া লইয়া ধিন্‌তাধিনা বাবুর হাতে দিয়াছেন।"

"তবে হুকুম লিখব কিসে?"

পে—"তাইত কিসে লেখবেন। সেও ত কথা বটে।"

হাকিম—"ওর জন্যে কি হবে? কোনও চিন্তা নাই। তুমি কোন সময়ে ওদের কাছে চেয়ে দেখ, কি বলে? দুষ্ট মতলব না থাকলে, চাইলেই দেবে। অন্য মতলব থাকলে দেবে না। না দিক, তাতেই বা কি? দেয় ভাল, না দেয় তাতেও ভাল। অর্ডার সিটে হুকুম হাকাম যেন ঠিকঠাক থাকে। তুমি সেইটে দেখো। আর একটি কথা তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, কোন কাগজের নকল আমাকে জিজ্ঞাসা না করে কিছুতেই দেবে না। খুব সাবধান। এই কথাটা যেন কখন কোন সময়ে ভুল না হয়, সর্ব্বদা মনে রেখো। আর সেই দারগামারা রিপোর্টে সে সময় হুকুম লিখি নাই। অনেক ভেবেচিন্তে দেখলেম, আসামী শাস্তি না পেলে সংগ্রহকারী,—লাঠিয়াল সংগ্রহকারীদিগকে অপরাধের মধ্যে আনা যায় না। প্রথমে ঐ মোকদ্দমার বিচার শেষ করে, শেষে এখন দারগার লিখিত আসামিগণের নামে ওয়ারেন্টের হুকুম লেখ।

"আর একটি কথা তোমাকে বল্‌ছি, গোপনে সাবলোট সাহেবকে সংবাদ দেও। আমার পক্ষ হতে খবর পাঠাও। এই সময় জয়ঢাককে তার মায়েব নিকটে এনে আপোস নিষ্পত্তির চেষ্টা করুন। দাগাদারী হাজতে, কুপরামর্শ দিবার লোক বোধ হয় আর কেহ নাই। এ সময়ে তাঁরা এলে সোনাবিবি আবার যমদ্বারে গেলেও যেতে পারেন। ভেড়াকান্তের কথা

লোকে যাই বলুক, আমি খুব গুপ্ত অনুসন্ধানে জেনেছি, সোনাবিবির উপর তার কোন ক্ষমতা নাই। রঙ্গরস হাসি-খুসী যাদের সঙ্গে বেশী, ক্ষমতাও তাদের বেশী। যদি তারা এখন চেষ্টা করেন, বোধ হয় বিবাদ মিট্‌তে পারে।"

"যে আজ্ঞা! আমি এখনি তার উপায় কচ্ছি। আজকে সেই তবিলদার হেড্ কনষ্টেবলটার মোকদ্দমার বিচার দিন ছিল, তার কি হবে? আজকেই বিচার করবেন না অন্য দিন ফেলবেন?"

"না, না আর অন্য দিন ফেলে কাজ নাই। তুমি তাকে গোপনে বলে দেও যে, তুই যার অলঙ্কার নিয়েচিস্, কি অলঙ্কার বন্ধক রেখে টাকা নিয়েচিস্, তাকে রাজী করে মানিয়ে সবগুলি ফেরত দে। তাহলে তুই বাঁচ্‌বি। আমি আর বেশী বাড়াবাড়ি করবো না। নথিটা কৈ? আমাকে দেও, আর তুমি ওকে এখনি জিজ্ঞাসা করে এসো, তাতে সে সম্মত হয় কিনা!"

পেস্কারবাবু নথি দিয়া বাহিরে গেলে হাকিম বাহাদুর রায় লেখা আরম্ভ করিলেন। পাঁচ মিনিট মধ্যে পেস্কার বাবু তবিলদার জমাদারকে সঙ্গে করিয়া এজলাসে উপস্থিত। তবিলদার, আসামীর টিক্‌টিকিতে খাড়া হইলেন। এক দুই তিন করিয়া দেখিতে দেখিতে এজলাস গৃহ আবার লোকে পূর্ণ হইল। সকলেই জানিত যে, এবারে তবিলদারের বাঁচাও নাই। চাকুরি ত যাইবেই অধিকন্তু ফাটক না হইয়া যায় না। গ্লাশের এয়ারের দল, বোতলের দল, পাড়ার দল, তিন দলের কম হইলেও ত্রিশজন নর-নারী মোকদ্দমার হুকুম শুনিতে আসিয়াছেন। হুকুম হওয়া মাত্র আপীলের যোগাড় করা হইবে। যার দ্বারা যত দূর সাহায্য সম্ভব, তাহা করিবে। সকলের মুখই ম্লান, বিমর্ষ ভাব, নিতান্তই দুঃখের চিহ্ন, বিষাদের লক্ষণ। বিপক্ষ দলেরও অনেকে উপস্থিত। কেমন করিয়া জেলে পুরিবে, সেই তামাসা দেখিতেই তাঁহারা দুহাতে সময়কে তাড়াইতেছেন। কয়েকদিন যখন গত হইয়াছে, আজ হুকুম না হইয়া আর যায় না।

হাকিম রায় লিখিতেছেন। জমাদার বাবু জোড়হাতে কাঠরার মধ্যে খাড়া রহিয়াছেন। মনে মনে ইষ্ট দেবতার নাম জপিতেছেন। রায় লেখা শেষ হইল, হাকিম বাহাদুর রায়টা মনে মনে আদি হইতে পাঠ আরম্ভ করিয়া শেষে অর্ডারের নিকটে আসিয়া মুখে বলিলেনঃ

"খালাস।"

দর্শকগণ অবাক। এত তাড়া এত ভয় দেখান, যে কাঁচা চিবিয়ে খাওয়ার ভাব, আজ একি ভাব? ভাবিতে ভাবিতে সকলেই কাচারির বাহির হইল, এয়ারের দল সকলে একত্র হইয়া তবিলদারকে কোলে করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। হাকিম বাহাদুর বাসায় গমন করিলেন। দাগাদারী অধিক ধুমধামে, প্রহরী বেষ্টিত হইয়া হাজত গৃহে গমন করিলেন। কারাগৃহ ও হাজত গৃহ একই গৃহ, তবে কয়েদী আর হাজতীর ভিন্ন ভেদ এই যে, হাজতীর পোষাক পরিবর্ত্তন হয় না, কয়েদীর মত হাড়-ভাঙ্গা খাটুনী খাটিতে হয় না। তবে আদর অভ্যর্থনা পরস্পর সকলেরই সমান। কান মলা, নাক মলা, কিল, নাথি, চপেটাঘাত, কথায়

কথায় হক নাহক যেমন কয়েদীর ভাগ্যে ঘটে, হাজতীর ভাগ্যেও সেইরূপই ঘটিয়া থাকে।

অরাজকপুরময় আজ এই সংবাদ। কাহারও পক্ষে সুসংবাদ কাহারও পক্ষে কুসংবাদ। কুঞ্জ-নিকেতনেও এ সংবাদ গিয়াছে। বেগম সাহেবের মনে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে। গোপনে দুই এক ফোঁটা চক্ষের জলও ঝরিয়াছে। কেন? সে বিশাল চক্ষে দাগাদারী জন্য জল পড়ে কেন? সোনাবিবির নামে আগুন, সোনাবিবিও তাঁর নামে আগুন। এ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে দাগাদারীর জন্যে বেগম ঠাকুরাণীর চক্ষে জল পড়ে কেন? সে জোড়া ভ্রূর মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র আঁখি দাগাদারীর জন্য কান্দে কেন? মনিবিবির পক্ষীয় যাবতীয় লোক দাগাদারীর পরম শত্রু, প্রাণ বিনাশের চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই। বেগম ঠাকুরাণী মনিবিবির পক্ষে, জয়ঢাকের পক্ষে, সোনাবিবির বিপক্ষে। এ অবস্থার মধ্যে দাগাদারীর জন্য বেগম ঠাকুরাণী এত অধীরা হইলেন কেন? সংবাদ পাওয়া মাত্র সংবাদ লইতে, দাগাদারীকে দুট আশ্বস্ত কথা বলিতে জনৈক বিশ্বাসী কার্য্যকারককে কোর্ট বাবুর কামরা পর্য্যন্ত পাঠাইলেন, কোন ফল হইল না। সে লোকের সহিত দাগাদারীর দেখা হইল না। সে গিয়া তাঁহাকে তথায় পাইল না। বিশ্বাসী বাবুর আগমনের পূর্ব্বেই তিনি সান্ত্রী পাহারায় শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দুই-এক কথা উপরি উপরি, এর কাছে, ওর কাছে, শুনিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

পাঠক! এখন কথাটা ভাঙ্গচুর করিব। এই উপযুক্ত সময়। কথাটা এতদিন চাপা রহিয়াছে। বেগম ঠাকুরাণীর সহিত পূর্ব্ব ভাব পূর্ব্ব কথার কথঞ্চিৎ আভাস, একাদশ নথির শেষ ভাগে দেওয়া হইয়াছে। তিনি সোনাবিবিকে বেগম ঠাকুরাণীর সহিত মিল করিতে বলেন। সোনাবিবি একেবারে নারাজ। শেষে এক প্রকার মনান্তর ভাবেরই পূর্ব্ব লক্ষণ। জমদ্বার হইতে আসা পর্য্যন্ত কুঞ্জ-নিকেতনে সুযোগ-সুবিধা মত গিয়া থাকেন। কোন দিন রাত্র দুট; তিনটা পর্য্যন্ত লেখাপড়ার চর্চ্চা, পদ্য গদ্য লেখার চর্চ্চা করিয়া থাকেন; বলিতে গেলে, বেগম ঠাকুরাণীর হাতেখড়ি দাগাদারী দিয়াছেন। তিনিই ক খ গ ঘ ঙ বহু কষ্টে প্রথম ভাগ পড়াইয়াছিলেন। তাহার পর নানা কারণে ছাড়াছাড়ির পর প্রায় বৎসর অন্তর আবার দেখা-সাক্ষাৎ। দাগাদারীর ইচ্ছা বেগম ঠাকুরাণীর সহিত সদ্‌ভাব রাখিতে পারিলে সময়ে বিশেষ উপকার দর্শিবে। ১নং উপকার—অনেক হাকিমের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় আছে, ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে তাঁহারও জন্মিবে, ফাড়া কাটিয়া যাইবে। ২নং উপকার—দুই স্থানে ভালবাসা দুই স্থানে আদর, দুই স্থানে যত্ন। জগতে দুইয়ের বড়ই আদর—একের পরেই দুই—বার্ষিক সুখপ্রিয়, লোভীজন পেটুক, ইহারা দুয়ে বড়ই সন্তুষ্ট। ৩নং উপকার—যদি এই আলাপ বজায় রাখিতে পারেন, তাহা হইলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার একটি রিজার্ভ স্থান। যে প্রকার বাতাস বহিতেছে, সকলের মুখেই এক কথা। দাগাদারী সোনাবিবিকে ছাড়িয়া গেলে, কি সোনাবিবি দাগাদারীকে দূর করিয়া দিলে, পুত্রের সহিত কোন বিবাদ-বিসম্বাদ থাকে না। বিবাদের গোড়াই দাগাদারী। কি জানি, স্ত্রীলোকের মন! কি জানি পুরুষেরই মন। যদি ছাড়াছাড়ি ঘটে, যদি হাকিমের লোক বাধ্য করিয়া ঘটায়। কি জানি, যদি অন্য অন্য জমিদারেরা মাতা-পুত্র বিবাদ নিষ্পত্তি জন্য এরূপ কল কৌশল

কিছু খাটায়, যাতে তিনিই স্ব-ইচ্ছায় তফাৎ হইতে ইচ্ছা করেন, কি তিনিই তফাৎ হইতে ইচ্ছা করেন! তখন উপায় কি? কোথায় আশ্রয়? কার আশ্রয় কে দিবে? আগেই স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া সুযোগ-সুবিধা করিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। ৪নং উপকার—বেগম ঠাকুরাণীর অনুগ্রহে, টিয়েকাটা শিকলের যে প্রকার দালান কোঠা ফল-ফুলের বাগান হইয়াছে। সময় কাহারও হাত ধরা নহে। বাক্‌সে বন্ধ করে রাখার জিনিসও নহে। যদি কপাল খোলে, সময়ের সুনজরে পড়া যায়, তবে কার কপালে কি আছে, কে বলিতে পারে? হইতে পারে ফুলের বাগান। হইতে পারে শিমলা শৈল। হইতে পারে গোলাপ বাগ!

আবার ঠাকুরাণী পক্ষে ১নং চিন্তা এই যে, এত দিন স্বাধীন রাজ্য ফ্রান্স জার্ম্মানি, এ দিকে লাহোর মূলতান মারিয়া আসিয়া অরাজকপুরের এই ক্ষুদ্র হিলে অর্থাৎ পাহাড়ে মাধবী-কুঞ্জে, অথবা কুঞ্জ-নিকেতনে, শুয়ে বসে, ঘুমিয়ে জাগায়ে—জাগিয়ে স্বপ্ন দেখে, দেখিয়ে—শয়নে জাগরণে কাল কাটাচ্ছি। সময়ে অসময়ে এমন একটি কবি, রসিক লেখক, সুবক্তা, পীরিত কুঞ্জের প্রণয়ের স্পঞ্জ সহিত ঘনিষ্ঠতা আলাপ থাকে, তবে অনেক সময় মনের সুখে, আমোদ-আহ্লাদে কাল কাটান যাইবে। ২নং চিন্তা এই যে, সোনাবিবি আমার প্রাণেয় বৈরী, জীবনকালের শত্রু, চক্ষের শূল, হৃদয়ের খেজুরের কাঁটা। কৌশল করে, খাতির করে, যত্ন করে, আলাপে, আহারে লোভ দেখিয়ে, যদি সোনাবিবির হাত ছাড়া কর্ত্তে পারি, তাহলে বিনা অর্থে বিনা সর্দ্দার লাঠিয়ালে, বিনা আইনে আদালতে সোনাবিবিকে জব্দ করবো, তার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিব, সমুদায় গায়ে বেড়া আগুনে ফোস্কা পড়াব। ৩নং উপকার—ভেড়াকান্তর সঙ্গে দাগাদারীর যতদূর মেলামেশা আছে, তা যদি ভাঙ্গিতে পারি, ভেড়াকান্তের শত্রু করে তুলতে পারি, তাহলে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না। ৪নং উপকার—সামান্য লোভ দেখিয়ে আড়াই হাজার হাত করেছি। সেগুলি আর না চায়, পরিবর্ত্তে কোন দলিল না চায়। যদি আরো কিছু হাতে কর্ত্তে পারি। যার মহাজন ধনকুবের, তার কাছে এ আশাটা নিষ্ফল হইবে বুঝি না। ৫নং উপকার—ভেড়াকান্ত জানুক, বুঝুক, যে দাগাদারী তার নয়—আমার। দাগাদারীর মত একটা লোক তার হাত ছাড়া হলে, সেই বুঝবে তার ক্ষতি কি পরিমাণ হল।

বেগম ঠাকুরাণীর ১নং বেশী। দাগাদারীর চার, বেগমের পাঁচ। এই কারণেই বেগম ঠাকুরাণী দাগাদারীর জন্য বড় দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিয়াছেন যে, তিনি মনে করিলেই দাগাদারীকে হাজত হইতে মুক্ত করিতে পারেন। তিনি মনে করিলেই সাবেক জামিনী পাঁচ শত টাকায় হাজির জামিনে রাখাইতে পারেন। কিন্তু সোনাবিবি যদি খুব তোষামোদ করে, পায় ধরিয়া না বলুন, হাত দুখানি ধরিয়া বলে, আর তার সঙ্গে নগদ দুই হাজার টাকা নিতান্ত পক্ষে দাগাদারীর খাতিরে হাজার টাকা দেন, তাহা হইলে তিনি ওর মধ্যে মাথা দেন, চেষ্টাও করেন, সুফল ফলিবারই বেশী সম্ভাবনা। বেগম ঠাকুরাণী সেই চিন্তায় কোন্ পথ, কি সন্ধান, কি কৌশল, কি কল খাটাইবেন, উপায়

আবিষ্কার জন্য বুদ্ধির ঘোড়া কত পথে কত চালে চালাইতে লাগিলেন। সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্যের সুপথ খুঁজিয়া পান না, ভাল পথ চক্ষে পড়ে না। হউক বা না হউক সম্পূর্ণ না ঘটুক, একটা স্থির হইল— সোনাবিবির সঙ্গে দেখা। আজই হউক, কালই হউক, সোনাবিবির সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত দরকার, এখন কথা, কাল কি আজ? আজই উচিত। পূর্ব্বে খবর দেওয়া কি না? খবর দেওয়া গেল, সে বলিয়া পাঠাইল, আজ নয় কাল, —কি এখন আমার মন ভাল নয়, কিছু দিন পরে। তখন ত এ ফন্দিবাজী টিকলো না। আজই যাওয়া, বিনা খবরে, বিনা জাঁকজমকে আজকেই যাওয়া দরকার। তখনি হুকুম, তখনি প্রস্তুত, তখনি গমন। অরাজকপুর সোনাবিবির বাড়ী, আর কুঞ্জ-হিলে কুঞ্জ-নিকেতন, প্রায় তিন মাইল ব্যবধান। বেহারাগণ পাল্কী ঘাড়ে করিয়া হুঁ হুঁ রবে ছুটিল।

সোনাবিবি মনের দুঃখে আছেন। কি প্রকারে দাগাদারীকে হাজত হইতে খালাস করিবেন, সেই চেষ্টা সেই কথাতেই দিন কাটাচ্ছেন। ভেড়াকান্ত আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে কথা হইতেছে। দাগাদারীর কথার পর, ভেড়াকান্ত বলিলেন "আর একটা কথা শুনেছেন কিনা বলতে পারি না। লাল আলু মোল্লা মোকদ্দমার গায়ে জল দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।"

সোনাবিবি বলিলেন, "বাবাজির এত বিপদেও হাসি তামাসা। আমি ওর কিছুই বুঝলেম না।"

ভেড়াকান্ত—"ভাবলে কি হবে? তাতে যখন কোন উপকার নাই, তখন হাসিখুসী করবো না কেন? বলছিলাম কি লাল আলু মোকদ্দমা উঠিয়ে নিয়েছে।"

"সত্যি উঠিয়ে নিয়েছে! কি বল কি বাবা! এ কথা ত আমার কাছে কেউ বলে নাই!"

"আপনার কাছে বলবে কেন? বল্লে যে অপ্রস্তুত হতে হয়, পাঁচটি দিনও সম্পূর্ণরূপে যায় নাই। এরই মধ্যে দেখুন কি হলো।"

সোনা—"ঠিক কথা! তোমার কথায় আমার খুব শিক্ষা হলো। ছি ছি! এত কথা, এত কিরে, তারপর এই কাণ্ড। আচ্ছা কত টাকা পেয়ে মোকদ্দমা তুলে নিলে?"

ভেড়াকান্ত—"কত টাকা নিয়েছে, সে কথা ঠিক বলতে পারি না। নিতেও পারে, নাও নিতে পারে। মিটমাট স্থানে আর নেওয়া লওয়া কি? যেখানে আপোসই হলো, সেখানে আর টাকার দরকার কি? তবে বেশী লোভী হলে অন্য কথা।"

সোনা—"মিটমাট কেমন? রফা নিষ্পত্তিই-বা কেমন! ওটুকু আর বাকী থাক্‌বে কেন বাবা? খুলে বলো, তোমার মুখে বেশ শুনা যায়।"

ভেড়া—"লাল আলু মোল্লা বিবির মুখখানা দেখতে পেতেম না, তা দেখতে পেলেন। যখন ইচ্ছা, তখনই কথা কইতে পারেন। জামাই মেয়ে আর কোন আপত্তি করবে না। কোন কাজ কর্ত্তে হবে না। অথচ যা চাইবেন, তাই পাবেন। যখন যা মনে করবেন তাই হবে। আর চাই কি? দরখাস্ত দিয়েছেন যে, 'আমার আর এখন স্ত্রীর প্রয়োজন নাই। সুতরাং মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলাম।' এ খেলা মন্দ নয়। যখন স্ত্রীর দরকার হবে, তখন আবার মোকদ্দমা রুজু করতে পারবে, এতে আর টাকা-কড়ির কথা থাক্‌বে কেন? তবে কিছু

যে না দিয়েছে আর না নিয়েছে, বিশ্বাস করি না। তাই দেখুন! মানুষের কর্ত্তব্য জ্ঞান দেখুন! সত্যবাদিতা দেখুন। ধর্ম্মেও বিশ্বাস দেখুন!"

সোনা—"ঠিক বলেছ বাবা! তোমার একটি কথাও নড়ান যায় না।"

একটি প্যাদা আসিয়া সংবাদ দিল যে, কুঞ্জ-নিকেতনের বেগম ঠাকুরাণী পাল্কীতে আসিতেছেন।

সোনাবিবি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া—"দূর! সে কি কথা? তিনি হলেন নবাব, নবাবের ভগিনী! নবাবের গৃহিণী! তাঁর পায়ের ধূলো আমার বাড়ীতে পড়বে কেন? বোধ হয়, কোন বাবুর বাসায় যাচ্ছেন।"

ভেড়াকান্ত—"তিনি কি বাবুদের বাসায় যান?"

"না তা যাবেন কেন? বাইনাচ দেখতে গিয়ে যে নাকাল হয়ে এসেছেন, তা বাপু আর মুখে আনা যায় না। মানুষের চাপনে বুকে ব্যথা হয়ে, পিঠের ছাল উঠে গিয়েছিল।"

বে-আক্কেল তাড়াতাড়ি আসিয়া খবর দিল যে, বেগম সাহেব পাল্কীতে দেউড়ির উপরে।

সোনা (বিশেষ বিরক্তিভাবে)—"এসেছেন ভালই, তা আমি কি করবো?"

ভেড়াকান্ত বলিলেন, "তবে আমি এখন যাই। আপনাদের কথাবার্ত্তা হক্।"

"না বাবা, তোমার গিয়ে কাজ নাই, তুমি ঐ কামরাতে দরজাটা বন্ধ করে বসে থাক। কি জানি, কোন নূতন কথা জিজ্ঞাসা করেন—আমার ভালর জন্য কোন কথা বল্লে, আমি কি উত্তর করবো? কি বলবো? তা বাপু তুমি এখন যেতে পাবে না। বার বাজারের চলাফেরা, সহর বাজার খুঁটে খাওয়া মাগীদের সঙ্গে কথাই কইতেই ভয় হয়। যদি দরকার হয়, আমি কোন বাহানা করে তোমার কাছে গিয়ে কথাটা শুনে আস্‌বো। এখন তুমি ঐ কামরায় বে-আক্কেলকে সঙ্গে করে নিয়ে বস। চুরুট দেশালাই ঐ টেবিলের উপরে আছে।

ভেড়াকান্ত বে-আক্কেলকে সঙ্গে লইয়া অন্য কামরায় গমন করিলেন। বেগম ঠাকুরাণী ইংলিস ড্রেসে সোনাবিবির সঙ্গে মিশামিশি কোলাকুলী করিয়া বৃহৎ একখানা ইজি চেয়ারে বসিলেন। সোনাবিবি চৌকির ফরসের উপর জাতীয় ধরনে খুব বড় একটা বালিস ঠেস দিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

সোনাবিবি বলিলেন, "মেমদের মত পোষাক পরেছ কেন? মাথার উপর টুপিই-বা কেন? আচ্ছা টুপীর উপর মুরগীর পাখা কেন? তুমি ত আগে এরকম ছিলে না? একি পোষাক। মুসলমান মেয়ের কেন এ রোগ! বিধবার এত চাঁছা ছোলা খুচি ভরা, পেলা দেওয়া কেন? কার জন্য এত বানান রূপ। যার স্বামী নাই, তার এত পরিপাটি সাজ-সজ্জা কেন?"

বেগম ঠাকুরাণী ভারি মুস্কিলে পড়িলেন। তিনি হচ্ছেন ইন্‌লাইটেন্ বিদ্যাবতী, সুরুচিসম্পন্না কামিনী, আদর্শ রমণী, মডেল ভগিনী। তাঁর কানে ঐ প্রকার আলাপ কুরুচিময় কথা। অসভ্যের মত আলাপ বড়ই কষ্টকর হইল। কোন উত্তর করিলেন না।

অতি মৃদু মৃদু স্বরে বলিলেন, "আপনার কোন উপকার মনে করে এসেছি। তা আপনি সওয়ালের উপর সওয়াল করে, আমার আত্মার রস শুকিয়ে দিলেন।"

"না ভাই! তোমার ও ইংরেজী পোষাকী কথা কিছুই বুঝা যায় না। আমার উপকারে তোমার রস শুকাল। এ কথার মানে কি ভাল করে বুঝিয়ে দেও।"

বেগম পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখে দিলেন। সভ্য মহিলারা দাঁত বাহির করিয়া হাসেন না। সাধু ভাষা ছাড়া গ্রাম্য কথা, চলিত কথা, যাহাকে ইংরেজীতে "কলোকেল" বলে, তাহা বলেন না। খাস বাঙ্গালা, যেন টোলের পড়ে, অথবা পূর্ব্ববঙ্গের মেয়ে, বাঙ্গলা চারুপাঠ বর্দ্ধমান মহারাজার মহাভারত পড়ে, কেতাবি বাঙ্গালা কথা বলিতে শুনিতে ভালবাসেন। কাজেই সোনাবিবির সোজাসুজি কথা বেগমের কানে ভাল লাগিবে কেন? হাসি ভিন্ন আর হইবে কি?

বেগম ঠাকুরাণী বলিলেন, "আপনার যাতে ভাল হয়, আপনি যাতে উপস্থিত দারুণ বিপদ হতে উদ্ধার পান, ভগবান মুক্তি দেন, আমি তারই কোন অতি পরিপক্ক নিখুঁত খাঁটি উপায় করব।"

সোনাবিবি একেই হাসি তামাসাপ্রিয়, বেগম ঠাকুরাণীর এই সাধুজন—প্রিয় সুমধুর কথা শুনিয়া হাসিয়া গলিয়া একাকার হইয়া পড়িলেন।

বেগম অতি আশ্চর্য্যান্বিতভাবে গালে হাত দিয়া বলিলেন, "আমি অবাক হয়েছি। দাগাদারী আজ হাজতে—আপনার মুখে হাসি বেরুচ্ছে কি প্রকারে? ধন্য আপনার মন! ধন্য আপনার কলিজে!"

সোনাবিবি হাসিয়া অস্থির হইলেন। দম বন্ধ হওয়ার মত হইয়া এক হাসি দুই তিন থাক করিয়া হাসিলেন।

বেগম ঠাকুরাণী পুনরায় বলিলেন, "আপনার মন কেমন? তা আমি বুঝতে পাচ্ছি না। একজন জেলে কষ্ট পাচ্ছে, আপনি দিব্বি হেসে খেলে—আমোদে আহ্লাদে আছেন।"

"যা হবার তাত হয়েছে। (হাসিতে হাসিতে) এখন আমি কি করবো? মাথা ভেঙ্গে কাঁদবো? না আছাড়ি পিছাড়ী করে, মাটিতে গড়াগড়ি যাব? পুরুষের দশ দশা, কখনও হাতি, কখনও মশা। আজ যদি দাগাদারী মরে যায়—তাহলে কি আমার মোকদ্দমা মামলা পড়ে থাকবে? চাকর চাকুরী কর্ত্তে এসেছে। সুখ-দুঃখ সইতে হয়। এত হাজত—তোমার স্বামীর যে ফাটক হয়েছিল। তোমার ভগ্নীপতির যে দুমাসের মেয়াদ হয়েছিল। তোমার শ্বশুরের তোমার চাচাশ্বশুরের যে ছয় মাসের ফাটক হয়েছিল। আমি যে এক মাস ফাটক খেটে এলেম, কি হলো? দিন যাবে, কথাটা রয়ে যাবে। এতে আমি কাঁদবো কেন? আমার এক চাকর হাজতে গেছে, দশ চাকর খাড়া আছে। দাগাদারীর জন্য তোমার যদি কিছু কষ্ট হয়ে থাকে, তবে তুমি কাঁদ। হাত পা আছড়ে গড়াগড়ি দেও। তোমার ছোট ঠাকুর—তোমারই বেশী দরদ, আমাদের সকলের চাইতে বেশী মায়া!"

"তা ঠিক। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখলেই আমার প্রাণ কাঁদে। দাগাদারী হাজতের কথা

শুনে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। এখন পর্য্যন্ত কিছু কিছু অজ্ঞানতা আছে। আমি ভাই তোমার মত অত হাসকুটে নই। বরদাস্ত করবার ক্ষমতাও আমার নাই। হৃদয়ও পাষাণে গড়া নয়।"

সোনাবিবি আবার মুচকে হাসিয়া বলিলেন, "তবে কি মাথায় জল ঢালবো? যেটুকু অজ্ঞানতা আছে বল, সেই পরিমাণ ঠাণ্ডা করে দেই।"

"এখন রসিকতার সময় নয়। সে বেচারির জন্য কিছু কর। যাতে জামিনী মঞ্জুর হয়, তার যোগাড় কর।"

"আমি আর কি করবো? স্ত্রীলোকের কি ক্ষমতা, কি সাধ্য, আর কি বুঝব? আমি বাড়ীর মধ্যে পর্দ্দার আড়ালে থেকে কি কর্ত্তে পারি—আর কি করবো।"

বেগম ঠাকুরাণী বলিলেন "কলির ধর্ম্মই এই। যার জন্যে যে প্রাণ দেয়, তার বিপদে আপন বিপদ মনে করে, তার উদ্ধারের চেষ্টা না করে—আরও রঙ্গরসের কথা। হায় রে সংসার। হায়রে কলিকাল!!"

সোনাবিবি বলিলেন, "দেখ তোমার যদি এত বোধ হয়ে থাকে, অন্তরে আঘাত লেগে থাকে, তার উদ্ধারের চেষ্টা কর। সে খালাস হয়ে এসে তোমার পায়ের ধুলা মাথায় নিয়ে তোমার পা দুখানি বুকে করে পড়ে থাক্‌বে।"

"যা বল—আমি যথার্থ বল্‌ছি, আমার মনে বড়ই লেগেছে। দেখলেম, দাগাদারীকে হৃদয় হতে কেই ভালবাসে না।"

সোনাবিবি গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "সে কথা ঠিক বলেছ। কেউ তাকে মন হতে ভালবাসে না। তুমি আপন মন দিয়ে ভালবেসেছ, এক ডিসে দুজন খেয়েছ, এক বাটি দুধ দুজনে মুখ লাগিয়ে ঢোকে ঢোকে গিলেছ। এখনও তুমিই প্রাণ হতে ভালবাস। তা বেশ! তার ভালর জন্যে কিছু কর্ত্তে পার ভালই, তুমিই যোগাড় কর, প্রশংসার ভাগও তুমিই নিও। হাকিম দল ত তোমার আজ্ঞাকারী! তুমি মুখের একটা কথা বল্লে দাগাদারী এখনই জেল ভেঙ্গে চলে আসতে পারে।"

সোনাবিবি একটু ঘাতে ঘাতে কথা বলিতেছেন। বেগম তাহা বুঝিতেছেন, অথচ সেদিকে কান দিতেছেন না। তিনিও চালাক। চাতুরীর বীচি পোড়াইয়া খাইয়াছেন।

সোনাবিবিও কম নহেন। বেগম সোনাবিবির সেই ঘাতের কথার দিকে তাকাচ্ছেন না। তার বিশেষ কারণ আছে। বেগমের উদ্দেশ্য কলে-কৌশলে কাজ উদ্ধার করা, এবং দাগাদারীর প্রতি কিরূপ টান, তাহা পরীক্ষা করা। সোনাবিবির মনের ভাব যে, বেগমের মনের ভাব দাগাদারী প্রতি কিরূপ, তাহা পরীক্ষা করা। তাহাতেই তিনি দাগাদারী প্রতি ঔদাস্য ভাব প্রকাশ করিতেছেন। বেগম মনে মনে বুঝিলেন। সোনাবিবির যথার্থ ভালবাসা দাগাদারীর উপর নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, দাগাদারীর হাজতের কথায় সোনাবিবি একেবারে জীয়ন্তে মৃত যাতনা ভোগ করিতেছেন, কত কান্দিতেছেন; কত হা-হুতাশ, হায়! হায়! কি হলো! কোথায় যাব! মায়া-মমতায় অধীর হইয়া গলিয়া পড়িয়াছেন, তিনি তার উপরে

রসান চড়িয়ে আর গলাইবেন, তাহা হইল না। সোনাবিবির নিকট হার মানিতে হইল। কিছুতেই সোনাবিবিকে কায়দার মধ্যে আনিতে পারিলেন না। সোনাবিবি এমনই ভাবে কথা বলিতেছেন যে, বেগম কাছে ঘেঁষিয়া জলে জল, হা হুতাশে, হায়! হায়! মিশাইয়া পরস্পর অঞ্চলে চক্ মুখ নাক মুছান দূরে থাকুক, বেগমকে প্রতি কথায় পঞ্চাশ হাত দূরে ফেলিতেছেন। চাতুরী খেলিয়া, কপট মায়া-জাল বিস্তারিয়া ফাঁদে ফেলিতে চাহেন, মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহেন, আবার সোনাবিবির এক এক কথায় পঞ্চাশ পঞ্চাশ হাত দূরে সরিয়া পড়েন। "হাকিম দল তো তোমায় আজ্ঞাকারী। তুমি মুখের একটা কথা বল্লে" এই কথাটায় বেগম মনে মনে ভাবেন যে এইবারে হাতে পেয়েছি। এই এখনিই ঔষধ ঢাল্‌বো। আবার তখনি 'জেল ভেঙ্গে চলে আস্‌বে।" কথাটায় একেবারে বহুদূরে ছট্‌কিয়া পড়িতে হয়। সোনাবিবিও অল্পে ছাড়িবার পাত্রী নহেন। আবার বলিলেন ঃ

"তুমি একটু মনোযোগ কল্লে বোধ হয় দাগাদারী বাঁচতে পারে। তা তুমি কি তার প্রতি দয়া করবে? এখন কি তার প্রতি তোমার দয়া আছে? থাক্‌লে এতক্ষণ তার খালাসের উপায় করে আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে আস্‌তে। সত্যি সত্যি বল্‌ছি, তুমি তার উদ্ধারের উপায় কর।"

বেগম মনে মনে ভারি খুসী। ঔষধ ধরিয়াছে। এইবারেই ফল দেখাইতে পারিবেন। একটু মুরুব্বিয়ানা ভাবে বলিলেন, "আমি উদ্ধারের উপায় করতে পারি। কিন্তু—"

"ঐ কিন্তুতেই ত তোমার সঙ্গে আমার বনে না। মনে মনে মিল হয় না। ভালবাসাও জন্মে না। ভালবাসায় বিপদে বিপদ উদ্ধারের উপায় আপন হাতে থাক্‌তে, আবার কিন্তু কি?"

বেগম একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "দেখ! কিন্তুতেই জগৎ ঘোরে, সংসার চলে। কিন্তুতেই কাজ উদ্ধার। কিন্তুর মার-পেঁচ যে বুঝে কাজ করে, সে অতি কঠিন অতি অসাধ্য কাজ হলেও উদ্ধার কর্ত্তে পারে। আমি না পারি তা নয়। কিন্তু যে বলেছি সেই কিছুই—কিন্তু।"

"বুঝেছি। হয় তোমার লজ্জা করে, নয় তুমি কার খাতিরে পার না। এ দুই কারণও যদি না হয়, তবে আর যা তাও বুঝেছি। খালি হাড় কুকুরে চাটে না, কিছু রস চাই। মিষ্টি মাস চাই। তাই যদি তোমার কিন্তু হয়, সে কিন্তুও তোমারই হাতে—তোমারই হাত।"

বেগম বলিলেন, "বুঝে কথাটার কাছে গিয়ে—আবার সরে দাঁড়ালে। আমার হাত কেমন?"

"তোমার হাতই ত কিন্তুর প্রশস্ত পথ। তোমার হাতেই কিন্তুর ইতি, এই হলো দুই রকম কথা। যদি কিঞ্চিৎ রসের দরকার, সেও তোমারই হাত। তোমার মুখের একটি কথায় শত টাকার কাজ হয়। আবার তুমি যার মুরব্বি, তার আবার অন্য রসের দরকার কি? কার জন্য? সে রস চাট্‌বে কে? হয় তুমি, নয় তিনি। দেখ দেখি। সকল দিকেই তোমার হাত। তুমি সকলই করতে পার। যদি বল কিছু টাকা না হলে কিন্তু যায় না,

তবে কি, ভালবাসা তোমার? টাকা আমার, নেবে তুমি?"

"আমি নেব কেন?"

"তবে দেবে? বল ত কাকে দেবে?"

"যাকে দিলে কাজ হবে।"

"তবে তোমার দ্বারা কি হলো? বুঝলেম, তুমি যোগাড়ে? আচ্ছা তাই যদি হয়, তা হলেও তোমারই হাত। যেখানে যা লাগে, দিয়ে কাজ চালাও। যার জন্য তোমার এত যোগাড়, সে জেলখানা হতে এসে তোমার যোগাড় দরুন 'যা', তা অবশ্য দিবে। যদি পারিশ্রমিক চাও, তাও দিবে। আমার কাছে কেন? যদি এটা ভেবে থাক যে, টাকা সোনাবিবির, হাতে করে নেব আমি, বাঁচাবে প্রাণের প্রাণকে, ওগো! তা হবে না। একবার শত কি কত মনে নাই। ও কর্ম্ম করেছ। মন্দ নয়, ভালবাসা তোমার, টাকা আমার। বেশ! বেশ! বুঝেছি। আচ্ছা! গালে গলায় অত বড় বড় লাল দাগ কিসের?"

"কথা হচ্ছে এক বেচারির উদ্ধারের, এর মধ্যে দাগের কথা কেন?"

"ঐত রঙ্গরস, কথার মাত্রা। যেখানে দাগাদারী সেইখানেই দাগের কথা। ভাল ভাল আমিও এক কথার মধ্যে অন্য কথা পাড়ি। দাগের কথা পাছে বলবো। আগে বল ত, ভেড়াকান্তকে নাকি সত্যি সত্যি ভেড়া বানানো হয়েছে?"

"সে আগে মানুষই ছিল। শেষে তুমিই ভেড়া বানিয়েছ। আমি বানাব কেন? সে তোমারই গুণ।"

"অনেকেই বলে। তুমিও বল। আবারও কিন্তু এলো—কিন্তু—"

"তবে অনর্থক একটা কথা কেন বল্লে? আমার কাছেই যে বল্লে তা নয়, ভেবে দেখ, আর কার কাছে বলেছ?"

বেগম চাপিয়া চেপে গেলেন। আর ভেড়াকান্তের কথা মুখে আনিলেন না। কারণ দাগাদারীর নিকট, সোনাবিবি আর ভেড়াকান্ত সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। সে কেবল তারই স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সোনাবিবি একটু ফাঁক পাইয়াই আবার বলিলেন, "ভেড়াকান্তের কথা তুলে, আবার সরে পড়লে কেন? চেপে গেলে কেন? গায়ে লাগে? দেখতে তো আর কম কর নাই? আমার শুন্‌তে বাকী নাই। কত ফন্দী, কত পত্রিকা, কত কথা, অরাজকপুরময় সে কথা। এখন আমিও এক কিন্তু ঝাড়ি। কিন্তু আসল খাটি খবর জানতে আমার বাকী নাই। তার ঘরের লক্ষ্মী বজায় থাক্। তুমি যা বলেছ, আমি শুনেছি। আমি যা বলেছি, তা তুমি শুন নাই।"

"আমি কি বলেছি?"

"শুনবে।—তোমার মত কপাল কার! রাজার রাজরাণীই বল, ধনীর ঘরের ঘরণীই বল, লক্ষপতির মেয়েই বল, স্বামীসুখে সুখভোগে তোমার পায়ে কেটে দিতে হয়। তোমার কপালখানার মত আমার হলে, আমার কপালে এত হবে কেন?"

"তুমি কার কাছে শুন্‌লে? ঠিক বল্‌তে হবে!"

"তুমিও বলো? তুমি কার কার কাছে শুন্‌লে?"

সোনাবিবির শুনা যথার্থ সোনা—বেগমের রাঙ্গ তামা মিশান গিল্টী করা টিকিবে কেন? শুনাশুনির কারবার। পদে পদে কাটাকাটিতে ক্ষয় পাইল—বেগম সে কথা ছাড়িয়া আবার বলিলেন, "সত্য সত্য বলছি, এমন দেখি নাই।"

"আমিও বলছি, তেমন দেখি নাই। আরও বলি স্বামী সুখে সে রাজরাণী।"

বেগম বলিলেন, "আমি তা বিশেষ করে জানি। কোনখানে দেখি আট আনা কৃত্রিম, দশ আনা কপট, ওদের মধ্যে দশটি বছরের মধ্যে কপটতা দেখি নাই। দুখানি মন যেন দুখানি দর্পণ। এর মনে ওর ছায়া। তার মনে এর ছায়া। ঘরের খবর যে জানে, সেই জানে। অপরের জানবার সাধ্য নাই।"

সোনাবিবি বলিলেন, "তবে ভেড়া বানান কথা বল্লে কেন? সে আমার পেটের সন্তানের ন্যায়।"

"আমিও বলি, সে আমার পেটের সন্তানের ন্যায়।"

সোনাবিবি হাসিয়া বলিলেন, "তবে সে কথায় এত কথা কেন? আসল কথা ধর—দাগাদারীকে খালাস করার উপায় করবে কিনা?"

"তা আমি পারি।—ঐ কথা।"

"যাতে যা হয়, তুমি দিয়ে কাজ উদ্ধার কর। সে খালাস হয়ে এসে দেবে।"

বেগম একটু হাসিয়া বলিলেন, "দেবে?"

"সে দেবে।"

বেগম দেখিলেন, কিছুই হয় না। কথার মাতব্বরিটা থাক্। প্রকাশ্যে বলিলেন, "যদি সে না দেয়?"

"তুমি জান।"

"আচ্ছা, বুঝে নেব। এখন বিদায় হই।"

সোনাবিবি বলিলেন, "আমি কপটতা জানি না। যদি ইচ্ছা হয়, বারণ করি না।"

বেগম সোনাবিবির হাত ধরিয়া এক দু-পায়ে হাঁটিতে হাঁটিতে গোপনে গোপনে আরও অনেক কথা বলিতে বলিতে সদর গেট পর্য্যন্ত যাইয়া দুইজনে বিশেষ প্রণয় ভাব জানাইয়া বিদায় হইলেন। সোনাবিবি বাটীর মধ্যে আসিলেন। বেগম পাল্কীতে উঠিলেন।

ভেড়াকান্ত ও বে-আক্কেল অন্য কামরা হইতে বাহির হইল। ভেড়াকান্ত বলিল, "যেমন চালাকি খেলতে এসেছিলেন, তেমনি দুরস্ত হয়েছেন।"

সোনাবিবি বলিলেন, "বাবা! আমি ওকে ছেলেবেলা হতে জানি। কেবলই ফাজিল চালাকি। বেগম ভাবেন যে, আমার মত চতুর, আমার মত সুন্দরী, দুনিয়া জাহানে আর কেউ নেই। হাকিম দলের সঙ্গে সর্ব্বদা বসা উঠা আছে। জানাশুনা আছে, আমি দাগাদারীর জন্য অস্থির হয়েছি। তাঁর হাত পা ধরে তোষামোদ করে বলবো, তিনি এক হাত মারবেন। যা নিয়েছেন, সে কেবল দাগাদারীর বোকামির জন্য, তারই আক্কেল সেলামী, যাক। আপদ

গেল—না বাঁচা গেল। এখন কথা এই যে, দাগাদারী সম্বন্ধে যেখানে যা করা আমার সাধ্যমত আমি করেছি। সে সকল কথা ত পূর্ব্বেই বলেছি। আমি নিশ্চয় জানি, তার এ মোকদ্দমায় কিছু হবে না। হাকিমে কষ্ট দিলে আর কি করবো? এখন তোমার কপালে কি আছে, সেইটিই আমার বেশী ভাবনা।"

বে-আক্কেল বলিল, "তারও দিন নিকটে। খোদা আছেন। সত্যের জয় চিরকাল।"

সোনাবিবি বলিলেন, "আমি যমদ্বার হতে এখানে যত দিন এসেছি, দুনিয়ার কারবার দেখে আর দুনিয়াদারী কর্ত্তে ইচ্ছা হয় না। যেদিকে দেখি, যাহার দিকে তাকাই, স্বার্থ ভিন্ন কথা নাই।—বেগম! তুই আমার ধরতে গেলে—ছোট ভগ্নী। আর তুই আমার কাছে লাভ কর্ত্তে আসিস্। ধিক্ এমন টাকায়!"

বে-আক্কেল—"হুজুর! আজকাল ওঁর ব্যবসাই ঐ। উকিল বাবুকে ঠকিয়ে হাজার কি দুই হাজারের ওকর্ম্ম করেছেন। এই ভেড়াকান্ত বাবুর অতি কম হলেও চার হাজারের গায়ে জল দিয়ে বসেছেন। দেখবেন, নিশ্চয় হলফ করে বলবে যে, আমি টাকা পাই নাই, টাকা ধারি না। আজকাল মুচ্ছদ্দীও জুটেছে তেমনি। ধর্ম্মজ্ঞান কার নাই।"

সোনাবিবি বলিলেন, "দেখ বে-আক্কেল! টাকা কয় দিনের? বাঁ-হাতের তালুর ময়লার মূল্য আছে ত, টাকার মূল্য নাই। আজ আমার, কাল তোমার। পানিতে ডুবলেই গেল, চোরে নিলেও গেল, আগুনে পুড়লেও গেল। কয় দিন? ঠকিয়ে খাবেন কয় দিন? আমি দেখি বা না দেখি, লোকে দেখবে।"

ভেড়াকান্ত বলিলেন "তবে আজিকার মত বিদায় হই। নচ্ছার জেলা হতে আর কোন খবর এলে আমাকে জানাবেন।"

সোনাবিবি—"মোকদ্দমা চেপে পলো ত অনেক। দাগাদারীকে যদি শীঘ্র জামিনীতে খালাস না করতে পারি, তবে ভারি বিপদ দেখতে পাচ্ছি।"

বে-আক্কেল ভেড়াকান্ত উভয়েই বলিলেন, "ঈশ্বর ভরসা।"

সোনাবিবিও বলিলেন, "খোদা ভরসা! আর একটি কথা। জেলখানায় পাহারাদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করেছি। রাত্র ১২ টার পর খাবার নিয়ে যাবে, যে গতিকে হয় তারা খাওয়াবে।"

ভেড়াকান্ত বলিলেন, "সাবধানে পাঠাবেন। শত্রুপক্ষ পায় পায় ঘোরাফেরা কচ্ছে। আজ তাদের আনন্দের সীমা নাই। মনিবিবি হাজতের সংবাদদাতাকে শাল বক্‌সিস দিচ্ছিলেন। তাঁর সেই ভক্ত ভিখারিণীর চক্ষু রাঙ্গানিতে নাকি পারেন নাই। নগদ দশ টাকা দিয়েছেন। আর উকিল মোক্তারদিগকে মনের মত খুসী করবেন। লাল আলু সেইখানেই জামাই আদরে আছে।"

সোনাবিবি বলিলেন, "বাবা! আর লাল আলুর কথা আমার কানে দিও না। আমি দুনিয়ার কারবার দেখে অবাক হয়েছি।"

পরস্পর সকলেই বিদায় হইলেন।

সপ্তদশ নথি

আজ যমদ্বারে ভারি ধূম। মনিবিবির বাড়ীতে ঘরে ঘরে আনন্দ। বাহিরে আমলামহলে পান তামাকে, গল্পে রগড়ে হাসির উপর হাসি, হাসিতে হাসিতে কাশি পর্য্যন্ত দেখা দিতেছে। দাগাদারী হাজতে, আহ্লাদের সীমা নাই। নিজেরা শত চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত কিছু করিতে পারেন নাই। দাগাদারীর বুদ্ধি দোষে আপন পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছে। দাগাদারীর বিবেচনার শত দোষ দেখান হইতেছে। ধিন্‌তাধিনা বাবু কোন কাজেরই নয়। অরাজকপুরের প্রথম শ্রেণীর মোক্তারকে মনিবিবির বাড়ীর বাদীরা পর্য্যন্ত নিন্দা করিতেছে। কেন দরখাস্ত দিয়া হাকিম বাহাদুরকে চটাইল? ইহাই মোক্তার বাবুর ষোল আনা অপরাধ।

ধুম্বলোচন—"ইয়েগা ইয়াগা"

"অহে ওকি সহজে অতদূর হয়েছে? তার কি কিছু খবর তোমরা রাখো? আমার ভাই সাহেবের শ্বশুর বাড়ী আর তাহার বাড়ী একই গ্রামে। আসল জায়গায় কল টিপেছি। তবে ত ইয়েগা ইয়াগা আমরা টিকে আছি তা না হলে এতদিন 'ইয়েগা ইয়াগা' করে আচ্ছা করে কাঁদাত। ওকে হাজতে পচাবে, এতদিনের জমান রাগ 'ইয়েগা ইয়াগা' কাতরা কাতরা— নেক্‌লাইবে।

চাঁদ-বদনীদের দলে বড় চাঁদ-বদনী ব্যতীত সকলেই দুঃখিত। মনিবিবি শুইয়া শুইয়াই খুসী। আজকাল লাল আলু সর্ব্বদা কাছে থাকিয়া, মাথা টেপা, হাত টেপা, পা টেপার কাজ করিতেছে, ধরিয়া তুলিতেছে, বেশ সুখে আছেন। এ পীড়া এখন তাহার পক্ষে আরাম। কিন্তু আহার প্রায় বন্ধ। দিনান্তে দুই এক চামচ সুরুয়া, তাও অনেক সাধ্য-সাধনার পর লাল আলু মাথার দিব্বি দিয়া মুখে ধরিলে দুই এক আধ ঢোক গলাধঃ করেন। লাল আলু নিকটে থাকায় এ অন্তিম শয্যা সুখশয্যা বোধ হইতেছে। দাগাদারীর হাজতের কথা শুনিয়া—কথা বলিবার শক্তি নাই—মুখে সন্তোষের ভাব দেখা দিয়াছে। মনিবিবির অবস্থা দেখিয়া কন্যাগণ মনে মনে বুঝিয়াছেন যে, আর বেশী দিন নাই। কিন্তু মুখে সে কথা কেহই কাহার নিকট প্রকাশ করিতে সাহস পান নাই। মনিবিবি জগৎ পরিত্যাগ করিলে, চাঁদ-বদনীরা সুখী বই অসুখী নহেন। বিশেষ বড় জামাতা ধুম্বলোচন মনে মনে শীঘ্রই শেষ হওয়ার কথাটাই আলোচনা করেন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাও করেন। বড় চাঁদ-বদনীই সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন। ধুম্বলোচনের আনন্দের সীমা থাকিবে না। লাল আলু মনিবিবির দুরবস্থা দেখিয়া মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন।

ভিখারিণী আর কত দিন থাকিবে? তাহার অনেক কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। সে মধ্যম চাঁদ-বদনীর মনের কথা শুনিয়াছে। যাহাতে যাহাতে যা যা হইয়াছে গিয়াছে, সমুদায় শুনিয়াছে। আর হইবার নহে। দিন দিন আরও হইবে, আরও যাইবে, সে কথাও বলিয়া দিয়াছে। লাল আলুর সহিত মনিবিবির সম্মিলন—তাহাও ঘটাইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছু দেওয়াইতে পারে নাই। মনিবিবি একটু সুস্থ হইলেই দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। বাকী কেবল মনিবিবির পীড়ার কথা, ব্যাধি শান্তির কথা। সত্য সত্য কথা শুনিয়া বলিয়াছেঃ

"তোমার পীড়া আরাম হইবে না। শক্ত পীড়া। কখনও কেহ আরাম করিতে পারে না, পারিবে না। কখনই আরাম হইবে না।"

ভিখারিণী আরও বলিয়াছে, "তোমার পাপের অন্ত নাই। মনে মনে খোদার নিকট গুনা মাফ চাও। যদি তিনি মঙ্গল করেন, তবে বাঁচিতে পার। তাহা না হইলে মানুষের সাধ্য নাই, ক্ষমতা নাই যে, তোমায় রক্ষা করে? যে অঙ্গে যে পাপ করিয়াছ, সেই অঙ্গেই শাস্তি হইতেছে। এত দৈহিক শাস্তি। পরকালে যে কি হইবে তাহা তিনিই জানেন। এখন আর কোন ঔষধ নাই। কেবল দিবা-রাত্র তাঁহার কান্নাকাটি করা আর মাফ চাওয়া। দাগাদারী জেলে গিয়াছে বলিয়া সকলে খুশী হইয়াছে। বিপদে হাসিও না। পরের বিপদে কখনই হাসিও না। কান্দিতে কতক্ষণ? বেশী হাসিলে কান্দিতে হয়।"

ভিখারিণী যাহাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিয়া[illegible]র্ব্বশেষে ছিঁড়িয়া খাতুনের কার্য্য যাহা বাকী ছিল, তাহা করিয়া ভিখারিণী বিদায় হইল। ভিখারিণীর জন্য সকলেই দুঃখিত। ভিখারিণী কাহারও মন্দের মধ্যে নহে। ছোট বড় সকলেরই ভাল চেষ্টা, ভাল কথা ভিন্ন মন্দ কথা বলিতে একখানি জিহ্বাও নড়াচড়া করিল না। একটি চক্ষুও ভিখারিণীর নিমিত্ত জল না ছাড়িয়া শুষ্কভাবে রহিল না। একটি মুখও ভিখারিণীর জন্য ম্লান না হইয়া হাসি খুসীর ভাব প্রকাশ করিল না। ভিখারিণী চলিয়া গেল। কোথা গেল? যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেইখানে গেল।

আমরা যমদ্বারে আর থাকি কেন? যমদ্বারে আর বেশী কাজ নাই। তবে ছিঁড়িয়া খাতুনের সহিত তাঁহার ভগ্নীর সেই বিবাহ বিষয়ের শেষ অংশ শুনিতে পাই নাই। তাহাতেই যে বিলম্ব।

ঐ যে ছিঁড়িয়া খাতুন, জননীর কক্ষ হইতে ভগ্নীর নিকটে আসিতেছেন। তাঁহার সেই প্রিয় ভগ্নী বাটীর মধ্যস্থ নারকেলী কুল বৃক্ষমূলে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছেন। ছিঁড়িয়া খাতুন ভগ্নীর নিকটে যাইয়া বলিলেন, "ভগ্নি' অকালে কুলতলায় কেন?"

ভগ্নী দুঃখিতভাবে উত্তর করিল, "বোন্! এ গাছটা এখানে থেকে বড়ই অন্যায় হয়েছ! শোন নাই?"

ছিঁড়িয়া—"যাক্! ওকথা যেতে দেও। ভগ্নি! ভিখারিণীর জন্য মনটা বড়ই চঞ্চল হয়েছে। আমার মার অবস্থাও যেন ভাল দেখলেম না।"

"যত শীঘ্রই যান, ততই ভাল। অত কষ্টে বেঁচে থাকা পাপের ভোগ ভিন্ন আর কি

বলব। বোন্—যা কপালে আছে হবে। সেই সে দিনের কথাটা শেষ হল না। এখন বেশ অবসর আছে, বল, আমার শুনতে বড়ই ইচ্ছা।"

ছিঁড়িয়া খাতুন ভগ্নীর নিকট মৃত্তিকা শয্যায় বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "বোন! আমাদের বিয়ে সুখের ব্যাপার নয়, বড়ই দুঃখের কথা। যে মুসলমান মেয়ে বিয়েকে সুখের সম্বন্ধ মনে করে, সে নিতান্ত হাবা। বিয়ে যে কি কঠিন ব্যাপার, তা অনেকে বুঝে না। আমি আগে যা ভেবেছিলাম, এখন দেখি যে, তার কিছু নয়। সে হাসী-খুসীর নামও এতে নাই। আগাগোড়া দুঃখ।

"যে যে কারণে আমার বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছা হয়, যাতে যাতে আমার মনের গতি খারাপ হয়, তা সেদিন বলেছি। ভগ্নি! আমাদের বিয়ে, ধরতে গেলে এক প্রকারে সূর্ত্তি খেলা। কপালে যদি ভাল স্বামী লেখা থাকে তবে হয়, তা না হলে আজীবন জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে মরতে হয়। হায়! যে আমার জীবন-যৌবনের অধিকারী, দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত সকলি বিষয়ে যে অধিকারী, যার মত ভালবাসা, যার মত প্রাণের প্রাণ চির ভালবাসা আর জগতে নাই, নারী জাতির যে স্বামী প্রাণসর্ব্বস্ব, প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন—যে স্বামী হৃদয়ের মহারত্ন, যতনের ধন, কলেজার টুক্‌রা, তার সহিত কোন চেনা নাই, পরিচয় নাই, নামেই ভালবাসা, নামেই অন্তরের নিধি, নামেই প্রাণাধিক প্রিয়তম।

"যে আমার শরীরের মনের হৃদয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করবে, তাহার সে কর্ত্তৃত্ব করবার ক্ষমতা আছে কিনা, তা জানলাম না। আমার মন তার অধীনতা স্বীকার করবে কিনা, তা বুঝলাম না। আমার চক্ষু তাকে ভালবাসবে কিনা, তার রূপে মজবে কিনা, তা দেখলাম না। তার কথাগুলি আমার কানে মিষ্ট বোধ হইবে কিনা তা শুনলাম না। তার শরীরের স্বাভাবিক গন্ধ আমার নাসিকায় সুগন্ধি বোধ হবে কিনা, যে আমার সুখে সুখ দুঃখে দুঃখ বোধ করবে, তার কোন তত্ত্ব আমি পেলাম না। কানা খোঁড়া, কাল ফরসা, মূর্খ বিদ্বান, অবোধ বুদ্ধিমান, তা জানলাম না, দেখলাম না। দেখলেন পিতা ভ্রাতা, অথবা কোন স্বগণ। আচ্ছা তাঁরা ত আমার শত্রু নহেন। তারা দেখলেই দৈহিক ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হলাম। কিন্তু যা নাকি চক্ষে দেখা যায় না, আর যা পরের চক্ষে দর্শনীয় নহে, সেগুলি ত গোপনেই রইল, চাপাই থাকল। যদি কপাল ভাল হয়, বাপ-মার পুণ্যের জোর থাকে—তবে আমাদের মেয়ের বিবাহ সুখী হতে পারে; আব তা না হলে আমার মত চিরকাল দুঃখ ভোগ করতে হয়। আবার বোন্। পুরুষদের মধ্যে, বোকা আহাম্মকই বলব, যার বিবাহ করবার প্রয়োজন নাই, সন্তান-সন্ততি জন্মিবার আশা নাই, বংশ রক্ষার উপায় কোন প্রকারেই নাই, তবে কেন তারা অনাথার সর্ব্বনাশ করে? কেন বিবাহ করে একটি অবলা কুলবালার গলায় কণ্টক হয়? লোকলজ্জা-নিবারণে বিবাহ করে, মানুষের চক্ষে ধোঁকা দিয়ে একটি নিরাশ্রয়া অবলার সর্ব্বনাশ করে বসে। সে দুঃখ তার চক্ষে পড়ে না। তাইতে অনেকের মুখে চুনকালি পড়ে। দশজনেও সে কালা মুখ দেখে। খুনখুনী হয়, শেষে ফাসি কাষ্ঠে ঝুলতে থাকে। একশত মধ্যে দুটি স্ত্রীলোক স্বামী সুখে সুখী কিনা আমি বলতে পারি না। আমার অবস্থা

ত দেখ্‌তেই পাচ্ছো। বড় ভগ্নীই কি সুখী? চখে দেখ যে স্বামীর সঙ্গে বড় মিল, স্বামীর বড় ভালবাসা। ও কিছু নয়, সমুদায় উপরি উপরি—সম্পূর্ণ কৃত্রিম। পুরুষে যত কৃত্রিম ভাব দেখাতে পারে, স্ত্রীলোকে তা পারে না! পুরুষে বলে যে, স্ত্রীলোকে যত সয়তানী খেলতে পারে, তত পুরুষে জানে না। একথা যদি কোন নিরপেক্ষ লোকে বিচার করে বলতেন তা হলে বুঝতে পারি। কার সঙ্গে দেখা হবার যাদের উপায় নাই, চাঁদ তারা সূর্য্য আকাশ ভিন্ন খোলা জায়গায় আর কিছু দেখবার ক্ষমতা নাই, এমন স্ত্রীলোক কখনই পুরুষ অপেক্ষা বেশী সয়তানী খেল্‌তে পারে না। অবসর, সময়, স্থান—এই তিনটি না মিললে মনে মনে হাজার সয়তানী থাকলেও পেরে উঠে না। এ অবস্থায় পুরুষেই বেশী পরিমাণ কৃত্রিম ভাবের অধিকারী। তবে যে স্ত্রীলোক স্বাধীন, তার কথা স্বতন্ত্র, তার চালচলন পৃথক, তার ব্যাকরণ বোধোদয় শিশুশিক্ষা পদ্যপাঠ সকলি পৃথক। তার কথা বলতেছি না। ভদ্রপরিবারের কথা বলতেছি। ইহাদের বাড়ীর পুরুষেরা বড়ই কপট। স্ত্রীকে বড়ই ঠকায়—বড়ই ঠকায়। এই যে আমাদের ভগ্নীপতি 'ইয়াগা ইয়েগা', ওঁর চরিত্র ভারি বদ্। দেখ ত ভেবে, ঐ সকল লোকে কিনা কর্ত্তে পারে? শেষে এই সকল দেখেশুনে আমার বিশ্বাস যে, ভদ্রঘরের মেয়েদের বিবাহ না করাই ভাল!

"বিবাহের ফলত এই; শেষে চব্বিশ ঘণ্টা ঝগ্‌ড়া-বিবাদ, শেষে যার কপালে যা তাই হয়। দেশসুদ্ধ লোক স্ত্রীলোকেরই নিন্দা করে। আমি অনেক ভেবে-চিন্তে দেখেছি, আমাদের মত মেয়েদের চিরকাল আইবুড় হয়ে থাকাই ভাল। বোন্! ঐ দেখ, বড় দিদি আঙ্গরমুখো হয়ে কি যেন বক্‌তে বক্‌তে আস্‌ছেন। চল আমরা এখান হতে সরে যাই।"

এই বলিয়া কুলগাছতলা হইতে সরিয়া নিজ নিজ কক্ষে গমন করিলেন।

বড় চাঁদ-বদনী প্রাচীর মধ্যস্থ কুলগাছতলায় আসিয়া এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিলেন। কবে, কে, কোন সময় কুলগাছ তলায় আসিয়া কুল পাড়িতে পাড়িতে কে কার সঙ্গে কি কথা কয়েছিল, তারা কি এখনও আছে, যে উঁকি মারিলে দেখা যাইবে?

বড় চাঁদ-বদনী, পূর্ব্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ চারদিক, চার কোণ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "ছি, ছি! ঘৃণার কথা! পুরুষের ধর্ম্ম-কর্ম্ম লজ্জা-সরম কিছু নাই। রাত্রদিন জ্ঞান নাই। একত্র এক পরিবারের মধ্যে এক ঘরে এক বাড়ীতে থাকিলেই, তার প্রতিফল এই হয়। আচ্ছা! হাতে হাতে ধরে—তবে তার পরে—" এই বলিয়া ত্রস্তপদে বাগানের দিকে চলিয়া গেলেন।

আর কি? এখন আর কার জন্যে থাকি। কুলগাছের কাঁটা দেখিতে? না, এখান হইতে বিদায় হই। আমলাপাড়া আমলা বাবুদের দুই একটি কথা শুনিয়া, যমদ্বার হইতে বিদায় হই। না না, সাবলোট সাহেবের বৈঠকখানা ঘরটা দেখিয়া যাইতে হইবে।

মনিবিবির আমলাগণ ভারি ব্যস্ত। নচ্ছার জেলায় সোনাবিবিকে ম্যানাজারি হইতে খারিজ করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। তাহার সাক্ষী প্রমাণের যোগাড়ে আছেন। ভেড়াকান্তর মোকদ্দমার দিন অতি নিকট। তাহার ফরিয়াদীদিগের শিক্ষা

দাগাদারীর জামিন জন্য রাজধানীতে, নচ্ছারপুরে যে তদ্‌বির হইতেছে, তাতে বাধা দেওয়ার যোগাড় পরামর্শ, হাকিম বাহাদুর সোনাবিবির সঙ্গে জয়ঢাককে এই সময় সাক্ষাৎ করিয়া আপোষ নিষ্পত্তি করিতে সাবলোট সাহেবকে অনুরোধ করিতেছেন, যাহাতে হয়, তাহার যোগাড়-যন্ত্র হইতেছে। একজনকে ফাঁদে আট্‌কাইয়াছেন, আর একটাকে জেলে পুরিতে পাল্লেই, এদিকে নিকেশ—সে একটা ভেড়াকান্ত।

সেই রাত্রে সাবলোট সাহেবের বৈঠকখানা দেখাইয়াছি। আজিও সেই ভাবে। সেই দেয়াল ঘড়ির টক্‌টক্ শব্দ। ব্রাহ্মণী সঙ্গে কেনাবেচা ভালভাবে হয় নাই। দরদস্তুরেই রহিয়া গিয়াছে। সেও হাতে না পেলে হাতে আসে না। সাবলোট সাহেবও হাতে না পেলে হাত দেন্ না। কোথাও কোথাও অগ্রিম দানে ঠকিয়াছেন। অতি আদরে সসম্মানে গ্রীবাস্পর্শে, মধুমাখা দুই তিনটি ধাক্কা ফল খাওয়াইয়া, সুখময় সখের খেলা খেলাইয়া, প্রাণবল্লভ এই পথে যাও! ঐ রাস্তা দেখা যায়—চলিয়া যাও। বড় রাস্তায় গেলেই আলো পাইবে। এই পথটুকু চক্ষে না দেখ, হাঁটিতে না পার, হামাগুড়ি দিয়া প্রেম-প্রণয়ে চলিয়া যাও। এই প্রকারে আরও কয়েক স্থানে বিশেষ শিক্ষা পাইয়া শিক্ষা হইয়াছে। আর আঁখিতে মজালে আঁখি, আঁখির উপরেই আছে। স্বতন্ত্র বাড়ী-ঘর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁর স্বামী মহাশয়, খেদমতগারী পদে অভিষিক্তই আছেন।

সাবলোট সাহেব ভারি ব্যস্ত, অরাজকপুর যাইবেন। হাকিম বাহাদুর গোপনে যাইতে বলিয়াছেন। দশজনকে বলা হইতেছে, বুঝান হইতেছে যে, অরাজকপুর চলিতেছে তাঁহার পরামর্শে। হাকিম বাহাদুর নিতান্ত পক্ষেই তাঁহার হাতে। যা করেন তিনি, যা বলেন তিনি।—যাহা হউক, এখনি রওয়ানা হইবেন। পাল্‌কী বেহারা হাতি ঘোড়া সমুদায় হাজির, যে একটু বিলম্ব সে কেবল জয়ঢাকের জন্য। জয়ঢাকের ঢাকের মত শরীরে কাপড় পরিতে মারামারি লাঠালাঠি। তিনি যেই আসিবেন, অমনি রওয়ানা হইবেন।

যমদ্বারে থাকিল কি? আর দেখিতে বাকী থাকিল কি? বাকী রহিল মনিবিবির জননী। তা তিনি নিতান্তই দুর্ভাগিনী। পতি-পুত্রঘাতিনী। জননী নন্দিনী—পাগলিনী। কুমারীজননী। কেহ জগৎচক্ষে পতিবিয়োগিনী, গুপ্তচক্ষে সদবা সীমন্তিনী। গুপ্তহত্যা, কন্যাহস্তে মাতৃহত্যা, পত্নীহস্তে পতিহত্যা, সকলি সম্ভবে। যমদ্বারে সকলি সম্ভবে। আর দেখিব না। এ পাপ-তাপ পরিপূর্ণ পাতকী, নারকী, নেক্কারজনক জঘন্য স্থান আর দেখিতে ইচ্ছা হয় না। যমদ্বার! তোমাতে ধর্ম্ম নাই। তুমি এখন নিরক্ষর নিরীশ্বর। মহাপাপে পরিপূর্ণ। হস্ত পরিমিত মৃত্তিকা দগ্ধ।

একি? মনিবিবির বাড়ীর লোকজন এরূপ ব্যস্তভাবে দৌড়াদৌড়ি করে কেন? বাহিরের লোক বাটীর মধ্যে, বাড়ীর মধ্যের লোক বাহিরে এরূপ শুষ্কমুখে যাওয়া আসা করে কেন? হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তন ভাব দেখি কেন? এক মুখে বলিতে—দশ মুখে প্রকাশ হইল—"মনিবিবি বড়ই অস্থির।" বাটীর উপরেই সরকারী ডাক্তারখানা। কবিরাজ তিন-চারিজন পাড়াতেই বর্ত্তমান। হেড মাষ্টার হেড পণ্ডিত উভয়েই হোমিওপ্যাথি মতে ডাক্তারি করেন। ক্রমে

সকলেই আসিলেন। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নাড়ী দেখিতেছেন, রোগী প্রলাপ বকিতেছেন।

মনিবিবির ব্যাধি-শয্যা পার্শ্বে কন্যাগণ। মায়ের অন্তিমকালের দুর্দ্দশা দেখিয়া কেহ ভয়ে কাঁপিতেছে, কেহ মনে মনে ঈশ্বরের নাম করিতেছে। কেহ মা মা বলিয়া কাঁদিতেছে। মনিবিবির দুই চক্ষু যেন কোটর হইতে ফুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে। সময় সময় জ্ঞান হইতেছে। অধিকাংশ সময় অজ্ঞার অচেতন ভাব। সকলেই বলিতেছে "আহা! এখনি দাগাদারীর হাজতের কথা শুনে কত কথা। আবার এখনি এ কি? সকলি ঈশ্বরের মহিমা।" অষুধ খাওয়াইতে ক্রটি করিতেছেন না। নাড়ী দেখিতেও ক্ষান্ত হইতেছেন না। কিন্তু কোন ঔষধই মনিবিবির গলাধঃ হইতেছে না। চামচে করিয়া মুখে দিতেছেন, নীচে নামিতেছে না। মুখের দুই চির বহিয়া গণ্ড ভাঙ্গিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

ধুম্বলোচন কান্দো কান্দো চক্ষে, আশা পূর্ণ হব হব মুখে বলিলেন, "ইয়েগা ইয়েগা! ঔষধ যখন পেটে যায় না, তখন আপনারা কেন কষ্ট দিচ্ছেন? আমার বিবেচনায় এসময় ঔষধের ক্ষান্ত দিয়া, খোদার নাম মহৌষধ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।"

ডাক্তার কবিরাজ সকলেই এ কথায় সায় দিলেন। ধুম্বলোচনের ব্যবস্থা মতে মনিবিবির ব্যাধি-শয্যা পার্শ্বে পবিত্র কোরান পাঠ আরম্ভ হইল। কন্যাগণ মধ্যে যাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি থাকিয়া কোরান পাঠ শুনিতে লাগিলেন। মনিবিবি—সময় সময় অজ্ঞান, সময় সময় চৈতন্য। চেতন পাইয়াই সঙ্কেতে কোরান পাঠ নিবারণ জন্য হস্ত সঞ্চালনে নিষেধ করিতেছেন।

সে সাঙ্কেতিক ভাব কেহ বুঝিতেছে না। বুঝিবেই-বা কে? কোন্ হৃদয়বান লোক একথা বুঝিতে পারে যে, অন্তিমকালে ঈশ্বরের নাম শুনিতে অনিচ্ছা? লাল আলুও বুঝিল না। পাঠকগণ মনোনিবেশে পাঠ করিতেছেন। ক্ষণকাল মোহ অবস্থায় থাকিয়া, পুনরায় চেতন পাইলে—অতি কষ্টে দুই হাত তুলিয়া, কোরান পাঠ নিষেধের কথা লাল আলুকে বুঝাইয়া মাথায় আঘাত করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য যে, বেশী গোলমালে আরও অস্থির বোধ হয়। কোন কথা কানে আসিলে মাথার মধ্যে খোঁচাইতে থাকে। উহা করো না। পড়াইও না। নিরবচ্ছিন্ন নীরব থাকিতে ভালবাসি। লাল আলুকে সঙ্কেতে ডাকিয়া মুখের নিকটে মুখ টানিয়া মৃদু মৃদু স্বরে বলিলেন, "কথা ভাল লাগে না। চুপ্‌চাপ ভাল।"

কি করিবে? খোদার কালাম কানে গেলেই যখন হাত দিয়া নিবারণ করে, শুনিতে চাহে না—বিকৃত মুখ, আরও বিকৃত করিয়া মাথায় আঘাত করিতে থাকে, তারা ফুটিয়া চক্ষের দুই কোণ হইতে অজস্রধারে জলধারা ঝরিতে থাকে, কন্যাগণ কি করিবে? ধুম্বলোচনই-বা কি করিবে? বাধ্য হইয়া কোরান পাঠ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তিন ঘণ্টা কাল ঐরূপ ক্ষণচেতন, ক্ষণ অচেতন। চক্ষু পলকহীন আবরণবিহীন। মনিবিবির এই রোগে জ্বরা শয্যাধরা ব্যাপার ত নূতন নহে? তিন বৎসর কাল ব্যাধি-শয্যায়। ক্রমেই অবস্থার অবনতি। দিন দিন পচিতে গলিতে শেষ সীমায় আসিয়াছে। শেষসীমা কি মধ্যসীমা কি তৃতীয় অবস্থার অন্তর্গত সীমা, বাড়ীর লোকের—কন্যাগণের, তার প্রতি বেশী লক্ষ্য

নাই। কারণ এরূপ অজ্ঞান অচেতন ভাব আরও কয়েকবার হইয়াছে। তবে এবারে বেশীর ভাগ ঔষধ গলাধঃ না হওয়া। বাড়ীর লোকের হাব-ভাবে, কাজ-কর্ম্মে তত ব্যস্ত ভাব, ভাবনার ভাব, চিন্তার ভাব,—একটি লোক চিরকালের জন্য জগৎ ছাড়িয়া যায়—ভাবিয়া কোনরূপে ভাবের পরিবর্ত্তন ভাব, দেখা যাইতেছে না। নিয়মিত রূপে কাজ-কর্ম্ম চলিতেছে, স্থানে স্থানে গল্প খোসগল্প রঙ্গরসের লহরী ছুটিয়াছে। কোন কোন চাঁদ-বদনী, হাসি-তামাসা, রস-রসিকতার আলাপ করিতেও পশ্চাদপদ হইতেছে না।

তিন ঘণ্টার পর মনিবিবির চক্ষে পলক আসিল, অক্ষিতারা অবনত হইল, মুখে দুই একটি কথা ফুটিল। লাল আলুকে বলিলেন, "তুমি আমার জন্য এত করিলে?"

লাল আলু চক্ষের জলে যেন ভাসিতে লাগিলেন। দর দর ধারে নয়নদ্বয় হইতে জলধারা পড়িয়া গণ্ড গড়িয়া দাড়ি বুক ভিজিতে লাগিল।

মনিবিবি ক্ষণকাল লাল আলু মুখের দিক তাকাইয়া চক্ষু ফিরাইয়া অন্যদিক দেখিতে লাগিলেন। দুই চক্ষের দুই ধারে জলের ধারা বহিতেছে। বেশী কথা কহিবার শক্তি নাই। দুই-একটি কথা সময় সময় বাহির হইতেছে। কোরান পাঠকারিগণ সেখানে নাই। কন্যাগণ ক্রমে দুই-একজন করিয়া আসিতে লাগিলেন। এক মুখ হইতে অন্য মুখ—সে মুখ হইতে অপরের মুখে শুনিয়াছেন যে, "মনিবিবি এখন একটু ভাল।" তাহাতেই দেখিতে আসিয়াছেন। পারতপক্ষে তাঁহারা মায়ের নিকট আসিতে চাহেন না। আসিলেও বসিতে চাহেন না। নাকে কাপড় দিয়া, কেহ সুগন্ধি মাখা রুমালে নাক মুখ বাঁধিয়া কাছে বসেন, অসহ্য হইলে উঠিয়া চলিয়া যান। বলিহারি যাই লাল আলুকে। ধন্যবাদ সেই লাল আলুকে। সে নিজের স্নান-আহার পরিত্যাগ করিয়া মনিবিবির সেবা করিতেছে, প্রাণ মন ঢালিয়া সেবা করিতেছে। মনের কথা মনের ভাব ঈশ্বর জানেন। হৃদয়ের টানে, মনের আকর্ষণে করিতেছে—না হয় স্বার্থের জন্য খাটিতেছে। যাহাই হউক, স্বার্থের জন্য হইলেও, অমন পচা দেহের নিকট সর্ব্বদা কোন প্রাণী থাকিতে পারে? ধন্যবাদ লাল আলু! নিমকের সত্ত্ব তুমিই বজায় রাখিলে।

কন্যাগণ মায়ের নিকটে আসা অনেক দিন হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন। শয্যার পার্শ্বে অন্য কামরা। সেই কামরায় স্বতন্ত্র বিছানা সর্ব্বদা পাতা থাকে। তারই উপর তাঁহারা সময় সময় আসিয়া বসেন। ঐখানে বসিয়া মায়ের সেবা শুশ্রূষা করেন। মনিবিবি একটু উচ্চস্বরে— হঠাৎ যেন তাঁহার গলার স্বরে জোর আসিল—বলিতে লাগিলেন, "মা সকল! আমি চললাম। আমার সময় হয়েছে! (কন্যাগণের প্রতি বার বার চাহিয়া) আমি আর বাঁচব না।"

দুই-একটি কন্যার চক্ষে জলকণা দেখা দিল। চক্ষু লাল হইল। কিন্তু নাক মুখ রুমালে অঞ্চলে আবদ্ধ।

"আমার মনের আশা পূর্ণ হইল না।" এই পর্য্যন্ত বলিতেই মনিবিবি সেই এক প্রকার বিকৃত রব করিয়া, দুই হস্তে অতি ত্রস্তে, চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। শরীরে বল নাই।

নড়াচড়ার শক্তি নাই। কিন্তু সে সময়ে, স্বাভাবিক শরীরের ন্যায় চক্ষু ঢাকিয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন।

ভাবে বোধ হইতে লাগিল, সকলেই যেন স্পষ্ট বুঝিতে লাগিল, এপাশেও ভয়, ওদিকে ফিরিলেও সেই ভয়। করদ্বয় চক্ষুর উপরেই আছে। চক্ষু ঢাকা অবস্থায় বিকৃত স্বরে, যেন কত ভয়ের স্বর, প্রাণ যেন টানিয়া ছিঁড়িয়া লইতেছে, এমন কঠিন স্বরে, সেই এক প্রকার অভাবনীয় শব্দ, যা কখনও মনিবিবির মুখে কেহ শুনে নাই, শুনিতে লাগিলেন। তাহার পর গাঁ গাঁ রবে, মুখ বালিসের মধ্যে লুকাইয়া গেঙ্গাইয়া বলিলেন ঃ

"তুমি সম্মুখে থাকতে আমাকে নিয়ে যায়! এত দিন কোথা ছিলে? বল, তোমার দুটি পায় ধরি, এতদিন কোথা ছিলে? ধর ধর আমায় ধর। আমায় টেনে লয়ে চলল। ওকি? ওরে লাল আলু। ওকি? এমন আগুনের শরীর তোর কবে হল? ওরে! তুই আমার কাছে আসিস না। তুই সরে যা। বাবাগো? আগুনের শলাকা! প্রাণ যায়! তোরা থাকতে আমার উপর এত যন্ত্রণা! না, না, আমি আর ওদিকে তাকাব না। মরেছি মরেছি। এইবার মরেছি। আমায় বেঁধ না! দেখ!! তুমি আমাকে কত ভালবাসতে, কত আদর করতে, আমি কিছুই করি নাই, আমি তোমাকে কোন দিন মনের সহিত ভালবাসি নাই, যত্ন করি নাই। তোমাকে ফাঁকি দিয়ে কত কি করেছি। তুমি আমাকে সেই প্রথম দিন—ওরে তোরা কে? ওরে তোরা কে? ও জিঞ্জির ও অগ্নিময় জিঞ্জিরে আমায় বাঁধিস্‌নে। তোমার পায় ধরি, একটি কথা কয়ে বারণ কর—উহাদিগকে বারণ কর। সেই বিবাহের দিন যে চক্ষে দেখেছ, সেই চক্ষে চিরদিন দেখেছ। দোহাই তোমার! তুমি সম্মুখে খাড়া থাকতে, আমার চখের মধ্যে আগুনের শলাকা দিতে চায়?

"আমি ওদিকে তাকাব না। আমি তোমার পায়ে ধরে বল্‌ছি। আমি লাল আলুর দিকে তাকাব না। দেখ! তোমার দুখানি পায়ে ধরি, আমায় বাঁচাও। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। আর সহ্য হয় না। দম বন্ধ হয়ে এলো। আমায় বাঁচাও। দোহাই তোমার। আর সহ্য হয় না। চক্ষে নাকে মুখে শরীরের প্রতি লোমকূপে উত্তপ্ত অগ্নিময় লোহার শলা চালাইয়া দিলে কি মানুষ বাঁচে? দোহাই তোমার ভালবাসার! দোহাই তোমার পিতা মাতার। দেখ! তুমি যখন চক্ষু তুলে আমার দিকে—এ হতভাগিনীর দিকে তাকাচ্ছ, তখনি যেন জ্বালা-যন্ত্রণা একটু কম বোধ হয়। তাতেই বলি, আবার তাকাও, তোমার হতভাগিনী স্ত্রীর মুখের দিকে একটিবার চাও। হতভাগিনীর কথা রাখ, একটিবার তাকাও।"

মনিবিবি বালিসে মুখ লুকাইয়া ছট্‌ফট করিতেছেন, ক্ষণকাল জন্য স্থির নাই। অস্থির। সঙ্গে সঙ্গে গোঙ্গানী স্বরে থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার। অস্ফুট স্বরে দুই-একাট কথা কহিতে কহিতে বাম পার্শ্বে ফিরিয়া একটু স্থির হইলেন। মাথা নাড়িতেছেন। চক্ষু বন্ধই রহিয়াছে। ছট্‌ফট একটু যেন কমিয়াছে। নীরস স্বরে কি যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় কহিতেছে ঃ

"সেই, তার, আমারই দোষ। ঠিক ঠিক। ঐ ঐ অন্ধকারে ফাঁকি দিয়ে। তুমি কেঁদে অস্থির। তোমাকে শাক ভাত,—লালে ঘি কোরমা কত মেঠাই চাটাই, মাদুর, ওহো তুমি,

—লালে ফুল নরম বালিস গদী। উহু! এখন আগুন আগুন, পুড়ি পুড়ি।"

আবার সেইরূপ গোঙ্গানী আরম্ভ হইল। অস্থির। এবারে মহা অস্থির। অধিকন্তু মর্ম্মভেদী এক চীৎকার করিয়া আবার বালিসে মুখ লুকাইলেন। চীৎকারের উপর চীৎকার করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ও হাঁপানী সহিত মহা অস্থিরভাবে বলিতে লাগিলেন ঃ

"গেলেমরে! মলেমরে! ও হো হো। উঃ—যাব না যাব না, আমি যাব না। অগ্নিকুণ্ড মধ্যে যাব না, যাব না? ওরে! যাইতে পারি না—একটু জল, একটু পানি। গলা শুকাইল, বুক ফাটিল, ফাটিল।"

লাল আলু গ্লাসে করিয়া সুশীতল জল আনিয়া মুখের নিকট ধরিতেই চক্ষু খুলিল। হস্তাবরণ চক্ষুদ্বয়ের উপর হইতে সরিল। গ্লাসে এমনি জোরে ধাক্কা দিয়া নিক্ষিপ্ত হইল যে, গ্লাস ভাঙ্গিয়া কাচখণ্ড সকল ঝনঝন শব্দে বিছানায় ছড়াইয়া পড়িল। চক্ষুতারা দুইটি যেন ফুটিয়া, লাল আলুকে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় বিদ্ধ করিতে লাগিল। মুখে বলিল ঃ

"কি গরম! হায়! হায়! কি গরম জল! গলা হইতে পেটের নাড়ী পর্য্যন্ত পুড়িয়া গেল, গলিয়া গেল। দোহাই তোদের মা বাপ। বাবারে আমায় ছেড়ে দে! ওরে ছেড়ে দে! চুল ধরে টেনে নিস না, আমার গায়ে ব্যথা, সমুদায় অঙ্গে ঘা, আমি কেমন করিয়া ঐ অগ্নিকুণ্ড মধ্যে আগুনের বিছানায় ওকে লইয়া শুইব? দেখ, তোমার মনে দয়া নাই। ওরে একটু দয়া নাই— (চীৎকার) মরেছি! মরেছি!! মরেছি!!! তুমি সম্মুখে থাকতে আমার এই দশা।—স্বামী স্বামী! সোনার স্বামী। হা! অদৃষ্ট! আমি তোমার স্ত্রী—"

মনিবিবি একটু স্থির হইলেন। ভাবে বোধ হয়, অনুমানে বোঝা যায়, বিকার অবস্থায় চক্ষে নানারূপ বিভীষিকা দেখিতেছেন।—নরকের ছায়া চক্ষের উপর পড়িতেছে—স্বামীর ছবিখানিও যেন চক্ষের উপর ঘুরিতেছে। অত যন্ত্রণার মধ্যেও স্বামীর পদতলে যেই মস্তক রাখিতেছেন, স্বামীর ছবি সম্পূর্ণ মনে হইতেছে, একটু আরাম বোধ হইতেছে।

"তুমি দাঁড়াও! এই সময় গোটাকত কথা বলি। তুমি আমার দিকে স্নেহ দৃষ্টি করিলেই আগুনের জ্বলন্ত শলাকা সকল একটু ঠাণ্ডা বোধ হয়। অগ্নিশয্যা, অগ্নির বালিস, অগ্নিময় গৃহ যেন কতই শীতল বোধ হয়। যেই তুমি চক্ষের উপর হইতে সরিয়া পড়—যন্ত্রণা বাড়ে, কপাল পোড়ে, দেহ জ্বলে, দাউ দাউ করিয়া পোড়ে।"

পুনরায় প্রলাপ আরম্ভ হইল, "পুষ্করিণী, জল, ফুটী, তরমুজ, ফাঁকি, বেদনা, গোলাপ, সরবত, পরাটা, কোমলা, খেজুর, কত খাদ্য। ডিস্‌ভরা পেয়ালা পোরা। দিব না। দিতে ইচ্ছা হয় না। কি দিলাম। (হাস্য করিতে করিতে) হা হা, কি দিলাম।—চিড়ে, মোটা গুম চিড়ে খা—তোর কপালে যা—যার কপালে—"

এবারে বহুক্ষণ কথা বন্ধ হইয়া নিস্তব্ধ—পরে দুই হাত তুলিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেনঃ

"আমার জীবন শেষ হয়েছে।—(চক্ষু তারা বাহির করিয়া এক দৃষ্টে দালানের কড়ি-কাঠের দিক তাকাইয়া) আমার জীবন শেষ হয়েছে। তোমাকে যত প্রকারে কষ্ট দিবার,

তাহা আমি দিয়েছি। যত প্রকারে ফাঁকি দিবার, তাহা আমি দিয়েছি। যত পাপ মানুষের দ্বারা হতে পারে, তাহার অনেক বেশী আমার দ্বারা হয়েছে। তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে। হায়! হায়! আমি ঘোর পাপিয়সী। স্বামীকে চিনি নাই। স্বামী কি জিনিস, তাহা বুঝি নাই। ভাল মুখে একটি কথা বলি নাই, এক বিছানায় শুই নাই। আমার মন, এখন সকল কথা উত্তলে তুলে দিচ্ছে। মুখে বলে ফেল্লেই যেন যন্ত্রণা কম বোধ হয়, মনের ভার কমে যায়। যতই গুপ্তকথা প্রকাশ কচ্ছি, ততই যেন আরাম বোধ হচ্ছে।" আবার প্রলাপ ঃ

"দেখ! তুমি মাপ করো। তোমাকে ঠকায়ে তোমাকে ভুলায়ে তোমার চক্ষে ধূলা দিয়ে, কত পাপ করেছি, পাপসাগরে ডুবেছি। তোমার নিজস্ব শরীরের যে যে স্থানে অপরে ছুয়েছে, দেখ সেই সকল স্থান পচে গলে, হাড় পর্য্যন্ত জ্বর জ্বর হয়ে খসে পড়বার উপক্রম হয়েছে। দোহাই তোমার পিতা-মাতার। আমায় ক্ষমা কর।"

আবার যন্ত্রণা ঃ

"না না না না। (চক্ষু হস্তদ্বারা আবরণ করিয়া) না না, ক্ষমা চাব না। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে) না না, ক্ষমা চাই না—চাই না, বেদনা বেদনা। লোহার কাঁটার জিহ্বা বিদ্ধ কর না। ওগো! ও বাবা! আমি যাই, এখনই যাইতেছি। আর স্বামীর পা দুখানি চেয়ে দেখবো না, দেখবো না, সেদিকে তাকাব না। এখন তাকালে আর কি হবে? এখন মাথায় করে বসে থাক্‌লে আর কি হবে? তাহা আমি বুঝি। যাই যাই। আর মের না। ঐ অগ্নিময় সাপ। ও! উহু অগ্নিময় অজাগর—হাঁ হাঁ রবে জিহ্বা বার করে আসতেছে। ঐ আসল, ---ঠেকাও ঠেকাও। (দক্ষিণ বামে ভয়ে জড়সড় হইয়া) ধরল---আমায় ধরল—উহু!—আবার—প্রবেশ করল—প্রাণ বার হও—হলো—শাস্তি—স্বামি—স্বামি! পদ দুখানি বুকে—দেও—দেও—।"

প্রলাপ বন্ধ হইল। চক্ষুতারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নীচে নামিল, বহু যন্ত্রণা বহু ক্লেশের পর প্রায় দুই ঘন্টা কাল নিঃশব্দে অন্তর-জ্বালা ভোগ করিয়া মনিবিবির প্রাণবায়ু নাকে মুখে বিকৃত আকারে বাহির হইয়া গেল।

কান্নার রোল উঠিল। কন্যাগণ, দাস-দাসিগণ, পাড়া-প্রতিবেশিগণ সুর বাঁধিয়া কান্দিতে লাগিল। সকলের মুখেই এক কথা,—"নাই,—আর নাই। এত জ্বালা-যন্ত্রণা সকলই একেবারে মিটিয়া গেল—গেল।"

লাল আলু আর কে? তখন তার আদর করে কে? কন্যাগণ জামাতা ধুম্বলোচন কান্দাকাটিতে মনোযোগ দিলেন। লাল আলু ভাবিল, "এখানে আর থাকা নহে। কার মনে কি আছে, কি করে বুঝব? আমার প্রতি কাহারও ভালবাসা নাই। তবে যে একবারে ডেকে এনেছিলেন, সে দায় পড়ে। এখন আর সে দায় নাই। এখন সে কথাও নাই। কপালে যা থাকে, তা না হয়ে যায় না। সোনার টাকা হাতে তুলে দিলেও কপালগুণে তামা হয়ে যায়। যা কপালে ছিল, তা হল। আমি কি জানি যে এত শীঘ্রই মনিবিবির পরমায়ু শেষ

হবে। মোকদ্দমাই বা কেন যাবে? ভাবলাম কি, হল কি? এখন আমার শত্রুই চারদিকে। শত্রুই আমার সকল। মিত্র বলতে কেহ নাই। বিপদ-আপদে সাহায্য করবার লোক নাই। এখানে জামাইবাবু—মেয়েরা হাড়ে চটা। হাতে পলে অল্পে ছাড়বেন না। আমলা, বাজে চাকর, দাসদাসী, বাগানের মালী পর্য্যন্ত আমাকে দেখতে পারে না। সকলেই আমার কল্যাণে, আমার দোয়ায় হাড়ে হাড়ে ভাজা ভাজা হয়ে জ্বালাতনের একশেষ হয়েছে। আমার ছায়া পর্য্যন্ত তারা দেখতে ইচ্ছা করে না। পূর্ব্বে যাই দেখুক, এখন কদাকার দেখবে, চক্ষুশূল বোধ করবে। হঠাৎ কোন ফাঁদে আটকাতেই বা আটক কি? ওদিকে সোনাবিবি আসল মুষল চেঁছে রেখেছেন। এখন যাই কোথা? থাকি কোথা? বুড় বাপকে কত সাধ্য-সাধনা করে এনে নাজেহাল করে দিয়েছি। এখন ঐ অবস্থায় তাঁর কাছেই-বা মুখ দেখাই কি করে!! যাক্ আর সংসারেই থাকব না। ঘর-কন্নার ধার ধারব না। যার কপালে যা আছে, তা হক্। মন বড়ই অস্থির, বড়ই চঞ্চল। সর্ব্বদাই অশান্তি। মনিবিবির মৃত্যু-যাতনা—মৃত্যু সময়ের যন্ত্রণা দেখে, আর দুনিয়ার নাম করতে ইচ্ছা হতেছে না। সময়ে সময়ে ভয়ের ছবি চক্ষের উপর নৃত্য করিতেছে। দূর কর, এ সকল কাপড়ে কাজ নাই। দূর কর।"

লাল আলু সেই আম বাগানের বকুল তলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে ভাবিতে শেষে সাব্যস্ত করিল যে, "আর বাটীর মধ্যে যাব না। মৃত শরীরের শেষ ক্রিয়া, কাফন দাফনও দেখব না। বাটিতেও যাব না। এই আম বাগান হতেই ফকির হয়ে দেশ-দেশান্তর ঘুরে আল্লার আলম দেখে বেড়াব। দেখি, তাতে মনে শান্তি জন্মে কিনা? দেখি! উত্তপ্ত মন শীতল হয় কিনা?"

লাল আলু তখনি গায়ের অন্য অন্য কাপড় পুষ্করিণী জলে নিক্ষেপ করিল। মাত্র এক পরিধেয় আর উত্তরীয় লইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির হইল। কেহ দেখিল না। সকলেই মনিবিবির মৃত শরীর ঘিরিয়া কান্দিতেছে। আর যমদ্বারে প্রয়োজন নাই। যা বাকী ছিল, সময়ের চক্রে তাহা ঘটিয়া গেল। মনিবিবির অন্ত্য-ক্রিয়া দেখিয়া প্রয়োজন নাই। কন্যাগণ এক এক করিয়া ক্রন্দনের পরীক্ষা দিবে, জামাতাদের ক্রন্দন হইবে, দূরস্থিত আত্মীয়-স্বজন আসিয়া কান্দিবে। তাহার পর গোর খনন, মৃত-দেহ স্নান করান, নব বস্ত্রে আবরণ (কাফন), শেষ ধর্ম্মক্রিয়া জানাজা, তাহার পর "দাফন"—মৃত্তিকায় প্রোথিত হইবে। অনেক বিলম্ব। চলুন! কুঞ্জ-নিকেতনে বেগম ঠাকুরাণীর তত্ত্ব লইয়া, ভেড়াকান্তের মোকদ্দমার অবস্থা শুনি গিয়া। যমদ্বারের হাসি-খুসী, আনন্দে দেখিলাম। শোকের নিরানন্দ, পাপের পরিণাম, স্বামীর মনঃকষ্ট, শারীরিক কষ্ট দেওয়ার ফল, প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত মনিবিবির মৃত্যুশয্যায় মৃত্যুকালীন প্রলাপ, বিভীষিকা দর্শন চিত্র বিশেষ করিয়া দেখিলাম।

নাটক-অভিনয়ে, দৃশ্যপট, প্রবেশ প্রস্থান, যবনিকা পতন দেখিয়া, দর্শকগণ গৃহে গমনকালে পথিমধ্যে যেমন অভিনয়ের সমালোচনা করিতে করিতে যায়, সংসার রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃ নর-নারীগণের কার্য্যক্রিয়া অঙ্গভঙ্গী কথাবার্তা শেষ হইলে,—জীবন নাটকের

অভিনয় শেষ হইলে, দর্শক প্রতিবাসি আত্মীয়-স্বজনও সেই প্রকার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়। যাইতে যাইতে শুনুন—প্রতিবাসিগণ পরস্পর কিরূপ আলাপ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিতেছে।

মনিবিবির বাটীর নিকটেই ইহাদের বাস। মধ্যবর্ত্তী ভদ্র মুসলমান কন্যা। একজনের নাম সালেহা, অপর জনের নাম সালেমা। উভয়ে জগতের সুখ দুঃখের সাধ বুঝিয়াছেন—সন্তান-সন্ততি, স্বামী, মাতা-পিতা, সকলি বর্ত্তমান আছে। সম্বন্ধে ননদিনী আর ভ্রাতৃজায়া।

সালেমা পবিত্র কোরান পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় সালেহা আসিয়া বলিলেন, "ভগিনি! মনিবিবি নাই।"

সালেমা কোরান পাঠ বন্ধ করিয়া, কোরান চুম্বন ও মস্তকে স্পর্শ করত থলিয়ার মধ্যে সযত্নে রাখিতে রাখিতে বলিলেন, "ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন। "হা! সেদিন শুনলাম একটু ভাল। আজ এ কি হলো? মানুষের আশা ভরসা বৃথা। বাঁচাই আশ্চর্য্য, মরণই নিশ্চয়। খোদা ওঁর বেহেস্ত নসিব করেন, আমরা এই প্রার্থনা করি।"

সালেহা একটু খারা স্বভাবের, উচিত কথা বলিতে কাহাকেও ভয় করেন না। মন যোগাইতে ন্যায্য কথা চাপিয়া দাবিয়া রাখেন না। যাহা মনে আসে, স্পষ্ট বলিয়া ফেলেন। কিন্তু বেলয়, বেজায়, বেহুদা কথা মুখে আনেন না। সালেহা বলিলেন ঃ

"আর দেখলেম—লাল আলু মোল্লা মলিন মুখে, খালি মাথায় খালি পায়ে হন্ হন্ করে ঐ গলি রাস্তা হয়ে চলে গেল। কয় দিন? ভগ্নি! দুনিয়ার বড়াই কয় দিন? এইত আমরাই দেখলাম। এই চক্ষেই লাল আলুর বাদসাই দেখলাম। আজ ফকিরিও দেখলাম। শেষ ফলতো এই হয়! হায় রে! সোনার স্বামী বেঁচে থাকতে কত কষ্টই না দিয়েছে।"

সালেমা—"সে ভোগও ভুগেছে। আর কি চাই? এই যে সাবান ঘষা,— উপটন্ মলা শরীর, শেষ দশায় কি হলো?"

সালেহা—"ছাই হলো। কি হলো? পোকা পলে ত বুঝতেম। খালি রক্ত পুঁজ পড়ে গলে আর কত কি হলো। মনে হয় না? দেখ দেখি! মনিবিবির স্বামীর কষ্টের কথা শুনে তুমি আর আমি দেখতে গিয়েছিলেম। কি দেখলে? খোদা কি ঐ দেখাবার জন্যই আমাদিগকে ঐখানে সেদিন নিয়ে গিয়েছিলেন?"

সালেমা—"কৈ, আমার ত মনে হয় না। কোন্ দিন? কত দিনই ত তাঁর ব্যারাম দেখতে গিয়েছি। লোকজন যখন কেউ সেখানে না থেকেছে, কেন্দে কেন্দে কত কথাই না বলেছেন। এঁরাই বড়লোক হয়ে,—মনিবিবিই বড় বিবি সেজে আর কুটুম্ব বলে চিনতেন না। তাঁর স্বামী আমাদিগকে ভালই বাস্তেন্।"

সালেহা—"মনে হয় না? মানিক মিয়াঁ (মনিবিবির স্বামী) একখানা মাদুর—তার উপর ছেঁড়া একখানা কাঁথা পাড়া, ছেঁড়া একটা বালিস মাথার, উঠিবার শক্তি তখন নাই। মুরগীর সুরুয়া খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, কত দিন বলে বলে ঘেঙ্গায়ে ঘেঙ্গায়ে মুরগীর সুরুয়া সেদিন পেয়েছিলেন। সুরুয়ার পেয়ালা সেইখানেই আগলা পড়ে রয়েছে, খান নাই, বেদনায় অস্থির

হয়েছেন। মনিবিবি সেই সময় জরির কাঁচলি এঁটে, বানারসী সাড়ী পরে,—কেরেপের চাদর উড়িয়ে, হীরামতি সোনার অলঙ্কারে একেবারে হুর-পরি সেজে, দাঁতে মিশি ঘসে তার উপরে পান চিবাতে চিবাতে আসলেন। গায়ে আতর গোলাপের খুস্‌বু ভুর ভুর করে ছুটেছে। স্বামী রোগে জ্বর জ্বর, মর মর, আর খেদমত খাদিমিও ঐ প্রকার। গায়ের উপর হাতখানা দিয়ে যে মশা মাছি তাড়ায়, এমন লোক একটি কাছে নাই। বিবি সাহেব এসেই নাকে রুমাল দিয়া বিছানার তফাৎ দাঁড়াইলেন। জুতা দিয়া ছেঁড়া মাদুরটা একটু একটু সরাইয়া বলিলেন, কর্কশ স্বরে বলিলেন, 'সুরুয়া তয়ের কর্ত্তে বুঝি পয়সা খরচ হয় নাই? মেহনত লাগে নাই। ভালাই চাস ত উঠে খা।' মানিক মিয়াঁর সে সময় বেশী কথা বলবার শক্তি ছিল না। গাঙ্গানি স্বরে আস্তে আস্তে বলিলেন, 'এত নুন হইয়াছে যে মুখে দেওয়া যায় না।' এই কথা যেই বলেছেন, মনিবিবি সুরুয়ার পেয়ালাটা পায়ে লাথি দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন। প্যালাটা ভেঙ্গে গেল না। সুরুয়া গুলা কতক মানিক মিয়াঁর গায়, কতক বিছানায়, কতক মাটির উপর গড়িয়ে পড়ে গেল। মনিবিবি চোক্ মুক বাঁকা করে, রাগে রাগে বল্‌তে লাগলেন—কে আছিস ডাক লালকে, শিগ্‌গির ডাক লালকে। আমি সুরো রাঁধিয়েছি তাই বলে নুন হয়েছে? শিগ্‌গির ডাক। ঐ পড়া সুরা একজন হাতে কেঁখে উঠা, আর একজন আমার লালকে ডাক। দেখ সুরা খাওয়াই কি করে। এই সুরো খাওয়াবো তবে ছাড়বো। যদি না খায় ত বিষ খাওয়ায়ে মেরেই ফেলবো। কাঁহাতক বরদাস্ত হয়। এতো টানাটানি কে কর্ত্তে পারে? আন্ লালকে—শিগ্‌গির ডেকে আন্। মানিক মিয়াঁ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে—আহা! উঠবার শক্তি নাই, একবার উঠতে চেষ্টা করে বালিসে ভর দিয়ে উঠে বসতে চান, আবার পড়ে যান—পড়ে গিয়ে বালিসের সঙ্গে মাথা ঘসেন, আর দুই হাত বাড়িয়ে বিবির দুখানি পা ধরতে চান। নাকী-সুরে বললেন—'দেও, আন, আমি খাব। তোমার পায় ধরি।' এই কথা বলে অতি মেহনতে হাঁক ছাড়তে ছাড়তে একটু উঠে হাত দুখানি জোড় করে, এক-একবার বিবির জুতার নিকট মাথা রাখিয়া আবার মাথা তুলিয়া হাত জোড়ে বলিতে লাগিলেন—'দোহাই তোমার খোদা রসুলের। আমায় বিষ দিয়ে মারিও না। আমি সুরুয়া খাব। ঐ পড়া সুরাই আমি খাব।"

সালেহা বলিলেন, "তোমার পায় ধরি, আমি হাত জোড় করে বলছি। আর শুনতে চাইনে। মনে হয়েছে। আর বলো না। ও কথা মুখে এনো না। আমার মনে হয়েছে। লাল আলুর নাম শুন্‌তে ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো। তারপর মনিবিবি বল্লে, 'খা ঐ পড়া সুরুয়া, নিজে হাতে তুলে চেটে চেটে খা। না খাবি ত খাঁটি আজ বিষ খাওয়ায়ে মারবো। আর বরদাস্ত হয় না। এত খেজালত জানে সয় না।' প্রাণের ভয়ে মানিক মিয়াঁর দুই চক্ষের পানিতে বুক ভেসে যেতে লাগল। পাষাণী কি তাই দেখে নরম হয়—তা হলো না। আরও গরম নজরে বলতে লাগলো, 'কেমন? এখন কেমন? নুন নাকি বেশী হয়েছিল? শিগ্‌গির খা।' আর বল্‌তে পারি না—খোদায় ভাল করুক, গোনাই মাফ হোক।"

এই প্রকার ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, পুরুষে স্ত্রীলোকে, মনিবিবির জীবনের গত

কথা, গত কার্য্য, গত ঘটনা সকল উল্লেখ করিয়া কত কথা বলিতেছেন।

কেহ বলিতেছে, "আহা! মানিক মিয়াঁ মরার আগে কি জমিদারী মনিবিবিকে লিখে দিয়েছিল, তা নয়। মানিক মিয়াঁর মরার লাস তাজা আছে বলে, দুদিন ঘরে রেখে এক কৃত্রিম হেবানামা তয়ের করে মেয়েগুলোকে ফাঁকি দিল। টাকার অসাধ্য ত কাজ নাই। মরা মানুষের দেওয়া দলিল সাক্ষরী যোগাড়ে রেজেষ্ট্রি হইল। যে লাল আলু সোনার খাটে শুয়েছে, রূপার চৌকিতে পা দিয়েছে, রাজভোগে উদর পূর্ণ করেছে. দশটা বেদানা নিঙ্গড়ে প্রাতে প্রতিদিন সরবত খেয়েছে, পেস্তা বাদাম আঙ্গুর সর্ব্বদা মেজে ধরা রয়েছে। মনে উঠ্‌লে যেন আর অভাব বোধ না হয়, সে লাল আলুর দশাও ত এখনি চক্ষে দেখলেম। হায়রে দুনিয়া! হায়রে দুনিয়া! দেখবে! ঐ যে দাগাদারী? ওর কপালেও শেষে তস্‌বিদানা আর আলখেল্লা আছে।"

পাঠক! ইষ্টিমার ইন্‌জিনে কত বল? রেলওয়ে ট্রেনের গতির শক্তিই বা কত? ব্যোমযান বেলুনের ক্ষমতাই বা কি? প্যারাসুট বিস্তারে বায়ুভরে আশ্রয় পাইবার পূর্ব্বে, বেলুন হইতে পতনের গতিরই বা মূল্য কি? তীরগুলি গোলার দ্রুত বেগ ধরিবার মধ্যেই নহে। বিদ্যুতের পরিচালন দ্রুত শক্তির সমকক্ষ নহে। মনের গতি আর কল্পনার রথের নিকট কিছুই নহে, সকলই পরাস্ত। ধারণার অতীত, বক্তব্যের বাহির। এক সেকেণ্ডের মধ্যে সমগ্র জগৎ একবার ঘুরিয়া আসা যায়। আমাদের গতিবিধি যাওয়া আসা কল্পনার রথেই হইয়া থাকে। এই যমদ্বারের নিকটস্থ প্রতিবাসিগণের বসতি ছাড়িলাম। আবার ঐ কুঞ্জ-নিকেতনে, বেগম ঠাকুরাণীর বাসগৃহের পশ্চাৎ খিড়কির দ্বারে আসিলাম। সম্মুখে পালকি বেহারা। এমন ঘোর সন্ধ্যার সময় বেগম ঠাকুরাণীর বাড়ীর মধ্য হইতে, এরূপ অভাবনীয় বেশভূষার একজন পুরুষ চুপি চুপি পা ফেলিয়া বাহির হইতেছে। কে ও? যায় কোথা? পাল্‌কির নিকটেই আসিতেছে, বোধ হয় পাল্‌কিতেই উঠিবে। যা হোক, পালকি উঠিবার পূর্ব্বেই রূপটা কলম বন্ধ করি। মাথায় লাল রঙ্গের বানারসী দোপাট্টার শীক ধরনের বৃহৎ পাগড়ি। গায়ে ঘন বোতামের ইহুদীদিগের ন্যায় রঙ্গিন সদরি, কিম্‌খাবের চোগায় স্কন্ধ হইতে পদ পর্যন্ত আবরিত। পরিধেয় বনাতের আরবী পায়জামা, অতিশয় ঘন কাল প্রায় নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত। গোঁফ মানানসই। নাসিকার নিম্ন হইতে ওষ্ঠ অধর ঢাকিয়া থুতির কতক অংশ ঢাকিয়া পড়িয়াছে। হাতে কুকুরমুখো হাড়ের হাগুল-যুক্ত মোটা বেতের ছড়ি। পায় বুট্‌। বুটের গড়ন কিছু ভিন্ন আকৃতির। খুর দুটি খুব ছোট, অথচ উঁচু খড়মের মত উঁচুতে যে চিনে, সে দেখিলেই বলিবে সে লেডীবুট্‌। ত্রস্তপদে নরমূর্ত্তি পালকিতে উঠিয়াই পাল্‌কির দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। চারজন মজবুত বেহারা অতি কষ্টে পাল্‌কি ঘাড়ে করিয়া, ঘাড় নোওয়াইয়া দ্বার বিশেষে বায়ু ত্যাগ করিতে করিতে চলিল। সঙ্গে মাত্র একটি চাকর। সেও ঐ পথে আসিয়া পাল্‌কির পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল। যেখানেই যাউক সন্ধান লইতেই হইবে, যেখানেই যাউক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে।

ক্রমে সহর ছাড়িয়া গ্রাম্যপথ ধরিল। প্রায় রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত গ্রামের মধ্যের সঙ্কীর্ণ পথ

দিয়া কত বাঁশবন বেতের ঝাড় ভাঙ্গিয়া, এর কানাচি ওর গোশালার পিছন দিয়া পাল্‌কি যাইতে লাগিল। সঙ্গের চাকর দৌড়িতে দৌড়িতে বড়ই ক্লান্ত হইল। কি করে। ঐ ক্লান্ত অবস্থাতেই পাল্‌কির সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ঝাড়্ জঙ্গল গ্রাম ছাড়িয়া আর এক ময়দান পার হইতে হইতে রাত্র অনুমান দশটা বাজিয়া গেল। বহু দূরে আলো জ্বালিতেছে। পাল্‌কি আলো লক্ষ্যে চলিল। যাইতে যাইতে দেখা গেল, একটি বড়লোকের বাড়ীর সদর দেউড়ির ফটকের মধ্যে দেউড়ি ঘরের নিকট পালকি থামিল। আরোহী দ্বার খুলিয়া বসিলেন।—বাড়ীর কর্ত্তা না আসিলে আদর অভ্যর্থনা না করিলে পাল্‌কি হইতে নামা হইবে না। আদর করিলেই গোল চুকিয়া যায়। বাবুর নিকট সংবাদ গেল যে, খুব ভারি এক বড়োলোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। উকিল বাবু তাড়াতাড়ি আসিয়াই পাল্‌কির মধ্যে নজর পড়িতেই থতমত খাইলেন। পাল্‌কির আসার কথা শেষ রাত্রে ১২টার পর ৩ ঘটিকার মধ্যে। বোধ হয় সে পাল্‌কি নহে। চেহারা ভয়ঙ্কর। দাড়ী গোঁপে আরও ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে। বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনে বুঝিয়াছে, উকিল মানুষ কত জনার সঙ্গে আলাপ। কত জনে কত কার্য্য উদ্ধার জন্য উকিল বাবুর নিকট আইসে। আগন্তুক কোন মামলা মোকদ্দমার জন্যই আসিয়া থাকিবেন।

উকিল বাবু কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। নাম জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতে চান্, অসভ্যতা প্রকাশ পায়। উকিল বাবু প্রথম খবর শুনিয়াই মনে করিয়াছিলেন যে, "বেগম ঠাকুরানীর আসার কথা আছে। কিন্তু সে এ রাত্রে নয়। তাঁহার পত্রে লেখা "১২টার পর তিনটার মধ্যে, ঠিক সময় দিতে পারি না, অনেক কারণ আছে।" এই ত আমার পকেটে আছে। ভেবেছিলেন, কাজের সুবিধা করতে পেরেছেন। শীঘ্র শীঘ্রই এসে পড়েছেন। কালই যখন মোকদ্দমার দিন, আর থাকবেনই-বা কি করে? তিনিই এসেছেন—তা না হলে আর কে রাত দশটার সময় আস্‌বে?

এই সিদ্ধান্ত করিয়াই উকিল বাবু আনন্দ প্রফুল্ল মুখে অভ্যর্থনা করিয়া নামাইতে আসিয়াছেন। আসিয়া একটু দূর হইতে পাল্‌কির মধ্যে দেখিয়া অবাক—ক্ষণকাল এই প্রকারে অতিবাহিত হইলে—উকিল বাবুর জ্ঞান জন্মিল। বেহারা পাল্‌কি চেনা। সঙ্গের লোকটিও চেনা। অচেনা কেবল পাল্‌কি নিসিন্। খোদ কর্ত্তা বুদ্ধির গোড়ার জল আসিল, হঠাৎ অগ্রসরও হইতে পারেন না। দক্ষিণ বামে উপযুক্ত পুত্রদ্বয়, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা। ভদ্রলোক, বিশেষ পালকিতে আসিয়াছেন শুনিয়া—সকলেই দেখিতে আসিয়াছেন ; ভাগ্যে উকিল বাবু অপর কাহারও নিকট হঠাৎ চেহারা দৃষ্টে বলিয়া ফেলেন নাই যে এ লোকের সহিত আমার চেনা পরিচয় নাই।

উকিল বাবু পাল্‌কির মধ্যে হাত দিয়া ধরিয়া নামাইয়া আনিলেন। অগ্রে অগ্রে করিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া অতি সমাদরে বসাইলেন। আকার ইঙ্গিতেই সাবধান হইয়া গেল। যমদ্বারের মৌলবী সাহেব বলিয়া আর আর সকলের নিকট পরিচয় দিলেন। মৌলবী সাহেব বাঙ্গালা জানেন না। আসল পাঞ্জাবী, আরবী ফারসীতে মহা বিদ্বান। বেশী কথা

বলেন না। দুই এক কথা যাহা বলা, তাহা উকিল বাবুর সহিত বলা কহা হইল। অন্য অন্য পরিজনেরা দেখিলেন, পাঞ্জাবী মৌলবীর সহিত আলাপে সুখ নাই, কথাই চলে না, শুধু বসিয়া থাকিয়া ফল কি? ক্রমে ক্রমে একে একে উঠিয়া গেলেন। বেহারাগণ চাল দাল সিদা পাইল। সঙ্গের লোকটির খুব আদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইল। বেহারাগণের আহারান্তেই গমন করিবেন। উকিল বাবু মাত্র জলযোগের আয়োজন করিলেন।

জলযোগের খাদ্য সামগ্রী আনিয়া টেবিলে সাজান হইল। খানার ঘরে মৌলবী পঞ্জাবী, উকিল বাবু জলযোগ করিতে টেবিলে বসিলেন। উকিল বাবু বলিলেন, "সাহস ত কম নয়!"

পঞ্জাবী—"এ আর কথাটা কি?"

উকিল—"ব্যস্ত কেন?"

পঞ্জাবী—"সপ্তাহ গেল, পক্ষ গেল, মাস গেল, দেখা হল না। আর ব্যস্ত কেন? ভেড়াকান্তর মোকদ্দমা যে আগামীকল্য।"

উকিল—"তাতে আমার কি কর্ত্তে হবে?"

পঞ্জাবী—"সে কি! তোমার কি কর্ত্তে হবে? এ দেখি যেন নূতন ভাব, নূতন আলাপ, নূতন কথা।"

উকিল—"না নূতন কথা কিছু নহে। আমার খুব মনে আছে। স্নান করতে যাওয়ার কথা মনে আছে। গাজী মিয়াঁর বস্তানীর কথা মনে আছে। আরও মনে আছে, সংকীর্ত্তন মনে আছে। আরও মনে আছে! আরও মনে আছে!"

পঞ্জাবী—"ভাল! যত মনে থাকে ততই ভাল। এখন কথা কি? মান ভাঙ্গলো কিনা?"

উকিল—"হলই-বা কবে? আর ভাঙ্গলোই-বা কিসে?"

পঞ্জাবী—"তা হবে, পাওয়া যাবে। কাল কোর্টে উপস্থিত হবে কিনা তাই বল?"

উকিল—"কোর্টে যাব তার আর বলাবলি কি? মোকদ্দমা নিব। বায়না দিবেন কত টাকা?"

পঞ্জাবী—(মনে মনে বিরক্ত হইয়া) "সত্যি সত্যি তুমি টাকা চাও?"

উকিল—"টাকা চাই না? টাকাই আমাদের পুত্র, টাকাই পরিবার, টাকাই বন্ধুত্ব, টাকাই সকল। টাকা! টাকা! টাকা ছাড়া কোন কথা নেই।"

পঞ্জাবী—"আচ্ছা দেওয়া যাবে।"

উ—"তা হবে না। দেওয়া যাবে বল্লে শুনি না। আপনার ত আর নিজের কাজ নয়? জমিদারের কাজ।" এ কথাগুলি উকিলবাবু খুব বড় বড় করে বল্লেন যাতে বাহিরের লোকে শুনিতে পায়। "নগদ কথা নগদ কাম।"

পঞ্জাবী—"সঙ্গে ত আর টাকা আনি নাই।"

উ—"তবে আমার যাওয়া হল না। আমি কখনই যাব না, যার বিরুদ্ধে যাব, সে হলো আমার বন্ধু ব্যক্তি। বেশী টাকা না দিলে তার বিরুদ্ধে আমি কিছুতেই যাব না, এ খাঁটি কথা।"

পঞ্জাবী—"আজকাল টাকাই দেখছি প্রাণ, টাকাই দেখছি জান্। টাকার কাছে সকলি হার মেনে পালান।"

উ—"হার মানুক আর যাই করুক, কেউ বেজারই হক, খুসীই হক্ নগদ টাকা হাতের উপর না পেলে আমি কখনই উঠব না।"

পঞ্জাবী মৌলবী অনেক কাকুতি মিনতি, শেষ জোড়হাতে কত মতে বলিলেন। উকিলবাবু কিছুতেই শুনিলেন না। উকিল বাবুকে না নিলেও মৌলবীর মনে বিশ্বাস জন্মে না। মনে বিশ্বাস যে এই উকিল বাবুর কথা হাকিম সাহেব বিশেষ মান্য করেন, বিশেষ ভেড়াকান্ত নিজের প্রাণরক্ষার জন্য অবশ্যই ভাল উকিল দিবে, হাজার হইলেও বিচার আসন আইনের সঙ্গে খেলা। কোন্ আইনে কোন্ নজিরে আসামী খালাস করিয়া নিবে, শেষে এত দিনের আশা-ভরসা অর্থব্যয়, শরীর ক্ষয়, রাত্রি জাগরণ, সকলি বৃথা হইবে। উকিল দাও পাইয়াছে, এক হাত মারিবেই। আমার ধড়ীবাজী, চালাকী চাতুরী, কোনই কাজে আসিল না। শেষে নাচার হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা এক কাজ কর—কালি কলম আন, আমি হ্যাণ্ড-নোট লিখে দিচ্ছি।"

উকিলবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হ্যাণ্ড নোট। আচ্ছা তাই দিন।"

উকিল বাবু তখনি হাত-বাক্স আনাইয়া দোত কলম কাগজ বাহির করিয়া দিলেন। হ্যাণ্ড নোট লেখা আরম্ভ হইল। টাকার অঙ্কপাত সময়ে মৌলবী জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকা লিখ্‌বো?"

"উ—"ক দিন হবে তাত বলতে পারি না। একটা চুক্তি হোক দশ দিন, বিশ দিন, পাঁচ দিন, দু'দিন যাই হক, মোকদ্দমা চুক্তি হাজার টাকা। হাজার টাকার অঙ্কপাত কর—আর সুদের হারটা লেখ শতকরা পাঁচ টাকা। আমি সুদ নেব না, বেশী লেখা থাক্‌লে শীঘ্র দেবার ইচ্ছে হবে।"

মৌলবী অনেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু ভাবি ভোলবার নয়, কিছুতেই টলিবার নয়। উকিল বাবুর যে কথা সেই কাজ। হাজার টাকার হ্যাণ্ড নোট লেখাইয়া লইয়া, বাক্স হইতে আটাল-রসীদ ষ্ট্যাম্প বাহির করিয়া নাম সহি করিয়া লইলেন, হ্যাণ্ড-নোট বাক্সে বন্ধ করিয়া বলিলেন, "এই ত মিটে গেল—এর জন্যে এতক্ষণ সময় নষ্ট করা হল কেন?"

মৌলবী "তা হক, হয়েছে ত এখন ত তার আর কোন আপত্তি নাই। আমি আর থাক্‌তে পারি না। নিতান্তই জেদ করে বসলে যাবে না। হ্যাণ্ড-নোট লিখে দিলেম আর কথা কি?"

উঃ—"কথা কি শেষ হয়? আরও কথা আছে। আমি যা বলবো, তা খোলাসা বলবো। মনে এক মুখে আর—দুই ভাব আমি জানি না। আমার আগের পাওনা সুদে-আসলে হিসাব করে দেখেছি তিন হাজার হয়েছে। তার একখানা দলিল লিখে দিতে হবে। আর সেদিন হতে যাই নাই। যাব না বলেই মনে করেছিলাম। তা তোমার পত্র পেয়ে মনটা কেমন করে উঠলো, তাই লিখেছিলাম—আচ্ছা, রাত্র দুটার সময় এলে ভাল হয়। তা

বেশ করেছ, এতে আর কেউ জানতে পারবে না, দেখলেও চিনতে পারবে না। এখন এক কাজ কর—টাকা যখন তোমার ইচ্ছে হয়, দিও। এখন আর একখানি হ্যাণ্ড-নোট তিন হাজার টাকার চাই।"

মৌলবীর মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। এলেন ফাঁদে ফেলে আটকে কোমরে দড়ী বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবেন। তাত হলো না। এখন নিজেই ফাঁদে আটকা পড়িতে হইল। কোন বুদ্ধিই সে সময় কাজে আসিল না, কথাটি বলিতেও অবসর হইল না। কাগজ কলম হাতে করিয়া লিখিতে হইল। ফাঁদে আটকা পড়িয়াছেন। কোন উপায় নাই। মুখখানি ভারী করিয়া আর একখানা তিন হাজার টাকার হ্যাণ্ড-নোট রীতিমত লিখিয়া উকিল বাবুর হাতে দিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৌলবী বলিলেন, "দেখ আর কিছু চাই কিনা?"

উঃ—"না না, আর কিছু চাই না। এখন মাজায় কাপড় বেঁধে লেগে যাব। দশটার পূর্ব্বেই কাচারিতে উপস্থিত হবো।"

উকিল বাবু খুব ভালবাসা দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ! কাজ উদ্ধার জন্যে সকলি কর্ত্তে হয়। জগতে কাজ উদ্ধারই কথা।"

মৌলবী মাথাটা একটু নত করিলেন। নত করিবার কারণ বুঝিলাম। একটু লজ্জিত হইলেন। তাঁহার কলমেও কোন দিন ঐ কথাটা বাহির হইয়াছিল। কার্য্য উদ্ধারই আসল কথা। যাই হউক, উভয়ের মধ্যে স্বার্থ যোগ হওয়ার নিখুঁত খাঁটি প্রণয় পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও রহিল না! শীঘ্র শীঘ্র ছাড়াছাড়ি হইলে উভয়ে রক্ষা পান। অনেক রাত হইয়াছে বলিয়া, মৌলবী ফাঁত ফাঁত করিয়া উপর্য্যুপরি দুই তিনটি নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বিদায়ী সম্ভাষণ করিতে কাহারও মনে হইল না। হাত উঠিল না। তাড়াতাড়ি পাল্‌কিতে উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বেহারাগণ, "জয় কালী মায়ী কি জয়!" বলিয়া পাল্‌কি উঠাইল। উকিল বাবু শয়ন কক্ষে যাইয়া স্ত্রীর নিকট সমুদায় রহস্য দশগুণ বাড়াইয়া বলিলেন। একটা কথা রটিয়া উকিল বাবুর স্ত্রীর মন যে ভারী হইয়াছিল—আজিকার মৌলবী কাণ্ডে তাহা একেবারে পাতলা হইয়া গেল। উকিল বাবু গৃহিণীর নয়ন-বাণে বিদ্ধ হইলেন। ডবল চুম্বনে এবং বিঘোর আলিঙ্গনে স্বর্গসুখ হাতে পাইলেন। উকিলবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "ছি ছি! এদেশের মুসলমান বড় ঘরের স্ত্রীরা—এইরূপ সাজ সেজে পরপুরুষকে ভুলাইতে আসে। ছি ছি!! বড় ঘৃণার কথা!"

উকিলবাবু বলিলেন, "যারা বার বাজার ঘুরে, স্বাধীনতার মাথায় চড়ে, তাদের দশাই এই। সকল ঘরে এরূপ নয়। যে স্বাধীনভাবে ঘরের বাহির হয়ে যথেচ্ছা বেড়ায়, হাটে ঘাটে বাজারে সহরে মেলায় দশ মর্দ্দের মজলিসে যোগ দেয়, তাদেরই এই দশা। তারাই পুরুষ সাজ সেজে পুরুষের দলে ফেরে, রাত হয়েছে, ঘুমন যাক।"

"বেগমের সাজ-গোজ, লম্বা দাড়ী, আর পাগড়ী বাঁধার কেতা দেখে আমার চক্ষে ঘুম নাই। বাপ্‌রে! কি সাহস! শুন আর একটি কথা বলি।"

সে ঘরে কেহ নাই, অথচ স্বামীর মুখের উপর মুখ রাখিয়া কানে কানে একটি কথা

বলিয়া প্রকাশ্য বলিলেন, "আমার অনুরোধ। দেখত নচ্ছার জেলার সেই সময় আমার বাড়ীতে আসত, লুচি তরকারী খেত, কত গল্প কর্ত্তো, বই কখানা আমি চাওয়া মাত্র দিলে, আমি গিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কল্লেম, কত ভালবাসা হলো। আমার অনুরোধ—"

উকিল বাবু বলিলেন, "যে, যেমন, তার সঙ্গে সেই রকমই কর্ত্তে হয়। আমার মনে আছে—তুমি দেখ। তোমার কথা আগে, না অন্যের—"

"দেখাই যাবে, প্রভাতেই পরীক্ষা।"

স্বামী স্ত্রী শয়ন করিলেন। ওদিকে সুদীর্ঘ দাড়ীমুখী, বৃহৎ পাগড়ীধারী বেগম ঠাকুরাণীর পালকি, মাঠ ঘাট, জঙ্গল পথ, ভাঙ্গিয়া কুঞ্জ-নিকেতন অভিমুখে চলিয়াছে। মনের মধ্যে নানা কথা ঃ

"কি করতে আসলাম। কি করে চললাম। ওর পত্রের অর্থে ভুলে এসে ভাল কাজ হয় নাই। হাতে পেয়ে খুব ঠকিয়েছে। আর চারা কি?"

নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে, প্রভাতের কিছু পূর্ব্বে কুঞ্জ-নিকেতনের সেই খিড়কির দ্বারে পাল্‌কি থামিল। বহুরূপী বেগম মনের দুঃখে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে, গৃহে প্রবেশ করিয়া কৃত্রিম বেশ ছাড়িয়া শয্যায় পড়িলেন। যেই পতন অমনি নিদ্রা। বেলা দশটার সময় নিদ্রা হইতে উঠিয়াই একখানা পত্র বেয়ারার হস্তে পাইলেন। পত্রে লেখা ঃ

"বেগম! আমার শরীর অসুখ হওয়ায় অদ্য কোর্টে উপস্থিত হইতে পারিলাম না, অন্য দিনে দেখা যাইবে।" ইতি—

আপনার স্নেহের ভ্রাতঃ।

পত্র পাঠ করিয়া বেগম স্থির ভাবে কতক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "ও অসুখ রাত্রেই জানতে পেরেছি। ঠকার উপর ঠকা। নাক মলা, কান মলা, তার উপর আর কিছু,—কি চালাক কি ধুরবাজ! কি ধড়িবাজ! এক ধূর্ত্ত সেই শিকলী কাটা, আর এক ধূর্ত্ত আকালের বন্ধু! এত ঠকান কেউ ঠকায় নাই, কেউ পারে নাই।"

পাঠক! শেষ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া এ নথি শেষ করি। ঐ দেখুন আজ কত দর্শক কাচারির নিকট ঝাউতলা, শান বাঁধা বকুল তলায় যাইয়া বসিয়াছে। কত দর্শক কাচারি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভেঁড়াকান্তের মোকদ্দমা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বারটা বাজিয়া গেল, বিচারপতি এজলাসে আসিতেছেন না। কেন আসিতেছেন না? তাঁহার বাসায় এক দরবার বসিয়া গিয়াছে। হাকিম, বড় হাকিম, মাঝারি হাকিম, নকল হাকিম, দুই তিন জন প্রধান প্রধান আমলা, আরদালী, মহাজন, জমিদার, তালুকদার, জমিদারদিগের আশা সোটাধারী আরদালী বাহিরে খাড়া আছে।

সোনাবিবির সহিত জয়ঢাকের আপোষের কথার পরামর্শ মীমাংসা সকলি হইতেছে। হাকিমানসহ সাবলোট সাহেব জয়ঢাককে সঙ্গে করিয়া সোনাবিবির বাটীতে গিয়াছিলেন। মাতা-পুত্রে অনেকক্ষণ ক্রন্দন আপ্‌শোস হইয়াছে। দুই তিনটি কথার আপত্তিতে আপোষ হইতেছে না। সে সকল কথা পাঠকগণের শুনিবার তত প্রয়োজন নাই। ঘরাও কথা পরের

কানে যাওয়া বর্ত্তমান সভ্যতার বিধি-বিধান বিরুদ্ধ। যাঁহারা সংশ্রবী, তাঁহারাই শুনুন।

ইতিমধ্যে হঠাৎ মনিবিবির মৃত্যু-সংবাদে জয়ঢাক ও সাবলোট অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। আপোষের কথা অদ্য এই পর্য্যন্ত রাখিয়া অন্য দিনে অবশিষ্ট কথার মীমাংসা হইবে স্থির করিয়া তাঁহার যমদ্বারে চলিয়া গেলেন। হাকিম সাহেব এজলাসে আসিয়া—ভেড়াকান্তর মোকদ্দমায় কয়েকটি জবানবন্দী করিয়া ১৪ দিন পর দিন ফেলিলেন।

ভেড়াকান্ত আসামী দুই শত টাকা জামিন দিয়া বাড়ীতে আসিলেন।

অষ্টাদশ নথি

লোকে বলে, যাদুমন্ত্রে মানুষের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হয়। সময় সময় শুনা যায়, অনেক কামাতুর নরপিশাচ, কোন রমণীর রূপে মজিয়া, কথায়, কৌশলে, লোভে, তাহাকে বাধ্য করিতে না পারিয়া গুরু অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। গুরুজীর কৃপায়, ছিটে-ফোঁটা, তুক-তাক, তন্ত্র-মন্ত্র, মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি বশীকরণ মন্ত্রের বলে, অবলা বালা পাগলের প্রায় হইয়া সতীত্ব ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়। কিন্তু সতী-সাধ্বী পতিব্রতা, পতিগতপ্রাণা যুবতীর ধর্ম্মতেজের নিকট কল-কৌশল, মন্ত্রতন্ত্র কিছুই খাটে না। গুরুজীর কোন বিদ্যাই কার্য্যকরী হয় না। যাহাদের ধর্ম্মমূল শিথিল, গোড়ায় ফাঁক, মনের মধ্যে রোগের হাঁড়ী, তাহারই মন্ত্রে-তন্ত্রে কৌশলে, ফাঁদে পড়িয়া, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ছট্‌ফট্‌ করে, অসহ্য হইলে নারী-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া মুখে কালি চুন মাখিয়া দ্বার প্রশস্ত করিয়া দেয়। কত স্বামী দিব্বি সুন্দরী স্ত্রীকে দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না। কি মারাত্মক কথা! স্বামী হৃদয়ের ধন স্ত্রীকে দেখিতে পারে না। যাহার জন্য সংসার, যে স্ত্রীর জন্যে দুনিয়াদারী, জগতে কেনাবেচা, যাহার জন্য জীবন, তাহাকে দেখিতে পারে না, এ কথার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান না করিয়া, মূল কারণ অন্বেষণ না করিয়া, না খুঁজিয়া, না দেখিয়া, পানপড়া, তেলপড়া, মাদুলী, তাবিজ, ছিটে, বশীকরণ প্রভাবে, মন্ত্রের জোরে ভালবাসা জন্মাইতে আশা করেন। অনেক রমণীই ঐ উপায়ে স্বামীর মনের মধ্যে যাইতে ইচ্ছা করেন। চাকর মনিবের অনিষ্ট করিয়াছে, প্রভু ক্রোধে জ্বলন্ত আগুন হইয়া বসিয়া আছেন। সুচতুর ভৃত্য রক্ষাকবজ হাতে বাঁধিয়া, পড়া তেল মুখে মাখিয়া, মনিবের সম্মুখে হাজির। চারি চক্ষু সেই একত্র, যেই ভৃত্যের মুখের উপর মনিবের দৃষ্টি, আর কথা নাই, সমুদায় আগুন জল, শীতল ঠাণ্ডা, একেবারে বরফ। এরূপ উপকথা অনেক মুখে শুনা যায়। কিন্তু গাজী মিয়াঁর দুর্ভাগ্যক্রমে আজ পর্য্যন্ত ওরূপ গরুরূপী গুরুর সাক্ষাৎ লাভ হয় নাই। তা না হউক, তাই বলিয়া যাদুমন্ত্রের মাহাত্ম্য নাই, অস্তিত্ব নাই, একথা ধর্ম্মশাস্ত্র মতে কখনই অস্বীকার করা যায় না। ভিখারিণীর ক্ষমতাই-বা কম কি! সে মিলাইতে পারে, ভাঙ্গা মন জোড়া দিতে পারে। সে দুইমন এক করিতে পারে।

বিচ্ছেদ, অভিমান মনান্তর, দৃষ্টিকটু যোগবলে দূর করিয়া, মনের মলিনতা দূর করিতে পারে, মিলাইতে পারে। কম কথা? যেরূপ যাঁহার ধারণা ও বিশ্বাস।

সোনাবিবি যাদুমন্ত্রের বড়ই ভক্ত। সন্ন্যাসী, ফকির, দরবেশ, যোগী প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। পুত্রকে বশে আনিতে অতি কম হইলেও এ পর্য্যন্ত হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। যেখানে যাহার মুখে শুনেন,—অমুক ফকির বড় বুজরক, ভারি গুণি; অমুক বেদিনী এমন ক্ষমতা রাখে, যে ছুঁইবা মাত্র, মানুষ দূরে থাক, ছাড়াছাড়ি গাছের পাতা একত্র হয়, তার আস্তানার নিকটে এক গাছ আছে, তুড়ি দেওয়া মাত্র দুইটি পৃথক পৃথক পাতা একত্র হয়। পাতা যেন কথা শুনে, লাগ্ লাগ্ বলা মাত্র গাছের ডাল নওয়াইয়া পড়ে, দুই পাতা একত্র মিশিয়া যায়, যে যাহা খোঁজে সে তাহা পায়। জগতের এমনি আকর্ষণ শক্তি যে, অন্বেষণকারীর নিকটেই প্রায় আসিয়া জোটে। সোনাবিবির নিকটেও এক গুরুজী জুটিয়াছেন। গুরুজী কতকগুলি জিনিসের ফরমাস করিয়াছেন, সেগুলি হস্তগত করা বড়ই কঠিন। এক প্রকার হতাশই হইয়াছিলেন, ইতিমধ্যে এক ভিখারিণী অরাজকপুরে তাহাকে দেখিতে আইসে। এ ভিখারিণী মন্ত্র-তন্ত্র কিছু জানে কিনা সোনাবিবি তাহা পরীক্ষা করেন নাই। ইহার কার্য্যই পরের উপকার করা, যথাসাধ্য পরের উপকার করা। স্বপ্নেও কাহারও মন্দ চেষ্টা করে না। যে সকাতরে দুঃখের অবস্থা জানায়, যদি তাহার সাধ্য ও ক্ষমতার মধ্যে বেড় পায়, তবে সে কখনই মুখ ফুটিয়া স্বীকার হয় না যে আমি তোমার উপকার করিব। "দেখবো" "চেষ্টা করবো" এই পর্য্যন্তই ভিখারিণীর কথা। সকলেই তাহাকে ভালবাসে। শত্রু মিত্র প্রভেদ নাই। ভিখারিণী শত্রু পক্ষেরও ভালবাসা, মিত্র পক্ষেরও প্রাণের প্রাণ। সকলেই তাহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট, বাধ্য ও অনুগত।

ভিখারিণী নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান কোথায়, কেহ তাহা জানে না। অরাজকপুরে আসিলে, প্রায়ই ভেড়াকান্তের বাটীতে থাকে। ভেড়াকান্তের স্ত্রীকে ভিখারিণী ভালবাসে, প্রাণের সহিত ভালবাসে। একবার ভিখারিণী আসিলে সোনাবিবির সহিত আলাপ হয়। আলাপ হওয়ার পর ভিখারিণী সোনাবিবির মনের কথা আজ দুই চারটা, কাল দশ বারটা, বলিতে বলিতে ক্রমে আর কিছু বলায় সোনাবিবি ভিখারিণীর গুণে একেবারে মোহিত হইয়াছেন। মনের অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। ভিখারিণী বলিয়াছে, "ওকাজ আমার নহে। তবে তুমি যার জন্য অস্থির হয়েছ, যা না হলে তোমার গুরুজী মন্ত্রফল ফলাতে পারেন না, তার যোগাড় করে, যাতে তোমার কোলের সন্তান কোলে আসে, যাতে তোমার হৃদয়ের ধন হাতে আসে, আমি যথাসাধ্য তার চেষ্টা করবো।"

এই কথাতেই ভিখারিণী যমদ্বারে মনিবিবির বাটীতে। সেই কথাতেই ভিখারিণীর চাঁদ-বদনীদিগের সঙ্গে এত আলাপ। তাহাতেই সকলের সঙ্গে পরিচয়। সেই কারণেই সকলের মনের মধ্যে গিয়া নিজের ইষ্টসিদ্ধি। সেই জন্যে সেই পাকা হেতুতেই ভালবাসা জন্মাইয়া, ভালবেসে, তাকে ভালবেসে তারই হিতের জন্যে তারই মনের দুঃখ দূর করিবার জন্যে, প্রলোভন দিয়া কিছু হস্তগত করা, যথা ছিঁড়িয়া খাতুন দত্তা বুকে পিঠের মলা,

হাত পায়ের নখ, বাম দিকের চুল, কাপড়ের কোণ-কাটা, কানের খইল, ইত্যাদি—

ভিখারিণীর শত্রু কোন স্থানে কেহ নাই। সকলই তাহার আপন, সকলই তাহার ভালবাসা। মায়ের কোলে সন্তান আসিবার ঔষধ ভিখারিণী যমদ্বারে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা সমুদায় সোনাবিবিকে আনিয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় চাহিয়াছে। সোনাবিবি রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা-যত্ন, কল-কৌশল করিয়াছেন, খাটাইয়াছেন, ভিখারিণীকে রাখিতে পারেন নাই। ভিখারিণী যমদ্বারে সোনাবিবির প্রসঙ্গে, বহু প্রসঙ্গ নানা রঙ্গে, বহু প্রসঙ্গে, নানা অঙ্গে, নানা আননে, বহু বহু বচনে, শুনিয়া মনের ভাব, আর সে ভাবে নাই। বহু বচনে বহু পরিবর্ত্তন। অন্যায়, অপকার্য্য, অপকথা, অবলার প্রতি অত্যাচার; বল প্রকাশ, ইত্যাদি অন্যায় কার্যে ভিখারিণী নারাজ। তাহাতেই সোনাবিবির উপর ঘৃণা। সোনাবিবি সোনার তখত্ পায়ে ঠেলিয়াছেন, মানুষকে মানুষ মনে করেন নাই। নামে দোহাই ফিরিয়াছে। লক্ষ্মীর দৃষ্টি থাকিলে, ছাইমুঠ ছুঁইলে সোনামুঠ হয়, আর অলক্ষ্মী নির্ভর করিলে কাঠের ময়ূর মতির হার গিলিয়া ফেলে। সোনাবিবি ভিখারিণীকে রাখিবার জন্য কত জেদ করিলেন। ভিখারিণীর সেই এক কথা, "থাকিব না।" কিছুতেই ভিখারিণীকে রাখিতে পারিলেন না। সে তাঁহার কথা শুনিল না। সময়ে এমনি ঘটে, না বুঝিয়া কার্য্য করিলে, এমনি দুর্গতি ঘটে যে সামান্য ভিখারিণীও ঘৃণা করে। ভিখারিণী সোনাবিবির নিকটে থাকিল না। সে যাহাকে ভালবাসে, অরাজকপুর মধ্যে সে যাহাকে ভালবাসে, তারই বাড়ীতে চলিয়া গেল।

ভিখারিণী আনীত গুপ্ত দ্রব্যজাত সোনাবিবি অতি গুপ্তভাবে গুরুজীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেই বেগড়া ছেলে কোলে আসিবার অষুধপত্র, ভিখারিণী ছিঁড়িয়া খাতুন হইতে যে সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাও পাঠাইয়া দিলেন। গুরুজী অতি নির্জ্জন গৃহে ধূপ ধুনা জ্বালিয়া আসর গরম করিয়া ধ্যানে বসিলেন। দিবারাত্র রজত প্রদীপে ঘৃতের বাতি জ্বলিতে লাগিল। গুরুজী ষোড়শোপচারে পূজা করিতে বসিলেন। মনে কি আছে, সেই অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন তার কে জানিবে? সম্মুখে মৃত্তিকা নির্ম্মিত এক মানবাকৃতি--দিব্বি চক্ষু বিস্তারে টেড়া সিঁথি কাটিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে মানব আকার মৃত্তিকা নির্ম্মিত দেহ, যাহা গুরুজীর সম্মুখে, ধ্যান চক্ষের সম্মুখে, দাঁড়াইয়া আছে। কক্ষ ভাঙ্গিয়া পুতুলটা বাহিরে আনিয়া দেখাই, সাধারণ চক্ষে গোচর করি, দেখি কেহ চিনিতে পারেন কিনা? দেখি এ চেহারার সঙ্গে অন্য কাহারও চেহারা মিলে কিনা, মিশ খায় কিনা? আসুন, নির্জ্জন গৃহের মধ্যে আসিয়া একে একে দেখিয়া যান, লোকটি চেনা কি অচেনা।

দেখুন! দেখুন! খুব ভাল করিয়া দেখুন, চিনিতে পারেন কি? এমন সুন্দর গড়ন সুন্দর কেতা-দুরস্ত মানানসই চেহারা চিনিতে পারেন কি? ঐ দেখুন ঈষৎ গোঁপের রেখা। আর বলিব না! কক্ষ ভাঙ্গিয়া দিয়াছি, যাইয়া দেখুন! ঐ দেখুন! ঐ দেখুন! কত গাছ-গাছড়া নানা রঙ্গের সুতা, লাল, কাল, বানাতের টুকরা, মূর্ত্তির হাতে-পায় গলায় জড়ান। প্রতিদিন ধনুকে তীর জুড়িয়া মূর্ত্তির বক্ষ লক্ষ্যে তীর নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

কথা গোপন থাকিবার নয়। যমদ্বার পর্য্যন্ত এ গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়াছে। জয়ঢাকের কার্যকারকগণই একথা হাকিমানের কানে তুলিয়া দিয়াছে। জেলার হাকিম, বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর পর্য্যন্ত একথার আন্দোলন হইয়াছে। জয়ঢাক কান্দিয়া বলিয়াছে ঃ

"হুজুর! আমার মা! আমাকে প্রাণে মারবার জন্য এক মূর্ত্তির বক্ষে তীর মারতেছেন। চল্লিশ দিন পুরা হলে আমার প্রাণ যাবে। আমিও মায়ের কাছে যাব না। দোহাই ধর্ম্মাবতার। আমাকে অমন মায়ের নিকটে আপসে নিষ্পত্তির কথা বলতে যাওয়ার হুকুম করবেন না।"

তাঁহারা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। মায়ের নিকট যাইতে অনুরোধ কি? সাবলোট সাহেবের পরামর্শ এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ভয়ে ভয়ে জয়ঢাক মায়ের নিকট আপস নিষ্পত্তির কথা, যমদ্বারে যাওয়ার কথা বলিয়াছিল। কয়েদ খালাস দিন মায়ের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল, সে কথা উঠিলে জয়ঢাক সাবলোট সাহেবের ইঙ্গিতে মায়ের দুখানি পা ধরিয়া ক্ষমাও চাহিয়াছিল। সোনাবিবি ক্ষমা করেন নাই। যমদ্বার যাইতেও রাজী হন নাই। জয়ঢাক বিদায় হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

গুরুজীর উপর সোনাবিবির ভক্তি দিন দিন বাড়িতেছে। যখন যাহা চাহিতেছে, তখনই তাহা পাইতেছে। সোনাবিবির বিশ্বাস, চল্লিশ দিন পুরা হইলে আর জয়ঢাক তাঁহাকে ছাড়িয়া যমদ্বারে থাকিতে পারিবে না। ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার কোলে বসিবে, পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তি করিবে, মা বলিয়া ডাকিয়া মন-প্রাণ শীতল করিবে।

দাগাদারী হাজতে গিয়াছেন, শুনিয়া তাঁহার বৃদ্ধা জননী এবং সহধর্ম্মিণী সন্তান-সন্ততি লইয়া সোনাবিবির বাটীতে আসিয়াছেন। দাগাদারীর মাতা সোনাবিবির নিকট সকাতরে বলিলেন ঃ "তোমরা আমার বাবাকে দেখাও। যে উপায়ে হক, আমাকে একবার চক্ষে দেখাও। তোমাদের পায়ে ধরি। আমার বাবার মুখখানা আমাকে একবার দেখাও। আমার ঐ একটি ধন। ওরে! আমার ঐ একটি ভিন্ন আর নাই। একবার দেখাও। আমি এক নজর দেখে আমার প্রাণ শীতল করি।"

সোনাবিবি বলিলেন, "সে কি কথা? সে রইল জেলের মধ্যে, আমি তাকে কি করে দেখাই!"

বৃদ্ধা অরাজকপুরে আসিয়া সন্তানকে না দেখিয়া অন্ন-জল ছাড়িয়াছেন, ছেলেমেয়ে বাপের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে, কিন্তু দাগাদারীর স্ত্রীর চক্ষে এক ফোঁটা জল কেহ দেখে নাই। সে দাগাদারীর কথা মুখে আনে না। হা-হুতাশ কান্না-কাটির মধ্যেও যায় না। দিব্বি খায়, শোয়, বেড়ায়। তবে কি স্বামীর উপর স্ত্রীর মায়া নাই? তিনটি পুত্র-সন্তান, দুইটি কন্যা জন্মিয়াছে, মায়া নাই বলিই-বা কি করিয়া?

এদিকে রাজধানী হইতেও কোন সংবাদ আসিতেছে না, নচ্ছার জেলা হইতেও কোন খবর আসিতেছে না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যাইতেছে আসিতেছে, কোন স্থান হইতেই জামিনীর আদেশ আসিতেছে না। সোনাবিবি প্রকাশ্যে খুব মজবুত আছেন, কিন্তু মনে মনে বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। দাগাদারীর বৃদ্ধ মাতার কান্নায় তাঁহাকে আরও

আকুলিতা করিয়াছে। সর্ব্বদা কান্না, সদা-সর্ব্বদা দাগাদারীর কথা, কি খাইতেছে, কেমন করিয়া কোথায় শুইতেছে, মায়ের প্রাণে সর্ব্বদা সেই সকল কথা জাগিতেছে। সোনাবিবির মন যে সময় নানারূপ চিন্তায় অস্থির হয়, অরাজকপুর আসিয়া অবধি যখনই কোন কাজকর্ম্ম না থাকে, মনের গতি অত্যন্ত খারাপ বোধ হয়, কি ছিলাম! কি হইল! আরও কি হয়, এই সকল ভাবনায় যখন নিতান্তই অস্থির হইয়া অসহ্য হইয়া উঠে, সে সময় ভেড়াকান্তর বাটীতে পাল্কি করিয়া যাইয়া, ভেড়াকান্তের স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা, নানা দেশের কথা, নানা গল্প শুনিয়া একটু সুস্থির হন্। কোন দিন পাল্কি পাঠাইয়া ভেড়াকান্তের স্ত্রীকে আনাইয়া ২/৩ ঘণ্টা রাখিয়া নানা কথা, নানা আলাপ করিতে থাকেন। কোন কোন দিন বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করাইয়া শুনিতে থাকেন।

ভেড়াকান্তের মোকদ্দমায় তাঁহারাও চিন্তিত হইয়াছেন। নিজেই যাওয়া সঙ্গত মনে করিয়া সোনাবিবি দাগাদারীর মাতাকে সঙ্গে করিয়া ভেড়াকান্তের বাটীতে গিয়াছেন। আদর অভ্যর্থনার পর, নানা গল্প, নানা কথা আরম্ভ হইল। বউমা কথায় কথায় বেগম সাহেবের কথা উঠিল। ভেড়াকান্তের স্ত্রীকে সোনাবিবি বউমা বলিয়া সম্বোধন করেন।

ভেড়াকান্তের স্ত্রী সুশ্রী নহেন, একেবারে যে কুশ্রী, তাহাও নহেন; তবে ভেড়াকান্তের চক্ষে কিরূপ তাহা তিনিই জানেন। নিরপেক্ষ চক্ষে বলিব সুন্দরী নহে। বাঙ্গালা ভাষায় সামান্যভাবে দুই-একখানি চিঠি লিখিতে পারেন, সেও অনেক বিলম্বে, লিখিবার অভ্যাস খুব কম। কিন্তু ছাপার পুস্তক পড়ার অভ্যাস লেখার ক্ষমতা হইতে অনেক বেশী। বয়স ত্রিশ বৎসর, গৃহকার্য্যে খুব পাকা, অত্যন্ত রাগী। কোনরূপ রূঢ় কথা, কি মতের বিরুদ্ধ অন্যায় কথা শুনিলে হঠাৎ চটিয়া উঠেন,—উচিত বলিতে মুক্তকণ্ঠা, মিথ্যা কথায় হাড়ে চটা। যে একবার মিথ্যা ধরা পড়িল, আর কখনও তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না। খুব মান্যমান বড় ঘরের ঘরণী, তিনিও যদি কোন অন্যায় কার্য্য কি অন্যায় কথা ব্যবহার করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখের উপর তাঁহাকে তাঁহার অন্যায় বিষয় অতি কর্কশভাবে প্রতিবাদ করা নিতান্তই অভ্যাস। চাকর-চাকরাণী সত্য পথে থাকিলে একটু দয়া আছে, কিন্তু তদ্‌বিপরীত তাদের পক্ষে সাক্ষাৎ যম। দেনা-পাওনার বিশেষ খাড়া। চাকর-চাকরাণী কি কোন আত্মীয়-স্বজন কোন অপরাধ করিলে, কখনই মাফ নাই। অথচ অপরাধের অতিরিক্ত শাস্তির ব্যবস্থা। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ইচ্ছা। ময়লা নোংরা তাঁহার চক্ষের শূল।

নিজে সম্মার্জ্জনী হাতে ধরিয়া বাড়ী-ঘর আঙ্গিনা পরিষ্কার করেন। প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যই ঘর-বাড়ী আঙ্গিনা পরিষ্কার করা। গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত যে কালই হউক, দিবা-রাত্র যে সময় হউক, যখনই শৌচাগারে যাইবেন, তখনই পরিধেয় পরিবর্ত্তন স্নান না করিলে তাঁহার সোয়াস্তি নাই। ফাজিল ফাজলেমু, বড় মানুষী, বাবুগিরি, বিবিয়ানা তাঁহার চক্ষের বিষ। নিজে পাঁচনী হাতে করিয়া, তরিতরকারির গাছ পাইট করিয়া দেন। এক মুহূর্তকাল অনর্থক সময় নষ্ট করা, তিনি মহাপাপ মনে করেন। অপর লোক

দূরে থাকুক, আত্মীয়-স্বজন, এমন কি গর্ভজাত সন্তান-সন্ততিগণ আলস্যে থাকিলে, কি নিষ্কর্ম্মা হইয়া অযথা সময় নষ্ট করিলে, যথাসাধ্য তিরস্কার করেন। একেবারে অসহ্য হইলে, তাদের পেটের ভাত বন্ধ করিয়া দেন। এই বয়সে পাঁচ কন্যা এবং পাঁচ পুত্রের জননী হইয়াছেন। এই স্থানে ভেড়াকান্ত বাবুর স্ত্রীর বিষয় আরও কিঞ্চিৎ বলিয়া রাখি।

পাড়ার কোন স্ত্রীলোক লবণ, তেল, চাউল, কি টাকা-পয়সা কর্জ্জ চাহিলে তিনি অম্লান বদনে বলিয়া দেন যে, "আমার কুলাবে না, দিতে পারব না। অথবা আমার আছে আমি দিব না। অমুক দিন তুমি দুই সের চাউল একদিন পরে দিবে বলে নিয়ে গিয়েছিলে, শেষে দশদিন পরেও দেও নাই। সে কথা মনেও কর নাই। এপথেও হাঁট নাই। লোক পাঠিয়ে তাগাদা করে, আদায় কর্ত্তে হয়েছিল। কর্জ্জ নেবে তুমি? লোক পাঠিয়ে তাগাদা করব আমি? তার উপরে আরও মিথ্যা কথা। করার মত দেও নাই। আর দেব না।"

জগতে সকল মানুষ এক প্রকার হয় না। সকল মানুষ সকল প্রকারে এক ভাবের হইতে পারে না। উনিশ বিশ অবশ্যই আছে। ভেড়াকান্ত বাবুর স্ত্রীর সে হিসেব নাই। কোন স্ত্রীলোক কথা কহিতেছে, দাঁত অপরিষ্কার, চক্ষুও ময়লা, নাকেও সেই প্রকার। যেই মুখের গন্ধ তাঁহার নাকে লাগিয়াছে, অমনি কর্কশ স্বরে বলিতে থাকেন ঃ

"বাছারে! খোদায় হাত দিয়াছেন। পানি এদেশে এত দিয়েছেন যে পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না। প্রাতে উঠে আখার কয়লা কি ছাই নিয়ে দাঁত কটা একটু পরিষ্কার করলেই গন্ধটা সরে যায়। আরামও বোধ হয়।"

এইরূপ কাপড় ময়লা, দাগিধরা, দুর্গন্ধ ছোটা দেখিলে ঐ নীরস রূঢ় কর্কশ ভাব। শক্ত শক্ত কথা ঃ

"বাছা সকল! মাসের মধ্যে দুই তিন দিন দুই ঘণ্টা পরিশ্রম করলেই কাপড় পরিষ্কার হয়। একটি পয়সা খরচ হয় না। কলাপাতার খার কর। তাতে কষ্ট হয় আখার ছাই মজুদ কর। সিদ্ধ কর সেই খারে, কাপড় সিদ্ধ কর, কাচো, অবশ্যই পরিষ্কার হবে। এত সহজ উপায় থাকতে, এরূপ নোংরা ভাবে থাক কেন?"

কোন গরীবের ছেলে, যার মাতা-পিতার অন্ন-বস্ত্রে ভারি ক্লেশ, গুণধর পুত্রের লম্বা কোঁচা, পায়ে বুট, গায়ে টাইট কোট, চেরা সিঁথি অথবা তেড়ী কাটা, (সম্মুখে লম্বা চুল, ঘাড়ে কিছুই নাই)—দেখিলে আর রক্ষা নাই। সে তখন চারদিক পলাইবার পথ অন্বেষণ করে। মা বাপের—তার মা বাপের—কষ্টের কথা তুলিয়া, তাকে একেবারে নাকের জলে, চক্ষের জলে এক করিয়া ছাড়িয়া দেন। বুড় বৃদ্ধ, আতুর, অন্ধ ভিন্ন একটু মাসাল, রসাল, ভিখারিণী ভিক্ষা পাওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার হাত হইতে রক্ষা পাইলে রক্ষা পায়। বিচার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। আপন ছেলেমেয়ে পরের ছেলেমেয়ের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ ঝগড়া করিলে, বিচার সময় এক তিল পরিমাণ আপন ছেলে-মেয়ের দিকে টান নাই। যেই অপরাধ অমনি শাস্তি। মার্জ্জনা মাপ একথা তাঁহার বিচারে নাই। অপরাধীর দণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য।

এই পর্য্যন্তই ভাল। আসল কথা বহু দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি। বস্তানীর কথাই শেষ করিতে পারিতেছি না, বাহিরের কথা বলিলে অনেক বলা যায়। পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন। মনে আছে,—সোনাবিবি দাগাদারীর বৃদ্ধ মাতাকে সঙ্গে করিয়া ভেড়াকান্ত বাবুর স্ত্রীর নিকটে আসিয়াছেন। দুদণ্ড কথাবার্ত্তা কহা, খোস-গল্প করা—এইটিই মূল কথা। একথা সে কথা, সে কেবল, আলাপ মাত্র। সোনাবিবি ভেড়াকান্ত বাবুর স্ত্রীকে বৌমা বলিয়া ডাকেন। সোনাবিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউ! বলত শুনি, বেগম ঠাকুরাণীর সঙ্গে তোমার সেদিন কি কি কথা হয়েছিল?"

ভেড়াকান্ত বাবুর স্ত্রী উত্তর করিলেন, "আমায় মাপ করবেন। তিনি ভদ্রঘরের মেয়ে, তাঁর নামটা ওভাবে লওয়া ভাল দেখায় না।"

সোনা—"আচ্ছা তুমি বল না। আমায় বলা দোষ নাই। আমার সঙ্গে বলাবলির সম্পর্ক আছে।"

বউ—"আমার শুনতেই যেন কেমন কেমন লাগে।"

সোনা—"লাগুক! কথাটা কি তাই শুনতে চাই।"

বউ—"তিনি কথায় কথায় তাঁর স্বামীর নাম ধরে বলেন, 'সে বড় বোকা ছিল, লেখাপড়া জান্তো না, একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ মূর্খ, স্বামী স্ত্রীতে কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তে হয় তার সে কিছুই জানতো না, সে বেঁচে থাকলে আমি যে ঘর গোয়ালা হাবা গাবা পূর্ব্বে ছিলাম, তাই থাকতেম।"

সোনা—"তুমি কি উত্তর কল্লে?"

বউ—"আমি উত্তর কল্লেম, "আপনি আমার মাথার মনি, পূজনীয়া দেবী। আপনি স্বামীর নাম যেভাবে, যে প্রকার তাচ্ছিল্যভাবে মুঁখে আন্‌লেন, মৃত স্বামী নিন্দা কল্লেন, যে কথা স্ত্রীর বিচার্য্য নয়, যে কথা স্ত্রীর আলোচনার উপযুক্ত নয়, সেই কথা তুলে, মৃত স্বামীর দুর্নাম রটালেন, শুনে আমি অবাক হয়েছি। আপনাকে কি বল্‌বো। আমি জানি, বোধ হয় সকল স্ত্রীলোকই জানে,—খোদাতালার নীচেই স্বামীর আসন।" বেগম সাহেব আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে বল্লেন, হাসতে হাসতে অস্থির হয়ে বল্লেন—আমাকে সম্বোধন করে বল্লেন—"বাবা"!—

সোনাবিবি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সেকি কথা? তোমাকে বল্লেন বাবা! সেকি? এ আবার কিরূপ সম্বোধন? স্ত্রীলোককে মা, বাছা, না হয় অন্য কিছু বলে লোকে ডাকে জানি। বা। বা। এ কেমন বাবা।"

ভেড়াকান্ত বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আজকাল, লেখাপড়া জানা স্ত্রীলোকেরা, বিশেষ হিন্দুঘরের শিক্ষিতা মহিলারা ভালবেসে, আদর করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে অনেকেই বাবা বলে থাকেন। তাতে দোষ কি? তিনি আমাকে ভালবেসেই বলেছেন, মন্দভাবে বলেন নাই।"

সোনা—"মা! আমি ও রকম উল্‌ট বাবা হতেও চাইনে, বলতেও চাইনে, শুনতেও

চাইনে। তাঁর। ক বাবা বলার লোক নাই? সে কি কথা! তুমি দশ ছেলের মা, আর তোমাকে বলেন বাবা! আচ্ছা তার পর কি হলো!"

বউ—"তার পর বল্লেন, 'স্বামীও মানুষ, আমিও মানুষ। তাঁর শরীরে যা আছে, আমারও তাই আছে। তিনি আমার চেয়ে বড় কিসে? তোমাদের কথা—স্বামী মাথার মণি? বুনো বাগদীর মত হলেও বুঝি মাথার মণি? আগারে-পগারে, কাল বিদকুটে, সমুদায় গায়ে দাদ হলেও বুঝি মাথার মণি? ওরে আমার মাথার মণি! তোমার কথা— মূর্খ বলদ, অথবা ধোপার গাধাটাকেও বিদ্বান বলে মান্য কর্ত্তে হবে নাকি? অরসিক, কাট গোঁয়ারটাকেও রসিক চূড়ামণি প্রাণ-প্রতিম বলে আদর কর্ত্তে হবে না কি? তার চাইতে যদি আমার গুণ বেশী থাকে, তবু তাঁকে মাথার মণি ভেবে মাথায় করে নাচতে হবে নাকি? আমার চাইতে যদি তার বুদ্ধি বেশী না থাকে তবু স্বামী বলে তাঁর পদানত দাসী হয়ে থাকতে হবে নাকি? তোমার ও বুট পাড়াগেঁয়ে কথা আমি শুনলেম না।" এইভাবে আরও অনেক কথা বল্লেন, "আমার মনে নাই। স্বামীর নিন্দা করাই মূল উদ্দেশ্য।"

সোনা—"আরও কি কি কথা বলেছিলেন, আমি শুনেছি।"

বউ—"সে সকল কথা শুনে কাজ কি?"

সোনা—"তুমি না বল্লে অরাজকপুরময় সে কথা। ঘরে ঘরে মেয়েপুরুষে শুনেছে। যাকে সন্তান বলে ডাকা যায়, তার সঙ্গে কি ওরূপ চাতুরী সাজে?"

বউ—"তিনি হাসি-তামাসা করে ভালবেসে যাই বলুন, আমি মায়ের মত ভক্তি করি। কিন্তু সেদিনের কথা শুনে মনে বড়ই আঘাত পেয়েছি। তা তিনি আমাকে ভালবাসেন। এই সেদিন আমাকে আমার ছেলেমেয়েদিগকে ডাবল ডাবল সাড়ী কোরতা কাপড় বিস্তর দিয়েছেন। লোকে তাঁকে যাই বলুক, আমাদের চক্ষে পাহাড় মনে করি। তিনি নিজে যাই করুন, যাই হউন, তাঁর উপকার আমাদের ভুলবার সাধ্য নাই। আমরা উপকার ভুলি না। চিরদিন মনে রাখি।"

সোনা—"থাম। বাছা থাম। সাধে দিয়েছেন? যার জন্যে দিয়েছিলেন, তার জন্যে দিয়েছিলেন। তার যে উপকার করেছে আমার সঙ্গেই ত করেছে। আমি মারতে উঠেছি, দেশ হতে তাড়িয়ে দিতে খাড়া হয়েছি, সে ঠেকিয়েছে, তারই কৌশলে রক্ষা পেয়েছেন। সে না হলে এতদিন কোথায় ঘুরপাক খেয়ে বেড়াতেন, তার খোঁজ-খবরও কেউ পেত না। যেমন কাজ তেমন দাম দেন নাই? ভাগ্যে তোমরা এসেছিলে, তাইতেই দেশে টিক্‌লেন। তার গুণ এখন খুব গাচ্ছেন।"

বউ—"খোদায় যা করবেন, তাই হবে। তিনি আর বেশী কি করবেন?"

সোনা—"আচ্ছা শুন আর এক লক্ষ্মীর কথা। (দাগাদারীর মায়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) কেমন, বউর কাছে তোমার বউর কথা বলি?"

দাগাদারীর মাতা হাঁ-না কিছুই করিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সোনাবিবি বলিতে লাগিলেন, "স্বামী হাজতে—একটি কথা কি আপোসের একটা নিশ্বাস

কানে শুন্‌লেম না। বেশ স্নান-আহার কচ্ছে, বেড়াচ্ছে, হাসি-তামাসা কচ্ছে, কে বলবে যে তার দুঃখ হয়েছে, স্বামী হাজতে আছে?"

বউ—"সে কি কথা! বোধ হয়, তিনি খুব চাপা।"

সোনা—"চাপা নয়,.খুব হাবা।"

বউ—"সেও ভাল। তার দুঃখ সে প্রকাশ কর্ত্তে পারে না, গুমরে গুমরে মরতে থাকে, সে যে ভারি জ্বালা। তিনি দেখতে শুনতে খুব ভাল্‌ শুনেছি।"

সোনা—"দেখতে খুব ফরসা, শুনতে কিছুই নয়। কাপড় চোপড় পরিয়ে বসিয়ে রাখ, ঠিক যেন একটা মাটির পুতুল। আচ্ছা বউ, আর একটা কথা মনে হলো—বলবে কিনা?"

বউ—"যা বলার কথা, তা অবশ্য বলবো। কখনই মিছে বলবো না। যে কথা বলতে পারবো না অথচ শুনে অবশ্যই বলবো, এ কথার উত্তর আমি জানি, বলবো না—বল্‌তে পারি না। মিছে কথার ধার ধারি না।"

সোনা—"বাবাজি নাকি চিরকাল একসঙ্গে আহার করে থাকেন?"

বউ—"এ আর অন্যায় কি? আশ্চর্য্যই-বা কি? আজ ২১ বৎসর একত্র আহার করেন। ছেলেমেয়ে সঙ্গে করে আহার করেন। আর এই ২১ বৎসর মধ্যে এক দুই করে ১৫ দিন কখনই আমাদিগকে ফেলে অন্য কোন স্থানে থাকেন নাই।"

সোনা—"ঠিক কথা। বেগমী যা বলেছে, তা ঠিক। তোমার মত সুখী—"

এই পর্য্যন্ত বলিতেই সংবাদ আসিল নচ্ছার জিলা হইতে কি হুকুম আসিয়াছে।

সোনাবিবি ব্যস্তভাবে উঠিলেন, পাল্কি পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে বউকে বলিলেন, "কোন চিন্তা কর না—মোকদ্দমার দিন কাল। ভাবনা কি?"

কেহ কোন উত্তর করিল না। সোনাবিবি চলিয়া গেলেন। দাগাদারীর মাতা পরে যাইবেন। সোনাবিবির বউমাকে দাগাদারীর মাতা ভাবি সাহেব বলিয়া সম্বোধন করেন। বলিলেন, "ভাবি সাহেব! বড় মানুষের ঘরের কথা, কি বলবো? আবার এমনি ঘটনা। থুথু ফেল্লে উল্‌টে আপন গায়ে এসে পড়ে। কি বলি? মনিবিবি, সোনাবিবি, রূপসী বিবি, তামাসা বিবি, কাঞ্চন বিবি, রাইম বিবি, যিনি এখন বেগম হয়েছেন, তাঁর এক নাম রাইমনি, এঁরা সকলেই আপন। আপনি, সকলি এক। সকলি এক। এ বলে আমায়, দেখ, ও বলে আমায় দেখ। মনিবিবির শাস্তি কিছু হতো, যদি সকল গায়ে পোকা পড়ে মরতো, শেল-কুকুরে কামড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত, গোর না হতো। তাহলে জানতেম যে, হাঁ কিছু হয়েছে। ওর কি সাধারণ পাপ! মুখে আনলেও মহাপাপ। এই সোনাবিবির স্বামীর মৃত্যুর পর কি কল্লেন? কেলেঙ্কারী—কেলেঙ্কারী। দেবরে দেখল, রাখা দায়, যা ইচ্ছে তাই করুক, তবে এর কথা—যা করেছে, শাস্ত্রমত ধর্ম্মসঙ্গত করেছে। কোন পাপের কাজ করে না। মুখে স্বীকার কর্ত্তে সাহস পায় নাই। প্রথম ঝুপঝাপ, তার পরে টুপটাপ, তার পরে চুপচাপ—তার পরেই কাপকাপ, ঘোপঘাপ, তারপর ধরাধরি, ঝক্‌মারি, সর্ব্বশেষে দাগাদারী। আবার দলাদলি। এর তবুও জাতীয় টান আছে। আর কাহারও তা নাই। হিন্দু

বন্ধু, হিন্দুই নেপ কাঁথা, হিন্দুই পরাণের ব্যথা। যাক্ দাগাদারী, আমার দাগাদারী হাজতে গেছে। এক প্রকার সুখী হয়েছে। তবে পেটের সন্তান সে, খুসী রাখি কি করে? প্রাণ হু হু করে কেঁদে ওঠে। বউ আমার লক্ষ্মী বউ। সোনাবিবি যাই বলুন না কেন, বউ আমার লক্ষ্মী। সে লোক দেখিয়ে কাঁদতে জানে না। তার মনে যা হচ্ছে, তা সেই জানে। আজ তিন বছর কি তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়? দাগাদারী কি বাড়ী যায়? যদি চুপে চুপে কোন দিন গিয়ে এক নজর দেখে আসে, কোটনার দল লাগাই আছে, অমনি টুক্ করে এসে কানে লাগিয়ে দেয় যে, আজ এই ঘটনা হয়েছে। আর যাবে কোথা? মারধর, খুনখুনী, কামড়াকামড়ি, চুলদাড়ী ছেঁড়াছেঁড়ী, ধুতী চাদর চেরাচেরী, এক বিতিকিচ্ছি ব্যাপার লেগে যায়। কি করে? ভয়ে অস্থির হয়ে দাগাদারী মরার মত হয়ে থাকে। কি বল্‌বো? কেবল ঘরে মাথা দিয়ে থাক্‌তে না পেরেই এখানে এসেছি। কালই চলে যাব।"

বউ—"আমরাও খুব ভাবনায় আছি। হাকিম বাহাদুর চটা, আর কেউ কেউ অন্তরে অন্তরেও চটা, মহা ভাবনা। কাল মোকদ্দমার হুকুম হবে। এখানে আমার কেউ নাই। যদি কোন আপদ বিপদ হয়, তাহলে আমাদিগকে যে এক নজর দেখবে এমন আত্মীয়-স্বজন এ বাড়ীতে একটিও নাই। শুধু চাকরে কি হবে?"

পাল্কি ফিরিয়া আসিল। সোনাবিবিকে বাটিতে রাখিয়া পাল্কি বেহারা ফিরিয়া আসিল। দাগাদারীর মাতা বিদায় হইয়া পাল্কিতে উঠিলেন।

ভেড়াকান্তের স্ত্রী ভিখারিণীর নিকট যাইয়া বসিলেন। দুইজনে কথা আরম্ভ হইল। ভিখারিণীর সঙ্গে দিদি সম্পর্ক। দুইজনে খুব আলাপ—পূর্ব্ব কথা পুনরায় চলিতে লাগিল।

ভিখারিণী বলিল, "দিদি মনে আছে? সেই তিনি সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া তোমার বাড়ীর নিকট হইয়া যাইতেন। তুমি পেয়ারা গাছতলায় ধূলা মাটি নিয়া খেলা করিতে? তুমিও দেখিতে, তিনিও দেখিতেন। সকল পথ আসিয়া তোমার খেলা করার স্থানেই তাঁর ঘোড়ার চাল বিগড়াইত। ঘোড়াটিও এমনি যে, আগে না যাইয়া পাছে হাঁটিত—পিছে হটিত। তাহার পর কত চুমকারী, কত ভালবাসা, ঘাড়ে হাত, ঘোড়ার ঘাড়ে হাত দিয়া, মাথা চাপড়াইয়া সায়েস্তা করিতেন। হক্-নাহক চাবুক কষিয়া বেগে ছুট দিতেন। তারপর কি হলো?"

বউ—"তারপর কতদিন ঐ ভাবেই কাটল। একদিন দেখি একখানি ঢাকাই সাড়ী কে যেন আমার জন্য পাঠিয়েছে। আমি আমার মাসীর বাধ্যই বেশী ছিলাম। তিনি বললেন, 'দেখ, এই দেখ, তোকে সাড়ী দিয়েছে'। আমি সাড়ীর কি জানি? ঢাকাই কলিকাতা শান্তিপুরে বারাণসী আমি কি চিনি? সে সাড়ী আমার গলা পর্য্যন্ত উঠল। এমনি সক্—কোন প্রকারে জড়িয়ে জড়িয়ে পরলাম। তাহার পর তিন বৎসর কেটে গেল, কিন্তু সেই সাদা ঘোড়া ও সওয়ারটিকে দেখতে ইচ্ছা করি, দেখতে পাইনে, কোথায় বাড়ী তাও জানি না। যে গণ্ডগ্রামে বাস, তাতে কামার কুমার ভিন্ন ভদ্রলোকের বাস অতি অল্প। মনটা যখন বড়ই উদাস হত, কুমারদের হাঁড়ী গড়া, চাকা ঘোরা দেখতেম। হঠাৎ একদিন জেলে পাড়ায় ভয়ানক আগুন—ঠিক দুপুর বেলা আগুন– চৈত্র মাস, বাতাসেরও তেমনি জোর। দেখতে

দেখতে আগুন যেন দশ হাত জিহ্বা বার করে বাতাসের সঙ্গে সমুদায় জেলেপাড়া গ্রাস করে ফেললো। আমি তফাতে দাঁড়িয়ে আগুনের কাণ্ডকারখানা দেখছি, ঘরগুলো দেখতে দেখতে ছাই হয়ে গেল। বাঁশের গেরো-পোড়া শব্দে কানা তালা লেগে গেল। আমি যেমন দেখতে গিয়েছি, পাড়ার আরও অনেক স্ত্রীলোক দেখতে গিয়েছিলো। হঠাৎ বাতাস ফিরে গেল, আগুনের তেজ জ্বলন্ত ছাই, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেদিকে দাঁড়িয়েছিলাম, সেইদিকে আসতে লাগলো। দৌড়া! দৌড়! কে কার গায়ে পড়ে—দৌড়! ধাক্কা খেয়ে, মানুষের গায়ের ধাক্কা খেয়ে, কোথাকার কাপড় কোথায়—দৌড় —সকলেই দৌড় দিল, আমিও ছুট্ দিলাম। আগুন যেন বাতাসের জোরে আমাদের পিছনে উড়ে আসতে লাগলো। সম্মুখে দুট এড়া ঘোড়া হিঁ হিঁ করে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। কুঠীর সাহেবের ঘোড়া, নীল জমির মধ্যে যথেচ্ছাভাবে চরে বেড়াচ্ছিল, আগুন দেখেই হক্, কি আর কিছু দেখেই হক্ চমকে, যেন ভয় পেয়ে, ঘাড় উঁচু করে, লেজ তুলে, ছুটে আমাদের দিকে চলে আসছে। কি করি, পিছে হাঁটবার উপায় নাই। দক্ষিণে বামে গড়াবারও সাধ্য নাই। মানুষের এত ভীড় যে ফিরে দাঁড়ালে পায়ের চাপে পিষে যাই। ভয়ে বুক দুর দুর কর্ত্তে লাগলো, মুখ শুকিয়ে গেল। সম্মুখে জোড়া জোড়া, ঘোড়ার সম্মুখে দশ হাত তফাতে আমি খাড়া। বাম পার্শ্ব হতে কে যেন ছুটে এসে বল্লে, ভয় নাই! ভয় নাই! তার পরেই দেখি, সেই লোকটি ঘোড়া আর আমার মধ্যে খাড়া। আমি দৌড়ের উপরেই আছি, আমার তখন হুঁশ ছিল না, বেহুঁশেই দৌড়—দৌড় ত একেবারে সেই লোকটির বুকের উপর মাথা ঠিকরে পড়লেম। সে লোকটি আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে বুকে করে, বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে পিঠে হাত দিয়ে খুব ভালবেসে বল্লে—আমি বেহুঁশ। সেই বেহুঁশেই যেন আমি সব দেখছি শুনছি, কথা বলবার শক্তি নাই—সে বল্লে—“ভয় নাই! ভয় নাই! কোন চিন্তা নাই।”

“আমি তার বুকের মধ্যে মাথা দিয়ে মুখ লুকিয়ে কেবল হাঁত কাঁত করে নিঃশ্বাস ফেলছি। কিন্তু বুকের সঙ্গে তার শরীর স্পর্শ হয়ে যেন খুব আরাম বোধ হচ্ছে।” সে লোকটি আমার পিঠের উপর হাত দে বল্‌ছে--‘তুমি দুপুরবেলা আগুন দেখ্‌তে কেন এসেছিলে?’

“একটু স্থির হয়েছি। শরীরের কাঁপানি যায় নাই, কিন্তু তত নাই, কথার স্বরে চিনি না, কে এই লোক। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, কি আশ্চর্য্য! সেই ঘোড়-সওয়ার, সেই সাদা ঘোড়ার সওয়ার।”

“চকে চকে চক্ পড়েই আমার প্রাণ অন্যভাবে কেঁপে উঠল। সে কাঁপনী পূর্ব্বের কাঁপনীর মত নহে, এ হৃদয়ের উচ্ছাসে কাঁপনী, লজ্জার কাঁপনী একি? দিনের বেলা—মাঠের মধ্যে একজন পুরুষের বুকের মধ্যে মাথা রেখে জড়িয়ে ধরে, একি? চারদিকে চেয়ে দেখি—সেখানে একটা কুল গাছের আড়াল, এমনিভাবে কুলের ডাল ঝাঁকড়াভাবে ছড়ান, আগুনের খেলা, মানুষের দৌড় সচ্ছন্দে দেখতে পাচ্ছি, আমাদিগকে কেউ দেখতে পাচ্ছে

না। অনেক দিনের পর দেখা, কিন্তু কথা প্রথম—প্রথম কথা। জগৎ কি বুঝি না, চিনি না। যে ভালবাসে, তাকেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে। সে সকল কথা সবিস্তারে বলতে গেলে দশ দিনে ফুরায় না। তুমিও ছাড় না—আজ আর সময় নাই। সময়ে আমি তোমাকে ইহার পর সমুদায় ঘটনা বিস্তারিত রূপে বল্‌বো। তবে তুমি যে প্রশ্ন করেছ, তার উত্তর সঙ্গে শেষ ঘটনা এখনিই শুনাচ্ছি। তবে এর মধ্যে যদি তিনি এসে পড়েন, তবে নাচার। তাঁর মন ভাল থাকলে তাঁর সম্মুখেই শুনতাম। ঐ অগ্নিকাণ্ডের চার বৎসর পর কোথায় জানি না, নাম বিন দিয়া সেই গ্রামে হজরাত সাহ আবেদল হাক্ সাহেব সম্মুখে যেতে হল। সে নিষ্কলঙ্ক জ্যোতিপূর্ণ মুখের ভাব দেখে আমার বিশেষ ভক্তি জন্মাল। সে চটাল কৃষ্ণ ভ্রূ, ভাসা চক্ষু, লোহিত ওষ্ঠ, সে যুগল কর্ণের নতির কিঞ্চিৎ উপর হতে কক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তারিত লম্বিত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রু, উচ্চ নাসিকা, মাথার শুভ্র বৃহৎ পাগড়ি। এরূপ দেবাকৃতি মানুষ আমি কখনও দেখি নাই। এক নজর দেখেই মাথা নীচে করে জানু পেতে সম্মুখে বসলাম। আমার বোধ হল, যেন আমি আজ পুণ্যের অবতার, ধর্ম্মশিক্ষার মহাগুরু; মহাপুরুষ সম্মুখে বসে আছি। গৃহের দ্বার গবাক্ষ সকলি বন্ধ, কেবল তিনি আমার দক্ষিণ দিকে জানু পেতে ভক্তিভাবে বসে আছেন। মহাপুরুষ আমাদের সম্মুখে। ক্ষণকাল পরে অর্থাৎ মহাপুরুষ তস্‌বি হস্তে কি পড়তে ছিলেন। তা শেষ হলেই, তাঁর সম্মুখস্থ একখানি পরিষ্কার রুমাল আমার হস্তে দিয়া, রুমালের এক পার্শ্ব তিনি দক্ষিণ হস্তে ধরে আমাকে ধর্ম্মের মুলমন্ত্র, কালেমা, ইত্যাদি সমুদায় পড়ালেন। গোলাপ জল মিশ্রিত এক গ্লাস সরবত সেইখানে পূর্ব্বেই রক্ষিত হয়েছিল। মহাপুরুষ তার কিঞ্চিৎ পান করে আমার হস্তে দিলেন। আমি কিঞ্চিৎ পান করে রেখে দিলাম। পরে কতগুলি হিতোপদেশ দিলেন—সে কথাগুলি আমি আজ পর্য্যন্ত মনে গেঁথে রেখেছি, একটিও ভুলি নাই। মহাপুরুষ মৃদুস্বরে আমার দক্ষিণ বাহুসংলগ্ন পুরুষকে বলিলেন, "সাবধান। ধর্ম্ম বিধির বিধান হইতে বিচলিত হইও না। নেকাহ আবশ্যক।"

"মহাপুরুষের উপদেশ ইঙ্গিতে তিনি তৎক্ষণাৎ সরে বসলেন, এমন কি, হস্ত পরিমিত স্থান ব্যবধানে সরে বসলেন। মহাপুরুষ পরদার পরস্ত্রীগমন সম্বন্ধে প্রায় আধঘণ্টা শাস্ত্রসম্মত উপদেশ দিলেন। আমরা মহাপুরুষের পদচুম্বন করে বিদায় হয়ে অন্য গৃহে আসলাম। কিন্তু তাঁর উদ্বিগ্নতা অস্থিরতা দেখে আমার ভয় হল। কার্য্য-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন—সময়ে সময়ে আমাকে দেখতে আসেন, কিন্তু চক্ষু তুলে আমার দিকে চাহেন না। ধর্ম্মত বলছি, সারাটি দিনের মধ্যে এক শয্যায় উপবেশন করলেন না।—আমার সঙ্গে কোন কথা বললেন না। আমি মহাবিপদে পড়লাম, এ হলো কি? আজিকার এ নব ভাবে কি ভাব যোগ দিল। মনের কথা বলতেছি, আমিই তাঁর প্রতি আসক্ত অনুরক্ত ছিলাম, তাঁর ততদূর ছিল কিনা জানতে পারি নাই। শেষে রাত্র ১২ টার সময়, দিদি তুমি চিনবে না, এক জনার নাম আক্‌বার দ্বিতীয় জনার নাম দলিল—এই দুইটি ভদ্রলোক এবং আর একটি ধার্ম্মিক চেহারার লোক এসে উপস্থিত হল।

"মহাপুরুষ—সেই ধর্ম্মগুরু মহাপুরুষ অপর গৃহে আছেন। তাঁর অনুমতি লয়ে তখনই সেই রাত্র ১২টার সময় পাঁচ হাজার টাকা দেনমহরে আমাদের নেকাহ হলো। সাক্ষী হল, ঐ দুই ভদ্রসন্তান। যে নেকাহ পড়াল, তাঁহার নাম বলব না। তবে হাসি-তামাসার সঙ্গে পরিচয়টা দিচ্ছি। বড় রহস্যের কথা। ঈশ্বরের মহিমার অন্ত নাই। কে জানে আমার সন্তান-সন্ততি হবে? পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর তিন বৎসর পরে একটি কন্যা জন্মিল। সেই কন্যার বিবাহ যাঁর সহিত হয়েছে, তারই খুল্লতাত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সন্তান, তিনিই আমাদের নেকাহ পড়িয়েছিলেন। লোকে বলত যে, ইহাদিগের মন পাওয়া ভার, প্রথম ভারি আদর, তাহার পর ধূলামাটির বরাবর, যেই একটি সন্তান জন্মাবে, অমনি ভালবাসার মূলে কুঠার বসবে, যদি দুটি—তবে ত আর কথাই নাই। দুই হাত তফাত, ক্রমে বয়োবৃদ্ধি, চক্ষের অগোচর। দিদি, আমি আমার জীবনে তার বিপরীত দেখলাম। ক্রমে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি, ভালবাসারও সংখ্যা বৃদ্ধি; ক্রমেই বৃদ্ধি ভিন্ন ঈশ্বর কৃপায় কমে নাই। ক্রমে দিন দিন বেশী আদর যত্ন।"

ভিখারিণী—"তোমার জীবন-কাহিনীর শেষ অংশ শুনে আমি বড়ই খুসী হয়েছি। দয়াময়ের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি যে, তুমি তোমার স্বামীর সম্মুখে জীবন পরিত্যাগ কর। সেই প্রথম আগুন দেখিয়া, এড়া ঘোড়া দেখিয়া, বক্ষে মাথা দিয়াছিলে, সেইরূপ বক্ষে মাথা রাখিয়া অনন্ত ধামে চলিয়া যাও। ইহাই আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা।"

বউ—"দিদি। আমিও তাই প্রার্থনা করি। সংসারের সুখ আশার অতিরিক্ত ভোগ করেছি। এখন পরকালের ভয়ে সর্ব্বদা প্রাণ কাঁপতে থাকে। হায়! হায়! আমার দ্বারা কিছুই হল না। ঈশ্বর পাঁচটি পুত্র দিয়েছেন। পাঁচটি কন্যার মধ্যে মধ্যম কন্যাটির কাল হয়েছে। চারটি আছে। দিবারাত্র আমাকে তাদের আবদার নিয়েই থাকতে হয়। দু-দণ্ডকাল স্থির হয়ে বসবার সাধ্য নাই।"

ইতিমধ্যে ভেড়াকান্ত আসিলেন। হ্যাটকোট খুলিয়া স্ত্রীর হস্তে দিলেন। কাচারির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেই ভেড়াকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে কি শীঘ্র ছাড়বে? হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নাজেহাল করবে। তারপর ওর মনে যা আছে, তা করবে। কাল দিন আছে, হুকুম দিবার দিন কাল নির্দ্ধারিত করেছে। আমি গুপ্তসন্ধানে জেনে এলেম যে কালও হুকুম দেবে না। যে যে কারণে বিলম্ব, একটু পরে বলছি।"

ভেড়াকান্ত হাত মুখ ধুইয়া বসিলেন, ছেলেমেয়ে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। ভেড়াকান্ত ছেলেমেয়েদিগকে একটু বেশী মাত্রায় ভালবাসেন। স্ত্রীর চাইতে একটু বেশী ভালবাসেন। তাহার প্রমাণ এই যে, স্ত্রীর নিকট ছেলেমেয়ের অপরাধের মার্জ্জনা নাই, পিতার নিকট খুব মাপ আছে। মায়ের নিকট তাহারা হাসি-খুসী করিয়া দুই কথা বলিতে ভয়ে কাঁপিতে থাকে। পিতার নিকট নির্ভয়ে কথা বলিতেছে, হাসিতেছে, খেলিতেছে, কান্ধে চড়িতেছে, ঘাড়ে বসিতেছে, বগলের মধ্যে হুড়ুস করিয়া মাথা ঠেলিয়া দিয়া শুইয়া পড়িতেছে। মায়ের কাছে যাইতে ভয়ে থরথরি কম্প। সাধ্য কি, কোনরূপ বেআদবী করে, অসংলগ্ন কথা

কহে, হাত দিয়া আবদার খাটায়, সে সকল কিছু নাই, কাহার সাধ্য নাই। পুত্রগণ পিতার গায়ে গড়াইতেছে, গোঁপ টানিতেছে, দাড়ী ধরিতেছে, পিতা সস্নেহে সকলকেই ভালবাসিতেছেন।

ভেড়াকান্ত একটু স্থির হইয়া স্ত্রীর নিকট বলিলেন, "হাকিমান দল এক জোট হয়ে আমার মোকদ্দমার রায় লিখেছেন। ঋতুরাজ বাবুই হচ্ছেন তার মুসবিদাকারী। গতরাত্রে কোন মজলিসে সে রায় শুনানী হয়েছে। শেষ অংশ এখনও লেখা হয় নাই। আর একটা যোগাড় হয়েছে। জেলায় বাহাদুর তিনিও আমার উপর ভারি চটেছেন।"

বউ—"কারণ? তাঁর আবার কি করেছ?"

ভে—"তাঁর কিছু করি নাই। সোনাবিবির পুত্রের সঙ্গে আমিই নাকি আপোস মিটমাট কর্ত্তে দিচ্ছি না। তাই এঁরা সেখানে লিখেছিলেন, তাইতে আমার উপর ভারি চটেছেন। আমাকে নিশ্চয় জেলে পুরবেন।"

বউ—"জেলে পুরবেন, পুরুন। তাঁর উপরে কি আর হাকিম নেই? এ রাজের সকল হাকিমই কি বেগম সাহেবের নুন খেয়েছেন? সকল হাকিমই কি তাঁর বন্ধু হয়েছেন? সকল হাকিমই কি তাঁর হুকুমের তাঁবেদার হয়ে খাটছেন?"

ভেড়াকান্ত কিছু বলিলেন না, অন্য অন্য কথা আরম্ভ করিলেন। সংসারের কাজ-কর্ম্মের বিলি-ব্যবস্থা সমুদায় স্ত্রীর উপর নির্ভর। তত্রাচ যাহা তাঁহার মনে নাই, কি মনোযোগে ত্রুটি হইয়াছে, সেইগুলি কথার ছলে বলিয়া দিলেন। ভেড়াকান্তের চির-অভ্যাস, স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া রাত্রে একত্র আহার করা। আহারের সময়ে সকলে টেবিল ঘিরিয়া বসিয়াছেন। হাসি-রহস্য নানা কথা চলিয়াছে।

ইতিমধ্যে ভেড়াকান্ত বলিলেন, "আচ্ছা, সত্যি সত্যি যদি আমার ফাটক হয়, তা হলে তোমরা কি করবে?"

কেহ কোন উত্তর করিল না। কাহারও চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। কেহ মাথা নীচে করিল। ছোট একটি কন্যা, সে বলিল, "আমরা কাঁদব।"

ভে—"কাঁদলে কি লাভ হবে?"

স্ত্রী বলিলেন, "তুমি হাসি-তামাসা করে ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমোদ কচ্ছো, না সত্য সত্যই কথার উত্তর চাচ্ছো।"

ভে—"হাসি-তামাসাও বটে; মাঝে একটু কথা যে না আছে, তাও নয়; তাও বটে। ঘটনার কথা কিছু বলা যায় না। উকিল মোক্তার যে শুনেছে, যে কাগজপত্র দেখেছে, সেই বলছে যে, এটা মোকদ্দমাই নয়। প্রমাণ নাই। কিছু নাই। উদ্দেশ্য নাই। বিনা কারণে ঘটনা হবে কেন? এই মোকদ্দমায় যদি তোমাকে দণ্ড পেতে হয়, তবে পথের লোককে ধরে শাস্তি দিলে কে বাধা দেয়? সকলেই এই কথা বলে। তা বলুক, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না, আমাকে নিশ্চয়ই ফাটকে দিবে; জরিমানা করবে না। কি জানি কথাটি যদি সত্য সত্য ঘটে যায়, তখন তোমরা ত একটা মহাবিপদে পড়বে। কতজনে কত কথা বলতে থাকবে। চার দিক হতে লোকে উপদ্রব আরম্ভ করবে। সে সময়ে খুব ধীরভাবে কার্য্য

করবে। প্রথম, আমার উদ্ধারের উপায়; ২য়, ছেলেমেয়ের প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক সাবধানে দৃষ্টি। ৩য়, যাহা যেমন যে প্রকার আছে, তা ঠিক সেইভাবে রাখা। একটি খড়ও যেন স্থানান্তরিত না হয়। ৪র্থ, তুমি কেঁদে অস্থির হইও না। আমি জানি, তোমার সাহস আছে—তত্রাচ স্ত্রীলোক—তারপর বিদেশ। আত্মীয়-স্বজন বলতে একটি প্রাণী নাই। কেবল আমরাই দশটি প্রাণী, আর চাকর-চাকরাণী, আর দূর আত্মীয় দুইটি স্ত্রীলোক। পাগলের মত কাজ করলে কোন ফল নাই। খালাসের যোগাড় এখানে কিছুই নাই। জেলায় ইহার যোগাড় করতে হবে। প্রথম জামীন দিয়ে খালাস করে আনতে পাল্লেই, আমি এসে আর অন্য অন্য কাজ কর্ত্তে পারবো। তোমাদের প্রধান কার্য্য জেলায় লোক পাঠিয়ে আপীল করা, সেইখানে তদ্‌বির করা। অবশ্য সোনাবিবিই সমুদায় করবেন। তথাচ তোমাদিগকেও বলে রাখলেম। আমার জন্য কোন চিন্তা কর না। আমি পুরুষ। রাজপ্রতিনিধি হাকিমানের অন্যায় বিচারে যদি শাস্তি ভোগ করি, সে আমার কপালের লেখা। অবশ্যই কোন পাপ আমার আছে, সেই পাপের জন্য জেল-ভোগ। মনের অগোচর পাপ নাই। আমি মনে মনে জানি, যে যে পাপ আমার আছে। ঈশ্বর কৃপায় এমন কোন পাপ জানিতপক্ষে করি নাই যে, যাতে জেলের কয়েদী হয়ে জীবন ক্ষয় করবো, চৌদ্দ পুরুষের নামে কলঙ্ক রটাব, আর তোমাদিগকে পাথারে ভাসিয়ে দিব, এমন পাপ আমি করি নাই। তবে ঈশ্বর কি ভাবছেন, তা তিনিই জানেন। তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজন কাহার কাছে কোন কথা লিখো না। যদি নিতান্তই অপারগ হও—সহ্য করতে অক্ষম হও—তোমাদের মনে যাকে যাকে লিখতে ইচ্ছা হয় লেখ। টাকা-পয়সা যা লাগে, সমুদায় সোনাবিবি দিবেন। নিতান্ত পক্ষে যদি তিনি না দেন, তবে তোমাদের ইচ্ছা হয় দিও, না হয় না দিও। ঈশ্বর আমার কপালে যা লিখেছেন, তাই হবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিতেই স্ত্রী আহারে ক্ষান্ত দিয়া হস্ত উঠাইয়া বলিলেন, "সে কি কথা? কথা বলতে বলতে কি কিছু ভাবতে নাই? কি বলো, কি হয়, তার অর্থ নাই, দিগ্‌বিদিগ জ্ঞান নাই।"

ভেড়াকান্ত একটু লজ্জিত হইলেন। বাস্তবিক, কথাটা মনের গতিকে হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছেন। প্রকাশ্য বলিলেন, "ঠিক তুমি যা বলেছ, তা দিন রাত ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ঠিক নাই।"

স্ত্রীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। তখন পর্য্যন্ত হস্ত উত্তোলিতই আছে। আর মুখে হাত উঠে নাই।

ভেড়াকান্ত স্ত্রীর মুখে চক্ষের ভাব দেখিয়া মনে মনে দুঃখের সহিত লজ্জিত হইলেন এবং বলিলেন, "সোনাবিবি যদি নিতান্ত পক্ষে টাকা না দেন, তুমি তাঁর নিকট গিয়ে নিজে টাকা চাহিবে। যদি তাতেও না দেন, তবে তুমি দিও। তোমার যা থাকে, সমুদায় দিয়ে দিও। যদি আমার প্রাণরক্ষা হয় তবে টাকা জিনিসপত্র সকলি পাবে। টাকার মূল্য কি? কতবার টাকা হল, গেল; আবার হলো, আবার যাবে। প্রাণের কাছে টাকা হাতের ময়লার

সমান। কাহারও কোন কথায় অস্থির হইও না। সুখদুঃখ জড়িয়েই সংসার।"

এ পর্য্যন্ত হস্ত উত্তোলিতই আছে। ভেড়াকান্ত স্ত্রীর হাত ধরিয়া সঙ্কেতে আহারের অনুরোধ করিলেন। গোল মিটিয়া গেল।

ভেড়াকান্ত বলিলেন, "জীবনে অনেক দেখলাম, অনেক ভোগ ভুগলাম; জেলখানার কাণ্ডটা আর বাকী থাকে কেন?"

যাহা হউক, এইরূপ আর অনেক কথা কহিতে কহিতে আহার সাঙ্গ হইল। হস্ত মুখ বিধৌতের পর চুরুট সিগারেটের পালা আসিল—কন্যা পুত্রগণ স্ব স্ব স্থানে শয়নের জন্য বিদায় হইল। স্বামী-স্ত্রীতে টাকাকড়ি সম্বন্ধে কোথায় কি আছে, কাহার নিকট কি গচ্ছিত আছে, এই সকল কথার আলোচনা করিতে করিতে অনেক রাত্র হইল। উভয়ে ঘুমাইতে যাইবেন, এমন সময় সব ডেপুটি সাহেবের বাড়ীর একটি দাসী আসিয়া বলিল, "হুজুর! দেখুন, এত রাত্রে মৌলবী সাহেব বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিলেন। এখন আমি যাই কোথা? আমি স্ত্রীলোক, এত রাত্রে যাই কোথা?"

সব ডেপুটির নিজ বাড়ীর লোক নহে, শ্বশুর বাড়ীর মানুষ, স্ত্রীর সঙ্গে আসিয়াছে। ভেড়াকান্তের স্ত্রী অতি যত্নে তাহাকে স্থান দিয়া আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। সে আহার করিল না। তাড়াইয়া দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কিছুতেই বলিবে না—শেষে চুপি চুপি ভেড়াকান্তের স্ত্রীর নিকট বলিল—তিনি শুনিয়া অবাক। দাসীকে ভিখারিণীর নিকটে রাখিয়া, স্বামীর নিকটে বলিতে যাইলেন।

"দেখ, তোমাকে এই বিয়ের পূর্ব্বে জোলা বলেছিলেম। আমার বেশ মনে আছে। তুমি কিছু বল্লে না, হেসে উড়িয়ে দিলে—মনে হয়? বলেছিলে যে, "ভায়া! টেলিগ্রাফে প্রণয় হয় না। দেখা নাই,শুনা নাই, কথা নাই, বার্ত্তা নাই, অমনি প্রেম। নামেই প্রেম। এ প্রেম কয় দিন?" ঠিক তাই হয়েছে, তোমার কথা ফলেছে। এই ছ মাস না যেতেই—বিয়ে করে ছ মাস না যেতেই, দেন মহর মাপের প্রার্থনা হচ্ছে। বিবি নারাজ। সে বলে "আমি কি জানি? মাপ দেয় না দেয় আমার পিতা ভ্রাতা মামা ইঁহারা জানেন।" এই এক নম্বর গোল। ২ নম্বর গোল—তুমিই এসে বল্লে ষ্টিমার হতে নামবার সময়, সেই আলীগড় হতে ফিরে আসবার দিন, ষ্টিমার ঘাটে সব ডিপুটির বাড়ীর দাসীও আসে। তুমি তাকে দেখেছ। সেই দাসী—সেই দাসীই নাকি বিবাদের মূল। এখন সব ডিপুটি সাহেব বাহিরে থাকেন। বিবি অন্দরে থাকেন। দাসী বিবির নিকট থাকে। সে কোন কামই করে না! কেবল সব ডিপুটি সাহেবের পা দাবে, হাওয়া করে, মাথার পাকা চুল টেনে তোলে। তাইতেই এত কেলেঙ্কারী। বিবির বাপমার বাড়ী হতে বজরা এসেছে। সর্দ্দার লাঠিয়াল এসেছে, বিবির ভাই এসেছে। বিবি এখন যায়, সব ডিপুটির আর রাখবার সাধ্য নাই। সব ডিপুটি ভেবেছে, এই দাসীটাই বিবির বাপের বাড়ীতে খবর দিয়েছে। তাতেই তার প্রতি রাগ। সেই অপরাধেই তাড়িয়ে দেওয়া।"

"চুলোয় যাক। ও সকল ভক্ত বিটেল কপটি ভণ্ডদের কথায় কান দিতে নাই। আগে

বোতল বোতল ব্রাণ্ডি চুমুকে কাবার করেছেন। হিন্দুর বাড়ীর প্রসাদী না খেলে ক্ষুধা যায় নাই। এখন প্রকাশ্য কতই বুজরগী, কতই মাথা নাড়া, কতই তস্‌বিটেপা। আবার গোপনে গোপনে বাড়ীর মধ্যে ঢোকে ঢোকে ওকর্ম্ম। ওদের আমি দুই চক্ষে দেখতে পারি না।। যারা প্রকাশ্যে হেদাতী, অন্দরে বেদাতী, গোপনে বজ্জাতি, তাদের অসাধ্য কিছু নাই। ঐ দেখ! ছোট ছেলে নড়াচড়া করে উঠলো। তুমি ওকে কোলে করে ঘুমাও, অনেক রাত হয়েছে, আমার সঙ্গে সঙ্গে জেগে কাজ নেই। তোমার চক্ষের বেরাম বেশী হয়েছে, রাত জাগলে আরও বাড়বে। গীতাভিনয়ের পালার শেষ অংশটা লিখতে বাকী আছে—রাত্রেই লিখে শেষ করবো। তুমি কাল শুনো।".

ভেড়াকান্ত দোত কলম কাগজ চুরুট লইয়া বসিলেন। স্ত্রী ছেলে কোলে করিয়া তাঁহার পার্শ্বেই শয়ন করিলেন। লিখা আরম্ভ হইল—বাসরঘর শেষ করিয়া প্রভাতে গানের সহিত রাত্র প্রভাত করিলেন। দোত কলম রাখিয়া একটু আড় হইলেন। ভেড়াকান্তের ভাগ্যে নিদ্রার সুখ প্রতি রাত্রে প্রায় ঐরূপই ঘটে।

রাত্র প্রভাত হইল। মোকদ্দমার হুকুম হইবে। শীঘ্র শীঘ্র লেখাপড়া, ঘর-সংসারের কাজ, চিঠিপত্র লিখিয়া ভেড়াকান্ত শীঘ্রই স্নান করিলেন। কিঞ্চিৎ আহার করিয়া নয়টার মধ্যে কাচারি যাইতে প্রস্তুত হইলেন। স্ত্রীর হাত ধরিয়া ঈশ্বরে সঁপিয়া বিদায় হইলেন। ছেলেদের মধ্যে যাহারা সম্মুখে পড়িল, কাহারও মাথায় হাত, কাহার মুখে চুমা দিয়া—কাচারিমুখো হইলেন। সোনাবিবির পক্ষের লোকজনও কাচারিতে ভেড়াকান্তের সাহায্যে চলিল। বারটা একটা দুটোর সময় হাকিম বাহাদুর এজলাসে রায় দিলেন। অন্য অন্য কাজ করিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বলিলেন, "ভেড়াকান্তের মোকদ্দমার হুকুম আগামীকল্য দিব।"

ভেড়াকান্ত বাটিতে আসিলেন। পরদিন নিয়মিত সময় কাচারিতে হাজির হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিলেন। সেদিনও কোন হুকুম হইল না। এই প্রকার সপ্তাহ কাল কাটিল, হাকিম সাহেব কাচারির শেষে বলিতেন, আজ নয় কাল—প্রতিদিনই বলেন কাল। উকিল মোক্তার সকলেই ভাবিল এবং বলিল, শাস্তি দেওয়ার কোন পথ পাইতেছেন না, এই প্রকার ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খালাস দিবেন।

আজ নহে কাল হুকুম দিব। এই আজকালের মধ্যে সেই পুলিস প্রহার মোকদ্দমায় পুলিস তদন্ত শেষ করিয়া একটি নকল আসামীকে চালান দিয়াছেন। কারণ আসল আসামী—তাহারা সেই রাত্রেই আপন আপন দেশে চলিয়া গিয়াছে। আসামী প্রায় দেড় শত, উপস্থিতের মধ্যে একজন—সেও আসল নহে। এই মোকদ্দমা পাইয়া হাকিম সাহেব মনোযোগের সহিত বিচার করিতেছেন। উদ্দেশ্য অনেক আছে। শাস্তি দিতে পারিলে লাঠিয়াল সংগ্রহকারীদিগকে আবার টানিতে পারেন। সাক্ষীদিগের মধ্যে কেহ বলিল, এই আসামী ছিল; কেহ বলিল, ইহাকে দেখি নাই। হাকিম বাহাদুর ঐ হাজিরা আসামীকে দুই বৎসরের জন্যে কয়েদের হুকুম দিলেন। দুই বৎসরের ম্যাদের পর ছয় মাস কাল

ভালভাবে থাকার জন্য পাঁচ শত টাকার জামিনের হুকুমও হইল। আর যাহারা লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাদিগকেও তলব করা হইল। বলা বাহুল্য যে, যে তলব মধ্যে দাগাদারী, ভেড়াকান্ত, সোনাবিবি নিশ্চয়ই আছেন।

সকলের মনেই ধ্রুব বিশ্বাস যে, ভেড়াকান্তকে খুব ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শেষে খালাস দিবেন। প্রতিদিন ১০টার সময় কাচারিতে আসেন, সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরিয়া যান্। ক্রমাগত এরূপ যাওয়া-আসায় ভেড়াকান্তও আর তত আশঙ্কার সহিত তত প্রস্তুতের সহিত বিদায় হইয়া আসেন না। কোনদিন স্ত্রীর সহিত দেখা না করিয়াও কাচারিতে আসিয়া থাকেন। কোনদিন কোন কথা না বলিয়াও কাচারিমুখো হয়েন। এইরূপে প্রায় ১৫ দিন অতীত হইল।

একদিন—সেদিন ভেড়াকান্তর মন যেন ডাকিয়া বলিল, আজ ফাটকে থাকিতে হইবে। ভেড়াকান্ত মনের কথা কাহাকেও বলিলেন না। কাচারি আসিবার সময় কয়েকখানি নোট দুই শত টাকার, নগদ ৬০্ টাকা, একখানা কোর্ট ফি ৷৷০ আনার, একখানা ডেমি কাগজ কোটের পকেটে করিয়া স্ত্রীর নিকট বিদায় হইয়া আসিলেন। স্ত্রীর মনে বিশ্বাস যে, প্রতিদিন যেমন সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে আসিয়া থাকেন, আজিও আসিবেন। তিনি অত লক্ষ্য করিলেন না। তাঁহার মনে আরও বিশ্বাস যে, সর্ব্বসাধারণে বলিতেছে কিছু হইবে না, এটা মোকদ্দমাই নহে, যদি হাকিমের মনের গতিকে কিছু দণ্ড করেন—জরিমানা ভিন্ন শারীরিক দণ্ড দিবার কোন কারণ নাই। হাকিম সাহেব এ পর্য্যন্ত তাচ্ছিল্য ভাব—যেন ছাড় ছাড় ভাব দেখাইতেছেন; কাহারও মনে এ কথা নাই যে, তিনি শারীরিক দণ্ডের হুকুম দিবেন। বিপক্ষ মোক্তারদিগের সহিতও ভেড়াকান্তর আলাপ আছে; তাঁহারাও বলিয়াছেন, কোন চিন্তা নাই, নিশ্চয় ছাড়িয়া দিবেন। নিতান্ত পক্ষে পঞ্চাশ টাকা অর্থ দণ্ড, ইহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

কাচারিতে দুই একদিন পর দাগাদারীর সঙ্গে দেখা হয়। দাগাদারীর মোকদ্দমার মুলতবি কাল উত্তীর্ণ হইয়া, এ পর্য্যন্ত কোন স্থান হইতেই জামিনীর হুকুম হয় নাই। ভেড়াকান্তের সহিত অদ্যও সাক্ষাৎ হইল। আজ দাগাদারী ভারি চিন্তিত। ধিন্‌তাধিনা মোক্তার বাবু কোন বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়েছেন, ভেড়াকান্তকে নিশ্চয়ই ফাটক দিবে। দাগাদারী কোর্ট সব ইন্‌স্পেক্টার ঘরে কোটের জিম্বায় আছেন। কাচারি অন্তে প্রতিদিন যেরূপ হাজত গৃহে গিয়া থাকেন, অদ্যও সেইরূপই যাইবেন। ভেড়াকান্ত কোটের ঘরে গিয়াছেন, উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। দাগাদারী কয়েকটা কথা ভেড়াকান্তর কানে কানে বলিলেন, "এখানে বেশী কথা বলিবার সাধ্য নাই। অবশিষ্ট কথা ধিন্‌তাধিনা বাবুর নিকট যাইয়া শুনুন। আমার শত উপরোধ—যা বলিলাম, তাহা করুন। ধিন্‌তাধিনা বাবু যে পরামর্শ দেন, তাহা শুনুন। অত গোঁয়ারতমু করিবেন না—শুনুন, আমার কথা শুনুন। দোহাই আপনার, আমার কথা রাখুন।" এই কথা যখন উভয়ে হয় তখন বেলা একটা।

ভেড়াকান্ত বাবুর মোক্তার লাইব্রেরীতে আসিয়া বসিলেন। ধিন্‌তাধিনা বাবুও আসিলেন, নির্জ্জনে উভয়ের কথা হইতে লাগিল।

ধিন্‌তাধিনা বাবু বলিলেন, "আমি কোন সন্ধানে জানিয়াছি যে নিশ্চয় আপনার ফাটক হইবে। যে রায় লেখা হইয়াছে, সে রায় যে যে লোকে পাঠ করিয়া দেখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ আমাকে বলিয়াছে, আপনার বন্ধু-বান্ধব মধ্যেও দুই একজন ঐ রায় দেখিয়াছে। কি শাস্তি হইবে, তাহা লেখা হয় নাই। সম্পূর্ণ দোষী, হুকুম হইল যে—এই পর্য্যন্ত লিখা আছে, ইহা নিশ্চয়। রায়ের এবারতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কায়িক শাস্তি না দিয়ে যায় না। তাইতে দাগাদারী বল্‌ছেন যে, আপনি—"

ভেড়া..."আমি কি?"

মোক্তার বাবু সাহস করিয়া বলিতেও পারেন না, না বলিলেও চলে না। অনেক কষ্টে বলিলেন, "দাগাদারীর ইচ্ছা, আপনি এখনি কাচারি হতে চলে যান। জামিনী জব্দ ভিন্ন আজ আর কিছুই কর্ত্তে পারবেন না। জামিনী জব্দ করে ওয়ারেণ্ট করিবেন, এই ত ক্ষমতা! এর মধ্যে আপনি রাজধানী চলে গিয়ে, মোকদ্দমা যাহাতে এর হাত হতে উঠে যায়, তার তদবির করুন। টাকা যত লাগে, সোনাবিবি দিবেন। যদি বলেন, আমিও আপনার সঙ্গে রাজধানীতে যাচ্ছি। তা যদি হয়, আর বিলম্ব করবেন না। এখনই চলে যান।"

ভেড়া—"আপনি আমাকে এই পরামর্শ দেন?"

মোক্তার—"আমি কিছুই বলি না। কারণ, যদি আপনি এই উপায়ে রক্ষা হতে পারেন, তবেই মঙ্গল। আর যদি রক্ষা না হয় আপনার কায়িক শাস্তি ঘটে, শেষ একটা কথা থাকবে—আমি কিছুই বলি নাই, দাগাদারী বলল।"

ভেড়া—"ছি ছি! আমি পালাব। ঘৃণার কথা, আমি পালাব। কখনই না। পুরুষের মত কাজ করবো, কাপুরুষের পরিচয় দিব না। ধিক্ আপনাদের এই কথায়! শত ধিক্ দাগাদারীর বিবেচনায়! যদি আমার অদৃষ্টে ফাটক লেখা থাকে, তবে অবশ্যই হবে। যদি না থাকে, এই হাকিম ধরে বেঁধে দিলেও টিকবে না। তবে দুই-চারদিনের কষ্ট, তা কি করব। জন্মেছি, জগতে এসেছি কি জন্যে? কষ্ট ভোগ করার জন্যেই এসেছি। চুরি-ডাকাতি করি নাই, অন্য কোন লজ্জাকর, ঘৃণাকর অপরাধ করি নাই। তাতে দণ্ড হলে তার চেয়ে মরণ ভাল। জমিদারদিগের জন্যেই হাকিম, জমিদারদিগের জন্যেই আইন। জমিদারী কার্য্যে কত রাজার ফাটক হয়েছে, কত বড়লোকের ফাটক হয়েছে। আমি সেজন্য কোন চিন্তা করি না। আপনি দাগাদারীকে বলুন, আমি কাপুরুষ নই, আমি পালান কথা শিখি নাই, আমার গুরু পালান পাঠ আমাকে পড়ান নাই। যা আমার অদৃষ্টে থাকে, হবে। তবে আপনাদের নিকট আমার এই নিবেদন যে, রায়ের নকল যাতে এই রাত্রে লেখা শেষ হয়ে আগামী কল্য জেলায় রওয়ানা হতে পারে, তাই করবেন।"

মোক্তার—"অবশ্য করবো। যত টাকা লাগে, যে খরচ লাগে, আজ রাত্রেই লিখিয়ে আগামী কল্য ডাকে জেলায় রওয়ানা করবো। একথা আমি প্রতিজ্ঞা করে আপনার নিকট স্বীকার হলেম, আর আপনি যে দাগাদারীর মতে অমত প্রকাশ কল্লেন, আমি ধর্ম্মতঃ বলতেছি, বড়ই সুখী হয়েছি। পুরুষের মতই কথা বলেছেন। পালালে ওয়ারেণ্ট হত।

সাধারণ মনে একথা নিশ্চয় জন্মাত, উপরিস্থ বিচারকগণের মনেও একথা অবধারিতরূপে উঠতো—দোষী না হলে কখনও পালায় নাই। আপনার সাহসে আমি শত শত ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

দাগাদারী লোকের উপর লোক পাঠাইয়া "শীঘ্র শীঘ্র কাচারি হতে চলে যান, শীঘ্র শীঘ্র চলে যান" বলিয়া বলিয়া বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিল। ওদিকে সোনাবিবি পর্য্যন্ত কথা গিয়াছে যে, ফাটক নিশ্চয়ই হইবে। নিজ পক্ষের মোক্তার বাবুগণ, দাগাদারী ভাই, এঁরা সকলেই বলিতেছেন যে, "আপনি পালান, এখান হতে চলে যান।" সোনাবিবির বাড়ী হইতেও লোক আসিয়াছে। ঐ কথা—দাগাদারীর প্রেরিত মোক্তার দলেরও ঐ কথা।

ভেড়াকান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি পুরুষ বাচ্চা। পালান কথা জানি না। কি জন্যে পালাব? এ ব্রিটিশ রাজা, এখানে অবিচার হতে পারে না। একজন অবিচার করে শাস্তি দিবেন, আর একজন সুবিচার করে খালাস দিবেন। শত সহস্র মোকদ্দমা এরূপ হচ্ছে। আমি স্ত্রীলোক নই, ভীতু নই, কাপুরুষ নই যে পালাব।"

সকলেই নিরস্ত হইলেন। বেলা চারিটার সময়ে ভেড়াকান্তের তলব হইল। ভেড়াকান্ত একখানি দরখাস্ত লিখিয়া পকেটে পুরিয়া এজলাসে আসামীর কাটগড়ায় খাড়া হইলেন। উকিল মোক্তার আমলা পেয়াদা কনেষ্টবল দর্শক তামাসগিরি লোকে কাচারি ভরিয়া গেল। অন্য অন্য আদালতের উকিল আমলারা পর্য্যন্ত আসিয়া ভেড়াকান্তের মোকদ্দমার হুকুম শুনিতে খাড়া হইলেন।

ভোলানাথ হাকিম বাহাদুর ঘাড় গুঁজিয়া রায়ের অবশিষ্টাংশ লিখিতেছেন। লেখা শেষ হইলে হুকুম পড়িয়া শুনাইলেন, "তোমার দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবাস।"

এই পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিয়া আর উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। গলার স্বর ভারী হইল, হস্ত কাঁপিতে লাগিল, কেন এরূপ হইল, ঈশ্বর জানেন। ঐ ভাঙ্গা স্বরে বহু চেষ্টায় পুনরায় বলিলেন, 'দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবাস, হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অর্থদণ্ড না দিলে আরও ছয় মাস কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবাস। ম্যাদ অন্তে ছয় মাস কাল সচ্চরিত্র থাকার জন্য দুই হাজার টাকার জামীন।"

কাচারিস্থ সমুদায় লোক একেবারে 'থ' হইয়া গেল। ভেড়াকান্ত মনে মনে একটুকুও ভীত হইলেন না। পকেট হইতে দরখাস্তখানা বাহির করিয়া হাকিমের টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। হাকিম পেস্কারকে দরখাস্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, পেস্কার দরখাস্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, "রায়ের নকল জন্য প্রার্থনা।"

হাকিম সাহেব দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন। দরখাস্তের পৃষ্ঠে সহি করিয়া ক্রোধস্বরে বলিলেন, "লে যাও।"

ভেড়াকান্ত বলিলেন, "আমাকে লে যাইতে হইবে না, আমিই যাচ্ছি। তোমার হদ্দমুদ্দ সাধ্য ক্ষমতা যা ছিল, তা করেছ। আর কি?"

হাকিম বাহাদুর চটিয়া বলিলেন, "আবি লে যাও।"

ভেড়াকান্ত সজোরে পদ নিক্ষেপ করিতে করিতে কোটের কামরায় আসিয়া কয়েকটি ভাঙ্গা বাক্সের উপর বসিলেন। কোটবাবু চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন, "আমি এখন কয়েদী, এই ভাঙ্গা বাক্সই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

কোটের কামরায় দাগাদারী বসিয়া আছেন, দুইজনে একসঙ্গেই বসিলেন। দাগাদারী তখনও চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন, "আমি এত বারণ করলাম এত বললাম, আপনি শুনলেন না, কি করব? মানুষ বিপদে পড়লে বুদ্ধিহারা হয়।"

ভেড়াকান্ত একটু বিরক্তির ভাবে বলিলেন, "আপনি আমাকে কি ভেবেছেন জানি না। এখন আর সে কথা কেন?"

ভেড়াকান্তর ম্যাদ হইয়াছে, মুহূর্ত্ত মধ্যে অরাজকপুরময় রটিয়া গেল। দলে দলে লোক সকল ভেড়াকান্তকে দেখিতে কাচারির আঙ্গিনায় আসিয়া জুটিতে লাগিল। দোকানদার, সদাগর, স্কুলের বালক, শিক্ষক, যেখানে যে অবস্থায় ছিল, ভেড়াকান্তের প্রতি এই অন্যায় অবিচারের কথা শুনিয়া, যেমন কোন হাটের লোক কি কোন মেলায় লোক ক্রমে একত্র হইতে থাকে, সেইরূপ একত্র হইয়া উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সকলের মুখই মলিন, অধিকন্তু অনেকের চক্ষেই জল, সকলেই নীরব।

ভেড়াকান্তর সহিত কাহারও অসদ্‌ভাব ছিল না, সর্ব্বসাধারণে ভেড়াকান্তকে ভাল জানিয়া ভালবাসিত, সহস্র মুখে ভোলানাথ হাকিমকে নিন্দা,—কেহ গালাগালি পর্য্যন্ত দিতে লাগিল। অরাজকপুরের মধ্যে যার কানে এই সাংঘাতিক সংবাদ প্রবেশ করিল, সেই আপন কার্য্য ফেলিয়া কাচারির আঙ্গিনার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কান্দিতে লাগিল, পুরুষ স্ত্রী সকলেরই চক্ষে জল। ভেড়াকান্তকে সকলেই ভালবাসিত।

কি চাতুরী! কি চালাকী! কুঞ্জ-নিকেতনের বেগম ঠাকুরাণী তাঁহার প্রধান কার্য্যকারককে ভেড়াকান্তর নিকট পাঠাইয়া দুঃখের সহানুভূতি জানাইলেন। কোনরূপ সাহায্য করিতে হইলে প্রস্তুত আছেন।

এদিকে হাকিম বাহাদুর দেখিলেন যে, জনসাধারণ সমুদায় ভেড়াকান্ত জন্য দুঃখিত। সকলেরই খরদৃষ্টি হাকিম বাহাদুরের প্রতি; সকলেরই মনের ভাব যে, যদি ক্ষমতা থাকিত, তবে ভোলানাথকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া পিষিয়া ফেলিত। হাকিম বাহাদুর এই সকল ঘটনা দেখিয়া তখনি জেলায় উপরওয়ালার নিকট রিপোর্ট করিলেন, "ভেড়াকান্তকে জেলে দেওয়া হইয়াছে। সাধারণের যেরূপ মনের গতি ও ভাব দেখা যাইতেছে, ভেড়াকান্তও যেরূপ দুর্দ্দান্ত, হয়ত এখানকার জেল ভাঙ্গিয়া পালাইতে পারে, কি সাধারণে লইয়া যাইতে পারে। যত শীঘ্র হয়, জেলা হইতে রিজার্ভ সৈন্য চল্লিশ জন মায় সঙ্গীন গুলি বারুদ পাঠাইলে কয়েদীকে নিঃসন্দেহে জেলায় পাঠান যাইতে পারে। সামান্য দুই চারিজন কনেষ্টবলের হাওলায় কখনই কয়েদীকে জেলায় পাঠান যাইবে না।

তখনই রিপোর্ট ডাকে রওয়ানা করিয়া হাকিম বাহাদুর ঋতুরাজ বাবুর বাসার দিকে চুরুট টানিতে টানিতে চলিয়া গেলেন। সূর্য্যদেব রাজপ্রতিনিধির নিরপেক্ষ বিচার দেখিয়া,

লোহিত লোচনে অস্তাচলে গমন করিলেন। ভেড়াকান্তর বাড়ীর লোকজন এই খবর শুনিয়া কান্দিতে কান্দিতে কাচারিতে আসিল; এবং তাহাদের নীরব ক্রন্দনে ও ভেড়াকান্তের দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রের ক্রন্দনে দর্শকগণের চক্ষু জল আরও বৃদ্ধি করিল।

ভেড়াকান্ত বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই। কান্দিলে কি হবে? এখনকার যে উপায়, তাই করতে বল গিয়ে।"

এই বলিয়া ভেড়াকান্ত মাথার টুপী, ঘড়ির চেন এবং নোট টাকা, সমুদায় স্ত্রীর হস্তে দিবার জন্য বাড়ীর লোকের হাতে দিলেন।

ঘোর সন্ধ্যার সময় দাগাদারীর হাত ধরিয়া ভেড়াকান্ত জেল অভিমুখে চলিলেন। চতুঃপার্শ্বে প্রহরি, স্বয়ং কোর্টবাবু জেল পর্য্যন্ত চলিলেন, দর্শকগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ জেলের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিল। বৃহৎ লৌহদ্বার ঝন্‌ঝন্ শব্দে খুলিয়া গেল। জেল রক্ষক পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল যে ভেড়াকান্ত বাবু জেলে আসিতেছেন। জেলের দ্বারদেশ হইতে ভেড়াকান্ত এবং দাগাদারীকে লইয়া জেলের মধ্যে প্রবেশ করিল। লৌহদ্বার পুনরায় ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে বন্ধ হইল। দর্শকগণ সজল নয়নে ভোলানাথের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে বাড়ী ফিরিল।

ভেড়াকান্ত বাবুর স্ত্রীর সম্মুখে টুপী ঘড়ি চেন টাকা নোট রাখিয়া দিয়া সংবাদদাতা কিছুই বলিতে পারিল না। চক্ষের জলে বুক ভাসিতেছে। ভেড়াকান্তের স্ত্রী শেষে দুই বৎসর ম্যায়াদের কথা শুনিয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে নির্ব্বাক কাষ্ঠপুত্তলিকার মত থাকিয়া পরে বলিলেন, "কি হল? ম্যাদ!!" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। কন্যাগণ, ছোট ছোট পুত্রগণ, মায়ের এই ভাব দেখিয়া তাহারাও কান্দিয়া উঠিল। মানুষ জগৎ ছাড়িলে কি হঠাৎ মৃত্যু সংবাদ আসিলে যেরূপ ক্রন্দনের রোল উঠে, মাথা-ভাঙ্গা আরম্ভ হয়, সেইরূপ ক্রন্দনের বিলাপ পাড়ার স্ত্রীলোক দলে দলে আসিয়া ক্রন্দনে যোগ দিল। কেহ ভেড়াকান্তর স্ত্রীর মাথায় জল ঢালিতে আরম্ভ করিল; কতক্ষণের পর একটু হুঁশ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামীকে যাহা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন, সেই কথা বলিয়া বলিলেন, "কোথায়? টুপী ঘড়ি চেন পাঠাইয়া তিনি কোথায় রহিলেন?"

চারিদিকে ক্রন্দনের রোল। পুত্র কন্যা মাটিতে গড়াগড়ি করিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া মনে হইল—আবার মূর্চ্ছা। অনেক শুশ্রূষার পর চৈতন্য হইলে বলিলেন, "হা! কপাল! এই জন্যই কি বিদেশে আসিয়াছিলাম? হায়! হায়! যা কখনও ভাবি নাই, তাই ঘটিল। হায়! হায়! কখনও যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, কপালের গুণে তাই হইল। কাঁদিব না। তাঁহার নিষেধ আছে। কাঁদিব না। এখন কি করা? কি উপায়ে তাঁহার রাত্রির আহার পাঠান যায়। হায়! হায়! তিনি উপাস পাড়িয়া কষ্ট পাইবেন। আমরা সুখে মুখে অন্ন দিব। তা হবে না, এখনই তাহার উপায় কর।"

সোনাবিবি তখন পাল্‌কি করিয়া ভেড়াকান্তের বাড়ীতে আসিলেন। বউকে অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন, "আমার জন্যে তার এই শাস্তি হলো। আমার যথাসর্ব্বস্ব পণ, যাতে

হয় খালাস করবো। তুমি কাঁদিও না। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তিনদিন মধ্যে খালাস করবো।"

বউ—"কাঁদিব না। মানুষের সাক্ষাতে কাঁদিব না। তাঁর নিষেধ আছে। প্রায় ১৭/১৮ দিন হলো, ভাত খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমাদের সব্বাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, বলত আমার যদি ফাটক হয়, তা হলে তোমরা কি করবে? বড় মেয়ে মেঝ মেয়ে, প্রকাশ্যে কাঁদলো না। কিছু বল্‌লে না। ছোট একটি মেয়ে সে বলে ফেল্লে, 'আমরা কাঁদব।' তাতে তিনি উত্তর করলেন, 'কাঁদলে কি লাভ হবে?' তাঁর প্রতি কথায় উপদেশ আছে। একটা কথা, বিশেষ ছেলেমেয়ে পরিবার এদের সঙ্গে তিনি বড় সাবধান সতর্কে কথা বলেন। অনর্থক একটি কথা বলতেন না। তাঁর উদ্দেশ্যই আমাকে শিক্ষা দেওয়া। কাঁদতে বারণ করেছেন। ছেলেমেয়ে আরও কাঁদবে, অস্থির হবে। 'প্রকাশ্যে কাঁদিও না। লোকের সম্মুখেও কাঁদিও না।' আমি প্রকাশ্যে কাঁদব না। এখন আমার প্রার্থনা এই যে, যাতে জেলের মধ্যে খাবার কিছু পাঠান যায়, তার যোগাড় করা। আর রায়ের নকল নিয়ে জেলায় লোক পাঠান, আপাতত এই দুইটি কাজ। রায়ের নকল নিয়ে জেলায় লোক পাঠান ত আর রাত্রে হবে না। কাল যাতে রায় জেলায় যায়, তার যোগাড় করা। আর আজ রাত্রের যোগাড় আহার সম্বন্ধে।"

সোনা—"সে সকল বিষয়ে তোমার কোন চিন্তা কর্ত্তে হবে না। সমুদায় আমি করবো। জেলখানায় প্রতি রাত্রে খাবার পাঠান হয়। যে যে উপায়ে পাঠান হয়, তা আমাদের খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। ১২টার পর ভিন্ন এদিকে পাঠালেও জেলের বাহিরে কোন স্থানে লুকিয়ে থাকতে হয়। ১২টার পর প্রহরিরা এমন একটি সঙ্কেত করে যে, তাইতে জানা যায় যে এই উপযুক্ত সময়। খাবার লয়ে যে যায়, তাকে খুব ময়লা কাপড় পরিয়ে পাঠাতে হয়। খাবার সমেত তাকে জেলের ভিতর ডেকে লয়। নিঃশব্দে দোর খোলে। জেলের মধ্যে যায়। যে স্থানে কয়েদী থাকে, সে ঘরের চাবি খোলে না। দরজার মধ্যে লোহার সিক গাড়া আছে। কপাট খুলে দেয়, সে কপাট বাহির হতে আটকান। ঘরের মধ্যে কপাট নাই, মোটা সিক দিয়া একেবারে বন্ধ করা। তার বাহিরে কপাট। তাব কারণ আছে, কয়েদীরা রাত্রে ঘরের মধ্যে কি করে না করে। সেই কপাট খুলে সঙ্কেত করলেই কয়েদী সেই সিকের নিকট আসে। ছোট ছোট বাটিতে খাবার পাঠাতে হয়। ঐ সিকের ফাঁক দিয়ে তারা হাত বাড়িয়ে লয়। বড় বাসনে পাঠাতে হয় না। সারা রাত ঘরের মধ্যে আলো জ্বলে। সেই আলোতে তাড়াতাড়ি খেয়ে, আবার ঐ ফাঁক দিয়া বাসন বাহির করে দেয়। প্রতি রাত্রে দশ টাকা করে বন্দোবস্ত আছে। আজ না হয় বিশ টাকা লবে। বিশ নিক্, ত্রিশ নিক্, যা নিক আমি দিব। তোমায় কিছুই দিতে হবে না। খাবার দিতে ইচ্ছা কর, দাও। বারণ করি না। কিন্তু আমিই আজ দুই জনার পরিমাণ পাঠাব।"

বউ—"তাঁর দুধ খাবার অভ্যাস। দুধ না পেলেই নহে। আমি দুধ পাঠাব। আর যদি কিছু পারি দিব। আপনি আর যা যা প্রতি রাত্রে পাঠান, আজ রাত্রে বেশী করে পাঠাবেন। যে লোক নিয়ে যায়, তার সঙ্গে দেখা হয়?"

সোনা—"কোন দিন দেখা হয়। কোন দিন হয় না। তুমি ছেলেমেয়ে নিয়ে যেমনভাবে ছিলে, সেই প্রকার থাক। কোন চিন্তা নাই, তোমার বাড়ীর লোকজনের অভাব নাই। তত্রাচ আমি বাহিরে পাহারার জন্য চারজন সর্দ্দার বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। তারা রাত্র দশটার সময় এসে খাড়া পাহারা দিবে। কোন চিন্তা নাই। রায়ের নকল জন্য একশত টাকা স্বীকার হয়েছি। আজ রাত্রেই লেখা শেষ হয়ে থাকবে। কাল প্রথম কাচারিতে হাকিমের দস্তখত হলে ডাকে পাঠান হবে। অদ্যই জিলায় উকিল ব্যারিষ্টার নিকট বিস্তারিত লিখে পত্র পাঠান হয়েছে। আজ মঙ্গলবার, কাল বুধবার, বৃহস্পতিবারে আপীল দাখিল হবে। তোমার যে দুই কথার দরকার, তার যোগাড় আমি আগে করে তবে তোমাকে দেখতে এসেছি।"

এই সকল কথা বলিয়া সোনাবিবি চলিয়া গেলেন। ভেড়াকান্তের স্ত্রী একটু আশ্বস্ত হইলেন। তাহার পর রাত্র দশটা পর্য্যন্ত অরাজকপুরের ভদ্রলোক মাত্রই ভেড়াকান্তের বাসায় আসিয়া সান্ত্বনা প্রবোধ দিয়া যাইতেছেন। সকলেই ভেড়াকান্তের জন্য দুঃখিত হইয়াছেন। অরাজকপুরের নাজিরের নাম কট্‌কটে বাবু। তাঁহার সঙ্গে ভেড়াকান্তের একটু বেশী আলাপ ছিল। তিনি প্রায়ই ভেড়াকান্তের বাড়ীতে আসিতেন। ভেড়াকান্তের স্ত্রী তাঁহাকে জানিতেন। তাঁহার সঙ্গে স্বামীর যেরূপ ভাব তাহাও জানিতেন। তিনি হাকিম পক্ষের লোক। হাকিম যদি শুনেন যে, কট্‌কটে বাবু ভেড়াকান্তের অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন, তবে ত কট্‌কটে বাবুর চাকুরি থাকা দায়। কট্‌কটে বাবু এমনি চতুর যে, হাকিমের নিকট এমনি ভাব জানান যে, ভেড়াকান্তের সহিত তাঁহার আলাপ নাই, একটু শত্রুতাই যেন আছে। সেই কৌশলের বলে তিনি মোকদ্দমায় রায় ফাটক হওয়ার দুই দিন পূর্ব্বেই পড়িয়াছিলেন। তিনি আসিয়া বলিয়া গেলেন, "কোন চিন্তা নাই। রায়ের নকল আজ রাত্রেই সারা হবে। দশটা মোমবাতি দিয়েছি। পাঁচজন লেখক নিযুক্ত করেছি। তবে একটা কথা সাবধান করে যাচ্ছি। হাজার টাকা যে জরিমানা হয়েছে, সে টাকাটা হাকিম কাল পর্য্যন্ত না পেলে পরস্ব দিন আদায় জন্য পুলিসের প্রতি পরোয়ানা দিবেন। সেই টাকার যোগাড় যাহাতে হয়, তা করে রাখবেন। তা না হলে হাকিম বেটা নিশ্চয় একটা গোল বাধাবে, অস্থাবর মাল ঘর বিক্রয়ের হুকুম দিবে।" এই কথা কট্‌কটে বাবু ভেড়াকান্তের স্ত্রীর নিকট বিশ্বাসী লোক দ্বারা বাড়ীর মধ্যে বলিয়া পাঠাইলেন। এবং আরও বলিয়া গেলেন যে, "আমি থাক্‌তে কোন চিন্তা নাই। জেলের মধ্যের ভাবনা ভাবতে হবে না। ডাক্তার আমার নিতান্ত বন্ধু। সে আমার হাত।"

এই বলিয়া কট্‌কটে বাবু বিদায় হইলেন। পাঠক! এতদিন রাত্রের ঘটনা অতি কমই দেখিয়াছেন। সারারাত জাগরণ করেন নাই। আজি আমার সঙ্গে সারাটি রাত বেড়াইতে হইবে। ঘুমাইতে পারিবেন না। এই এখনি দশটা বাজিবে। কুঞ্জ-নিকেতনের আমোদ-আহ্লাদ দেখিতে হইবে। তথা হইতে জেলের অবস্থা (আজ রাত্রির অবস্থা) দেখিতে হইবে। রাত্র শেষে ভেড়াকান্তের স্ত্রীর আক্ষেপ ও কাতর উক্তি শুনিয়া, রাত্র প্রভাতেই কয়েদীর কামজারী শরীরের মাপ নাম ধাম লেখা দেখিয়া, মোকদ্দমার রায় ডাকে পাঠাইয়া এ নথি শেষ

করিতে হইবে। চলুন, কুঞ্জ-নিকেতনে যাই। আজ কুঞ্জ-নিকেতনে বিরলে কুকুর পর্য্যন্ত আমোদে মাতিয়াছে। কারণ ভেড়াকান্ত জেলে।

বেগম-ঠাকুরাণীর সাজশয্যা আজ দেখে কে? সমুদায় জরির বসন। হিন্দুস্থানী পোষাক। বানারসী সাড়ী। বানারসী দোপাট্টা। অঙ্গে সোনার কাজ-করা চুমকি বসান আঙ্গিরা। বুকের উপর বেশী বেশী সোনা ঢালা। কারিগর খুব রসিক। স্ত্রীলোকের অঙ্গের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিস দুটি যে স্থানে, সেই স্থানে কত চাঁদ-তারা কাটিয়াছে। চার কোণে লতাপাতা সহিত প্রস্ফুটিত সোনার ফুল তুলিয়া দিয়াছে। সবুজ রেশমের সুতায় গোলাপের পাতা তুলিয়া সেই পাতার চতুষ্পার্শ্বে সোনার জলের রেখা টানিয়াছে। মাঝে মাঝে গোলাপের কুঁড়ি। কোন কোন কুঁড়ি অর্দ্ধ বিকশিত, কোন কোন স্থানে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত, বস্‌রাই গোলাপের জীবন্ত ফুল উঠাইয়াছে। ওড়নাখানা এমনি ভাবে বুকের এক পার্শ্বে রাখা হইয়াছে যে, প্রস্ফুটিত গোলাপের বাহার বেশ সুন্দররূপে দর্শকের বক্ষে পড়িতেছে।

কাল কেশ, পরিপাটীরূপে ইংলিশ ফ্যাসানে, পছন্দসই বাঁধা হইয়াছে। কাঞ্চনের প্রজাপতি, রজতের ভ্রমর, জোড়ায় জোড়ায় সিঁথির দুই দিকে, খোঁপার উপরে চিত্র-বিচিত্র পাখা বিস্তারে, অতি মোলায়েম অতি চিক্কন লম্বিত শিরা দুটি সামান্য বাতাঘাতে সঞ্চালিত হইয়া, জীবন্ত প্রাণীর পরিচয় দিতেছে। সদ্য প্রস্ফুটিত বেল ফুল খোপার চারিদিক খাঁটি রজত নির্ম্মিত ফুলের সহিত মিশিয়া নকল আসলে ভ্রম জন্মাইতেছে। শুভ্র দাঁতে আজ মিশি মিশিয়াছে। ওষ্ঠাধরে মিশির সহিত পানের সুরঞ্জিত রস মিশিয়া, চমৎকার ভায়লেট রঙ্গের আভা দেখাইতেছে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চাক্‌চিক্য বিশিষ্ট টিপ যুগল ভ্রূ মাঝে বসিয়া নূতন রূপের সৃষ্টি করিয়াছে। আজিকার পোষাকে সাএবির ভাঁজ নাই, খাঁটি হিন্দুস্থানী ভাব। উচ্চ অঙ্গের অতি উৎকৃষ্ট পালিস করা সুবর্ণের যুগল বলয় হাতে উঠিয়া সুবর্ণ জল যেন টলমলভাবে টলিয়া টলিয়া ঢলিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। হিরকের ফুল ঝুমকা উভয় কর্ণে দুলিতেছে। সুবর্ণে জড়িত, এয়াকুত পান্না জমরদে খচিত কপিপাত চিক্ কণ্ঠে উঠিয়া মন নয়ন মারাত্মক বিজলী ছটা, প্রতি প্রস্তর খণ্ডে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সুবর্ণ চন্দ্রহার অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত প্রসর জড়োয়া থাওয়া যথাস্থানে নিতাম্বরোপরি পড়িয়া আহ্লাদে ক্ষণে ক্ষণে নৃত্য করিতেছে অর্থাৎ শরীরের আকুঞ্চন, স্পন্দন, ফড়কান্ সহিত সংযোগে থাওয়া নড়াচড়া করিতেছে। তাহারই নাম চন্দ্রহারের থাওয়ায় নৃত্য। পায়ে সোনার জলতরঙ্গ জোড়া মল। জলতরঙ্গ রঞ্জিত জলের তরঙ্গ উঠাইয়া শত শত সুবর্ণ তারার ন্যায় ঝিকিমিকি করিতেছে। স্বভাবসিদ্ধ পদযুগল এদিক ওদিক নড়াচড়ায় সোনার ঢেউ যেন ঠাকুরাণীর পদযুগল ধরিয়া লুটলুটি করিতেছে। দর্শকগণের মাথা ঘুরিতেছে, পাঠকগণের মনে সেই এক মহামারী জলপ্লাবন ভাবের উদয় হইতেছে।

বাবুগণ! পূজনীয় দেবীকে মধ্যে বসাইয়া তাহার চতুঃপার্শ্ব ঘিরিয়া বসিয়াছেন। আজিকার বৈঠক, চেয়ার, কৌচ, কেদারা, সোফা নহে। প্রশস্ত চৌকির উপর ফরাস আসন। বাবুদের পরন পরিচ্ছদ খুব জাঁকাল, সকলের সম্মুখেই এক-একটি স্যাম্পিন উড়িয়া গিয়াছে,

তাঁহাদের আমোদ-প্রমোদের পুরামাত্রা দ্বিপ্রহর। উঠতিও নহে, ঢলতিও নহে, পড়তিও নহে, ঠিক বেলা বারটা, তবলা, বেহালা, মন্দিরা পর্য্যন্ত সঙ্গী হইয়াছে। রঞ্জিত নয়নে, মধুমাখা সঙ্গীত সুধা সমস্বরে ঝরিতেছে, আজ যেন জগৎ উল্টিয়া গিয়াছে, দুনিয়া রসাতলে যাইবার উপক্রম হইয়াছে, কিছুই জ্ঞান নাই, মন অতিরিক্ত প্রফুল্ল। অঙ্গ-ভঙ্গী, আঁখির ঠার, মস্তক হেলন, দোলন, বাহবা, বলিহারি যাই যেন পরবশে হইতেছে। গুপ্তভাবে সকলের উপর কে যেন আধিপত্য করিতেছে, মনের দ্বার—জানালা কবাট একেবারে খুলিয়া গিয়াছে।

ঋতুরাজ বাবু খুব তবলিয়া, বিখ্যাত তবলচি; মাথা নাড়িয়া, ঘাড় নাড়িয়া, হাতে হাতে সোম ফাঁক দেখাইয়া, লয়ের সহিত বোল, মেঘ গুড় গুড় ন্যায় গানের সঙ্গে সঙ্গে মাখামাখি ভাবে ছুটিয়াছে। আর আর সকলে সমস্বরে একযোগে গান ধরিয়াছেন। যথা—

(১)

"শারদে বরদে ওমা রেখো এই রাঙ্গা পায়।
হয়ে নিরুপায়
ধরি দুটি পায় (ওমা)
যে পায়ের আভা হেরে, চপলা মেঘে লুকায়।

(২)

শত মণি ধর গলে,
কর্ণেতে হীরক দোলে,
কাঞ্চনেরি তারা চাঁদে
ঘন কুচ শোভা পায়।

(৩)

ভ্রূ মাঝে টিপ্ বিন্দু,
করিতেছে শত ইন্দু,
গণ্ডেতে গোলাপ যেন ফুটিয়াছে দেখা যায়।

(৪)

চিকুরের শোভা হেরে,
ভ্রমর গুঞ্জিয়ে মরে,
রজতের বেলফুল কে রাখিল এ খোঁপায়।

(৫)

কিবা শোভা মুক্ত-হারে
চন্দ্রহারে সূর্য্য হারে,
ক্ষীণ কটি শোভা হেরে, হরি লাজে বনে যায়।

(৬)

তুমি যারে দেও পদ,
পদে পদে তার পদ,
নতুবা তার বিপদ, কিছুতে না রক্ষা পায়।

সমস্বরে বাবুগণ বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা! ঠিক কথা! অহে! এ গানটি কার লেখা হে? সে অন্তর্য্যামী নাকি? যা হবে পরে, তা সে লিখে গেছে আগে। বাবা! কি বন্দনা! কি মজার কথা! ফিরে গাও। আবার গাও।"

সকলে সমস্বরে পুনরায় গানটি গাহিলেন। গানের পর ভোলানাথ বাবু বলিলেন, "এখন আবার মুখ ভারী কেন?"

ঋতুরাজ বাবু বলিলেন, "আবার বুঝি কাউকে সরাতে ইচ্ছা হয়েছে।"

ভো—"ভায়া! ইচ্ছা হলেই কি সহজে সরান যায়। আট্‌ঘাট না বেঁধে সরান—সে সরান সরান নয়। সে সরে না, আরও সরে আসে, গায়ে পড়ে, ঘাড়ে চেপে—জড়িয়ে ধরে। কথাটি কি? হঠাৎ এর মনে কি কথা উঠে পলো?—আমি ত কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনে।"

ঋতু—"অহে ভায়া! স্ত্রীলোকের মন রাজধানীর কেল্লা, অথবা যাদুঘর। যেমন কেল্লার ভিতর, গোলা, গুলি, বারুদ, বন্দুক, কামান, ডিনামাইট, টরপিডো, তীর, তরবার, পুরামাত্রায় মজুদ আছে, আবার জ্বলন্ত দাবাগুনে গুমে ধোঁয়াটে, রঙ্গ-বিরঙ্গের তাপও আছে। আর একটা জিনিস যে আছে, তা আর কোথাও নাই।"

ভোলা—"একেবারে যে আকাশে তুল্লে!"

ঋতু—"মন যোগাতে আকাশে তুলি নাই। সেটি রমণী জাতির প্রধান অস্ত্র। সে অস্ত্র শান দিতে হয় না, অধিক ব্যবহারে ভোঁতা হয় না, ধার কমে না, মুখ ফেরে না, শত সহস্র পুরুষকে অনায়াসে বধ করে প্রাণে মারতে পারে। তার নাম হচ্ছে—'মায়া'।"

বেগম—(মুখ ভারী করিয়া) "যাহক খুব বল্লে। মনের গতি কখন কিরূপ হয়, তা যার মন সেও বুঝতে পারে না। অবশ্যই কিছু হয়েছে। মিছে বল্‌বো কেন?"

ঋতু—(তবলা রাখিয়া) "আচ্ছা! সে·'কিছু হয়েছে' কি আমরা কথাটা শুন্‌তে পারি না?"

বেগম—"তোমরা না শুন্‌লে চল্‌বে কেন?"

ঋতু—"তবে আর বিলম্ব কেন? আপনার মুখ ভারী হলে যে আমরা মারা যাই, উঠতে

পারি না,—পায়ে বেড়ী পড়ে। দশ মন পাথরে ভার মাথায় চাপে। হাত অবশ হয়। কণ্ঠতালু শুকিয়ে যায়! কলিজা কাঁপতে থাকে। পেটের ভাত চাল হয়। শীঘ্র শীঘ্র বলে ফেলুন! সহ্য হয় না। আর সহ্য হয় না। বলুন।"

বেগম—"তাইত ভাবছি, বলি কিনা? যদি না হয়, যদি কথা না থাকে, যদি কথাটা উড়ে যায়, যদি মনের কথার সুব্যবস্থা না হয়, যদি কার মনে, মনের কথার অন্য ভাব দাঁড়ায়, তবে ভারি লজ্জা—শুধু লজ্জা নয়—সঙ্গে সঙ্গে মনঃকষ্ট।"

ভোলানাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "সে কি কথা! ওহো হো! সে কি কথা! আপনার কথা মনে ধরবে না! ওহো! আপনার কথা উড়ে যাবে! ছি ছি, এ লজ্জা রাখি কোথা! আপনার কথা অন্যভাবে দাঁড়াবে? মরণ আর কোন্ সময় হবে? বাঁচিয়ে লাভ কি? আপনার কথা সুব্যবস্থা হবে না? বলেন কি? ছি ছি! ঘৃণা ঘৃণা!—আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা কি জন্যে, আপনার কথা, সে কি কথা? সে বেদ-বাক্য। সে দেব-বাণী আমাদের সাধ্য সামর্থ্য মধ্যে থাকলে অবশ্যই হবে।"

বক্কেশ্বর—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) "বুঝি কি করে? পারি কিনা? কথাটা না শুনলে বুঝি কি করে? বলি কি না বলি! এ ত নূতন শুন্‌লেম। কথাটা কি? এত দোমনা কেন? আগ্ পাছ—ভাবনাই-বা কিসে? আমরা ত আপনারই—ভিখারী। আড্ডার ভিখারী।"

ঋতু—"অহে ভায়া! ঐ অস্ত্রই আসল অস্ত্র, মার পেঁচের কথা। আসল মার-পেঁচ।"

বেগম—"আচ্ছা, আপনারা অনুমতি করবে ত একজনার কাছে বলি।"

ঋতুরাজ বাবু বলিলেন, "কে অনুমতি করবে? কার কাছে বল্‌তে কে অনুমতি করবে? কার মনের কথা—কে—ঐ—কথায়—। আচ্ছা যদি তাই হয়—আমার অনুমতি, আমার কাছে বলুন।"

বক্কেশ্বর—(কৃত্রিম রোষভাবে) "হুঁ তাইত, তোমার কাছে? ও কথা কথা নয়, যদি বল্‌তে হয় আমার কাছে বলুন।"

ভোলা—"না না, তা হতেই পারে না, আমার কাছে।"

বেগম—"আচ্ছা যারই কাছে বলি, গোপনে বল্‌বো।"

সকলে একবাক্যে এক স্বরে—"না—না—না, তা হবে না, তা হবে না—আপনারই কথা, কান কথা নাই। বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে গোপনে কোন কথা নাই।"

বেগম—"তবে বলি—কথাটা কি? দাগাদারী।" এই পর্য্যন্ত উচ্চারণ হইলে সকল নিস্তব্ধ— ভোলানাথ বাবুর চক্ষুস্থির।

ঋতু—"দাগাদারী? সে ত হবেই। আজ একটা গেল। দুদিন পরে শুন্‌বেন, সেও দুটি বছরের জন্য গেছে। তার আর চিন্তা কি?"

ভো—"সে আর বল্‌তে হবে কেন? সে হয়েই আছে! তার জন্য এত কথা? এই কথাটার জন্যে মুখ ভারী ছি ছি!"

বক্কেশ্বর বলিলেন, "আর ভায়া! কথাটা আগে শুন! তারপর হুকুম পাস্ করো। না শুনতেই খুশীতে ভরে গেলে। কথাটার আগাগোড়া কিছুই হল না। নামটি শুনতেই নেচে উঠলে।"

ঋতু—"ওর আর শুনবে কি? বুঝব কি? যখনই হা করেছেন, তখনি বত্রিশ নাড়ী গণে ফেলেছি।—দাগাদারীর কি?"

বেগম মুখখানি ভারীর উপরে আরও ভারী করিয়া, ওড়নাখানা গায়ের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া, বুক মাজা দুই তিন বার নাড়া দিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, নিস্তব্ধভাবে গালে হাত দিয়া বসিলেন।

ভোলা—"ঠিক কথা! আমরা যা ভেবেছি, তা নয়।—বলুন! কথাটা একেবারে ভেঙ্গে বলুন! দাগাদারী কি?"

বেগম—"আপনারা কথার শেষ পর্য্যন্ত না শুনেই নেচে উঠলেন। তার আর বলি কি?"

ঋতু—(গম্ভীরভাবে বসিয়া) "বলুন। এবারে শেষ পর্য্যন্ত না শুনে কোন কথা বলবো না।"

বেগম সকলের চক্ষু সহিত নিজ চক্ষু অতি মারাত্মকভাবে এক-একবার মিলাইলেন। বিশেষ ভোলানাথ প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দাগাদারী হাজতে আছে। জামিনে রেখে কি ওর বিচার হয় না?"

ঘরের মধ্যে যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। একথার উত্তরের পালা হচ্ছে, ভোলানাথ বাবুর। ভোলানাথ বাবু প্রায় পাঁচ মিনিট মাথা হেঁট করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তার উপর এত দয়া হল কেন?"

বেগম ঠাকুরাণী বলিলেন, "তার মার কান্দাকাটি, স্ত্রীর মাথাভাঙ্গা দেখে আমার মনে বড়ই আঘাত লেগেছে।"

ভোলানাথ বাবু ক্ষণকাল মাথা হেঁট করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এর মধ্যে একটা কথা বসেছে। তাতেই আমি আকাশ পাতাল চক্র খাচ্ছি। কথাটা অতি সামান্য। একটা কলমের খোঁচা মাত্র। কিন্তু হয়েছে কি? তারা আমার অনেক দোষ, অনেক অবিচারের কথা উল্লেখ করে, জেলার রাজধানীতে একেবারে শেষ সীমায় গিয়ে পড়েছে। সেখান হতে কি হুকুম আসে, সেটা না দেখে ত পারি না। আচ্ছা দেখি, যদি কোন রকমে সুযোগ সুপথ বের কর্ত্তে পারি, সাপও মরে, লাটিও না ভাঙ্গে, তার চেষ্টা করবো।"

এই কথার প্রসঙ্গে অনেক কথা হইল। পাঠক! ইহারা আমোদ-আহ্লাদ করিতে থাকুন, আমরা একবার জেলখানার অবস্থাটা দেখিয়া আসি। আমোদের মধ্যে যদি একবার ভাঙ্গা পড়ে, ফাঁক হইয়া যায়, সে আমোদ আর জমে না। হাজার চেষ্টা করিলেও আর মন মনোমত বসে না। আমোদ-আহ্লাদের হাওয়াই এই প্রকার।

জেলখানার দ্বারে সাস্ত্রী খাড়া পাহারা দিতেছে। ডবল কপাট। লৌহ সিকের এক জোড়া

কপাট। তাহার পরই লৌহ তক্তার কপাট। দিবসে লৌহ তক্তার কপাট খোলা থাকে। লৌহ সিকের কপাট তালা-চাবি দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দরজার নিকটে কোন কয়েদী দাঁড়াইলে বাহিরে যতদূর নজর চলে তাহা দেখিতে পায়। নিশিত সময়ে খাড়া পাহারার মধ্যে জেলের ভিতরে প্রবেশ অসম্ভব। কিন্তু লেখকের লেখনী-অস্ত্রের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে। ঐ দেখুন, দীর্ঘ একটি লম্বা হল, উপরে একটা হিঙ্কস্ লুণ্ঠন ঝুলিতেছে। ডবল দ্বারে হুড়কা ডবল ডবল তালা। গৃহ মধ্যে শূন্যে বাতি জ্বলিতেছে। একরূপ মিটিমিটি আলো হইয়াছে। সারি সারি সকল কয়েদী কম্বল পাতিয়া শুইয়া আছে। বালিস নাই। কম্বলের বিছানা, কম্বল জড়াইয়া বালিস। কম্বলই গায়ের কাপড়। সে কম্বল ধূলা মাটিতে পরিপূর্ণ, ছারপোকায় একাকার। দাগাদারীর শয্যা আর ভেড়াকান্তের শয্যা একদিকে। সেদিকে আর কেহ নাই। দাগাদারী শুইয়া আছেন। ভেড়াকান্ত বসিয়া কি ভাবিতেছেন। শীতকাল—গায়ে বনাতের কোট, জেলে আসিবার সময় ভেড়াকান্তের বাড়ীর লোকেরা একখানা নেহালী, পাতলা তুলা-ভরা, দোলাই বাজার হইতে খরিদ করিয়া দিয়াছে। ভেড়াকান্ত তাহাই গায়ে দিয়া বসিয়া আছেন। দাগাদারী শুইয়া শুইয়া বলিতেছেন ঃ

"আপনি অত অস্থির হবেন না। প্রথম দিন আমারও এই ভাব হয়েছিল। দুই তিনদিন থাক্‌তে থাক্‌তে সহ্য হয়ে গেছে। আর একটু পরেই খাবার আস্‌বে। কিছু খেয়ে শুয়ে পড়েন।"

ভেড়াকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "আমি অস্থির হই নাই। আমার নিজের জন্য কিছুই ভাবনা নাই। এত বেশ দিব্বি পরিষ্কার দালানে আছি। তবে কষ্টের মধ্যে দেখিতেছি, এই ঘরের মধ্যেই একটি টিনের বড় গামলায় বাহ্য প্রস্রাব সকলেই উলঙ্গ হইয়া করিয়াছে। কোন আবরণ নাই। পঞ্চাশ জনের মলমূত্র একই পাত্রে সারাটি রাত চলিয়াছে। এক যাইতেছে, আর আসিতেছে। লজ্জা সরমের নামমাত্র নাই।"

বাহির হইতে প্রহরী ধমক্ দিয়া বলিল, "কে কথা বলে? এত রাত্রে কথা কেন? চুপ করে থাক।" কি করিবেন, ভেড়াকান্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার পর জেলের মধ্যে যাহারা আইসে, তাহারা সে রাত্রি আর কিছুই খাইতে পায় না। রাত্রের জলপিপাসা হইলেও জল পাইবার উপায় নাই। ভেড়াকান্তের শিয়রে একটা লোহার চোঙ্গা রাখিয়া দিয়াছে। ভেড়াকান্ত চুপি চুপি দাগাদারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এটা কি?"

দাগাদারী বলিলেন, "ওটা জলের ব্যবহার জন্য জলপাত্র। যত প্রকার জলের আবশ্যক তা ওতেই সম্পন্ন করতে হয়।"

হঠাৎ জেলের বড় দ্বার অতি সাবধানে খুলিয়া গেল। বাহির হইতে একটি লোক কাপড়ে ঝুলাইয়া কতকগুলি বাসনপত্র লইয়া আসিল, এবং সান্ত্রীর হাতে দিল। সান্ত্রী হাতে লইয়াই তাহাকে বাহিরে খুব দূরে যাইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল। দাগাদারীর খাবার আসিল। সিক-দেওয়া আটা দরজার কাঠের পাল্লা খুলিয়া গেল। চার-পাঁচটা পাত্র ঐ সিকের

ফাঁক দিয়া সান্ত্রীর সঙ্কেত অনুসারে দাগাদারী হস্ত বাড়াইয়া লইলেন। ভেড়াকান্তের বাড়ীর কোন পাত্র নাই, কোন খাদ্যও নাই। দাগাদারী কম্বল মুড়ি দিয়া আহার আরম্ভ করিলেন। ভেড়াকান্তকে অনেক জেদ করিলেন, তিনি কিছু খাইলেন না।

সান্ত্রী পুনরায় গেটের নিকট যাইয়া কথা বলিতেছে। চুপি চুপি কথা বলিতেছে, "ওতে হবে না। আমাদের ভাগ হয় কটা, তা জান? ৮টা ভাগ হয়। ওতে কি হবে? আর আমার সঙ্গে বন্দোবস্ত হবে না। শেষে কি মারা যাব? হাকিম বাহাদুরের যে কড়া হুকুম, ডাক্তারবাবুর যে শাসন, ভেড়াকান্ত বাবু সম্বন্ধে ভারি আঁটুনী। আজ ফিরে যাও। যদি কাল হেড অর্ডারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে পার, তবে হবে।"

সে লোকটি বলিল, "তবে সে কথা আগে না বলে টাকাগুলি হাতে নিলেন কেন?"

সান্ত্রী বলিল, "চুপ, চুপ।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দাগাদারীর সহিত তাহার যে সঙ্কেত আসে, সেই সঙ্কেত করিয়াই বলিল, "জলদি দিজিয়ে।"

দাগাদারী তাড়াতাড়ি খাইয়া বাসনগুলি ঐ লোহার সিকের ফাঁক দিয়া সান্ত্রীর হাতে দিলেন।

সান্ত্রী বাসনগুলি লইয়া কিরূপ একটা সাঙ্কেতিক শব্দ করিল। যে লোক খাবার দিয়া গিয়াছিল, সে আসিয়া সমুদায় লইয়া ত্রস্তপদে জেল হইতে বাহির হইল। অতি সাবধানে সদর দরজা আবার বন্ধ করা হইল। চাবি পড়িল। দ্বিতীয় লোকটার সহিত সান্ত্রী আর কোন কথা কহিল না। কি করে সেও দাগাদারীর লোকের সঙ্গে চলিয়া গেল।

ভেড়াকান্তের বাড়ীতে সকলেই নিদ্রিত। জাগিতেছে কেবল ভেড়াকান্তের স্ত্রী আর ভিখারিণী। ছেলেমেয়ের সম্মুখে কাঁদিবেন না। খুব সাহসে ভর করিয়া থাকিবেন। স্বামীর আজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। ভেড়াকান্তের স্ত্রী সে আজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু মনের দুঃখে স্বামীর বিপদে সময় সময় জ্ঞানহারা, বুদ্ধিহারা, আত্মহারা হইয়া, কি বলিতে কি বলিতেছেন, তাহার আদি অন্ত মধ্য নাই। ভিখারিণী তাঁহাকে বিশেষরূপে যত্ন করিতেছেন। মাথায় তেল-জল দিয়াছে, কত প্রকার প্রবোধ দিতেছে।

তিনি বলিতেছেন, "দিদি! আজ দুইটি যুগের মধ্যে এমন মনোবেদনা কখনই পাই নাই। জীবনে কখনও এরূপ সাংঘাতিক মর্ম্মবেদনায় আমার অন্তরে আঘাত লাগে নাই। বিদেশে কেহ নাই। আপন বলতে একটি লোক নাই। আমি স্ত্রীলোক, কি করতে পারি। ছেলেটি নিতান্ত শিশু। পরে মুখে অনেক কথাই বলে, কাজে করে কি? পাওয়া যায় কি?

"হায়! হায়!! তার কপালে এই ছিল? কি কুক্ষণে এদেশে এসেছিলাম। আজ দশটি বৎসরের মধ্যে একদিন ভালভাবে নিশ্চিতভাবে থাকতে পারি নাই। দিদি! আমার কি হবে? জেলখানায় সে কখনই বাঁচ্‌বে না। আরও শুনেছি, জেলখানার লোকের সঙ্গে বেগম যোগাড় করেছে। তাঁকে কষ্ট দিয়ে একেবারে প্রাণে মারবে। হায়! হায়! এ হলো কি?

আমি কোথা যাই। কাকে এ কথা বলি। আপীল হয়েছে। কিন্তু আপীলের পূর্ব্বেই যদি তাঁর প্রাণ গেল, সে আপীল হয়ে আমার লাভ কি হবে? আমি এই ঘরের যে দিকে তাকাচ্ছি, তারই সকল কার্য্য ব্যবহারের জিনিস সকল দেখে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। রাত্রে যখনই ঘুম ভাঙ্গে চেয়ে দেখি ঐ চেয়ারের উপর বসে লিখ্‌ছে। আজ ঐ চেয়ার শূন্য দেখে আমার অন্তরে ছুরি মেরে পার কচ্ছে। এই কলম, দোত, লেখার কাগজ যেখানে যা রেখে গিয়েছে, সমুদায় পড়ে আছে। সকলই আছে, কেবল সেই নাই। আমার বুক ফেটে গেল। মনে হচ্ছে খুব চেঁচিয়ে কাঁদি। কান্দে কান্দে পথ বয়ে জেলখানার দোরের নিকট যাই। যদি কোন কৌশলে দেখ্‌তে পারি। কি তার দুই-একটা কথা শুন্‌তে পারি। হা! খোদা এই করলে? বিদেশ, আত্মীয়-স্বজনবিহীন বিদেশে এই করলে?" (ক্রন্দন)।

ভিখারিণী অঞ্চল দিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া বলিল, "দিদি তুমি নিজে এত উতলা হলে তোমাকে প্রবোধ দিবে কে? তোমাকে বুঝাবে কে? আর তোমাকে এত বুঝিয়ে গিয়েছি, তুমি তার কথা রাখছ না? এও ত মহা পাপ। ঈশ্বরে নির্ভর কর। তিনি এ হতে আরও মনকষ্ট দিতে পারেন, এ অবস্থা হতে দুরবস্থায় ফেলতে পারেন, এ বিপদ হতে আরও দশগুণ বিপদে আটকাতে পারেন। অরাজকপুরের এমন চক্ষু নাই যে আজ তোমার স্বামীর জন্য কাঁদে নাই। তবে দুই চার জনার কথা ধরি না। ঈশ্বর আছেন। তিনিই মুক্তি দিবেন। যেখানে মুস্কিল, সেইখানেই আসান। আজ সারা দিনটা কিছু খাও নাই যেখানকার খাবার সেইখানেই পড়ে আছে। আর কিছু না খাও, একটু দুধ খাও।"

"সর্ব্বনাশ! আমি আজ দুধ মুখে দিব, কখনই না, যতদিন তিনি ফিরে না আসবেন, ততদিন আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই। খাবার পাঠালেম, কৈ সে লোক ত এখনও ফেরে না! কি হল? খাওয়াতে পাল্লে কিনা? দেখা পেলো কিনা?"

ভিখারিণী—"এই ত বলতে না বলতে, ঐ তারা এসেছে।"

যাহারা খাবার লইয়া গিয়াছিল, দাগাদারীর খাবার সঙ্গে যাহারা জেলখানায় খাবার লইয়া গিয়াছিল—তাহারা ফিরিয়া আসিল। ম্লানমুখে খাবারগুলি রাখিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। ভিখারিণী তাহাদের হাব-ভাব দেখিয়াই বুঝিয়াছে যে কি একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। তাড়াতাড়ি পাত্রের আবরণ মোচন করিয়া দেখিলেন, দুধ বাটি পোরাই আছে, বাটি যেমন তেমনই আছে। যাহা যাহা পাঠান হইয়াছিল—কিছুই কমে নাই, কেহ ছোঁয় নাই, খায় নাই।

খাবার জিনিসগুলির ঐ অবস্থা দেখিয়া ভেড়াকান্তের স্ত্রী মহাব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে, হলো কি? হয়েছে কি? শীঘ্র করে বল্, দেখা হয়েছে কি?"

যে চাকর খাবার লইয়া গিয়াছিল, সে কান্দিতে কান্দিতে বলিল, "না দেখা হয় নাই। সেপাইরা দাগাদারীর খাবার জেলের মধ্যে নিয়ে গেল, এ খাবার নিল না। টাকা পঁচিশটা হাতে করে নিয়ে শেষে বল্লে যে, এত জেল সালামী—এত দিতে হবে। জেলে আমরা কিছু বলবো না, মারধর করবো না, সেইজন্যে দেওয়ার কথা ছিল। খাবার টাকা কৈ?

সে আলাহিদা দিতে হবে। আর এ পঁচিশে কি হবে! জান না, হাকিমের হুকুম কেমন? ডাক্তার বাবুর কড়া হুকুম। আজ যাও। কাল যদি আর পঁচিশ আন্‌তে পার, তবে খাবার নিয়ে এসো, তা না হলে আর এস না, খবরদার এস না। কি করি, ফিরে এলেম। সেখানে ত কথা বলা যায় না। তারা কপাটের আড়াল হতে কথা কয়, আমরা বাহিরে থাকি। সে কথাও অতি চুপে চুপে।"

ভেড়াকান্তের স্ত্রী কান্দিয়া কপালে আঘাত করিয়া বলিলেন, "হায়রে টাকা! হায় হায়! টাকার জন্য খেতে দিল না! আমি টাকা দিচ্ছি। সোনাবিবি বলে গিয়েছিলেন বলে আমি টাকার কথা মনে করি নাই। (তাড়াতাড়ি সম্মুখের হাতবাক্‌স খুলিয়া) নেও, এই পঁচিশ টাকা নেও, এখনি আবার যাও।"

ভৃত্য—"আর কি যাওয়া যায়? আজ আর হয় না। সেখানে ত আর হঠাৎ কাউকে পাওয়া যায় না। গাছতলায় বসে থাকতে একটা আওয়াজ,—যেমন কোন পাখি ডাকে—এইরূপ শুনা গেলেই দোরের নিকটে যেয়ে দাঁড়াতে হয়। সেও সময় বাঁধা আছে। তা না হলে, যখন তখন গেলে দেখা হয় না, দরজাও খোলে না। যার সঙ্গে দিনের বেলা যে রকম কথা থাকে, সেইরূপ কাজ করে।"

"দেখ বাবা! তুমি আবার যাও, মেহনত করে গিয়া দেখ। যদি দেখা কর্ত্তে পার, তোমাকেও আমি দুই টাকা দিচ্ছি, তোরে মিনতি করছি। তুই আবার যা।"

"আপনি অত বলছেন কেন? আজ আর কিছুতেই হবার নয়। আমি টাকা নিব কেন? আমার কি আর মনে কিছু বল্‌ছে না?"

"আজ আর হবেই না, নিশ্চয় আর দেখা হবে না?"

"না, আজ কিছুতেই হবে না।"

কপালে আঘাত করিয়া—হস্ত দ্বারা কপালে আঘাত করিয়া বলিলেন, "হা কপাল! টাকা খরচ করেও কিছু খাওয়াতে পাল্লেম না। দিদি! দেখ্‌লে, আমার সময় দেখ্‌লে? বেগম! তোর কি মন্দ আমরা করছিলাম! তোর কি ক্ষতি করেছিলাম যে, তুই এমন করে জিয়ন্ত মানুষ কৌশলে মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিস্। তোর জন্যে পথে পথে বেড়িয়েছি। শীত, বর্ষা, বৃষ্টির জল, ঝড় মাথায় সয়েছি, সহ্য করেছি। তোর জন্যে, ভয়ে—শত্রুর ভয়ে প্রাণটি হাতে করে, কত কাজ করেছি। তোর জাতি ধর্ম্ম মান, সে রক্ষা করেছে। তোর যথাসর্ব্বস্ব যেত, জ্ঞাতিরা লুটে নিত; আপন প্রাণকে তুচ্ছ করে তা রক্ষা করেছে। তোর জন্যে কতজনে তার মাথা কাট্‌তে চেয়েছে। তোর উপকারের জন্য আজ দশটি বৎসর বাড়ী ঘর ছেড়েছে। পথে পথে তোকে বাঁচাবার জন্য, আমরা পথে পথে তোর সঙ্গী হয়ে বেড়িয়েছি। হায়! হায়! তুই এই করলি! খোদা তোর এন্‌সাফ্ করবেন, তাঁর কাছে হক্ বিচার ভিন্ন নাহক হয় না। তোর উপকারী জনার প্রাণ বধ কর্ত্তে তুই দাঁড়িয়েছিস্? পারিস্! তুই তা পারিস্! তোর অসাধ্য কিছু নাই। তুই আপন মা-বাপকে গ্রাহ্য করিস্ না। তাদের সম্মুখে তুই যা যা করেছিস্ তা মানুষে কর্ত্তে পারে না। তোর

স্বামীকে তুই যে চক্ষে দেখেছিস্, মৃত স্বামীর নাম ধরে ডেকে আমার সম্মুখে যে নিন্দা করেছিস্, তা তুই পারিস! একজনার গলায় ছুরি বসাতে পারিস্। আচ্ছা যদি জগতে ধর্ম্ম থাকে, যদি জগতে ন্যায়বিচার থাকে,—তবে তোর শাস্তি এই চক্ষেই দেখবো। খোদায় এই চক্ষে দেখাবেন, আমি কেন? দশজনে দেখবে।

"হায়! হায়! তোকে যেদিন সোনাবিবির লাঠিয়ালেরা ঘিরে নিয়েছিল, তোর লম্বা দাড়ীওয়ালা বাবুকে যেদিন মেরে সটান করেছিল, তোর সঙ্গের পাঞ্জাবী পেশওয়ারির মাথা ভেঙ্গে রক্তের স্রোত বহায়েছিল, সেদিন কে তোকে রক্ষা করেছিল? সে শত্রু-সম্মুখে বুক্ পেতে দাঁড়িয়েছিল? সমুদায় কার্য্যকারক দল, প্রতিবাসী দল, তোর বাড়ী ঘর সম্পত্তি হতে বেদখল করে, ঝাঁটা মেরে গ্রাম থেকে দূর করে দিয়েছিল, কে পরিশ্রম করে, কে যত্ন করে, চেষ্টা করে সম্পত্তি ফিরিয়েছিল? কে তোকে বাঁচিয়েছিল? তুই কার নয়। মার নয়, বাপের নয়, ভায়ের নয়, স্বামীর নয়, খোদাতালার নয়। যার পরকালের ভয় নাই, ধর্ম্মে যার ভক্তি নাই, সৎ ইচ্ছায় যার মনে নাই, ঠকান কথা ছাড়া যে ভাল জানে না, মন্দ পথ মন্দ রাস্তা ছাড়া যে ভুলেও ভাল পথে পা ফেলে না, ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে পর্দ্দার ধার ধারে না, হাট-বাজার ঘাট বাগান যে মানে না, তার আবার নারী ধর্ম্ম কি? তার আবার অন্তর মায়া-মমতা কি?

"তুই টাকা-পয়সা ঠকিয়েছিস্, খোদার কাছে নালিশ করেছি। আমরা সরল মনে বিশ্বাস করেছিলাম বলেই ঠকেছি। খোদার দরবারে নালিশ করেছি। তোর কি অনিষ্ট করেছি, তা কি তুই বলতে পারিস, না দেখাতে পারিস্?"

ভিখারিণী বলিল, "দিদি! আল্লার নাম কর, ও সকল কথা মুখে এন না। ওর চাইতে দুদণ্ড খোদার নিকট কান্দাকাটি কর, নিজের গুণা মাপ চাও। বিনাপাপে কখনও এ বিপদ ঘটে নাই। সেই দয়াময় ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, পরের নিন্দা কল্লে নিজের পবিত্র মনে কলঙ্ক বসে, মুখের সত্য গৌরবও ক্ষয় পায়। তুমি এত উপদেশ আমারে দেও, এখন এত ভুলে যাচ্ছ কেন? যে যা করেছে, তার শাস্তি ঈশ্বর দিবেন, হাতে হাতে ফলভোগী হবে, দিব্য চক্ষে দশজনে দেখ্‌বে।"

"দিদি, আমার মনের কথা উথ্‌লে উঠছে। কি বল্‌তে কি বল্‌ছি, জ্ঞান থাক্‌ছে না। আমার প্রাণ ফেটে চৌচির হচ্ছে। তোমাকে যদি দেখাতে পার্ত্তেম, তবে দেখ্‌তে যে আমার কি কষ্ট হচ্ছে।"

"উঠ! রাত্র ভোর হয়ে এলো। ঐ শুন সেই পাখিটা ডাকছে।"

"দিদি! পাখিটা ডাক্‌ছে। তারাও জোড়া জোড়া একত্র বাসা থেকে উঠে ঈশ্বরের নাম কচ্ছে, বনের পাখি, তারও স্বাধীনতা আছে। হা! মানুষের নাই। তোমার কথায় আমার জ্ঞান হলো। আর মুখ ফুটে দুঃখ জানাব না, মানুষের কাছে দুঃখ জানাব না; যাঁর কাছে জানালে সুবিচার হয়, তাঁরই কাছে জানাব।"

"উঠ! দেখ! একেবারে ফরসা হয়ে এলো। ঘড়িতে ছটা বেজে গেল। তোমার নামাজের

সময় হয়েছে। উঠে মুখে হাতে জল দিয়ে ঈশ্বরের নিকট কায়মনে উপাসনা কর।"

রাত্র প্রভাত হইল। তারাসকল মলিন ভাব ধরিয়া ক্রমে ক্রমে চক্ষের অগোচর হইতে লাগিল। পাখিরা প্রভাতী গাহিয়া সেই বিশ্বপতির গুণগান আরম্ভ করিল। ভেড়াকান্তের স্ত্রী মুখ হাত ধুইয়া, অজু বানাইয়া নামাজে খাড়া হইলেন। ভিখারিণীও নিকটেই এক ধ্যানে বসিয়া তাহার ধ্যান যোগে মনোনিবেশ করিল।

পাঠক! পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করি। কয়েদীর কমজারী শরীরের মাপ দেওয়া দেখিয়া আসি। রাত্র প্রভাত হইয়াছে। চারিটা বাজিলেই, কয়েদখানার দ্বার খোলা হইয়াছে। প্রায় ৩০ জন কয়েদী সেদিন জেলখানায় ছিল। রাত্র চারিটার সময়, আহা শীতে থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে কয়েদিগণ আপন আপন কম্বল লইয়া একে একে দ্বার দিয়া বাহির হইয়া সারি বাঁধিয়া দরজার সম্মুখে বসিল। প্রহরী, এক দুই তিন করিয়া যেমন ছাগল ভেড়া গণিয়া দেখে, সেইরূপ গণিয়াই দরজার বাহিরে আঙ্গিনায় বসাইয়া রাখিল। ভাবুন! শীতকাল চারটার পর কত পরিমাণ রাত থাকে। প্রভাতেই বেশী শীত পড়ে, শিশির পতন হয়। এক-একটি পক্ষ হাত-পা গোট করিয়া দুই দুইজনকে এক এক সঙ্গে সার বান্ধিয়া বসাইয়া রাখিল। বসিতে বিলম্ব কি লাইন তেড়া বাঁকা হউক বা না হউক, চপেটাঘাত, সবুট পদাঘাত, যার কপালে যেমন লেখা ছিল, পড়িতে লাগিল। কোন অপরাধ নাই, অথচ মার। এক প্রহরী সোজা করিয়া বসাইয়া গেল, আর একজন আসিয়া সে আবার পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিতে আদেশ করিল। নড়িতে চড়িতে একটু যেই বিলম্ব অমনি লাথি, অমনি ঘাড়ে গর্দ্দানি! মারের আর আচার বিচার নাই। মনে হইল মার,—লাথি কিল চড়। দাগাদারী হাজতের আসামী, তাহাকে আর সে সামিল বসিতে হয় না। ভেড়াকান্ত মাত্র সেই রাত্র আসিয়াছে। বহিতে নাম লেখা হয় নাই। তাহাকেও উঠিতে হয় নাই। তাহাদিগকে ডাকেও নাই। প্রত্যেক কয়েদীর ব্যবহারের লোহার চোঙ্গা আর এক একখানি লোহার তাওয়া হাতে আছে।

প্রায় দুই ঘণ্টা কাল—হিমে বাতে শেষ রাত্রের শিশিরে ঐ প্রকার, যেন কুকুরের মত বসাইয়া রাখিয়া আবার অন্য প্রকারে বসাইল। অন্ধকার একেবারে পরিষ্কার হইলে এক-একজন করিয়া, যেমন নিমন্ত্রণ খাইতে বসে, সেইরূপ সারি বাঁধিয়া পুনরায় অন্য স্থানে বসাইল। এক একখানি টিকিট প্রত্যেকের হাতে আছে। টিকিটখানি দুই হাতে ধরিয়া হাত উঁচু করিয়া জোড় হাতে বসাইয়া দিল। স্ব স্ব ব্যবহারের লোহার তাওয়া লোহার চোঙ্গা কম্বলের মধ্যেই রহিল। সূর্য্যদেব উদয় হওয়া পর্য্যন্ত ঐ অবস্থায় বসাইয়া রাখিল। ভেড়াকান্ত জাগিয়া আছেন। শুইয়া শুইয়া দরজার ফাঁক দিয়া সমুদায় দেখিতেছেন। ঝাড়ুদার ঘর ঝাড়ু দিতে আসিতেই ভেড়াকান্ত কম্বল শয্যা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে উঠিলেন। হুকুম আছে, প্রত্যেক কয়েদী একখানা পাতিবার, একখানা গায় দিবার কম্বল পাইবে। যাহারা প্রহরীদিগকে মুঠা মুঠা অর্থ দিয়া পূজা করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে কম্বলের ব্যবস্থা নিয়মিত নহে। যে কয়খানা আবশ্যক, তাহা পাইতে পারে। কম্বলের অনাটন নাই,

ঘরের এক পার্শ্বে গাদা করা আছে, প্রহরীদের অনুমতি লইয়া লইলেই হইল। ভেড়াকান্তর পরিচিত পাঁচ ছয়জন লোক জেলে কয়েদ আছে দেখিলেন। তাহারা ভিন্ন গ্রামের। ভদ্রশ্রেণী মধ্যেও দুই তিনজন ছিল। এমন কি, ভেড়াকান্তর অধীনে একজন কার্য্যও করিয়াছিল। সেই কয়েদী ভেড়াকান্তের শয্যা রচনা করিয়া দিয়াছিল। সেই কয়েদী এক ঘটি জল ইন্দারা হইতে তুলিয়া দিল। ঈশ্বরের মহিমা! ভেড়াকান্তের যাবতীয় আবশ্যকীয় কার্য্য সেই করিতে লাগিল। ভেড়াকান্ত যে বেশে বাড়ী হইতে কাচারি আসিয়াছিলেন, সেই বেশেই আছেন। পেন্টুলন, ষ্টকীং, বুট, কামিজ, গঞ্জী, কোট, কম্ফাটার, সকলি আছে। ভেড়াকান্ত মুখ ধুইয়া একখানা ছালার উপর বসিয়া রহিলেন। তাঁহাকে কেহ কোন কথা বলিল না। কেন বলিল না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন। রাত্রের সেই অর্থই ভেড়াকান্তকে এতক্ষণ একটু ভাল অবস্থায় রাখিয়াছে। সর্ব্বোপরি দয়াময়ের দয়া। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার জেলের বাহিরে গেট-লগ্ন আপীস ঘরে আসিয়া বসিলেন। গতরাত্রে যে সকল কয়েদী আসিয়াছে, একে একে তাহাদিগকে তলব হইল। ভেড়াকান্তের ডাক পড়িল। লৌহদ্বার খুলিয়া দুইজন সান্ত্রী ভেড়াকান্তকে ডাক্তার বাবুর সম্মুখে লইয়া গেল। ভেড়াকান্ত ডাক্তার বাবুর সম্মুখে খাড়া হইলেন।

ভেড়াকান্ত আপীস গৃহে যাইয়াই দেখিলেন, কটকটে বাবু ডাক্তার বাবুর পার্শ্বে বসিয়া আছেন। অতি প্রত্যুষে কটকটে বাবু কেন ডাক্তারের আপীসে আসিয়াছিলেন, ভেড়াকান্ত তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারিলেন না। কটকটে বাবু ভেড়াকান্তের দিকে তাকাইতে পারিলেন না, মাথা হেট করিয়া নির্ব্বাক বসিয়া রহিলেন। ডাক্তার বাবু ভেড়াকান্তকে অতি কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি? পিতার নাম কি? বাড়ী কোথা? কি ব্যবসা?" সমুদায় ভেড়াকান্ত একে একে বলিলেন। তাহার পর ভেড়াকান্তের গায়ের কাপড় খুলিয়া গায়ে দাগ কি কোন প্রকারের চিহ্ন বক্ষে পৃষ্ঠে হস্তে আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিলেন। দীর্ঘে কয় ফীট তাহা দেয়ালের গায়ে ঠেকাইয়া চিহ্ন দিয়া পরিমাপ করত কাগজে লেখা হইল।

ভেড়াকান্ত ভাবিলেন, বোধ হয় এ কাপড় ছাড়াইয়া এইক্ষণে কয়েদীর পোষাক পরাইবে। ঈশ্বর ভিন্ন আর সহায় কে? কেহ নাই। মনে মনে সেই বিপদ-তারণ ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু পুনরায় কাপড় গায়ে দিতে অনুমতি করিলেন। ষ্টকীং বুট ব্যবহার করিতেও আদেশ দিলেন। অনুমান বিশ মিনিট কাল আপীস ঘরে রাখিয়া, মাপ জোক নাম ধাম ইত্যাদি লিখিয়া লইয়া, কোটের পকেটে কি আছে সেগুলি লইয়া, পুনরায় সান্ত্রী সহ জেলের মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। ভেড়াকান্তের পকেটে কিছুই ছিল না, একখানা রুমাল, আর চারটা চুরুট, তাহা হেড অর্ডারের জিম্বায় রহিল। জেলের মধ্যে যাইয়া ভেড়াকান্ত পুনরায় ছালা পাড়িয়া বসিয়া রহিলেন। ঘানি গাছের কাষ্ঠ, জোঁয়াল, সরিষা আনিয়া ঘানি গাছের গোড়ায় রাখা হইল। সে সময় ভেড়াকান্তের মনে কি ভাবের উদয় হইল, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু ঈশ্বরের মহিমায় সে ভাবনা বেশীক্ষণ রহিল না। ঘানিগাছ খাড়া

করিয়া দুইজন চোর কয়েদীকে ঘানি জুড়িয়া তৈল বাহির করিতে দিল।

জেলের মধ্যে কোন কয়েদী কাট চালা করিতে লাগিল। ছয় সাতজন সান্ত্রীদিগের, হেড অর্ডারের, ডাক্তার বাবুর বাসায় থালা, ঘটি, কড়াই, বাটি, বাউলী, বাটি ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া মাজিতে বসিল। সান্ত্রিগণ মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া "ভাল করিয়া মাঁজ, খুব সাপ কর, দুই তিনবার জল দিয়া ধো" এই সকল হুকুম জারি করিতে লাগিল। যে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর, সে আসিয়া, কোন কথা নাই, কোন অপরাধ নাই, এর পিঠে সবুট এক লাথি, ওকে রুলের গুঁতো দিয়া বলিল, "বেটার হাতে যেন জোর নাই, আচ্ছা করে মাঁজ্!" কি করে, মাঁজা ধোয়া বাসন পুনরায় মাজিতে লাগিল। মাঁজা ঘষা শেষ হইলে ডাক্তার বাবুর চাকরাণী আসিয়া বাবুর বাসন সকল দুই তিন বার করিয়া লইয়া গেল। সান্ত্রীদিগের বাসন সকল রৌদ্রে শুকাইতে দিল।

দশটার সময় আহার। ঐ লোহার তাওয়ায় ভাত, তাহাতেই ডাল, তাহাতেই কুমড়া সিদ্ধ। যে পরিচিত কয়েদী দাগাদারী ভেড়াকান্তের সমুদায় কাজ কর্ম্ম করিয়া দিতেছে, সে দুইখানি তাওয়ায় করিয়া ভাত আনিয়া দিল, আর একখানি তাওয়ায় জল। সর্ব্ব কার্য্য ব্যবহারী লৌহ চোঙ্গাও আছে, যাহাতে সুবিধা জলপান কর, তাহাতে কোন বাঁধা-প্রতিবন্ধক নাই। ভেড়াকান্ত দুইবার দুই মুট ভাত মুখে দিয়া তাওয়া তুলিয়া জল মুখে দিতে সমুদায় জল পড়িয়া গেল। সেই সাহায্যকারী অনুগ্রহকারী পরিচিত কয়েদী পুনরায় তাওয়া ভরিয়া জল আনিয়া দুই হাতে তাওয়া সোজা করিয়া ধরিয়া রাখিল। ভেড়াকান্ত কোন প্রকারে মুখ জুবড়াইয়া দুইবার শোষ টানিয়া জলপান করিলেন। আহার শেষ হইল। সিকি পরিমাণ তুষ মিশ্রিত আধ ফোটা ভাত, খোসাসমেত, কলাইর আধ সিদ্ধ দাইল, হরিদ্রামাখা পূঁড় কুমড়াসিদ্ধ ব্যঞ্জন, ইহাই জেলখানার খাদ্য। অন্য অন্য কয়েদীরা আঙ্গিনায় বসিয়া খাইল। ইহারা দুইজন ঘরের মধ্যে যাহা অদৃষ্টে ছিল খাইলেন। রাত্রের খাওয়া চারিটার পরেই আরম্ভ হইল। ঐ ভাত, ঐ ব্যঞ্জন। পাঁচটার সময় তালা-চাবি দিয়া দরজা বন্ধ করা হইল। বুধবার এই প্রকারে কাটিল।

বেলা ১২টার সময় হাকিম সাহেবের বাড়ীর চাকরাণী একটি ছোট ছেলে লইয়া জেলখানার দ্বারের বাহিরে আসিয়া অনেকক্ষণ সান্ত্রীদিগের সহিত হাসি-তামাসা করিয়া ৩টার সময় চলিয়া গেল। প্রায় প্রতিদিনই চাকরাণী ঐ সময় জেলখানার দ্বারের নিকটে আসিয়া ছেলেকে খেলা দেয়, আর কয়েদীদিগের দুরবস্থা দেখে। চাকরাণী সান্ত্রীদিগের নিকট ভেড়াকান্তকে কথায় কথায় জানিয়া চিনিয়াছেন, গায়ে কোট পায় ষ্টকীং বুট আছে কেন, এ প্রশ্নও হইয়াছে। সান্ত্রীরা কি উত্তর করিয়াছে, তাহা শুনা যায় নাই। সেদিন রাত কাটিয়া গেল, পরদিন হাকিম সাহেব স্বয়ং জেল দেখিতে আসিয়াছেন। ভাগ্যে ভেড়াকান্ত সে সময় ঘরের বাহিরে আঙ্গিনায় ছিলেন। কি কারণে শুধু ষ্টকীং পায় দিয়া দেয়ালের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। হাকিম সাহেব তাড়াতাড়ি আসিয়াই ভেড়াকান্তের পায়ের দিকে নজর করিয়াই ঘরের মধ্যে গেলেন। সান্ত্রীরা ভেড়াকান্তর বুট হাকিম সাহেবের আসিবার খবর

পাইয়াই কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ভেড়াকান্ত ইহার কিছুই জানেন না। বিছানা হইতে উঠিয়া বুট পান নাই। কাহাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই। শুধু মোজা পায়ে বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভোলানাথ গৃহমধ্যে এ কোণ, সে কোণ খুঁজিয়া বাহির হইলেন, এবং ভেড়াকান্তর প্রতি আড়-নয়নে চাহিতে চাহিতে জেলের বাহির হইয়া হেড্ অর্ডারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ কয়েদীর জেলখানার কাপড় পরান হয় নাই কেন?

হেড অর্ডার উত্তর করিল, "আর কাপড় নাই। শীঘ্রই জেলায় চালান গেলেই হইবে। সেইখানে কাপড় পরাইয়া দিবে।"

ভোলানাথ আর কিছু বলিলেন না। চুরুট টানিতে টানিতে চলিয়া গেলেন।

সেই যে চাকরাণী আসিয়াছিল, তাহারই অনুগ্রহে এই তদন্ত। যাহা হউক, সময় মতেই জেলখানার ছালার জাঙ্গিয়া ও হাত কাটা কোর্ত্তা ছিল না, ইহাও দয়াই দয়া।

পরদিন নিশীথ সময়ে নিয়মিত মত পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে খাদ্য আসিল। ভেড়াকান্ত আপন বাড়ীর পাত্র দেখিয়া একটু আশ্বস্ত হইলেন। প্যালাটার প্রতি বার বার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, আর মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যাহক্, বাড়ীর একটা জিনিস আজ চক্ষে পড়ল।"

তাঁহার স্ত্রী ঐ সকল খাদ্য যে নিজ হাতে সাজাইয়া পাঠাইয়াছেন, সাজান দেখিয়াই বুঝিলেন। আরও কোন কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। রুটি দুই তিনখানা উঠাইয়া এদিকে ওদিকে দৃষ্টি করিতে দেখিলেন ক্ষুদ্র একখানি কাগজ—চার আঙ্গুল পরিমাণের কাগজ। দেখিয়াই অপর পিঠ উল্টাইতেই অক্ষর দেখিয়া চিনিলেন। মনে মনে পাঠ করিলেন, লেখা আছে—"আপীল করা হইয়াছে। কোন চিন্তা নাই। ঈশ্বর মঙ্গল করিলে আগামী কল্যই জামিনে খালাস হইতে পারেন।" কাগজখানা তখনি খণ্ড খণ্ড করিয়া হাতে রাখিলেন, যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া ঐ পাত্র মধ্যে খণ্ডিত কাগজ রাখিয়া যে প্রকার কাপড়ে বাঁধা আসিয়াছিল, সেই প্রকার বাঁধিয়া দিলেন।

শীতে বড়ই কষ্ট হয়, কোন কৌশলে ভেড়াকান্ত স্ত্রীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। সান্ত্রীদিগের মধ্যে একজনার সহিত বিশেষ আলাপ করিয়া লইয়া খবরাখবর চালাইতে লাগিলেন। সান্ত্রী প্রতিদিন বাজারের সময় বাজার করিতে যায়, ঐ সুযোগে ভেড়াকান্তের বাড়ী গিয়া সংবাদ দেয়, সংবাদ আনে। দৈনিক বন্দোবস্ত দুই টাকা। টাকার অসাধ্য কোন কার্য্য নাই। বাড়ী হইতে একখানা রাজাই আনিয়া লইলেন,—কিন্তু সে রাজাই দিনের বেলা কাহারও চক্ষে পড়ে না, রাত্র ১২টার পর পাওয়া যায়। লৌহশিকের ফাঁক দিয়া রাজাই যাওয়া আসা করে। রাত্র ৫টার পূর্ব্বেই সান্ত্রী লৌহশিকের নিকট আসিয়া রাজাই টানিয়া লইয়া যায়। তাহাতে প্রতি রাত্র পাঁচ টাকা বন্দোবস্ত। আহারের জন্য বিশ টাকা। প্রতি রাত্র আহারে ২০, রাজাইয়ে ৫, এই ২৫ টাকা লইয়া হাতের উপর দেয়,—তবে খাদ্যসামগ্রী ঘরের মধ্যে আসিতে পারে।

যেদিন ভেড়াকান্ত জেলে গিয়াছেন, তাহার পরদিন তাঁহার শরীরে কোনরূপ অসুখের

লক্ষণ দেখা যায় নাই। তৃতীয় দিনের দিন তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইল। অনবরত দাস্ত হওয়া আরম্ভ হইল। ডাক্তার বাবু হাত মুখ জিহ্বা দেখিয়া ঔষধ দিলেন। অন্নাহার বন্ধ করিয়া দুধ সাগুর ব্যবস্থা করিলেন। সঙ্গে চিনি মিশ্রী যাহা পাওয়া যাইবে। কিন্তু আহারের সময় নানা আবর্জ্জনা সহ জলসাগু সঙ্গে লবণ মিলিল। ভেড়াকান্তকে খাটুনী খাটিতে হইল না, ডাক্তার বাবু সহ ফিটফাট বাবু আবার ভেড়াকান্তকে দেখিয়া গেলেন।

ডাক্তার বাবু সে সময় বলিলেন, ভেড়াকান্তকে বলিলেন, "আপনার কোন বিষয় চিন্তা নাই। আমি সমুদায় অবস্থা শুনিয়াছি। ঈশ্বর কৃপায় আপনি শীঘ্রই মুক্তি পাইবেন।" ফিটফাট বাবু কোন কথাই কহিলেন না। ডাক্তার বাবুর কানে কানে কি কথা চুপি চুপি বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন। আভাস পাওয়া গেল যে, ভেড়াকান্তর মোকদ্দমার রায় জেলায় প্রেরিত হইয়াছে। আমরাও বহু কথা বহু ঘটনার পর অষ্টাদশ নথি শেষ করিলাম।

ঊনবিংশ নথি

অতি ত্রস্তপদে চলিয়াছে। নচ্ছারপুর হইতে অরাজকপুর যাওয়ার পথে একজন যুবা পথিক অতি ত্রস্তপদে, উর্দ্ধশ্বাসে হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়াছে। পথিক দেখিতে গৌরবর্ণ। গায়ে কাল বনাতের টাইট কোট। মাথায় পঞ্জাবী কেতার সাদা কাপড়ের পাগড়ী। পরনে মালকোচা মারা ধুতি। কাঁধে চৌড়া সাদা ফিতায় ঝুলান সাদা মোটা জিনের ঝোলা। হাতে বাঁশের মোটা লাঠি। পথিক নচ্ছারপুর জেলা হইতে অরাজকপুর যাইতেছে। পথের পরিমাপ স্তম্ভ অঙ্কিত অঙ্ক প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টি করিয়া ক্রমেই গমনের বেগ বৃদ্ধি করিতেছে। বেলা প্রায় আটটা। পথিকের মুখ চোক দেখিয়া বোধ হইতেছে যে সারারাত্র জাগিয়াছে। কিছু দুর যাইয়া পথিক বলিতেছে, "উহু! এখনও আট মাইল. এখান হইতে অরাজকপুর আট মাইল! বেলাও আটটা। যেভাবে যাইতেছি, ১১ টার সময় নিশ্চয়ই পৌঁহুছিতে পারিব।" কিছুদুর যাইয়া পথিক দেখিতে পাইল যে, চল্লিশ জন সঙ্গিন বন্দুকধারী সেপাই অরাজকপুর অভিমুখে চলিয়াছে। পথিক একটু ত্রস্তপদে যাইয়া তাহাদের সঙ্গী হইল। কথায় কথায় সঙ্গে চলিল। একত্র যাইতে যাইতে আলাপ পরিচয়, কথাবার্ত্তা, হাব ভাবে জানিতে পারিল যে, সেপাইদিগের মুখে শুনিয়া জানিতে পারিল যে, অরাজকপুর জেলখানায় একজন ক্ষমতাপন্ন লোককে সেখানকার হাকিম ফাটকে আটক করিয়াছেন। অপর সাধারণ সকলেই সেই কয়েদীর পক্ষে। বিচার-বিভ্রাটে পড়িয়া, অবিচারে এই হইয়াছে। হাকিম জেদ করিয়া ফাটকে আটক করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণ লোকের মনেই এই বিশ্বাস। হাকিম সাহেবের মনেও বোধ হয় বিশ্বাস যে, কয়েদীকে জেলায় চালান দিলে, সাধারণ লোকে পথে একটা হাঙ্গামা করিয়া কয়েদীকে কাড়িয়া লইবে। এই আশঙ্কায় ডিপুটির রিপোর্ট অনুসারে, জেলার কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে, এই সঙ্গিন বন্দুকধারী সৈন্যদল মহকুমায় চলিয়াছে। গতকল্যই যাইবার

কথা। পথে বিলম্ব হওয়ায় নিয়মিত সময় অরাজকপুরে পৌঁছিতে পারে নাই। অদ্য ১০টার পূর্ব্বে যাইয়া অদ্যই কয়েদী লইয়া নচ্ছারপুর অভিমুখে রওয়ানা হইবে।

যুবা পথিক এই সকল কথা শুনিয়া বড়ই ভাবিত, বড়ই চিন্তিত হইয়াছে। কি করিবে, কোন উপায়ে এইক্ষণে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না মনে মনে বলিতেছেঃ

"হায়! কি কুকাজ করিয়াছি। কি ঝক্‌মারি করিয়া পথে নেঙ্গটিচোরার বাজারে বিলম্ব করিয়াছি। গত রাত্রেই পৌঁছিব কথা। আজ বেলা আটটা। এখন দশটার পূর্ব্বে কাচারিতে পৌঁছিয়া জজের হুকুম ডিপুটির এজলাসে পৌঁছাতে পারিলেও অনেক রক্ষা। এ আপদ আবার নিবারণ করি কি প্রকারে? ইহারা অরাজকপুরে পৌঁছিলেই, কয়েদী জিম্মা হইবে। এত মেহনত, এত যত্ন, এত টাকা খরচ সমুদায় বরবাদ যাইবে। দেশে বিদেশে মুখ দেখাইতে পারিব না। গাড়ী ভাড়া বারটি টাকা দিয়া রাতারাতি হুকুমনামা, খালাসের হুকুমনামা, জামিনে খালাসের হুকুমনামা, ডিপুটির এজলাসে দিব, এই কথা বলে, আমাকে বিশ্বাসী লোক জেনে পাঠিয়েছে আমার দুর্ব্বুদ্ধির জন্য মাঝে এক লোভে আট্‌কা পড়ে সর্ব্বনাশ হল।"

পথিক নানা ভাবনা, নানা কথা ভাবিয়া, সৈন্যদলের প্রধান হাওয়ালদার সহিত নানা কথায়, নানা আলাপে ঘনিষ্ঠতা জন্মাইয়া শেষে বলিল—হাওয়ালদারকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সেপাইজী! আমার একটা কথা আপনার কাছে বলবার আছে।"

হাওয়ালদার—"কি কথা বলো।"

পথিক—"এত গোলযোগের মধ্যে বল্‌তে চাইনে। গোপনীয় কথা। একটু আড়ালে না গেলে বলতে পারি না।"

হাওয়া—"আচ্ছা! এসো? একটু তেজ পায়ে আমার সঙ্গে চলে এসো। ঐ যে বটগাছ দেখা যাচ্ছে, ঐ গাছের আড়ে চল্‌তি রাস্তার বাম পার্শ্বে গিয়া আমরা দাঁড়াই।"

উভয়ে ত্রস্তপদে নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলায় যাইয়া দাঁড়াইল, সঙ্গী সৈন্যদল ক্রমে ক্রমে পথ বাহিয়া যাইতে লাগিল। পথিক অতি নম্রভাবে বলিল, "আপনারা যে কার্য্যে যাচ্ছেন, তা আমার অজানা নাই। আমি একটা কাজ বড়ই অন্যায় করেছি। আপনি দয়া করে অনুগ্রহ কল্লে, সংশোধন হলেও হতে পারে। আপনি মহৎ লোক। সমুদায় ক্ষমতা আপনার হাতে। একটু নেক নজরে চাইলেই আমার প্রাণ বাঁচে। আমি বড়ই অন্যায় কাজ করেছি। আর আপনি যে অনুগ্রহটুকু করবেন, তা আমি কান্দাকাটি করে আপনার নিকট জোড় হাতে প্রার্থনা কচ্ছি। আর এই পাঁচটি টাকা আপনার পান খাবার জন্য দিচ্ছি।"

হাওয়া—"আরে বাইয়া! টাকা থাক্। কথাটা কি আগে বলো।"

পথিক টাকা পাঁচটা পকেট হইতে বাহির করিয়া হাতের উপর নাড়াচাড়া আরম্ভ করিল।

দেসওয়ালী, মেড়ুয়া ছাতুখোরের জাত, গোটা টাকাটা হাতে আসিলে বলে—"রোও মাৎ তোম্‌কো নেহি তোড়ায়েগা।" টাকাটা হাতের মধ্যে থাকিলে অবশ্যই ঘামিয়া থাকে, একটু ঘাম ঘাম বোধ হয়। দেসওয়ালীদের চক্ষে সেইটি টাকার ক্রন্দন। তাইতে বলিয়া থাকে যে, "হে টাকা! তুমি কেন্দ না, তোমাকে ভাঙ্গাইব না।"

পাঁচটা টাকার নাড়াচাড়া দেখিয়া সেপাইজী (হাওয়ালদার) অতি আগ্রহে বলিল, "ভাইয়া! বলো কি কথা?"

পথিক বলিল, "আপনারা যেভাবে রাস্তায় চলেছেন, দশটার পূর্ব্বে কিছুতেই অরাজকপুরে যেতে পারবেন না। আমি এই চাহি যে, আর দুই এক মাইল পথ গিয়ে আপনারা পান আহারের যোগাড় করুন। আহার শেষ করতে করতে বেলা তিনটা হবে। শেষ বেলায়, আহারের পর, আস্তে আস্তে রাস্তা চলবেন। আজ পথে কোন স্থানে থেকে কাল দশটার মধ্যে কি প্রাতে যখনই হয় অরাজকপুরে যান, এই আমার প্রার্থনা।"

হাওয়া—"এতে তোমার লাভ কি?"

পথিক—"আপনারা যাঁকে আস্তে যাচ্ছেন, জজ সাহেব তাঁকে জামিনীতে খালাস দিয়াছেন। আমি সেই সরকারী পরওয়ানা নিয়ে ডিপুটি বাবুর এজলাসে যাচ্ছি।"

"হাঁ হাঁ—আমরাও শুনে এসেছি যে, হক-নাহক এক ভদ্রলোককে ডিপুটি কোন মেয়েমানুষের কথায় ফাটকে দিয়েছে। জেলায় বড় বড় হাকিমানের কানে সে কথা উঠেছে। আপীল মঞ্জুর হবে, জামিনীতে খালাস পাবে, এ সকল কথা আমরা জেলায় শুনে এসেছি। তা সাহেবের হুকুম, না এসে ত উপায় নাই—আচ্ছা আমি আজ যাব না, আর গিয়েই বা কি করবো? জজের যখন খালাসের হুকুম হয়েছে, তখন ডিপুটি চালানই-বা দেবে কি করে? তবে তোমার আগে গিয়ে আমরা যদি আসামী নিয়ে জেলের বাহির হতেম, তা হলে, জেলায় না এলে পথে আর খালাস হতো না। আমরা রাত্রে চিড়ে খেয়েছি, এখন রসুই করে চারটে ভাত না খেলে আর চলতেই পারব না। আচ্ছা আমরা এই বটগাছ তলাতেই আড্ডা কল্লেম। কিন্তু ভাইয়া! একটি কথা, সেই বাবুকে তুমি বল যে আমরা এই কাজ কল্লেম। অরাজকপুর গেলে আমরা কিছু বক্‌শীস চাই।"

পথিক—"তা একবার করে? আমি ত বল্‌বই আর আপনিও একবার দেখা করবেন। দেখা কল্লেই বক্‌শীস পাবেন, নিশ্চয়ই পাবেন, বাবু বড় দাতা লোক।"

পথিক আপন কার্য্য শেষ করিয়া, হাওয়ালদারকে ভায়া চারিভাবে সেলাম আলকি দিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পবন বেগে ছুটিল।

গত কথা আরম্ভ হইল। নচ্ছারপুর পোষ্ট অপিসে সোনাবিবির লোক মোতাইন ছিল, ডাক পৌঁছিবা মাত্র, ডাক খোলাইয়া রায়ের নকল উকিল বাবুদিগের নিকট দিয়া দাখিল করিল। বৃহস্পতির শেষ বলিয়া কোন কোন হিন্দু উকিল আপত্তি করিলেন যে, "আজ বৃহস্পতির শেষ দিনটা ভাল নয়, আপীল কাল দাখিল করা যাবে," ব্যারিষ্টার তাহা শুনিলেন না, বলিলেন, "সে কি কথা? একজনার প্রাণ যায়। বৃহস্পতিবারের শেষ কি? আপনারা থাকুন, আমি দাখিল করব।"

দাখিলমাত্রই জজ আপীল মঞ্জুর করিলেন। চল্লিশ হাজার টাকার জামিনী দাখিল করিলে আসামী জামিনীতে থাকিবে। আপীল শুনিবার দিন অমুক তারিখ। তখনি জজের রায়ের হুকুম লইয়া ব্যারিষ্টার নিজ লোক দ্বারা লেফাফা ডিপুটির এজলাসে পাঠাইতে বন্দোবস্ত

করিয়া,—ভেড়াকান্ত বাবুর দেশের একটি লোক, সোনাবিবির নিকট চাকর ছিল সেও সেদিন জেলায় উপস্থিত ছিল, সে খুব চালাক চতুর বিশ্বাসী,—সকলে তাহাকেই ঐ লেফাফা লইয়া অরাজকপুর আসিবার জন্য মনোনীত করিয়া গাড়ী ভাড়ার টাকা দিয়া তখনই রওয়ানা করেন। প্রায় অর্দ্ধ পথ আসিয়া জলখাবার জন্য দোকানের সম্মুখে খাড়া হয়। এক বারবনিতা খুব সাজগোঁজ করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল। পথিকের চক্ষু তাহার চক্ষু সঙ্গে মিশামিশী হইয়া চাওয়াচাই হইলেই, পথিকের মনে হইল, "এই ত নিকটেই বাড়ী, একটা পান খেয়ে একটু বিশ্রাম করে যাই না কেন? কতই বিলম্ব হবে?" দুর্ম্মতি ঘটিল, এক সাংঘাতিক কার্য্যের উদ্ধার, যে জন্য কত টাকা ব্যয়, কত শত লোকের যত্ন আর পরিশ্রম, কত চেষ্টা কত বড় কাজ, এ সকল কথা পথিকের মনে কিছুই উদয় হইল না। স্ত্রীলোকের এমনি মোহিনী শক্তি যে ভেড়াকান্তের এমন দুঃসময়েও তাঁহার দেশের লোক শুধু চক্ষের চাউনিতে ভুলিয়া গেল। হা। স্ত্রীলোকের চক্ষের মূল্য নাই। বিস্ফারিত আকর্ণ টানা, জোড়া ভ্রূযুক্ত পটলচেরা, অথবা মৃগ-নয়নী হইলেও যে ক্ষমতা, কোঠরে বসা, মিট্‌মিটে, কুঞ্জরাক্ষী কি বিড়ালাক্ষী হইলেও সেই একই কথা, হায়রে আঁখি। সাবলোট সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন—"আঁখিতে মজালে আঁখি।"

পথিক পান খাইতে খাইতে শেষে পান পর্য্যন্ত করিলেন। বিভোর—অচেতন—ভেড়াকান্তের নিতান্তই কপাল জোর যে হুকুমনামাখানা মাতালের পকেট হইতে পড়িয়া যায় নাই। তারপরে যেই নেশার ছুট, পথিকও দৌড়। সারারাত হাঁটিয়া পথিমধ্যে পূর্ব্ববর্ণিত, সেপাই কাণ্ড করিয়া বেলা দশটার সময় অরাজকপুর যাইয়া হাকিমের এজলাসের উপর জজের হুকুমনামা রাখিয়া দিল। পথের মধ্যে বুদ্ধি করিয়া যাহা করিয়া গেল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মাতালের কথা বিশ্বাস করা যায় না।

ভেড়াকান্ত জেল হইতে মুক্তি পাইলে পথিক তাহার বন্ধু-বান্ধবের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল যে, "ভাই! আমি ত সেইখানে মদ্ খেয়ে ঢোল বাজিয়ে গান করে পড়ে আছি। স্বপ্ন কি নেশার ঝোঁক বুঝতে পাল্লেম না। আমার মৃত পিতা এক বেত হাতে করে এসে সপাসপ আমার পাছায় পিঠে বসিয়ে দিয়ে, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বল্লেন, 'নচ্ছার হারামজাদা পাজী, যার নুন খেয়ে আমার শরীর, তোর শরীর, তোর দাদার শরীর, সেই জেলে কষ্ট পাচ্ছে, আর তুই তার খালাসের হুকুমনামা নিয়ে এখানে পড়ে আছিস্? বেহায়া পাজী নিমকহারাম।' ভাইরে! আমার বোধ হল, যেন বেতের বাড়ীতে আমার পিঠের চামড়া উঠে গিয়েছে। ঘুম ভেঙ্গে গেল—আর সেই সকল মারের স্থান যেন জ্বলতে লাগল, আমি হাত দিয়ে ঘস্‌তে ঘস্‌তে থতমত খেয়ে কাপড় চোপড় নিয়েই দৌড়—বিষম দৌড়।"

ভেড়াকান্তর খালাসের হুকুমনামা পাইয়াই ভোলানাথ কাচারি হইতে উঠিয়া আপন বাঙ্গালায় যাইয়া শুইয়া পড়িলেন। এদিকে জামীনদারের হইতে লাগিল। আজ পরীক্ষা! বন্ধু-বান্ধব পরীক্ষা। সোনাবিবির হিতৈষী হিতাকাঙ্ক্ষীর পরীক্ষা। ভেড়াকান্তর বন্ধু, মিত্র, দোস্ত, প্রাণের প্রাণদিগের পরীক্ষা। ভেড়াকান্ত যদিও কাহার বাড়ীতে কি অন্য স্থানে কোন

আমোদ-আহ্লাদে কয়েক বৎসর হইল যোগ দেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে আপন বাড়ীতে তাঁহার নিতান্ত দরদী বন্ধু সকল, প্রাণের প্রাণ, প্রিয়তম মিত্রসকল, সময়ে সময়ে আসিয়া খুব এক পেট, রোষ্ট কবাব মারিয়া যান। ব্রাণ্ডি হুইস্কিও যে না চলে, তা নয়। এক বন্ধুর পরীক্ষা হইয়াছে। তিনি বন্ধুর উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। কিন্তু ফুট্ফুটে বাবুর মত বন্ধু হাজারের মধ্যে মধ্যে একজন পাওয়া কঠিন।

যে সকল বন্ধু আপদে-বিপদে প্রাণ দিতে চাহিয়াছিলেন, ঐ এক রাত্র বাড়ীতে আসিয়া, দুঃখ জানাইয়া গিয়াছেন, আর খোঁজ-খবর নাই। অনেকে কার্য্যের গতিকে আসিতেও পারেন নাই। ভেড়াকান্ত এই সকল বন্ধু-বান্ধব লইয়া বাড়ীতে বসা-ওঠা আমোদ-আহ্লাদ করিতেন, তাহাতে তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত চটিতেন এবং বলিতেন, "এ সকল গ্লাসের বন্ধু। এ সকল মালাধারী, পৈতেধারী বন্ধু-বান্ধব আমার চিনতে বাকী নাই। খেয়ে মুখটি পুচে, গেট পারে হয়েই বলে যে, বেটাকে খুব ফাঁকি দিয়েছি। হাজার হক্ নেড়ে কিনা!' তুমি বিশ্বাস কর বা না কর, আমি খুব বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনেছি। দেখ, এদের দ্বারা যদি কোন দিন তোমার কোন উপকার হয়! আমি আজ দুই যুগ দেখে আস্ছি।"

ভেড়াকান্ত বাবু স্ত্রীর কথায় কখনই চটিতেন না। সাধ্যানুসারে কোন কথা কি কার্য্যে তাঁহার মনে আঘাত দিতেন না। কারণ এই স্ত্রীই তাঁহার উন্নতির মূল। ভেড়াকান্ত বাবু কোন সময়ে মানুষের মধ্য হইতে একবার উঠিয়া গিয়া পশু দলে মিশিতেছিলেন। রচনা গান প্রস্তুত করার সৎপথে সু-মতে ক্রমে ক্রমে আসিতে হইয়াছে। ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা সত্ত্বেও মরিচা ধরিয়া জঘন্য পথে পরিচালিত হইতেছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আর এই স্ত্রীর প্রসাদে সে পথ হইতে ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া উচ্চ ও পবিত্রভাবে সৎপথে চালিত হইয়াছিল। এই স্ত্রীই তাঁহার উন্নতির দৈবকারণ।

"ঐ বিষয়টা লিখিতে চেয়েছিলে, কৈ লিখলে না।" "ঐ প্রবন্ধটার এক পাত লিখিয়া ফেলিয়া রাখিলে কেন"..."নাম রাখিলে, বিজ্ঞাপন দিলে, পুস্তকের খোঁজ নাই।" "পদ্যটার আধাআধি লিখে আর লিখলে না?" স্ত্রী এই সকল কথা কহিয়াই কি ক্ষান্ত থাকিতেন? তাহা নহে। কথা বলিয়াই কার্য্যের শেষ বিবেচনা করিতেন? তাহা নহে। কাগজ দোত কলম প্রদীপের তৈল বাতি সমুদায় স্বহস্তে যোগাড় করিয়া দিয়া চুপটি করিয়া স্বামীর নিকট বসিয়া থাকিতেন। হাত পা পর্য্যন্ত নাড়িতেন না। বড় করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেন না। কিছুক্ষণ লিখা হইলে ভালবাসা জানাইয়া আদরে এবং স্নেহের সহিত বলিলেন, "যদি কষ্ট না হয় পড়ে শুনাও।" স্বামী তৎক্ষণাৎ পড়িয়া শুনাইতেন। স্ত্রী আহ্লাদে যেন গলিয়া পড়িতেন। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেন, "তারপর কি হলো মুখে বল।"

"মুখে বল" কথাটা চালাকি। স্বামী বলিতেন, "তা কি বলা যায়? লেখনীর গতি কোন পথে কোথা যাইবে, কল্পনা দেবী কি চিত্র দেখাইবেন, তা কি মুখে বলা যায়? তোমার নিতান্তই শুন্তে ইচ্ছা হয়ে থাকে, না হয় আবার লিখা আরম্ভ করি।"

এই প্রকারে ভেড়াকান্তর লেখনীশক্তিকে তাঁহার স্ত্রী চেষ্টা করিয়া পরিমার্জ্জিত

করিয়াছেন। সেই সকল কারণে ভেড়াকান্ত তাঁহার কথায় কখনই চটিতেন না। আর সতর্ক হইতেন।

সেই সকল বন্ধু-বান্ধব নিকট-ভেড়াকান্তর স্ত্রী লোক পাঠাইলেন, অনুনয় করিয়া পত্র লিখিলেন। কেহ উত্তরই দিলেন না। কেহ মাথাধরার ভান করিয়া নেপ মুড়ি দিলেন। সোনাবিবি জামিনীর জন্য খুব ব্যস্ত হইয়াছেন। ভেড়াকান্তর স্ত্রীও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ইচ্ছা—যেদিক দিয়াই হউক, শীঘ্র শীঘ্র জামীননামা দাখিল হইলে স্বামী জেল হইতে খালাস হইতে পারেন। সোনাবিবির হিতৈষী বন্ধুদের মধ্যে অনেকে মুখে স্বীকার করেন, জামীন হইব। আপন বাড়ী গিয়া এক কল্‌কে তামাক টানিলেই মত ফিরিয়া যায়। তখন নানা দৃষ্টান্ত নানা বিবেচনার কথা আসিয়া পড়ে। ভেড়াকান্তের বন্ধু মহাশয়রা ত একেবারে অদৃশ্য, সোনাবিবিও হায়রান। কেহই জামিন হইতে চাহে না; চুপি চুপি বলে, "চল্লিশ হাজার টাকা, কম কথা! ভেড়াকান্ত জেল হইতে বাহির হয়েই যদি সট্‌কে পড়েন, তখন জামিনদারের ঘাড়েই চাপ্! বাপরে বাপ, চল্লিশ হাজার!"

অনেক যোগাড়-যন্ত্রের পর ভেড়াকান্তের পরিচিত সোনাবিবির উকিল দুইজন সম্মত হইলেন। কিন্তু দুই হাজার টাকা নগদ দুইজনে না নিয়া জামিন হইবেন না। সোনাবিবি বিরক্ত হইয়া চল্লিশ হাজার টাকা নগদ দাখিল করিতে প্রস্তুত হইলেন। টাকারও যোগাড় হইল। ধনকুবের মহাজন থাকিতে টাকার চিন্তা কি? টাকার সংস্থান হইল, কিন্তু সেদিন দলিল লিখাপড়া রেজেস্ট্রী না হইলে টাকা হস্তগত হয় না। কি করেন! উকীল বাবুদ্বয়কে অনেক তোষামোদ, শেষে ভেড়াকান্তের স্ত্রী সোনাবিবির বাটীতে যাইয়া কান্দাকাটি করায়, উকিল বাবুদের মনে দয়া হইল, এক হাজার টাকায় সম্মত হইলেন। জামিননামা লিখিয়া কাচারি উপস্থিত—হাকিম নাই। কাহার দ্বারা কি করিবেন? বারটা—একটা—দুটা বাজিয়া গেল হাকিম বাহাদুরের নিদ্রা ভাঙ্গিল না।

ভেড়াকান্ত জেলের মধ্যে খাড়া হইয়া সিকের দরজা দিয়া বাহিরের লোকের চলাফেরা দেখিতেছেন। পরিচিত লোক রাস্তা দিয়া যাওয়া-আসা করিতেছে। হাকিম বাহাদুরের বাঙ্গালায় উকিল বাবুগণ দলে দলে যাওয়া-আসা করিতেছেন, যেমনি যাইতেছেন, অমনি ফিরিতেছেন। সামান্য সামান্য লোক স্বাধীনভাবে রাস্তায় মাঠে চলাফেরা করিতেছে। তাঁহার কিন্তু এক হস্ত পরিমিত স্থানও অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা নাই। রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটির প্রতি নজর পড়িল। সে অনেকক্ষণ পিতাকে দেখিবার জন্য জেলের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; দেখার কোন সুযোগ পায় নাই, জেলের গেটের নিকটেও ভয়ে আইসে নাই। ভেড়াকান্তের চক্ষে পড়িতেই ইসারা করিয়া ডাকিলেন। ভয়ে ভয়ে এক পা আগে, এক পা পিছে করিয়া সিকের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, "জামিনের হুকুম আসিয়াছে, চল্লিশ হাজার টাকা। জামিনদার জুটলে আজই খালাস হতে পারেন।" এই কথা বলিয়াই বালক অতি ত্রস্তপদে জেলের দ্বার হইতে চলিয়া গেল।

ভেড়াকান্ত একথা জেলের মধ্যে কাহাকেও বলিলেন না, দাগাদারীকেও বলিলেন না।

তিনটা বাজিয়া গেল, চারটা বাজিয়া গেল, রীতিমত গণনা করিয়া কয়েদী ঘরে উঠাইয়া তালা চাবি দিল। ভেড়াকান্ত ভাবিলেন, জামিনদার জোটে নাই, কি করিবে? সন্ধ্যাও প্রায় নিকটে, শীতকালের চারটা প্রায় সন্ধ্যা। ভেড়াকান্ত আজকার মত এক প্রকার নিরাশ হইলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ জেলের দ্বার খুলিল। একজন সেপাই ভেড়াকান্তকে ডাকিয়া বলিল, "বাবু জল্‌দি আসুন, জল্‌দি আসুন।"

ভেড়াকান্ত বাহির হইলেন। দাগাদারী কত বলিয়া দিলেন, ভেড়াও শুনিতেছেন, আর অন্যমনস্কে হাঁ হাঁ করিয়া, কোট পেণ্টুলন ইত্যাদি পরিতেছেন। পেটের পীড়া আর জ্বরের কল্যাণে গায়ের কাপড় খুলিয়া নেহালি গায়ে পরিয়া থাকিতেন। জেল হইতে বাহির হইয়া ডাক্তারবাবুর বহিতে এক দস্তখত, আর একখানা কাগজে এক দস্তখত করিয়া, তাঁহার পর সোজা হাকিম বাহাদুরের এজলাসে চলিলেন। আগে পাছে সান্ত্রী। যে সময়ে জেলে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে জেল ছাড়িলেন।

হাকিম বাহাদুরের এজলাসে যাইয়া পেস্কারের বেঞ্চের নিকট যাইয়া দাঁড়াইতেই, পেস্কার একটা কাগজ দস্তখত করাইয়া লইল। নামিয়া আসিতেই ডেপুটির ইঙ্গিতে পেস্কার ডাকিয়া বলিল, "মহাশয়! আর একটা কাজ বাকী আছে, আসুন।"

ভেড়াকান্ত বলিলেন, "বলুন, আর কি করতে হবে?"

পেস্কার একখানা সমন হাতে দিয়া বলিলেন, "আসল সময়ে লিখে দিন যে, 'নকল সময় পাইয়া রসীদ লিখিয়া দিলাম।' হাকিমের মুকাবেলা এজলাসের মধ্যে পাইলেন, তাহাও লিখিবেন।"

ভেড়াকান্ত বলিলেন—একটু কর্কশ স্বরে বলিলেন, "মশায়! যা যা থাকে, আর যা যা আছে, আর যা যা করবেন, আনুন, আমি দস্তখত করে দিচ্ছি। যখন দাঁড়িয়েছি। আর লজ্জা কি?"

ভোলানাথ মাথা হেঁট করিয়া দোত হইতে কলম কালি তুলিতেছেন। লোক-দেখান ছাই মাটি লিখিতেছেন, কারণ সে সময় কোন রায় লিখা বাকী ছিল না, কোন ফরিয়াদী কি সাক্ষীর জবানবন্দীও হইতেছিল না। ভেড়াকান্ত নাম সহি করিয়া কাচারি ঘরের বাহির হইলেন। হাজার লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। সকলের সহিত আলাপ আপ্যায়িত করিয়া জেলখানায় দুই-একটী কথা বলিতে বলিতে চলিলেন। পথের মধ্যে তাঁহার অতি শিশুপুত্রটিকে চাকরে কোলে করিয়া আনিতেছিল। পুত্রটির দৃষ্টি পড়িতেই, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বাটীতে আসিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে যে তাঁহাকে দেখিল, ঈশ্বরের নাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ও ভোলানাথকে অভিসম্পাত—বুদ্ধি-বিবেচনার ঘৃণাসূচক থুথু দিতে দিতে চলিয়া গেল। যে সকল ভদ্রলোক ভেড়াকান্তের সঙ্গে আসিতেছেন, তাঁহারা গেটের নিকটে কেহ-বা বাহির প্রাঙ্গণ হইতে বিদায় লইলেন। ভেড়াকান্তের স্ত্রী বিষাদমিশ্রিত সজলনয়নে দেউড়িতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বামীর মুখাকৃতি প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, যথাসাধ্য কিছু পয়সা চাউল দীন দুঃখীদিগকে দান করিতে অনুমতি

করিলেন। কিছু মেঠাই আনিয়া ঈশ্বরের নামে খায়রাত করিতে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন, স্বামীর দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া অতি সমাদরে বিশেষ আগ্রহ ও ভালবাসার সহিত আগু বাড়াইয়া লইয়া চলিলেন এবং মুখে বলিলেন যে, "ঈশ্বর দুঃখ কষ্ট দেন মনের ভ্রান্তিতে বলি, সেই ঈশ্বরই সদয় হইয়া দুঃখ দুর করিয়া দ্বিগুণ রূপে সুখ দিয়া থাকেন।"

গৃহমধ্যে লইয়া বসাইলেন। পরিধেয় বসন তখনি পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া, হস্ত মুখ ধৌতের যোগাড় করিয়া আহারের ব্যবস্থা করিলেন। পুত্র কন্যাগণসহ একত্র বসিয়া, কিঞ্চিৎ জলযোগ সহিত জেলখানার অবস্থা স্ত্রীর দুই একটি প্রশ্নমত বলিতে লাগিলেন। সকলে শুনিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দয়াময়! তুমিই রক্ষা করিয়াছ।"

ভিখারিণী এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মনের আনন্দে হাসিমুখে সকল কথা শুনিতেছে। ফিটফাট বাবুর ব্যবহারের কথা শুনিয়া সকলেই মহা খুসী হইয়াছেন।

ভেড়াকান্তর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিগকে বলিলেন, "ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, দিবারাত্র কান্দাকাটি করতে থাক, এই হাসি-খুসী যেন ঠিক থাকে। আমি এতক্ষণ ভেবেছিলাম, কেমন করে জেল হতে খালাস করব। এখন মনে হচ্ছে, এ হাসী-খুসীর গৌরব থাকবে, তা না হলে মহাবিষে পরিণত হবে। এখন সেই চিন্তা-জালে আবার মন ঘিরে নিল। এ হাসী-খুসীর সময় নহে।"

সকলেই স্থির হইলেন। দুই বৎসর মিয়াদের কথাটা সকলের মনে জাগিয়া উঠিল। ভেড়াকান্তর স্ত্রী স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও এই দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন। এ সাংঘাতিক বিপদের সংবাদ দুই স্থানে লিখিয়াছেন। একখানা স্বামীর সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে, অপরে একখানা একটু দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতাকে। দূরসম্পর্কীয় বটে, কিন্তু ব্যবহারে সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভেড়াকান্তর স্ত্রীর ইহাই বিশ্বাস। এই দুই পত্র ভিন্ন আর কাহাকেও লিখেন নাই। তিনি মনে মনে চিন্তা করিয়াছেন, অনর্থক পত্র লিখিয়া লোক জানাজানি করা ভাল নয় বিবেচনা করিয়াই স্বামী বারণ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এই দুই স্থানে না জানাইয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে বিশ্বাস যে বিদেশ, এ সময় এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া দেশে গেলে শত্রু হাসিবে, সাধারণ চক্ষেও ভয়ে পলাইল বলিয়া একটা কথা উঠিবে; কাজেই একজন নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় উপস্থিত থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাইতে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লিখা। দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা সহোদরের সমান; তিনি স্বয়ং জমিদার, অথচ তাঁহার আত্মীয়-স্বজন অতি নিকট সম্বন্ধীয় সকলেই বড়লোক। বিশেষ তাঁহার একটি জামাতা, আপন জামাতা না হইলেও অতি নিকট-সম্পর্কীয় জামাতা, একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার। এ বিপদে তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্যে অনেক লাভ আছে ভাবিয়াই স্বামীর বিনানুমতিতে এই দুই স্থানে পত্র পাঠাইয়াছেন। ভেড়াকান্ত জেল হইতে জামিন দিয়া খালাস হইয়া আসিলে দুইদিন পর তাঁহারা অরাজকপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। ভেড়াকান্তর স্ত্রী তাহাদিগকে দেখিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "এখন আমার অনেক সাহস হল।"

ভেড়াকান্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, অন্য ভ্রাতাসহ

আপীলের মকদ্দমার তদ্‌বির করিতে জিলায় চলিয়া গেলেন। দুই বৎসর মিয়াদ, হাজার টাকা জরিমানা যে শুনিতেছে, সেই মাথা হেঁট করিতেছে। ঈশ্বরের দয়া ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। ভেড়াকান্তের জীবন, সংসার, পুত্রকন্যা, ধনসম্পত্তি জজের সুবিচারের প্রতিই নির্ভর।

জামিনে খালাস হওয়ায় বেগম ঠাকুরাণী এবং আরও কয়েকজন বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, "কয় বার?—বাঁচবে কয় বার? আর এক অস্ত্র মাথার উপর ঝুলতেছে। এতেও যদি ফসকে যায়, আর একটা ফাঁদ,—যা তার মাথার উপরে ঝুল্‌ছে, তাতে আটক পড়বে। যাবে কোথা?"

দাগাদারী জেলার হাকিমের হুকুমে হাজত হইতে উদ্ধার হইয়া জামিনে খালাস পাইয়াছে। ধিন্‌তাধিনা ও ধামাধরা বাবু "বাগা" ব্যারিষ্টার সাহেবের সহায়ে রাজধানীর খুব উঁচু ঘরে জোড়া হাকিমের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। অরাজকপুরের হাকিমের উপর "কৌৎকা।" (এক প্রকার রুল) জারি হইয়াছে, শেষ আদেশ হয় নাই। শীঘ্রই চূড়ান্ত হুকুম হইবে।

দাগাদারী জামিনে খালাস হইয়া আসিয়া গোপনে গোপনে ঠাকুরাণীর কুঠিতে রাত্রে যাওয়া-আসা করেন। বেগম ঠাকুরাণীর মুখে তিনি শুনিয়াছেন যে, তাঁর খালাসের জন্য, জামিন মঞ্জুর জন্য, বেগম ঠাকুরাণীর চক্ষে ঘুম ছিল না, পেটে ভাত ছিল না, স্নান আহারের সময় ছিল না, দিন রাত খাটিয়াছেন। যার কাছে যাওয়ার কথা নয়, কথা বলার লোক নয়, তার কাছে দশবার গিয়াছেন; কথা ত কথা, সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিয়াছেন। চক্ষের জলে এক একদিন পরিধেয় বসন ভাসিয়া গিয়াছে। দিনে দুট ভাত মুখে ওঠে ত রাত্রে উপবাস গিয়াছে,—কষ্টের একশেষ হইয়াছে, তবে ত জামিন, তবে ত খালাস।

দাগাদারী শুনিয়াছেন,—বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন, জেলার মোক্তারের পত্রে জানিয়াছেন,—তদ্‌বিরকারক আমলার মুখে শুনিয়াছেন যে, জেলার হাকিমের নিকট দরখাস্ত করিয়া জামিন মঞ্জুর হইয়াছে। তবু বেগম ঠাকুরাণীর চেষ্টায়, বেগম ঠাকুরাণীর যত্নে ও পরিশ্রমে অরাজকপুরের হাকিম বাহাদুরের অনুগ্রহে, জামিন মঞ্জুর হইয়া খালাস পাইয়াছেন। সেই অনুগ্রহেই বেগম ঠাকুরাণীর সহিত আলাপ করিয়া সৌভাগ্যজ্ঞানে সুখের উপর সুখ, তার উপরে আরও ডবল সুখভোগে পরম সুখী হইয়াছেন। দাগাদারীর বিশ্বাস, বেগম যাহা বলিতেছেন, তাহার ষোল আনাই সত্য। তিনি চেষ্টা না করিলে এতদিন হাজতে পচিতে হইতো। বেগমই তাঁহার খালাসের মূল। দ্বিরদ-রদ-শরীরা, দ্বিরদ-রদ হস্তপদ, দ্বিরদ-গামিনী বেগম ঠাকুরাণীই তাঁহার উদ্ধারকর্ত্রী, রক্ষাকর্ত্রী, আসল কর্ত্রী। তাঁর দয়া ও ভালবাসার গুণে জেল হইতে বাহির হইয়াছেন। তাই কথার উত্তরে বলিয়াছেন, "দাগাদারীর গায়ের চামড়া দিয়ে আপনার পায়ের ষ্টকীং প্রস্তুত করে দিলেও এ উপকারের প্রতিশোধ হয় না।" কি স্বার্থ! কি স্বার্থান্ধ! হায়রে! কি ধড়িবাজী! যে সোনাবিবি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, জলের মত টাকা ব্যয় করিয়া, কত জনার তোষামদ করিয়া, কত যোগাড়ে, জজ আদালত হইতে জামিনের হুকুম বাহির করিয়াছেন, কত টাকা ব্যয় করিয়া জেল হইতে

খালাস করিয়াছেন, জেলে জলটুকু পাইবার জন্যে জলের স্রোতের ন্যায় টাকা খরচ করিয়াছেন, ভোলানাথের বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া, লেজ কেটিয়া, দশ জনার মুখে কত খোসনামি হাসিল করিয়াছেন, তার নাম মুখে আসিল না। দাগাদারীর মুখে সোনাবিবির নাম আসিল না! প্রশংসা হলো বেগম ঠাকুরাণীর! যে দাগাদারীর জন্য সোনাবিবির এত কলঙ্ক, এত অর্থ ব্যয়, এত বিপদ, এত গঞ্জনা, এত লাঞ্ছনা, কোলের সন্তান হাতছাড়া, ঘরের বউ পর্য্যন্ত বিদ্রোহী, তার নামটা বেগমের সম্মুখে দাগাদারীর মুখে বাহির হইল না। কি ধূর্ত্ত! কি কপাটি! চামড়ার ষ্টকীং—গায়ের চামড়ার ষ্টকীং পরিল বেগম ঠাকুরাণী! ও দুনিয়া! ও স্বার্থ! ওহো দাগাদারী! তোমার মনে এই কথা, তুমি ভাব এই কথা, তুমি স্থির করিয়াছ এই কথা—"সোনাবিবি আমার হাতে পিঞ্জরের পাখী, আমার হাতের ধরা মাছ, তার জিয়ন কাঠি, মরণ কাঠি আমার হাতে। ইঙ্গিতে উঠাই, ঠারে বসাই, সাধ্য কি এক পা আমার বিনানুমতিতে সরিয়া বসেন। এখন বেগমের জন্যেই ভাবনা। বেগমের মনের মধ্যে প্রবেশ করা সহজ কথা নহে! তাকে হাত কর্ত্তে পাল্লেই দাগাদারীর জয়জয়কার। ভারত জয়! ভারত করতলে! অরাজকপুর পদতলে, যমদ্বার পায়ের চটির সুকতলার তলে! তা হলেই স্বাধীন নিশান গগনের মধ্যভাগে উড়িয়ে, জয়ঢাক—ধুম্বলোচনের উপর বাক্যবাণ, ধমকির গুলিবর্ষণ করতে পারি। বেগমের ভালবাসা বেচে যদি শরীর ঢাকা থাকে, তবে অরাজকপুরের পেনেল কোড খড়্গাঘাত হতে এক প্রকার সম্পূর্ণ নির্ভর, কারও ভয় নাই। এক বেগম সহায় থাকলে, এই অরাজকপুরে রাতকে দিন, দিনকে রাত করতে পারি! কা'কে ডরাই? আমার কাছে লাগে কে? বুক ঠুকে শত্রুদিগকে পায়ের তলে ফেলে, পিঁপড়ে-পেষা মত পিষে ফেল্‌তে পারি। সোনাবিবির টাকা, বেগমের চেষ্টা। দাগাদারীর কল-কৌশল, এ তিন একত্র হলে কার ক্ষমতা?" দাগাদারী বুক ঠুকিয়া টেবিলে আঘাত করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন যে, "এ তিন যোগ একত্র হলে কার ক্ষমতা! লোকমানের বুদ্ধি লাগে কোথা? বিস্‌মার্কের পরামর্শের ধার ধারে কে?"

দাগাদারী বেগম ঠাকুরাণীর অন্দরমহলে চেয়ারে বসিয়া "মনের কথা" পড়িতেছেন, এ পাতা, সে পাতা উল্টাইয়া কত নিন্দা করিতেছেন। লেখকের চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতেছেন, কেহই তাঁহার মত লেখক নহে। রবি বাবু—নবীন বাবু, বঙ্গবাসীর লেখা একঘেঁয়ে, সেই কল্‌কেতাই কেতা, খাঁটি বাঙ্গালা নহে। বিদ্যাসাগরের নিজের জিনিস কিছু নাই, সকলি পরের, ছেঁটে কেটে বিদ্যাসাগর ছাপ দিয়ে বাজারে বদলাই কচ্ছেন। মাইকেল পর্য্যন্ত দাগাদারীর দন্তপেষণে জিহ্বার শাসনে পড়িয়া, মধুসূদন! হা মধুসূদন! নাম ডাক ছাড়িয়া হাঁপ ছাড়িতে ছাড়িতে কপোতাক্ষীর জলে ডুব দিচ্ছেন।

বেগম ঠাকুরাণী বলিলেন, "দেখ! পরের সমালোচনা কর, কিন্তু নিজের সমালোচনা কর্ত্তে কি লজ্জা হয়? তুমি চিরকালই ভোলা মহেশ্বর। ভাবছ কি? চোরের ধন বুঝি বাট্‌পাড়ে লয়? বোধ হয় তোমার মাথায় প্রবেশ করে নাই। ভেড়াকান্ত তোমার হিতৈষী, তোমার ভালবাসা। সাবধান্। ভালবাসা, আসল ভালবাসার ভালবাসা হতে আটক নাই। আমি যেন

কিছু শুনেছি, আমার কানে যেন কিছু এসেছে, কোন ভাল লোকে যেন কিছু বলেছে, একাসনে এক তক্তপোষের উপরে দুজনে অনেক রাত্র পর্য্যন্ত একত্রে বসে কত কথা হয়। প্রকাশ্য সম্বন্ধ গুরুতর বটে, সন্দেহের ছায়া আসতে পারে না। কিন্তু ভাই! ওহে দাদা! ব্যাভার আচরণ কোন কোন কথার ভাবে যেন কিছু সন্দেহ হয়, কিছু গন্ধও পাওয়া যায়। আমি একদিন তাই যাচাই কর্ত্তে গিয়েছিলাম। তোমার হাজতের কথায় আমার প্রাণ ফেটে গিয়েছিল। এখনও সে ফাটা জোড়া লাগে নাই। কত কেন্দেছি। বললে তুমি কি ভাববে জানি না, হঠাৎ মুখে বার হলো। দিন রাত ভেবেছি। কিন্তু দাদা! তাঁর সে কথা মনে নাই। তিনি দিব্বি বাহার দিয়ে, হাসি হাসি মুখে, ভেড়াকান্তকে নিয়ে, ভারি আমোদ, ভারি মজা,—ভারি কথা।—ভেড়াকান্তের কত খোসনাম, কত প্রশংসা। এতদিন যে ভেড়াকান্ত প্রাণের বৈরী—চক্ষুর শূল ছিল, মাথা পর্য্যন্ত কাটবার কথা,—এখন তার জন্য মাথা দিতে প্রস্তুত। এখন সেই ভেড়াকান্তর জন্য প্রাণ যায়!

কেন? এত মায়া জন্মায় কিসে? এত ভালবাসা হলো কিসে? মাঝে কি কিছুই নাই? ভেড়াকান্তই-বা খেয়ে না খেয়ে, তার জন্য মরে কেন? তুমিও ত আছ। তবে তার এত মাথাব্যথা কেন? কি কারণে? কিছু খবর রাখো? গুড়ে বালি মিশেছে। আরও কথা, —ভেড়াকান্ত আর সোনাবিবিতে যে প্রকার সম্বন্ধ তাতে নিশীথ রাত্রে একঘরে দুজনায় কথা কেন? আমোদ-আহ্লাদের কথা, রঙ্গরসের কথা,—এসকল কথা কেন? পানের উপর পান চুরুটের উপর চুরুট দেওয়া কেন? কর্ত্রী শুয়ে,—ভেড়াকান্ত তার বুকের কাছে গায়ে গায়ে ঘেঁসে বসা কেন? প্রতি রাত্রেই ভেড়াকান্তের সঙ্গে আলাপ কেন? আর বাড়ীতেই-বা যাওয়া কেন?

"আমি ত আর খুকী নাই, মূর্খ নাই, চোরেই চোরের সঙ্কেত বুঝে। তুমি বিশ্বাস কর বা না কর, বাতাস ভালভাবে ব'চ্ছে না। আমি শুনেছি ভেড়াকান্তের তত দোষ ছিল না। কর্ত্রীঠাকুরাণীর ভালবাসাটাই কিছু বেশী। ভেড়াকান্ত না হলে বুঝি আর জ্বরের লক্ষণ কেউ টের পায় না! সে হাত ধরে নাড়ী না দেখ্‌লে বুঝি আর আরাম বোধ হয় না। এ সকল ঘটনা ত তোমার চক্ষের উপরই হয়েছে—হয়ে থাকে। বলত সত্য না মিথ্যা? বুকে বেথা ধরল? ভেড়াকান্তর হাত টেনে বেথাস্থানে দেওয়া হল কেন? তুমি নিতান্ত হাবা ঘরগোয়ালা! তখন কি তোমার মাথায় কিছুই প্রবেশ করল না?"

দাগাদারী অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "শেষের কতকটা ঘটনার কথা যা বল্লেন, সে ত আমার সম্মুখেই হয়েছে। আমি জানি।"

"শেষের ঘটনা তোমার সম্মুখে হয়েছে, তুমি জান। মাঝের ঘটনা বুঝি তোমার অসাক্ষাতে হতে পারে না? ও ক্ষেপা!"

দক্ষিণ হস্ত দ্বারা চিবুক ধরিয়া মধুরভাবে নাড়া দিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকে অপর পুরুষের হাত আপন হাতে টেনে এনে বেদনা দেখাতে কোরতার মধ্যে হাত লয়ে গিয়ে দেখায়। কিছুই বুঝলে না! গাধা! বেদনা বুঝি অপরে হাতিয়ে অপরের বেদনা বুঝতে পারে?

আচ্ছা মানলাম, কোন স্থানে ফুললে হাতে টের পাওয়া যায়। সে ফুলো দেখ্‌তে কতক্ষণ সময় লাগে? আধ ঘণ্টার মধ্যে কি আর স্থান খুঁজে পাওয়া গেল না। আমি সমুদায় শুনেছি। তোমার সম্মুখেই এই কাণ্ড।"

"কার মনে কি আছে, কেমন করে বলি?"

"কেমন করে বলি, তা তুমিই জান। আমার কথায় বিশ্বাস কর না। তুমি নিজে পরীক্ষা করে দেখ, বেশী টান কোন দিকে। যাক্—ও কথা যাক্। আর একটি কথা তোমায় বলছি। বোধ হয় তুমি চেষ্টা কল্লে হতে পারে। তুমি মনোযোগ করে বুদ্ধি খাটিয়ে আমার একটি কাজ করবে কিনা?"

"অবশ্য করবো। আপনার কার্য্য—তার জন্যে মনোযোগ! যথাসাধ্য প্রাণ-মন যোগ করে কর্ব্বো।"

"ভেড়াকান্ত ত এখন বাড়ীতে নাই। তার স্ত্রীর কাছ থেকে কতকগুলি কাগজ কৌশল করে হাত করে এনে আমাকে দিতে পার কিনা? অতি কম হলেও আমার হাতে লিখা তিনশত চিঠি কোন গতিকে ভেড়াকান্তের হাতে পড়েছে। আরও কার কার চিঠি। সেই সকল চিঠি, আর একখানা পুস্তকের কপি হাত করতে পার, তাহলে প্রথম সময় এক কাজ করেছিলে, মধ্য সময় এই কাজ করো। শেষ সময় আর কোন কাজ করো বা না করো, তোমার দাবি অনেক।"

দাগাদারী মনে মনে বলিতেছেন, "ভালই। আমার ভাগ্য প্রসন্ন হওয়ার লক্ষণ এখনই প্রমাণের সহিত পাচ্ছি। একে বাধ্য রাখতে পাল্লে আর কাকেও ভয় করি না।" প্রকাশ্যে বলিলেন "এ অতি তুচ্ছ কথা। অতি সহজে এনে দিব। ভেড়াকান্তর স্ত্রী যদিও আমার সঙ্গে কথা বলেন না, তত্রাচ আমি কোন কথা বলে পাঠালে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, কোন পুস্তক চাইলে তখনই পাঠিয়ে দেন। শুনেছি, নিতান্তই ছেলে-মানুষের মত দেখায়। বুদ্ধি শুদ্ধিও তত বেশী নাই। আপনারা বলেন, ভারি চালাক চতুর বুদ্ধিমতী, আমি জানি নিতান্তই হাবা, বুদ্ধিটা বড়ই মোটা।"

বেগম সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা বল দেখি, তুমি কি বলে কাগজ চাইবে?"

"আমি গিয়ে বলবো যে, আপনার স্বামীর নিকট একখানা পুরাতন পত্র জিলায় পাঠাতে হবে। আরও একটা দরখাস্তের নকল পাঠাতে হবে। কাগজ-পত্র কোথায় কি আছে বের করে দিলে আমি বেছে নিতে পারি।"

"তারা বলবে, কি কাগজ বলে দেও, আমরাই বেছে দিচ্ছি।"

"তা কি বলতে পারেন? সে সকল কথা—যেখানে অবিশ্বাস, যেখানে সন্দেহ সেইখানে বলতে পারেন। আমার সঙ্গে কি ওরূপ ব্যবহার কর্ত্তে পারেন? তাঁরা জানেন যে, ভেড়াকান্তর সঙ্গে আমার ভারি প্রণয়। আমি তার ভাল ভিন্ন মন্দ করবো না। আর স্ত্রীলোক অত কাগজ বাছবে, দেখ্‌বে, সে সহজ কথা নয়। আমার হাতে এলো, রাখলেম—পরে দিব; মিটে গেল। আপনাকে এনে দিলুম। আর কি! বাস্।"

"তোমার এতদূর ক্ষমতা সেখানে যে হবে, বুঝি না। তা যাই হক্ আজকেই চেষ্টা করবে।"

দাগাদারী বিদায় হইলেন।

দাগাদারী! তোমার অসাধ্য কিছুই নেই। ঘসা-পয়সা বাবু যে তোমার বর্ণনা করিয়াছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। তুমি বিষধর সুহৃদ। তুমি এক হাতে প্রহার কর, অন্য হাতে ঔষধের ব্যবস্থা দেও। তোমার পাপরাশি ক্রমে ঘন হইয়া আসিতেছে, একদিন শিলা বজ্রাঘাত একত্রে ধরিবে। হিতৈষী উপকারী প্রিয়পাত্র সহিত সামান্য স্বার্থের খাতিরে, একজন অপদার্থ স্ত্রীলোকের অনুরোধে। তুমি একটি পতিপ্রাণা অসহায়া, এখন নিরাশ্রয়া অবলার চক্ষে ধূলি দিয়া বোঁকাবাজী করিয়া অতি প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র এবং পুস্তকের কপি হাত করিবে। তোমার এ পাপের শাস্তি হইবে—হইবে—হইবে।

এদিকে ভোলানাথ হাকিম ভেড়াকান্তর জরিমানা হাজার টাকা আদায়ের জন্য পুলিসের উপর পরওয়ানা দিয়াছেন, তা যেন শীঘ্রই দিবেন। পুলিস জরিবানার টাকার জন্য ভারি উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। ভেড়াকান্ত যাইবার সময় স্ত্রীকে ঘরকন্নার অনেক কথা বলিয়াছেন। জরিমানার টাকার কথা কিছুই বলিয়া যান নাই। তিনি মহা চিন্তায় পড়িলেন। স্বামীর নিকট তখনি পত্র লিখিলেন। পুলিসকে বলিয়া সপ্তাহকালের জন্য সময় লইলেন। পুলিস এত সদয় ব্যবহারের কারণ এই যে, ভেড়াকান্তের স্ত্রীর সহিত দারোগা বাবুর স্ত্রীর ভারি আলাপ। এমন আলাপ যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া দুই জনে কোন প্রভেদ ছিল না। দারোগা বাবু ডিপুটির মন তুষ্ট জন্য অনেক অন্যায় অত্যাচার করিতে প্রস্তুত হন, কেবল স্ত্রীর জন্য পারিয়া উঠেন না, তাঁহার বৃদ্ধ পিসিমার জন্যে পারিয়া ওঠেন না। দারোগা বাবু বলিয়া গিয়াছেন, যদি এক সপ্তাহ মধ্যে টাকা না দেন, তবে জিনিসপত্র নিলাম করিয়া বাড়ী ঘর নিলাম করিয়া টাকা আদায় করিব। ভেড়াকান্ত স্ত্রী ঐ জরিবানার টাকার জন্য ভারি অস্থির হইয়াছেন।

সোনাবিবির নিকট টাকার কথা বলিয়াছেন। সোনাবিবি প্রথম দিন অম্লান বদনে এক হাজার টাকা দিতে স্বীকার হন। "আগামীকল্যই দিব। দাগাদারী এখন এখানে নাই; সে উকিলের বাসায় গিয়েছে : এসেই যদি সুবিধা হয়, তবে আজকেই দিব। নিতান্ত পক্ষে কাল নিশ্চয়ই দিব।"

যেদিন টাকা দিবার কথা, সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দাগাদারী পরিপাটি সিঁথি কাটিয়া, সরুপেড়ে চিকন ধুতি পরিয়া, বাবুগিরি চাদরখানা কাঁধের উপর দিয়া, ভেড়াকান্তর বাটিতে আসিয়া বসিলেন। ভেড়াকান্তর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া, ভেড়াকান্তের স্ত্রীর নিকটে কি কথা বলিবেন, প্রকাশ করায়, ভেড়াকান্তর স্ত্রী বলিলেন, "আমি তার সঙ্গে কখনও কথা বলি নাই। বিপদ সময় কি করব? কথা না বললেও চলে না, তা আগে আপনিই শুনুন। নিতান্ত পক্ষে না হয়, শেষে আমি শুনবো।" ভেড়াকান্তর ভ্রাতা এই কথা লইয়া দাগাদারীর নিকট গেলে, দাগাদারী একটু দুঃখিত হইয়া বলিল, "কপাল

যখন মন্দ হয়, তখন এইরূপ কুবুদ্ধিই ঘটে। এখন কি তাঁর ওরূপভাবে থাকতে হয়। গোপনীয় কথা, তাঁকে ভিন্ন অন্য কাকেও বলা যায় না।"

ভেড়াকান্তর স্ত্রী পুনরায় এই সকল কথা শুনিয়া মহাবিপদে পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন যে, "তিনি কাগজে লিখে লেফাফা এঁটে পাঠিয়ে দিন, আমি উত্তর দিচ্ছি।"

ভেড়াকান্তর স্ত্রী দাগাদারীর নামে চটা, তাঁহার আচার-ব্যবহারে নিতান্তই ঘৃণা। স্বামীর সহিত দাগাদারীর সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। তিনি দাগাদারীকে যারপরনাই অবিশ্বাস করেন, মনের সহিত ঘৃণা করেন।

দাগাদারী লিখিয়া দেওয়ার কথা শুনিয়া আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তাঁর স্বামীর খালাস সম্বন্ধেই কোন কথা। তা তিনি শুনলেন না; আমি কি করব?"

স্বামীর খালাস সম্বন্ধে কথা শুনিবামাত্র, দাগাদারীকে বাটীর মধ্যে আনিতে বলিলেন। ঘরের মধ্যে ভেড়াকান্তর স্ত্রী, বারান্দায় দাগাদারী একখানি তক্তপোষের উপরে বসিলেন। একথা সেকথা বলিয়া শেষে বলিলেন যে, "ভেড়াকান্ত বাবুর কাগজপত্রের বাক্সটা আমি দেখতে চাই। কাগজপত্রের বাক্স কি পেটারা, যে কয়েকটা আছে, দেখতে হবে, একখানি দলিলের নিতান্ত দরকার হয়েছে। বাক্স কয়েকটা আমার বাসায় পাঠিয়ে দিন, আর অলঙ্কার ইত্যাদি ভাল ভাল জিনিসপত্রের বাক্সও বাড়ীতে রাখবেন না। টাকা এক হাজার আজ দিবার কথা যে ছিল, তা আজ পাওয়া গেল না। টাকা কৰ্জ্জ না কল্লে আর দেওয়ার সাধ্য নাই। কি জানি, জরিমানার টাকার জন্য এ বাড়ীর জিনিসপত্র বিক্রয় হলে সমুদায় যাবে। আমার বিবেচনায় আপনি এবাড়ী হতে উঠে আমাদের বাড়ীতে আসুন। নিতান্ত পক্ষে তাও যদি না যান, তবে জিনিসপত্র কাগজ কোন প্রকারের রচনা, হাতে-লিখা পুস্তক, চিঠি ইত্যাদি কিছুই রাখবেন না। সমুদায় আমার নিকটে দিন আমি খুব যত্ন করে রেখে দিব। পরে গোলযোগ মিটে গেলে ফিরিয়ে দিব।"

ভেড়াকান্তর স্ত্রী একেই হঠাৎ-রাগী, তার উপরে স্বামীর মেয়াদ হওয়ার পর মনের গতি বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। কি বলিবেন, কি উত্তর করিবেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না। রোষে, অপমানে, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার স্বামী কখন এভাবে তাঁহার সহিত কথা বলেন নাই। অনেক চিন্তা ও মনে মনে যুক্তির পর সাব্যস্ত করিলেন, স্বামীর বিপদ, টাকা সোনাবিবির, মালিক দাগাদারী, হঠাৎ চটান নয়। প্রকাশ্যে বলিলেন, 'আমি একটু পরে এই সকল কথার উত্তর দিচ্ছি। আপনি বাইরে গিয়ে বসুন।"

দাগাদাবী বলিলেন, "এ আর বিবেচনার কথা কি যে ভেবে-চিন্তে বুঝতে হবে? কাগজপত্রের কথা আপনারা অত বুঝতে পারবেন না।"

এ কথায় কাটা-ঘায়ে লবণের ছিটা পড়িল। ভেড়াকান্তর স্ত্রী বলিলেন, "নামাজের সময় হয়েছে। আপনি বাইরে গিয়ে বসুন, আমি নামাজ পড়ে এই সকল কথার উত্তর দিচ্ছি।"

দাগাদারী উঠিলেন, জুতা পায় দিলেন, চাদর ঘাড়ে করিলেন, আস্তে আস্তে অতি মৃদুভাবে বাহির বাটীতে আসিয়া বসিলেন।

ভেড়াকান্তের স্ত্রীর শরীর রাগে কাঁপিতেছে। তখনই একটি লোকের দ্বারা উত্তর পাঠাইয়া দিলেন যে, তাঁহার স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কোন কাগজ কাহাকে দেখাইতে পারেন না, কোথায় কোন্ বাক্সে কি আছে তিনি জানেন না। কোন্ কাগজের কি দরকার জানিলে, তিনি নিজেই দেখিতে পারেন। জিনিসপত্র অলঙ্কার আদি আপনাদের বাড়ীতে পাঠাবেন কি না তাহা কাল বলিবেন।

দাগাদারী ভারি অপ্রস্তুত হইয়া, কি বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন, তাহা কেহই বুঝিল না।

নামাজ অন্তে ভেড়াকান্তের স্ত্রী কন্যাদ্বয়, পুত্র, দেবর, ভিখারিণীকে লইয়া বসিলেন—তাঁহার স্বামী যে প্রকার ঘরাও কথা কি কোন নূতন কথা মীমাংসার জন্য তাঁহাদিগকে লইয়া সকলের মত জিজ্ঞাসা করিয়া কার্য্য করিতেন, সেই অনুকরণে তিনিও সকলকে লইয়া দাগাদারীর কথা বলিলেন। সকলেই একমতে বলিল, "ওঁকে কাগজের বাক্স কি জন্য দেখাব? কি দরকার, কি প্রয়োজন, প্রকাশ করে না বল্লে, আর কোন কথাই বলা হবে না। আর বাড়ীর জিনিসপত্রই বা কেন দিব? সোনাবিবি টাকা দিতে চেয়েছেন, দাগাদারীর কথায় না দেয়, আমরা যে উপায়ে পারি হাজার টাকা সংগ্রহ করব।"

এই প্রকার কথা সাব্যস্ত করিয়া রাখিলেন। প্রভাতে আসিলেই বলিয়া দিবেন।

ভেড়াকান্ত ও তাঁহার সঙ্গীর ভ্রাতা রাজধানীতে যাইয়া সেই আত্মীয় ব্যারিষ্টার সাহেবকে মকদ্দমার যাবতীয় অবস্থা বলিলেন এবং সময়ে কাগজপত্র দেখাইলেন। ব্যারিষ্টার সাহেব মকদ্দমার সওয়াল জবাব করিবেন স্বীকার হইলেন। ভেড়াকান্তের জন্মস্থানে পাড়া-প্রতিবেশী যাবতীয় মুসলমান বৃদ্ধ ও বিধবা স্ত্রীলোক রোজা নামাজ ঈশ্বরের উপাসনা যথাসাধ্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। নচ্ছারপুর জিলায় মুসলমানগণ ভেড়াকান্তের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করিলেন। অরাজকপুরে ভেড়াকান্তের স্ত্রী কন্যা পুত্র ভ্রাতা, সকলেই রোজা নামাজ উপাসনা, যথাসাধ্য দান ধ্যান আরম্ভ করিলেন। ভিখারিণীও আপন সাধ্যমত তাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিল। নির্দ্ধারিত দিনে ব্যারিষ্টার সাহেব উপস্থিত হইয়া ঘটনার আদি-অন্ত জজ বাহাদুরের নিকট ধীর-গম্ভীরভাবে সুযুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিলে নিরপেক্ষ বিচারপতি ভেড়াকান্তকে নির্দ্দোষ সাব্যস্তে খালাস দিলেন। ডিপুটির যাবতীয় হুকুম রদ হইল। হাকিম বাহাদুর দণ্ডের টাকার জন্য বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিলেন, খালাসের কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। বাসগৃহ হইতে দুই দিন বাহিরেই আসিলেন না। দাগাদারীও কম করেন নাই। সোনাবিবিকে বলিয়া টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, যে সোনাবিবি প্রথমে এত করিব, অত করিব, ভয় কি, চিন্তা কি, বলিয়া কত আশ্বাস দিয়াছিলেন, শেষে ভেড়াকান্তর স্ত্রী নিজের টাকার জন্য যাইয়াও একটি টাকা পান নাই। দুপ্রহর পর্য্যন্ত থাকিয়া রুক্ষমুখে রিক্তহস্তে বাটী ফিরিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক, ভেড়াকান্তের বেকসুর খালাসের সংবাদে অরাজকপুরের যাবতীয় লোক সন্তুষ্ট হইল।

ভেড়াকান্তের স্ত্রী সংবাদ পাইয়া কায়মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মন খুলিয়া হর্ষ বিকাশ করিতে পারিলেন না। হাকিম ভোলা ভেড়াকান্তের নামে ওয়ারেন্ট বাহির করিয়া রাখিয়াছেন। যেই অরাজকপুরে আসিবে, অমনি গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে দিবে। এই পাকাপাকি পরামর্শ আঁটিয়া রাখিয়াছে। তিনি গোপনে স্বামীকে একথা লিখিয়া বাড়ী আসিতে নিষেধ করিলেন।

পাঠক! মনে আছে? সেই জেল হইতে খালাসের রাত্রি ভেড়াকান্তের দ্বারা একখানি আসল সমনের পৃষ্ঠে সহি করিয়া লইয়াছিলেন। এতদিনে তাহার ফল ফলাইলেন। সেই দারোগার মারপিট মকদ্দমার নকল আসামীর শাস্তি হইয়াছে, সেই মকদ্দমার শাখা মকদ্দমা— লাঠিয়াল সংগ্রহ করা। তাহাতেই ভেড়াকান্ত আসামী, সমন হাতে নির্দ্ধারিত দিনে উপস্থিত হন নাই—তাহাতেই ওয়ারেন্ট। ভোলানাথের ইচ্ছা যে, কয়বার ফাঁক যাবে? একটা ছাড়বে আর একটা বেরুব।

রাজশক্তি পাইয়া যাহার মনের ভাব এতদূর উচ্চ, তাহার অধীনে তাহার রাজ্যে বাস করা সহজ কথা নহে। ভেড়াকান্তের স্ত্রীকেই-বা কত প্রকারে ভয় দেখান হইতেছে। তাহার আর কি করিবে? এক বিপদ ভার হইতে রক্ষা পাইতে পাইতে আবার দশ মন ভারী পাথরের চাপ মাথায় চাপিয়া পড়িল। তবে একটু রক্ষা যে দাগাদারী সোনাবিবি দুইজনই আসামী শ্রেণীভুক্ত আছেন। তাঁহারা এ মকদ্দমার তদ্‌বির ভালরূপই করিবেন। একা ভেড়াকান্ত আসামী থাকিলে দাগাদারী বন্ধুবরের কল্যাণে আর ভেড়াকান্তের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না। হায় রে জগৎ! স্বার্থই তোমার অন্তঃসার, স্বার্থই তোমার মূল মন্ত্র, স্বার্থই তোমার জীবন।

এদিকে রাজধানীর হাকিমদ্বয়ের বিচারে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, ভোলানাথ ডিপুটি, সোনাবিবি, দাগাদারী ও ভেড়াকান্তকে নিরপেক্ষ চক্ষে দৃষ্টি করিয়া রাজবিধির সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভেড়াকান্তের মকদ্দমার রায়েতেই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ করিতেছে। আন্তরিক ক্রোধ না থাকিলে এরূপভাবে লেখনীর গতি পরিচালিত হয় না। ইঁহাদের মোকদ্দমা ভোলানাথের হাতে বিচার হইলে বিচারার্থী সুবিচারের আশা করিতে পারে না। কাজেই মকদ্দমা অন্য বিচারকের হস্তে বিচার হওয়াই কর্ত্তব্য।

বাদানুবাদের পর খামখেয়ালীগঞ্জের রাঙ্গামুখো হাকিমের এজলাসে দাগাদারীর মকদ্দমা আর লাঠিয়াল সংগ্রহের মকদ্দমা বিচার অর্পিত হইল।

নচ্ছারপুর জেলার জজ বাহাদুরের বিচারে দারোগা মারপিট মকদ্দমায় নকল আসামীকে ভোলানাথ বাবু যে দুই বছরের জন্য ফাটক দিয়াছিলেন, সে হুকুম রদ হইয়া নকল আসামী খালাস পাইল।

মাথা রহিল না; কিন্তু মাথাব্যথা গেল না। লাঠিয়াল সংগ্রহ যাহাতে হইয়াছিল, সে মকদ্দমার আসামী খালাস পাইল। সংগ্রহের মকদ্দমা চলিতে লাগিল। খামাখেয়ালীগঞ্জের রাঙ্গামুখো বিচারপতি লাঠিয়াল সংগ্রহের মকদ্দমায় সোনাবিবিকে মোক্তারতন, আর

দাগাদারীকে স্বয়ং আসামী শ্রেণীতে হাজির পাইয়াছেন। ভেড়াকান্তকে হাজির পান নাই। কারণ ভেড়াকান্তর স্ত্রীর সাবধান মতে অরাজকপুরে আর আইসেন নাই। তাঁহার নামে ওয়ারেন্টই আছে।

দাগাদারীর ইচ্ছা যে, ভেড়াকান্তসহ মকদ্দমায় উপস্থিত হন। ভেড়াকান্ত কোথায় আছেন জানেন না। মকদ্দমা অরাজকপুরের হাকিমের হাতে নাই। খামখেয়ালীগঞ্জের হাকিমের হাতে মকদ্দমা। অরাজকপুরের ভোলানাথের ওয়ারেন্ট ভেড়াকান্ত যে মান্য করিবেন, সেই ওয়ারেন্টের ভয়ে ভেড়াকান্ত যে খাম্‌খেয়ালীগঞ্জের হাকিমের এজলাসে উপস্থিত হইবেন, একথা তিনি কিছুতেই মনে স্থান দিলেন না। খাম্‌খেয়ালীগঞ্জের কোর্ট বাবুর সহিত যোগ করিয়া বিচারকের নিকট এতেলা দিলেন যে, ভেড়াকান্ত নামক আসামী অনুপস্থিত। সময় লইয়া স্বয়ং রসিদ দিয়া নির্দ্ধারিত দিনে উপস্থিত না হওয়ায় অরাজকপুরের হাকিম বাহাদুর ওয়ারেন্ট করেন—এ পর্য্যন্ত ওয়ারেন্টে ধৃত হয় নাই। এখন এই এজলাস হইতে সমন, কি ওয়ারেন্ট দেওয়ার হুকুম হইলে ঐ আসামীকে বিচারের দিন উপস্থিত করা যায়।

বিচারক দুই চক্ষু পাকল করিয়া কোর্ট বাবুর দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন, "ভেড়াকান্তের অবস্থা মকদ্দমার বিবরণে অপ্রকাশ নাই। এই মকদ্দমার মূল মকদ্দমার একজন আসামী, যে দুই বছরের শাস্তি পায়, জজের বিচারে নির্দ্দোষ সাব্যস্তে সে খালাস পাইয়াছে, তাহাও অপ্রকাশ নাই। উপস্থিত আসামীর বিচার হইলে, বক্রী আসামীর বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে।"

কোর্ট...বাবু অপ্রস্তুতের একশেষ। দাগাদারী স্বকর্ণে শুনিয়া হিংসার আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তত্রাচ ক্ষান্ত হইলেন না। খামখেয়ালীগঞ্জে থাকিয়াই ভেড়াকান্তবাবুর স্ত্রীর নিকট এক পত্র লিখিলেন যে, "আপনার স্বামী যেখানেই থাকুন আপনার অজানা নাই। তাঁহাকে আগামী বিচার দিনে খামখেয়ালীগঞ্জের হাকিমের এজলাসে উপস্থিত না হইলে মহাবিপদ। ওয়ারেন্টের আসামী গোপন রাখা অপরাধে আপনাকেও বোধ হয় বিপদে পড়িতে হইবে।"

ভেড়াকান্ত নচ্ছার জিলা হইতে খালাস পাইয়াও, ভোলানাথ ডিপুটির ওয়ারেন্টের ভয়ে প্রকাশ্যে অরাজকপুরে আইসেন নাই। অতি সংগোপনে বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর ঘরে গুপ্তভাবে রহিয়াছেন। বাড়ীর লোকজন চাকরেরা পর্য্যন্ত এ গুপ্তসন্ধান জানে না। কিন্তু বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ জানে। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছেন যে, নকল আসামী খালাস। বিচার ভার খাম্‌খেয়ালীগঞ্জে। ভোলানাথের ওয়ারেন্ট অস্ত্র ভোঁতা। তবে শত্রুতা করে জবরানে ধরে, হাতকড়া হাতে লাগাইয়া শেষে না টিকুক, উপস্থিত একটা গোলযোগ করিতে পারে। তাই ভাবিয়া স্ত্রীর শয়ন ঘরেই স্নান-আহার—অতি গোপনে অবস্থান।

দাগাদারীর পত্র যথাসময়ে হস্তগত হইলে, ভেড়াকান্তের স্ত্রী স্বামীকে পত্র দেখাইলেন। তিনি ভীত হইলেন না।—"এখনও বিচারের ১৫/১৬ দিন বাকী। যদি নিতান্তই হাজির হতে হয়, বিচার দিনে উপস্থিত হব। কিন্তু দাগাদারীর কথায় বিশ্বাস নাই।" এই কথা বলিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আমি লিখিব না। মানুষকে আর বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি

স্বহস্তে লিখো না। তোমার পক্ষ হইতে মুন্সী দ্বারা ... মোক্তার নিকট খামখেয়ালীগঞ্জে লিখে পাঠাও। তার সঙ্গে আমার বহুদিন হতে পরিচয়। তার পারিশ্রমিক কত দিবে, তাও লিখে পাঠাও। তিনদিন মধ্যে উত্তর আসিবে, আমার সম্বন্ধে কি হুকুম।"

তখনি পত্র ডাকে রওয়ানা হইল। পঞ্চম দিনে হাকিমের হুকুমের নকল সহ মোক্তার বাবুর পত্র আসিল। ছি! ছি! কি ঘৃণা! দাগাদারীর চাতুরী প্রকাশ পাইল। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে কায়মনে ঈশ্বরে ধন্যবাদ দিয়া আশ্বস্ত হইলেন।

পাঠক! এক কথার শেষ না হইতে অন্য কথা উঠান যায় না। জিলার হাকিমের হুকুম— পুনরায় সোনাবিবির সহিত পুত্রের আপসের কথা উপস্থিত কর। যদি তিনি না শুনেন, তবে তাঁকে আর অনুরোধ করিও না। ভোলানাথ ডেপুটি সেই হুকুম অনুসারে সাবলোট ধুম্বলোচন, জয়ঢাক, ঘষা পয়সা, মাথা-পাগলা, ঘরভাঙ্গা, তেনাচেরা, তুড়ুক পাহাড়, ধিন্‌তাধিনা, ধামাধরা, বে-আক্কেল, দাগাদারী প্রভৃতি উভয় পক্ষের সংশ্রবী ও বে-সরকারী নিরপেক্ষ কুলকুচ নগরের থুথথুড়িমীর, পালতোলা গ্রামের মাখাল খাঁ, এই সকল লোকজন জমিদার লইয়া আপস সম্বন্ধে খুব জাঁকাল এক দরবার করিয়া বসিয়াছেন। আপসের কথা চলিতেছে। সেই সময় মোকদ্দমা উঠাইয়া খামখেয়ালীগঞ্জের মহকুমায় বিচার জন্য রাজধানী হইতে ভোলানাথ প্রতি পরওয়ানা আইসে, আর কৈফিয়ৎ তলব হয়।

ভোলানাথ লজ্জায় অস্থির, রোষে থরহরি কম্প। দরবারস্থ লোককে বলিলেন, "আপনারা আর একবার যেয়ে সোনাবিবিকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি আপস করবেন কি না? যাই বলুন, আমি লিখে খালাস হই। আমার কি গরজ, কেন আমি আপসের জন্য তোষামোদ কর্ত্তে যাই। আপনারা আগে যা বলেছিলেন, তার ত একটিও সত্য দেখ্‌তে পাইনে। সেই আসল গোড়া, সেই অনিষ্টের মূল, ওকে সরাতে পাল্লেই আপস হয়। ওকে কিছুদিনের জন্য আট্‌কে রাখলেই সমুদায় গোল মিটে যায়। আপনারা আপন আপন স্বার্থ সাধন জন্য কৌশল করে বেশ এক হাত খেলে নিয়েছেন। কৈ, সে এখন কোথায়। কৈ, সে কাকে পরামর্শ দেয়? কৈ, সে ভেড়াকান্তের কথা কে শুনে? সে ত এখন এ দেশেই নাই। তবে হয় না কেন? আপন হয় না কেন? এখন আর কে বাধা দেয়?"

সকলেই চুপ। অনেকের মাথা হেঁট। হাকিম বাহাদুর দরবার হইতে উঠিলেন। জমিদার সাহেবগণ আর থাকিয়া কি করিবেন? আপন আপন বাসায় যাইয়া স্নান-আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দরবারী লোক উঠিয়া গেলে ভোলানাথ কোর্ট বাবু, দারগাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ এঁটে, —রাজধানীতে হাকিমের সম্মুখে নিন্দা করার প্রতিশোধ লইবার জন্য সোনাবিবির নামে এক ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন। লাঠিয়াল সংগ্রহ মকদ্দমায় সোনাবিবি প্রথম সামনে উপস্থিত না হওয়ায়, ওয়ারেণ্ট জারি হইল।

সোনাবিবি বাড়ী মধ্যে আহার করিতে বসিয়াছিলেন। দাগাদারীও তাহার পাত্রের কাঁটা হাড় চিবাইতেছিলেন, আর হাসিয়া হাসিয়া হাজতের গল্প করিতেছিলেন। হঠাৎ ঘরের

মধ্যে দারগা, মায় হাতিয়ার বাঁধা, যাইয়া উপস্থিত। কথাটা শুনিতে একেবারেই পাগলের কথার মত শুনা যায়। জমিদারের বাড়ী, হঠাৎ অন্দরমহলে, একজন দারগা মায় হাতিয়ার আহারের স্থানে প্রবেশ, অতি আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য।

চাকর, চাকরাণী দাগাদারীর ব্যবহারে সকলেই অসন্তুষ্ট। সকলের সঙ্গেই চালাকী, সকলের সঙ্গেই ফাঁকিবাজী, সকলের সঙ্গেই মিথ্যা ব্যবহার—এই এক কথা। দ্বিতীয় কথা, থানার কনেষ্টবল, মিউনিসিপ্যালিটির চৌকিদার, এবং ফৌজদারীর প্যায়দা, সর্ব্বসমষ্টিতে প্রায় পঞ্চাশ জন সোনাবিবির বাড়ীর চারিদিকে ঘেরা। যে যেখানে ছিল, তাহাকে সেইখানে রাখিয়াছে, এক পাও হেলিতে দিতেছে না। দারগা বাবু ঘরের মধ্যে উপস্থিত হইলেই, সোনাবিবি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ কে? এ কে"?

দারগা বলিল, "আমি পুলিসের দারগা। তুমি সোনাবিবি? তোমাকে এই ওয়ারেণ্ট বলে গ্রেপ্তার কল্লেম।"

দাগাদারীর চক্ষু উপ্‌র উঠিল, গালের ভাত পড়িয়া গেল, হাতের মুরগীর হাড় বুকের উপর হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া কোঁচড়ের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। সোনাবিবি ভাতের বাসন ফেলিয়া পর্দ্দার আড়ালে লুকাইলেন। দারগা কোন মতেই ছাড়ে না! হাতে হাতকড়া লাগাইতে চায়, বান্ধিয়া হাকিম বাহাদুরের নিকট লইয়া যাইতে চায়। সোনাবিবি দেখিলেন, দাগাদারী অস্থির, অজ্ঞান। তিনিই দারগাকে বলিলেন, "একটু থাক, বাবা! একটু অপেক্ষা কর। কথাবার্ত্তার আওয়াজে দাগাদারীর চমক্ ভাঙ্গিয়া গেল। শেষে দারগার পা-ধোয়ার জল, জল-খাওয়ার পানি দিয়া, একটু ঠাণ্ডা করিয়া, ঠাণ্ডা হইলেন।

সোনাবিবি দেখিলেন, দাগাদারীর খাতিরে ভেড়াকান্তের সহিত ভাল ব্যবহার করি নাই। ভেড়াকান্তের স্ত্রী একদিন দুঃখে পড়িয়া ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত এইখানে এক হাজার টাকার জন্য কত কাকুতি-মিনতি করিয়াছিল। শেষে তাকে এক গ্লাস জল পর্য্যন্ত খাইতে দেওয়া হয় নাই। আর কি তারা এ বিপদে আসিবে, আসিয়া দেখিবে? সে আশায় নিরাশ হইয়া, সাবলোট সাহেবও জয়ঢাককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তারা তখনি আসিলেন, দাগাদারী পায়খানার মধ্যে লুকাইলেন। জয়ঢাককে দেখিলেই তাঁর পীলা চমকিয়া যায়। যেই জয়ঢাক আসিয়াছে, অমনি পলাতক। সোনাবিবি ছেলের হাত ধরিয়া, সাবলোটের হাত ধরিয়া কেন্দেকেটে বল্লেন, "তোমরা থাক্‌তে আমার এই দশা?" তাঁহারা সকলে হাকিম বাহাদুরের নিকট গিয়া অনেক মিনতি, অনেক সাধ্যসাধনার পর, পঞ্চাশ হাজার টাকা জামিনীর হুকুম বাহির করেন, তবে রক্ষা। সোনাবিবি প্রথম স্বীকার হইয়াছিলেন যে, যমদ্বারে যাইব, আর মকদ্দমা মামলা করিব না। শেষে দাগাদারীর পরামর্শ মত সে মত উল্‌টিয়া যায়। ভোলানাথ রিপোর্ট দেন যে, কিছুতেই আপস হইবে না। বাহিরের লোকে আপস হইতে দেয় না, কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সোনাবিবির ঘুষখোর আমলার দল, আর দাগাদারী, ইহারাই আপসে নারাজ।

এই ঘটনার পরই খামখেয়ালীগঞ্জের মহকুমায় লাঠিয়াল সংগ্রহের মকদ্দমা উপস্থিত।

নির্দ্ধারিত দিনে সোনাবিবির ও দাগাদারীর ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড হইল। বিচারপতি রায়েতে লিখিলেন, এ মকদ্দমার প্রমাণ নাই। মূল মকদ্দমা মিথ্যা সাব্যস্ত হইয়া আসামী ... খালাস পাইয়াছে। যাহা হউক, আমার বিশ্বাস হওয়ায় দণ্ড করা গেল।

দণ্ড করিয়াই হাকিম আপীল করিতে অনুমতি করিলেন। তাহার ইচ্ছা নয় শাস্তি দেওয়া, বোধ হয় কোন কারণে এই দণ্ডের হুকুম দিয়া আপীল করিতে আদেশ করিলেন। দাগাদারীর ইঙ্গিতে বিপক্ষের মোক্তারবাবু, কোর্টবাবু অবশিষ্ট আসামী ভেড়াকান্তের তলবের কথা বলায় হাকিম বলিলেন, সে ত "সোনাবিবির চাকর নয়। যদি জজ সাহেব ইচ্ছা করেন, তলব করিবেন। আমি কোন আসামীর তলব দিব না।"

ঈশ্বরের মহিমার অন্ত নাই, ভেড়াকান্ত বিনা পরিশ্রমে, বিনা চেষ্টায় মুক্তি পাইলেন। শেষে জেলায় আপীল হইলে সোনাবিবি, দাগাদারীও দণ্ড হইতে মুক্তি পাইয়া দণ্ডের পাঁচ শত টাকা ফেরত পাইলেন।

বিংশ নথি

স্বার্থপর লোকের নিকট ধর্ম্ম-কর্ম্ম, প্রণয়-পীরিতি প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মায়া-মমতা, আদর-যত্ন, ঠিক যেন জলে রেখাপাত, বালুকায় জল সিঞ্চন। স্বার্থের নিকট সর্ব্ব-প্রকার আশার জলাঞ্জলি; স্বার্থময় জীবনে—জীবনের আশাও অতি অল্প। পদে পদে ভয়, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সংশয় ও নিরাশ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, দাগাদারীর অসাধ্য কিছু নাই। আজ দাগাদারী এক সাফাই হাত খেলিতে বসিয়াছেন। যোগাড়-যন্ত্র করিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন। এইক্ষণে সোনাবিবির ঘোর দুর্দ্দিন, দেশময় কলঙ্ক, কোলের সন্তান হাত ছাড়া, আত্মীয়-স্বজন বৈমুখ, পুরাতন কার্য্যকারক প্রাচীন, প্রবীণ, আমলা, দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী বিদ্রোহী। প্রজাগণ দো-মনা, হাকিমান নারাজ, দেশের বড়লোক জমিদার বিরক্ত। ঘনিষ্ঠ, স্বগণ, জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রধান শত্রু। বসত বাটি হইতে বে-দখল, ঋণে জড়িত। মকদ্দমা মামলায় অস্থির, নাবালক পুত্রের প্রকাণ্ড জমিদারীর কর্ত্তৃত্ব যায় যায়। অলি অছি খারিজের মকদ্দমা দায়ের, ছালাভরা টাকা খৈয়ের মত বাতাসে উড়িতেছে; পরিণাম ফল ভবিষ্যতের গর্ভে লুকান। ভাল-মন্দ উভয়ই অনিশ্চিত। হয় রাজরানী, নয় পথের ভিখারিণী। কার কল্যাণে? যাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই বলিবে—দাগাদারী!! দাগাদারীই সোনাবিবির ঘরের প্রধান শনি। তারই পরামর্শে, বুদ্ধির দোষে সোনাবিবির আজ এই দুর্দ্দশা। যদি নাবালক পুত্রের অলি অছি পদ বাহাল থাকে, তবে ত মঙ্গল তাহা না থাকিলে ভরা-ডুবি একেবারে বিসর্জ্জন। এক মকদ্দমার উপরেই মরণ-জীবন।

দাগাদারী পদ পাইয়া সকলেই ভুলিয়াছেন। পূর্ব্বাবস্থা, পূর্ব্ব জীবন, সাবেক চাল-চলন, সকলই ভুলিয়াছেন, ভাগ্যগুণে যে পদ তাঁহার প্রাপ্তি হইয়াছে যে ক্ষমতা লাভ হইয়াছে, কপালক্রমে যাহা তিনি হাতে পাইয়াছেন, শক্তি নাই বলিয়া, ধারণা শক্তির ক্ষমতা নাই বলিয়া, উথলিয়া পড়িয়াছে, ভ্রম জন্মিয়াছে, মতিভ্রম ঘটিয়াছে, নিজকে নিজেই ভুল হইয়াছে, লক্ষ্য স্থির নাই, কাহারও কথায় বিশ্বাস নাই, আত্মপর জ্ঞান নাই, লাভ-লোকসানে দৃষ্টি নাই, হাজার খাটিলেও তাহার পুরস্কার নাই। যে মন্দ করিল, তাহারও যে আসন, যে মন্দ না করিল, তাহারও সেই উচ্চ আসন। উচিত অনুচিত বিবেচনা নাই। সত্য-মিথ্যা বাছিয়া পৃথক করার শক্তি নাই। অনুপযুক্তে প্রশংসার সীমা নাই, উপযুক্তে আদর-যত্ন ভালবাসা নাই। অযথা পুরস্কার, অযথা তিরস্কার, সাচ্চায় ঘৃণা, গিল্‌টিতে মহা আদর। এইরূপ ব্যবহারে ও আচরণে সকলেই বিরক্ত। মনে মনে সকলেই চটা, মনে মনে সকলেই শত্রু। সোনাবিবির মন কিরূপ, দাগাদারীর প্রতি সোনাবিবির মন এখন কিরূপ তাহা প্রকাশ পায় না।

দাগাদারী একখানা দলিল সৃষ্টি করিয়াছেন। উপযুক্ত ষ্টাম্পে চড়ান হইয়াছে, দস্তখত হয় নাই। দাগাদারীর মনের ভাব যে, হাসিমুখে কথাটা বলিলেই সোনাবিবি নাম সহি করিবেন। এত কথা শুনেন, আর একটা দস্তখতে আপত্তি করিবেন, কখনই নহে—কখনই নহে। অবশ্যই হাসি-খুসী, খোস-মেজাজে দলিলখানি সহি করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন। কথাটা ত আমার মনগড়া নহে, তাহার ইঙ্গিত আছে। সোনাবিবির পক্ষের উকিল মোক্তার কয়েকজনকে প্রত্যুষে সোনাবিবির নাম করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছেন। কি কারণে ডাক, সে কথা বলা হয় নাই। দাগাদারী মনে মনে স্থির করিয়াছেন যে, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার পক্ষ অবশ্যই অবলম্বন করিবেন। যাহা বলিব তাহাই শুনিবেন, সোনাবিবি পর্দ্দার আড়ালে, উকিল মোক্তারগণ পর্দ্দার বাহিরে, যথা যথা আসনে উপবেশন করিয়া পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছেন। দাগাদারী দোত কলম আর একখানা দলিল হাতে এ পাত সে পাত উলট পালট করিয়া ক্রমে দলিলের কথা সকলকে জানাইলেন। দলিলের আসল মর্ম্ম এই ঃ

সোনাবিবি দাগাদারীকে একখানা একরার লিখিয়া দিয়া, অঙ্গীকার করিতেছেন যে, "তুমি আমার অনেক খেদমত খাদিমী করিয়া, তাবেদারী করিয়া, সুখী করিয়াছ। জীবন অস্থায়ী, কোন সময় কি হয়, বলা যায় না। তোমার সেই উপকার স্মরণ করিয়া আমার সম্পত্তির আয় হইতে মাসিক একশত টাকা করিয়া মাসহারা পাইবে। দাগাদারী অভাবে তাহার উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্তগণও পুরুষ পুরুষানুক্রমে ঐ এক শত টাকা মাসহারা চিরকাল পাইতে থাকিবে। সোনাবিবির উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্তগণও দিতে বাধ্য হইবেন। সহজে না দিলে আদালত আশ্রয়ে লইতে পারিবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই দলিলে সকলের সাক্ষী হইতে হইবে। দাগাদারী এক পদ অগ্রসর হইতেছেন, এক পদ পশ্চাৎ হটিতেছেন। এমন স্বার্থ-সংযুক্ত দলিল, অথচ উকিল মোক্তারের হাতে দিবেন?

কি জানি, কি হয়। এই সকল ভাবিয়া কথা ফুটে ফুটে না। একরার সম্বন্ধে কথা উঠে উঠে না। উকিল মোক্তারগণও কোন কাজের কথা খুঁজিয়া পান না, প্রত্যেষেই ডাক্, কথাটা কি?—সোনাবিবিও কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। এত সকালে এরা কেন?

দাগাদারী দলিলখানা হাতে করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন, এবং সোনাবিবির চির বিশ্বাসী প্রধান মোক্তার ধিন্‌তাধিনা বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "আর কিছু নহে, আর কোন কথা নহে, এই দলিলখানার আপনারা সাক্ষী হইবেন, এই আমার বাসনা।"

ধিন্‌তাধিনা বাবু পাঠ করিয়া প্রধান হিতৈষী উকিল নাছোড়বান্দার হাতে দিলেন। ক্রমে সকলেই মনে মনে পাঠ করিয়া মনের ভাব গোপন করিলেন। কিন্তু চক্ষে মুখে, ভ্রূযুগলে, নাসিকার নানা ভাবে নানা ভঙ্গীতে নড়াচড়া হইয়া সেই অব্যক্ত ভাব অনেকটা প্রকাশ করিল। দলিলে সাক্ষী শ্রেণীতে নাম লিখা দূরে থাকুক, নাছোড়বান্দা উকিল বাবু, হীরার টুকরা অথচ পগারে পড়া মোক্তার বাবু, দাগাদারীর আপাদ-মস্তক আড়নয়নে দুই তিনবার দেখিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং বলিলেন "এ দলিলে আমরা সাক্ষী হইতে পারি না। বিশেষ আমরা বুড় বৃদ্ধ লোক, দলিল দস্তাবেজে সাক্ষী হওয়া নওজওয়ান মানুষের কাজ। আপনারা বসুন, আমরা চলিলাম।"

প্রধান দুইটির অনভিমত দেখিয়া আর আর সকলে তাঁহাদের পশ্চাৎ উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ভেড়াকান্ত বাবুও সে মজলিসে ছিলেন। দাগাদারী নাছোড়বান্দা,—ভেড়াকান্তকে সাক্ষীর শ্রেণীতে নাম লিখিতে ইঙ্গিত করিলেন। ভেড়াকান্ত বলিলেন, "আমায় নাম সহি করার কোন আপত্তি নাই। তবে এই দলিল যিনি দিতেছেন, তাঁর অভিপ্রায় কি, সেইটি জেনে পরে যাহা হয় করিব। যাঁর সম্পত্তি, যাঁর টাকা, তিনি যদি দেন, তবে আমার আপত্তি কেন হবে? দলিল-দাতার মনের ভাবটা জানা আবশ্যক।"

ধামাধরা বাবু বেতন-ভোগী মোক্তার। তিনি অন্য অন্য বাবুদের ন্যায় উঠিয়া যান নাই। তিনিও বলিলেন, "ভাল কথা! খোদ কর্ত্তার অভিপ্রায়টা কি? তিনি নাম সহি করলে আর কাহার আপত্তি থাকবে না।"

সোনাবিবি পর্দ্দার আড়াল হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথাটা কি? উকিল বাবুরা এলেন কেন? নীরবে চলে গেলেনই-বা কেন? তোমরাই-বা কি বলাবলি করছো? কার দলিল? কার নাম সই? কে করবে?"

পর্দ্দার মধ্যে মাথা দিয়া দাগাদারী বিজড়িত জিহ্বায় থাক থাক ভাবে বলিলেন, 'আমাকে যে যৎকিঞ্চিৎ মাসহারা সাব্যস্ত করে দিতে চেয়েছিলেন, তারই একটা লিখাপড়া করা হয়েছে।"

সোনাবিবি বিরক্তভাবে বলিলেন, "আমাকে ত কিছুই বল নাই। আমি এর কিছুই জানি না।"

দাগাদারী বলিলেন, "জানান ত আছেই। আজ আর নূতন করে কি জানাব?"

সোনাবিবির কানে কথা কয়েকটা খুব ধারাল অস্ত্রের মত বাজিয়া উঠিল। অন্তরেও

আঘাত লাগিল। একটু থামিয়া, একটু সুস্থ হইয়া, প্রকাশ্যে বলিলেন, "তার আর লিখাপড়া কি? তোমার মনে কি বিশ্বাস হয় না? না, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না? লিখাপড়া কেন? যেখানে অবিশ্বাস, সেইখানে দলিল, সেইখানেই রেজেষ্ট্রি। আমি তোমাকে কিছু মাসহারা করে দিচ্ছি, তোমার খোরাক পোষাক আবশ্যক মত খরচ সকলি আমার মধ্যে চলতেছে, এখন আর স্বতন্ত্র মাহিয়ানার দরকার কি? কালে অবশ্যই দরকার হবে। সে ভাবনা আমার মাথায় আছে। ঝাপঝুপ ভাই মাসে ৭৲ টাকা করে পেতেন। তার সঙ্গে তুলনা করলে তোমার পাঁচ টাকা হওয়া উচিত। তা আমি করবো না। তোমাকেও সেই ৭৲ টাকাই দিব। ঝাপঝুপ ভাইও যে পদে যে কাজে চাকর ছিল, তুমিও সেই কাজ, সেই পদে আছ, মাহিয়ানাও তাই পাবে। এ কথার জন্যে ষ্ট্যাম্পই বা কেন? লিখাপড়া সাক্ষী সাবুদই-বা কেন? ছি ছি! তোমার মন কেমন? ছি! ছি! বড়ই ঘৃণার কথা! ছি ছি! বড়ই বেজার হলেম। তোমার মাথায় কি কিছু রাখে নাই? এদিকে ত বড়ই সোজা দেখা যায়। কিছুই যেন বুঝে না, কিছুই যেন জানে না। ছি ছি! তোমাকে তোমার ঘরের লোক এত দূর অপদার্থ করেছে। ছি ছি! তোমার মাথায় কিছুই নাই। এই সময় কি ঐরূপ দলিল লেখাপড়া হওয়া, তোমার পক্ষেই ভাল, না আমার পক্ষেই সুবিধা? দেশসুদ্ধ লোকে বলে যে, ছেলেকে সম্পত্তি না দিয়ে দাগাদারীকে লিখে দিবে। আপন ছেলে—পেটের ছেলে—সে হলো পর, দাগাদারী হলো আপন। এই কথাটাতে আমি দশ হাত মাটিতে বসে পড়েছি। মাথাটি হেঁট করে, কত লোকের কত কথা দিনরাত সহ্য কচ্ছি। এই সময় ঐ দলিল লেখা হয়ে রেজেস্ট্রি হলে, বল ত কে আমাকে বিশ্বাস করবে? কে আমাকে ভাল বলবে? হাকিমান লোকই-বা কি বলবেন? শত্রু-পক্ষরাই-বা কি কবে? কুকথা, কুখ্যাতি, দুর্নাম, বদ্‌নাম, দশ গুণ বাড়ায়ে বলবে। আপোসে মিট্‌মাট হবার কথাটা যে চলেছে, তাও আর হবে না। তোমার আমার মধ্যে যে কথাটা গোপন ছিল, তুমি কোন্ বিবেচনায় তাহা বিশ কানে তুলে দিলে?"

দাগাদারী কোন কথা বলিলেন না। ধামাধরা বাবুর হাত ধরিয়া বাহির বাটীতে চলিয়া গেলেন। ভেড়াকান্তকে সম্বোধন করিয়া সোনাবিবি বলিলেন, "বাবাজি! দেখলেন ত? আপনি কথাটা না তুললে গোপনে গোপনে কাজ শেষ হত, কি ঝক্‌মারি করেছি। জেনে শুনে বিষের প্যালা হাতে করেছি। আর রক্ষা নাই।"

ভেড়াকান্ত দস্তরমত সেলাম বাজাইয়া বিদায় হইলেন, কোন কথা বলিলেন না।

পাঠক! দলিলের প্রসঙ্গ হইল। এখন গুরুজীর কথা বলিতে হইতেছে। এই নথিতে অনেক কথায় ইতি দেখিবেন। কারণ আমাদের উপন্যাসের যৌবন দশা উত্তীর্ণ হইয়া এই নথিতে মধ্য দশায় ঠেকিয়াছে।

গুরুজী চল্লিশ দিনের মধ্যে জয়ঢাককে সোনাবিবির কোলে আনিয়া দিবেন। ৬৮টি দিনরাত গত হইল, কিছুই হইল না। কোলের সন্তান কোলে আসিল না। সে তীর-ধনুকে, মন্ত্রের তুক-তাকে , গুণ-জ্ঞানে, বুকের মলা, কাটা চুলে কেনী কাটা কাপড়ে কিছুই হইল

না। ভিখারিণীর পরিশ্রম বৃথা হইল। গুরুজী মহাসুখে উদর জ্বালা নিবারণ করিয়াছেন। আসল কাজ কিছুই করিতে পারিলেন না। সোনাবিবির পক্ষের প্রাচীন প্রবীণ আমলা কর্ম্মচারী যাহারা গুরুজীর বিষয় অবগত ছিলেন, কথায় কথায় গুরুজী তাহাদের নিকট বলিয়াছেন, "আমার পরিশ্রম বৃথা হইল। সে দিকে রক্তবাণ—কাটা, যাদুমন্ত্র কটা লোক দাঁড়াইয়াছে। আমার মন্ত্র দুট্‌কে পড়িতেছে, ছিটকে ফিরে আসিতেছে, 'আসর' করিল না, কাজেই মন ফিরিল না। ছেলে মায়ের পদানত হইল না। দেখি, আরও কিছু দিন দেখি! এই সকল কথার পর গুরুজী এক রাত্রে কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহই বলিতে পারে না।

সোনাবিবি গুরুজীর পলায়ন কথা শুনিয়া আরও অস্থির হইয়াছেন। তাঁহার মনের গতি দিন দিন খারাপ হইতেছে, দাগাদারীর মাসহারার দলিল লিখার দিন হইতে সোনাবিবির মনের গতি দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতেছে। তিনি ভাবিয়াছেন, এ সংসারে কেহই আপনা নাই, ভালবাসা নাই। পেটের সন্তান, সেও ঐরূপ, তবে কার জন্য এত? এইরূপ ভাব মনে উদয় হইয়া দিন দিন সংসারের প্রতি ঘৃণার ভাগ বেশী হইতেছে। মনে মনে যে সকল আশা পোষণ করিয়া আশার কুহকে মাতিয়া, কত ভাঙ্গচুর, কত গড়াপেটা, কত কাণ্ডকারখানা, কত কার্য্য করিবেন, মনে মনে আশা ছিল, সে সমুদায় লোপ পাইতে লাগিল। যে একটি প্রধান আশা, পুত্রকে আনা—তাহা হইতে একেবারে নিরাশ হইতে হইল। তাঁহার হৃদয়াকাশে চারিদিক হইতে কাল মেঘ ঘিরিয়া আসিতে লাগিল। "দুঃসময় সমাগত, বেশী দিন নাই।" এই কুসংবাদ সময় সময় তাহার কানে চুপে চুপে কে যেন তুলিয়া সরিয়া পড়ে। সময় সময় মনেও নানা কথা উদয় হয়। সংসারের কার্য্য, জমিদারীর কার্য্য ভালমতে চলিতেছে না। দাগাদারী কর্ত্তা, কর্ত্তার ইচ্ছায় কার্য্য। কর্ত্তার অভিমত মকদ্দমা মামলার তদ্‌বির, তাহার পর কাহারও মনের গতি ভাল নহে। দাগাদারীর ব্যবহারে প্রধান চাকর হইতে ময়লা পরিষ্কার করার মেথর পর্য্যন্ত নারাজ, দাগাদারী প্রতি অসন্তুষ্ট। সম্মুখে, হাঁ—হু—চলিলাম, যথাসাধ্য পরিশ্রম করিব, চক্ষের অন্তর হইলে কিছুই নহে। কার কার্য্য কে করে? সকলেই বলে, "দাগাদারী বাবু বলেন সকলেই বসিয়া থাকে, তিনিই সমুদায় কাজ করেন, খাটিতে খাটিতে তাহার শরীর মাটি হইল।" এই সকল ভাবে ও কার্য্যে সোনাবিবির মামলা মকদ্দমা ক্রমে মাটি হইতে আরম্ভ হইল। দুই-একজন এই সকল বিষয় বলিলেও, দাগাদারীর কথাই প্রবল ও বলবৎ থাকে। বেশী দেখাশুনা তদন্ত ইত্যাদির নাম আর উঠে না, ক্রমেই চাপা পড়িতে আরম্ভ হইল।

আজ এই মকদ্দমায় হার, কাল ও মকদ্দমার নম্বর খারিজ, পরশু সম্পত্তির ডাক টেক্স দাখিল হয় নাই, পথকর, পাবলিক কর দেওয়া হয় নাই, কি অন্য সরীকে দেয় নাই, নিলামী এস্তেহার জারির সংবাদ। কোন এক কিস্তির বাকি খাজানাই কালেক্টরিতে জমা দেওয়া হয় নাই, নিলামের সংবাদ, কর্ম্মচারী খাজানার তহবিল ভাঙ্গিয়া পলাতক। অমুক ডিক্রী তামাদী। এই সকল কুসংবাদ সোনাবিবির কানে আসিতে লাগিল। দাগাদারী বাড়ীর মধ্যে বসিয়াই হাম্বি-তাম্বি করেন, রাগে ফাটিয়া যান, জেলা মহকুমা দ' করিয়া ফেলেন।

কাহাকে কাঁচা খান, কাহাকে গিলিয়া ফেলেন, কাকেও-বা কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া যা ইচ্ছা তাই করেন, কিন্তু আসলে কিছুই নহে। সোনাবিবি পূর্ব্বে দুই এক কথা বিশ্বাস করিতেন, এখন দাগাদারীর একটি কথাতেও আর আস্থা নাই। কিন্তু তাহার মতের বিপরীত কার্য্য করিতে অক্ষম। কি করেন, মনের আগুনে নিজেই জ্বলিয়া পুরিয়া খাক হইতেছেন। তাঁহার প্রধান চিন্তা অলি অছি খারিজের মকদ্দমা। হাকিমান নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে নাবালকের ষ্টেটে ঋণ নাই, সমুদায় ঋণ নিজের। যদি অলি অছি হইতে খারিজ হন, তবে সমুদায় ঋণ নিজের মাথায় চাপিবে। নাবালকের জমিদারী যে দখলে ছিল, তাহা আর রাখিতে পারিতেছেন না। মকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বেই জয়ঢাকের মন্ত্রদাতা কার্য্যকারকগণ কৌশলে দখল করিতেছেন। আজ ও-গ্রামের প্রজা জমদ্বারে খাজনা দিতে গেল, কাল ও-গ্রামের প্রজা নজর সেলামী দিয়া জয়ঢাকের সহিত আপোস করিল। দাগাদারী কিছুই করিতে পারিলেন না। যে কার্য্যে হাত দিতেছেন, কতক তাঁহার বুদ্ধির দোষে, কতক অন্য অন্য নিমকহারাম হিন্দু আমলাগণের শয়তানী জুয়াচুরিতে একেবারে বিনষ্ট হইতেছে। রক্ষার উপায় আর নাই, নানা পথে নানা প্রকারে মাটি হইতেছেন।

কয়েক মাস এই ভাবেই কাটিয়া গেল। একদিন নচ্ছার জেলা হইতে সংবাদ আসিল যে, অলি অছি খারিজের মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। দুই পক্ষে উকিল, মোক্তার, ব্যারিষ্টার খাড়া হইয়াছেন। জয়ঢাক, ধুম্বলোচন, ঘর-ভাঙ্গা, মাথা-পাগ্‌লা, ঘসা-পয়সা সকলই উপস্থিত আছেন। সোনাবিবি পক্ষে বে-আক্কেল মকদ্দমা চালাইতেছেন। দাগাদারী বাড়ীর মধ্যে থাকিয়াই লম্পঝম্প করিতেছেন। তর্ক-বিতর্ক শেষ হইলে, কয়েকদিন পর হাকিম রায় প্রকাশ করিলেন, "সোনাবিবি নাবালকের ষ্টেট ভালমতে রক্ষণাবেক্ষণ করেন নাই। অলি অছি পদ হইতে খারিজ। নাবালক কোন প্রকার ঋণ দায়ে দায়ী নহেন।"

এই সংবাদে সোনাবিবির মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্রন্দন ভিন্ন আর উপায় কি? দাগাদারী মুখে অনেক আশা-ভরসা দিলেন, আপীল করিয়া হুকুম রদ করিবেন, বিচারককে ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলাইবেন, নিতান্ত পক্ষে কালাপানিতে পাঠাইবেন। নিজ পক্ষের উকিল মোক্তার ব্যারিষ্টারগণকে যথোচিত খাতির তোয়াজের সহিত নানা প্রকারে সম্বোধন করিলেন। সোনাবিবির সংসারে সোনাবিবির সহিত ষ্টেটের সহিত যাহার যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, আশা-ভরসা সংশ্রব ছিল, সমুদায় মিটিয়া গেল। কার আশায় কে থাকে? কার কথা কে রাখে? সোনাবিবির আর আছে কি? থাকিবে কি? সকলেই আপন আপন পথ চিন্তা করিয়া সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ জলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যেরূপ পূর্ব্বাবস্থার চিহ্নমাত্র থাকে না, অল্প সময় মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটে, সোনাবিবির সংসার দেখিতে দেখিতে সেইরূপ ভাঙ্গিয়া গেল। অন্য অন্য পাওনাদারগণ হতাশ হইয়া আপন আপন পাওনার দাবিতে নালিশ রুজু করিয়া দিল। ধনকুবের টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করিলেন। এখন উপায় কি? সোনাবিবি এই সকল ভাব দেখিয়া শুনিয়া একেবারে শয্যাধরা হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন, কি উপায়ে এই মহাঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন, দিবা-রজনী

সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, সংসার-কাণ্ডে তাঁহার সুখ আর নাই। একটি সন্তান, সেও না থাকার মধ্যে। ক্রমেই ঋণ বেশী হইয়া সাধারণ লোকের নিকট অপমানিত হইতে হইবে। এক দাগাদারী তাহার ক্ষমতা বুদ্ধি সকলি পরীক্ষা করিয়াছেন। সে যে বুদ্ধিবিদ্যা ব্যয় করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবে, সে আশা দুরাশা মাত্র।

যাহা হউক, অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বর-উপাসনায় কর্ত্তন করাই তাঁহার মনের সঙ্কল্প হইল। কালে ঋণদায়ে সমুদায় বিক্রয় হইয়া যাইবে। পরিণাম ফল যাহা, তিনি তাহা যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, দাগাদারীর কথায় আর ভুলিলেন না। সুখ-সূর্য্যের মুখ আর দেখিবেন না, সে সুখের দিন আর আসিবে না। এই পথ—এই পথই সুপ্রস্ত উদ্ধারের পথ। মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিয়া স্থাবর-অস্থাবর যত সম্পত্তি ছিল, সমুদায় ক্রমে ক্রমে বিক্রয় করিলেন। ঋণ পরিশোধ করিয়া বিস্তর টাকা হাতে মজুত হইল। বিশ্বাসী একজন হাজী ও একটি চাকরাণী সঙ্গে করিয়া পবিত্র ধাম মক্কায় চলিয়া গেলেন; কাহারও বাঁধা মানিলেন না, কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। জন্মভূমির মায়া, সন্তানের মায়াতেও মনের গতি ফিরাইলেন না। একমনে সেই পরম কারুনিক খোদাতালার পদে মনঃপ্রাণ সপিয়া, মহাতীর্থ মক্কাধামে চলিয়া গেলেন।

আর দাগাদারীর মান-মর্য্যাদা কি? কে জিজ্ঞাসা করে? যাহারা দশ হাত তফাতে থাকিয়া ঘাড় নওয়াইয়া সেলাম করিত, এইক্ষণে বুকো-বুকি মুখোমুখি হইলেও কথা কহে না। যেখানে সোনাবিবির কথা উঠে, সেইখানে দাগাদারীর মুখেই লোকে কালিচুন দেয়, শত প্রকারে সহস্র মুখে নিন্দা করে।

দাগাদারীর অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হইতে আরম্ভ হইল। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য বেগম ঠাকুরাণী। সময় সময় ঠাকুরাণীর নিকট যাওয়া-আসা করেন। বেগম ঠাকুরাণীর মনের আশা পূর্ণ হইয়াছে। সোনাবিবি সম্বন্ধে তাঁহার মনের আশা ষোল আনা রূপে পূর্ণ হইয়াছে। চিরশত্রু সোনাবিবির একেবারে ভারত পরিত্যাগ—ইহজীবনে আর আসিবার সম্ভাবনা নাই। দাগাদারী এখন আশ্রয়শূন্য, এখন দাগাদারীকে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। দাগাদারী এখন পথের ভিখারী, যে-বলে দাগাদারীর এত বল-বিক্রম ছিল, তাহা এখন নাই; সুতরাং দাগাদারী চক্ষেই পড়ে না। তবে সময়ে সময়ে বেগম ঠাকুরাণীর বাড়ীতে যাওয়া আসা করেন বটে, কিন্তু আদর-অভ্যর্থনা ভালবাসার নাম গন্ধ নাই, না গেলেও ডাকা নাই।

কয়েকদিন যাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। দারওয়ান গেট্ হইতেই হাঁকাইয়া দিয়াছে—"আভি ফরসুৎ নাই।" কি করেন, বেগম ঠাকুরাণীর ফুরসুৎ নাই, কি করিয়া দেখা হইবে? ফিরিয়া যান। মুখখানি ম্লান করিয়া ফিরিয়া যান, আর মনে মনে দুঃখ করেন, পুরান কথা সকল অন্তরের ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে।

দাগাদারী! পুরাতন কথা ফুটিয়া উঠিলে এখন কি হইবে? অবস্থাই মান-অপমানের

মূল। এই বেগম ঠাকুরাণী কোনদিন তোমার হাতে ক্রীড়ার পুত্তলী ছিলেন। তুমি বসিতে বলিলে বসিয়াছেন, খাইতে বলিলে খাইয়াছেন। একত্র এক টেবিল ভিন্ন কাহারই মুখে অন্ন যায় নাই। আজ দেখ দেখি? দশ দিন হাঁটিয়াও দেখা পাইতেছ না। "ফুরসুৎ নাই" শুনিয়া মুখখানি ভারী করিয়া ফিরিয়া যাইতেছ। মানুষের কোন সাধ্য নাই। ঈশ্বরে ধন্যবাদ দাও, তিনি সকলি করিতে পারেন।

একদিন দাগাদারী বেগম ঠাকুরাণীর দেখা পাইলেন। দাগাদারীকে বসিতে বলিয়া বেগম ঠাকুরাণী অন্য ঘরে যাইয়া চিঠিপত্র লিখিতে বসিলেন। এখন দাগাদারী এতই নীচ যে, লিখিবার ঘরের মধ্যে বসিবারও উপযুক্ত নহে। কিছুক্ষণ পরে বেগম আসিয়া বলিলেন, "মনে হয়? ভেড়াকান্তের স্ত্রীকে বললেই সমুদায় কাগজপত্র দেখিয়ে দিবে, সে কথা মনে হয়? ভেড়াকান্তের স্ত্রী তোমার কথায় কাগজপত্র তোমায় দেখাবে, তুমি যে কাগজ চাইবে, সেই কাগজ দিবে, কথাটা শুনেই আমার বিশেষ সন্দেহ হয়েছিল। আবার ভাবলেম্, ভেড়াকান্তের সঙ্গে তোমার হরিহর আত্মা, হলেও হতে পারে। কেমন ক্ষমতা? কেমন আলাপ? কেমন ভালবাসা?—দেখ! সেই কারণে—তুমি আনতে পারলে না, সেই কারণে আমার কত অনিষ্ট হলো। এখন বাধ্য হয়ে বৃদ্ধ বয়েসে হলপ করে মিছে কথা বলতে হলো। কি করি, মকদ্দমার জন্যে মিছে বল্‌তে হয়, তা না হলে সংসার চলে না। ভেড়াকান্ত তোমার মাথায় কাঁঠাল রেখে ভেঙ্গে খেয়ে মনস্কামনা সিদ্ধি করল। তুমি ভূতের বোঝা বয়েই মলে। আমি ঋতুরাজ বাবুর দ্বারা খুব জব্দ কর্ত্তে পার্ত্তেম, তা হলো না—ভারি ধড়িবাজ, মকদ্দমা জিলায় উঠিয়ে নিয়েছে। আচ্ছা, তুমি লিখা দেখে অর্থাৎ এবারত দেখে, লিখার ভাবভঙ্গী দেখে চিন্তে পার কার লেখা?"

দাগাদারী সদর্পে বলিলেন, "হাঁ, তা পারি। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা লিখতে এক দাগা ভিন্ন অন্য কেহ নাই। ঠিক জানবেন, কেহ নাই। যখন কেউ কোন পুস্তক লিখে নাই, তখন এই দাগাদারীর কলমে 'জটিলা কুটিলা লীলা' বাহির হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাকরে সমালোচনা করে বেশ লাভ করেছিলেন। পাঁচ হাজার প্রভাকর নগদ বিক্রয় হয়। আজকাল যত লেখা দেখেন, সে লেখা কোন কাজের লেখা নয়, সেই একঘেঁয়ে সম্বরে লিখা। স্বভাব কবির মাথা, মনোহারী মুদি, ময়রা, বন্দুকের দোকান। রস ভরা রসগোল্লা পদ্য চাও, সোনায় গিল্‌টি করা গলার মালা উপন্যাস চাও, ছানার সহিত মিশ্রীর বুক্‌নী মিশান ছানাবড়া নাটক চাও, খাঁটি ময়দার ইতিহাস চাও, ঝাড়া ছাঁটা বাছাই করা ৻ ৷টা গোটা দাদখানী টেবিল রাইস সাহিত্য চাও,—অভাব নাই। মধুর কণ্ঠের মনোমোহন রাগিনীর সহিত সঙ্গীত চাও, কামানের শব্দ, বন্দুকের আওয়াজ তীর-তরবারির খেলা, বীর রসে পোরা সমরকাণ্ড চাও,--অভাব নাই। যা চাও তাই পাবে। যা যা দরকার, ·লি মিলবে। আপনার এই দাগাদারী দেখতে কুৎসিত, নাম-ডাক নাই; কেউ চিনে না—এতে সকলি আছে। দাগাদারীর মাথায় না আছে, এমন জিনিস নাই। তবে গাঁয়ের ফকির ভিক পায় না, এই যা দুঃখ। দেখি, আনুন দেখি! কার কি লিখা?"

বেগম একখানি সংবাদ-পত্রিকা আনিয়া চিহ্নিত স্থান দেখাইয়া দিলেন। দাগাদারী মনে মনে পাঠ করিয়া বলিলেন, "এ কোন মাতালের লিখা হবে। কাগজখানির নাম শশধর। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, আগরা হতে পারে মুর্শিদাবাদের ছায়া নিয়ে লিখেছে। হতে পারে কল্পনা।"

"সে সকল বিচার কর্ত্তে তোমাকে ভার দিচ্ছি না। লিখাটা কার?"

"লিখাটা কোন মাতালের?"

"সে মাতাল কে?"

"যে মদ খায়।"

"মদ খায় না ক'জন? তোমাকে দেখালেম কেন? তুমি একজন স্বভাব কবি, বেছে বাহির কর দেখি, এ লিখাটা কার?"

'তা ত ঠিক বলতে পাল্লেম না। কার বোঝা কার ঘাড়ে ফেলবো?"

বেগম ঠাকুরাণী কাগজখানা লইয়া বলিলেন, "তুমি এখন যেতে পার। ঋতুরাজ বাবুর বদলীর চিঠি এসেছে। এখনি আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে আস্‌বেন। তুমি না হয় কাল এসো।"

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যা 'হাফেজ' পত্রিকায় মশাররফ হোসেন 'উদাসীন পথিক' ছদ্ম নামে নিম্নলিখিত কবিতাটি প্রকাশ করেন। কবিতাটিকে তিনি 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র চতুর্বিংশ নথির শেষ অংশ বলেছেন। 'আমার জীবনী' গ্রন্থে বস্তানীর একবিংশ থেকে চতুর্বিংশ নথি প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে এ-কবিতাটি নেই।

"বর্তমান মুসলমান সমাজের একখানি চিত্র"

১। দ্বিতল ত্রিতল ঘর
খাড়া আছে ভিত্তি 'পর,
সুর্কি চুন খসিয়া পড়েছে।

২। জানালা কপাট ভাঙ্গা
ভেঙ্গে পড়ে ইট রাঙ্গা,
কত গাছ শিকড় ছাড়িছে॥

৩। চামচিকে আরশুলা
দিনকানা পেঁচা গুলা
গিরগিটি জেঠী করে বাস।

৪। যাদের বাসের কথা
কুঁড়ে বেঁধে আছে তথা,
দালানের এপাশ ওপাশ॥

৫। পেটে নাই অন্ন কণা
পরিয়াছে ছেঁড়া টেনা
ছেঁড়া কাঁথা কাহার সম্বল।

৬। গরমে পরাণ যায়,
ঠেকিয়া লজ্জার দায়
গায় দেয় দো-সূতী কম্বল॥

৭। কেহ মোট খেটে খায়
কেহ বোটে দাঁড় বায়
কেহ কাটে জঙ্গলের কাট।

৮। কাঁটায় চিরিছে গা
কুড়ালে কাটিছে পা
শিরে কাট, ফিরে সারা হাট॥

৯। সে হাট তাদেরি (হি) ছিল,
মহাজন বেচে নিল,
এবে তারা কড়ার ভিখারী।

১০। মোটা কচু, কাঁচা কলা
আলু ওলে ভরি জালা,
বেচিতেছে বসিয়া দোধারী॥

১১। কাহার মাথায় বোঝা,
ভারেতে হইয়া কুজা
সোজাভাবে চলিতে না পারে।

১২। আজ অন্ন পেটে নাই
পাইবে দুই এক পাই
"ক" দিন চলিবে আর ধারে?

১৩। তামাক, আগুন, টিকে
জোগাইছে দোকানিকে
কেহ দেয় কলিকা সাজিয়া।

১৪। মাসি বরাদ্দ আছে
তাতেই পরাণ বাঁচে,
ছেলেমেয়ে পরিবার নিয়া॥

১৫। এ হাট তাদেরি ছিল
ফাঁকি দিয়ে কেড়ে নিল
পুরাতন নায়েবের ভাই।

১৬। পৈত্রিক বসত বাড়ী
পুষ্করিণী গোলাবাড়ী
কিনিয়াছে তাহার জামাই॥

১৭। প্রথমেতে "ছুঁচ" হয়ে
পশে হিন্দু রয়ে রয়ে
মুসলমান জমিদার ঘরে।

১৮। ক্রমে চেপে বসে ঘাড়ে,
সাধ্য নাই মাথা নাড়ে
"ফাল" হয়ে ফাড়ে চেরে পরে।

১৯। বেঁড়ে বুড় বলদেরে
চোম্বা বলি সমাদরে
সদা মুখে যে আজ্ঞা হুজুর।

২০। সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়
জোড় হাতে কথা কয়
তোষামদে বড় বাহাদুর॥

২১। গণ্ডমূর্খ জমিদার
ফুলে হল ঢোলাকার
শুনিতেও ভাল লাগে কানে।

২২। আগ পাছ নাহি চান,
আহ্লাদেতে গলে যান
খাবি খান খুসীর তুফানে॥

২৩। যদি বলি জল উচা,
বলে হিন্দু তাই সাচা
প্রতিবাদ করে না কাহার।

২৪। বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন,
একেবারে অর্বাচীন
বাঙ্গালার প্রায় জমিদার॥

২৫। অলসের দাস হয়ে
বিছানা বালিশ লয়ে
গড়াগড়ি যান দিনরাত।

২৬। মুখে দিতে দুটো ভাত
উঠে না উপরে হাত,
দিন দিন হয় কুপকাৎ॥

২৭। কাৎ হয়ে, চিৎ হয়ে
হুকো টানে শুয়ে শুয়ে,
মুখে করি সুবাসিত নল।

২৮। পরনিন্দা গ্লানি গীত,
শুনে হন হরষিত
গায় গীত মোসাহেব দল॥

২৯। যাহারা দেশের মান
মানি মধ্যে মান্যমান
ছিল মান সম্ভ্রম প্রচুর।

৩০। তাঁদের তনয় যাঁরা
আরদালি হরকরা
হইয়াছে মুটিয়া মজুর॥

৩১। সদরালা পুত্র যিনি
কাছারীতে পাখা টানি
করিছেন দিন গুজরান।

৩২। কেহ লাল পাগ বেঁধে
চাপরাস করি কাঁধে
পোড়া পেট জ্বালায় হয়রান।

৩৩। ডেপুটির পুত্র হয়ে
ডেপুটির বাক্স লয়ে
পালকির আগে আগে ধায়।

৩৪। মুন্সেফের সন্তান
মারিয়া তামাকে টান
বাজারেতে টিকে বেচে খায়।

৩৫। লক্ষপতি জমিদার,
সন্তান-সন্ততি তাঁর
খেটে খায় অপরের বাড়ী।

৩৬। কাযেতে করিলে হেলা,
মার খায় দুই বেলা,
জুতা লাথি খড়মের বাড়ী॥

৩৭। কটিতে কাপড় আঁটা
হাতেতে বাঁশের ঝাঁটা,
যায় কাঁটা ফেলিতে পথের।

৩৮। জিজ্ঞাস তাঁহার ঠাঁই,
পরিচয় পাবে ভাই,
সে যে পৌত্র কোন নবাবের॥

৩৯। হইয়ে ঘোড়ার ঘাসী,
ঘাস তোলে রাশি রাশি
খুরপই খুন্তির সহায়।

৪০। পরিচয় জিজ্ঞাসিলে
সত্যকথা প্রকাশিলে
অবিশ্বাস করিবে তাহার॥

৪১। খাঁ বাহাদুরের নাতী
ছিল কোটা বাড়ী হাতী
আয়মাদার কিবা জমিদার।

৪২। গিয়াছে যা ছিল হায়,
বার ভুতে লুটে খায়,
এবে হইয়াছে খুন্তি সার॥

৪৩। ঐ যে ভিখারী যায়,
ঝোলা ঘাড়ে ফিরে চায়,
ডাক ওরে জিজ্ঞাস কি বলে।

৪৪। বাপ দাদা ধনবান,
ছিল বড় মান্যমান,
মাথা হেঁটে পূজিত সকলে॥

৪৫। তাহাদের বংশধর
ভিক্ষা মাঙ্গে ঘর ঘর,
হাতে মালা কাঁধে ছালা ঝুলী।

৪৬। গলায় তসবির দানা
দেরে বাবা! এক দানা,
প্রাণ যায়; মুখে এই বুলী॥

৪৭। দেখ দিল্লী লক্ষ্ণৌ গিয়ে,
আছে ভস্মে আচ্ছাদিয়ে,
কত মহামূল্য রত্ন ধন।

৪৮। শাহানশার বংশধর
পান বেচে করে ঘর,
কোচয়ানী করে কোন জন॥

৪৯। নবাব কুলের কুল
বেচিতেছে ফল মূল
মাথায় করিয়া বোঝা বোঝা।

৫০। আম, জাম, নারিকেল,
খরমুজা, পাকা বেল
ভারে দেহ হইয়াছে কুজা॥

৫১। হাতেতে হীরার বালা,
গলায় মোতির মালা,
কানে এয়ারিং ফিরোজার।

৫২। পায়েতে সোনার মল
করিতেছে ঝলমল,
কটিদেশে হেমচন্দ্র হার॥

৫৩। বেগম নবাব জাদী
বাইজীর হল বাঁদী
কেহ সাদী করে ভেড়ুয়ায়।

৫৪। কেহ গুড় গুড়ী মাজে,
কেহ-বা তামাক সাজে,
কেহ বাও করিছে পাখায়॥

৫৫। বঙ্গের বুনেদী দল
গেছে সবে রসাতল,
কেহ মরা কেহ আধমরা।

৫৬। গেছে সবে হিন্দু ঘরে,
কেহ না তা দৃষ্টি করে,
আরও মুখে বলে ভাল তারা।

৫৭। একবার মাথা তুলে
দেখ ভাই চক্ষু মেলে
মুসলমান কিসে হল সারা।

৫৮। জমিদারী কোথায় গেল
সোনারূপা কি হইল,
এত ঘর কিসে গেল মারা॥

৫৯। চিরকাল হিন্দুগণ
করিতেছে নির্যাতন
তবু জ্ঞান হলনারে হায়।

৬০। নিতেছে সকল টেনে,
তবু তারে নাহি চিনে,
চক্ষে ধাঁধা এমনি লাগায়॥

৬১। দেখ যত হিন্দু ঘর
কিসে হল ধনেশ্বর,
খোঁজ দেখি কারণ ইহার।

৬২। প্রতি মুসলমান ঘরে,
চাকুরীর সাজ পরে,
সর্বনাশ করিল সবার॥

প্রকাশক—"উদাসীন পথিক।"